কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দ্বাদশ খণ্ড

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

KIRITI OMNIBUS Vol XII
Collection of Detective Stories & Novels
by Niharranjan Gupta
Published by Amar Sahitya Prakashan
7 Tamer Lane, Cal-9

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭০
দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯১

প্রকাশক :
এন. চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট :
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

সমাজজীবন যখন পূর্ণ পরিণতি লাভ করেনি, অর্থাৎ মানুষ যখন আর দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে সুশৃঙ্খল ও সুসংহত জীবন যাপন করতে শেখেনি, সভ্যতার সেই ঊষাকালে দেশের শাসনযন্ত্র অথবা প্রচলিত আইন-কানুন কিছুই সাধারণ মানুষের বন্ধু বা হিতৈষী ছিল না। আইন যাঁরা তৈরি করতেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাঁদের একমাত্র অভীষ্ট—নানাবিধ কালা-কানুনের সুযোগ নিয়ে অসাধু রাজপুরুষ, অত্যাচারী ভূস্বামী ও অর্থগৃধ্নু কুসীদজীবী একযোগে সাধারণ প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন চালিয়ে যেত। আইন তাদের রক্ষা করত না—তারা ছিল আইনের শিকার। আর রাজশক্তি পরিচালিত শাসনযন্ত্র ছিল শোষণযন্ত্রেরই রূপান্তর মাত্র।

অর্থাৎ যাদের রক্ষক হওয়া উচিত ছিল তারাই হয়ে উঠেছিল ভক্ষক, শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী।

যখন মানবসমাজের আবহ-পরিমণ্ডল ছিল এই ধরনের, তখন অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে রক্ষাকর্তা হিসাবে মানুষ কাদের কথা ভাবত? নিশ্চয় রাজকীয় আরক্ষাবিভাগের ঊর্ধ্বতন বা নিম্নতন কোন কর্মকর্তাদের কথা নয়। তখন নানা কাহিনী কিংবদন্তী ও গাথাকাব্যের মধ্য দিয়ে পরিত্রাতা-রূপে মানুষ তাদের মূর্তি আদর্শান্বিত করে তুলত, তারা সবাই ছিল আধুনিক বিচারে রাষ্ট্রদ্রোহী সমাজবিরোধী দস্যুতস্কর শ্রেণীর লোক—যেমন ইংলণ্ডের রবিন হুড, স্কট্‌ল্যাণ্ডের রব্‌ রয়, অথবা আমাদের দেশের রঘু ডাকাত বা বাবু বিশ্বনাথ। মধ্যযুগে এবং তার বেশ কিছু পরেও এদের হাতেই ছিল অত্যাচারীর ও অপরাধীর শাস্তিবিধানের ভার।

গোয়েন্দা-কাহিনী লেখার সময় তখনও হয়নি।

এর পর ধীরে ধীরে সমাজগঠনে সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা দেখা দিল, মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, রাষ্ট্রপরিচালকদের মধ্যেও এক নূতন ধরনের দায়িত্ববোধের সঞ্চার হল। তখন রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হল অত্যাচারের প্রতিকার ও অপরাধের দণ্ডদানের ভার। এ সময় যদি রবিন হুড বা রঘু ডাকাত বেঁচে থাকত তাহলে নিশ্চয় তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়ে যেত। বস্তুতঃ আদর্শবাদী চোরডাকাতের চেয়ে রাষ্ট্রশক্তির ও শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত আইন-আদালতের ওপরেই এ যুগের মানুষের আস্থা বেশি।

এই যুগেরই অন্যতম ফসল হল গোয়েন্দা-কাহিনী।

আবও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে বাখা ভাল। অনেক মনস্তাত্ত্বিকের মতে আমাদেব প্রত্যেকের ভিতবে ইচ্ছা পরিপূরণেব একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশই আমবা দেখতে পাই নানাবিধ শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। কথাটা অন্যধরনের শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে কতখানি সত্য তা বিতর্ক-সাপেক্ষ, কিন্তু 'Crime and Punishment'-জাতীয় সাহিত্যের বেলায় তাব সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহেব বিন্দুমাত্র কারণ নেই। পরস্বাপহারী দস্যুপ্রতিম সামন্তরাজেব বা মঠাধ্যক্ষ মোহান্তেব সর্বস্বলুণ্ঠন ও চবম নিগ্রহ দেখতে পেলে সমসাময়িক জনগণের আনন্দের অবধি থাকত না—ববিন হুডকে দিয়ে ঠিক তাইই করানো হয়েছে। আবার আজকাল প্রতিদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্রের পাতা ওলটালে যেসব চুবি জুয়াচুরি ছিনতাই ডাকাতি ও নির্মম হত্যাকাণ্ডেব খবব চোখে পড়ে, মনে হয় না কি যে এখুনি ছুটে গিয়ে তাব প্রতিবিধান কবে আসি, স্বহস্তে সমস্ত অপরাধীকে যথোপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত কবি? কিন্তু হায়। দবিদ্র দোকানদাব বা কেবানী বা স্কুলমাস্টার আমবা—কতটুকুই বা আমাদের সাধ্য? তাই সেই অতৃপ্ত ইচ্ছা পূবণেব জন্য আমাদেব প্রয়োজন হয় কতকগুলি প্রতীক-চবিত্রেব—শার্লক হোমসেব, এর্কুলে পোয়ারো-র, ব্যোমকেশেব অথবা কিবীটীব।

অপবাধীব উপযুক্ত শাস্তি হোক, গোয়েন্দা-কাহিনীব প্রত্যেকটি পাঠকেরই এই কামনা—এবং এই কামনাব চরিতার্থতাতেই গোয়েন্দা-কাহিনীব সার্থকতা। যদি কোন লেখকেব রচিত প্রতিটি উপন্যাসেব উপসংহাবেই আমরা দেখতে পাই অপবাধী কে তা জানা গেল না অথবা গোয়েন্দাকে ফাঁকি দিয়ে অপরাধী পালিয়ে গেল তা হলে সে লেখকেব গোয়েন্দা-কাহিনী বচনা ছেড়ে দেওয়াই উচিত—তিনি কোনদিনই জনপ্রিয়তা অর্জন কবতে পাববেন না।

কবে কোন্ ভাষায় কাব দ্বাবা প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনী রচিত হয় তা আমাব জান, নেই। আমি গবেষক নই, পাঠক মাত্র। কেউ কেউ নাকি প্রাচীন মিশবের প্রস্তবগাত্রে উৎকীর্ণ প্রস্তলিপিব মধ্যে, বাইবেলের 'Old Testament' গ্রন্থে, ভার্জিলের মহাকাব্যে এবং ইতিহাসেব গলিঘুঁজিতে অনেক গোয়েন্দা-কাহিনীর বীজ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আমাব বিশ্বাস, 'ডিটেক্‌টিভ উপন্যস বা গল্প' বলতে আজ আমরা যা বুঝি এসবের কোনটিই ঠিক সে বস্তু নয়। পূর্বে আমি যে আলোচনা করেছি তা থেকে প্রমাণিত হয় যে এই জাতীয় কাহিনী প্রাচীন যুগে সৃষ্টি হয়নি—সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না।...

আমার গবেষক হওয়ার পথে মস্ত বড় একটা বাধা আছে—ইংরেজি ও বাংলা ছাড়া আমি আর কোন ভাষাই জানি না। এই অতি সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে এবং প্রধানতঃ নিজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তা থেকে বলা চলে যে ইংরেজী ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা-কাহিনী রচনা করেন বিখ্যাত আমেরিকান কথাসাহিত্যিক এড্‌গার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯)—এ সম্মান কোন ইংলণ্ডীয় সাহিত্যিক অর্জন করতে পারেননি। তিনি চারটি মাত্র ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনা করেছিলেন, তার তিনটির রহস্যভেদ করেন ফরাসী সখের গোয়েন্দা মঁসিয়ে ডুপ্যাঁ। পরবর্তী বহু গল্পোপন্যাসে আমরা বার বার যেসব অ-পেশাদার ডিটেক্‌টিভের সাক্ষাৎ পাই তাদের সকলেরই একমাত্র পূর্বপুরুষ হলেন এই ডুপ্যাঁ।—অনেক সমালোচকের মতে এর পর যত গোয়েন্দা-কাহিনী রচিত হয়েছে তাদের সবগুলিরই মূলীভূত কাঠামো বা নকশা নাকি এই চারটি গল্পের মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে নিহিত আছে। মন্তব্যটিকে অর্ধসত্যের অতিরঞ্জনরূপে গ্রহণ করাই ভাল বলে মনে হয়।

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্‌সের বন্ধু উইল্কি কলিন্‌স্ (১৮২৪-১৮৮৯) অপরাধ ও অপরাধীদের নিয়ে দু-খানি এই জাতীয় উপন্যাস লিখেছিলেন—এখনও সে দু-খানি মাঝে মাঝে মুদ্রিত হয় এবং লোকে পড়েও থাকে। ডিকেন্‌স্ নিজে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকালে যে উপন্যাসখানি অসমাপ্ত রেখে যান সেখানিও গোয়েন্দা-কাহিনীরূপেই পরিকল্পিত হয়েছিল।—কিন্তু এই দুজনের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিকেরা বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

পো-র পরেই যাঁর নামোল্লেখ অবশ্যকর্তব্য তাঁর জন্ম হয় পো-র মৃত্যুর দশ বছর পরে। ইনি খাস ইংলণ্ডেরই অধিবাসী—ইংরেজ। এঁর নাম আমরা সবাই জানি—সার আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০)। এঁর হাত ধরে আমরা যে যুগে এসে পৌঁছাই সেটা আধুনিক যুগই বটে, কিন্তু তবু তার সর্বাঙ্গে সেকালের রঙ—তিনি লণ্ডন নগরীর যে ছবি এঁকেছেন আধুনিক যুগের নাগরিকদের কাছে তা একান্ত অপরিচিত। তার পথে পথে মোটর-হর্নের পরিবর্তে শুনতে পাওয়া যেত নাল-বাঁধানো ঘোড়ার পায়ের খটাখট্ শব্দ—তখনকার লণ্ডনে ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া অন্য কোন রকমের ভাড়াটে যান মিলত না—বাসগাড়িও ঘোড়ায় টানত, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জ্বলে উঠত বিজলী-বাতির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণদীপ্তি গ্যাসের আলো, শহরের মধ্যে অনেক জায়গায় খোলা মাঠ-ময়দান পড়ে থাকত—রাত্রিকালে শহরের অনেকাংশে চলাফেরা

করা বিপজ্জনক ছিল। অর্থাৎ কোনান ডয়েলের লণ্ডন আধুনিক হলেও অত্যাধুনিক ছিল না।

এই লণ্ডন শহরের বেকার স্ট্রীটে অবস্থিত একটি গৃহে বাস করতেন একজন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ—তাঁর নিজস্ব কিছু বিত্তসংস্থান ছিল, জীবিকার্জনের জন্য কোন কাজ করতে হত না। অত্যন্ত অগোছালো স্বভাব, যতক্ষণ জেগে থাকতেন ক্রমাগত পাইপ টানতেন, ছোট্ট একটি ল্যাবরেটরিতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন—হাতে কোন কাজ না থাকলে হয় বসে বসে বেহালা বাজাতেন নয়তো চণ্ডুর নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতেন। অতি সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি এবং এই ধীশক্তির প্রয়োগ করতেন অপরাধবিজ্ঞানের চর্চায় অথবা সেই বিজ্ঞান-পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনুষ্ঠিত অপরাধের রহস্য-সন্ধানে।

ইনিই হলেন কোনান ডয়েলের বিশ্ববিশ্রুত সৃষ্টি, শার্লক হোম্‌স্—নিখিল-বিশ্ব-গোয়েন্দা-সাম্রাজ্যের অবিসংবাদী অধীশ্বর। ইংরেজীভাষাভাষী উচ্চনীচ সর্বশ্রেণীর জনগণ—ডিউক থেকে ট্রাক-ড্রাইভার পর্যন্ত—সকলেই যে-তিনটি সাহিত্যিক চরিত্রের নাম সদাসর্বদা নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে থাকে, তাঁরা হলেন হ্যাম্‌লেট, ডন কুইক্‌জোট ও এই শার্লক হোম্‌স। বস্তুতঃ সারা পৃথিবীর পাঠকমহলে শার্লক হোম্‌সের নাম জানে না এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। কোনান ডয়েল রচিত চারখানি উপন্যাস এবং দুই-শতাধিক গল্পের মাধ্যমে এই কল্পনাসৃষ্ট গোয়েন্দা-চরিত্রটি যে কি বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল একটি ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। অনেক-গুলি গোয়েন্দা-কাহিনী রচনার পর কোনান ডয়েল শার্লক হোম্‌সের মৃত্যু বর্ণনা করে তাঁর একটি ছোটগল্প শেষ করেন। অমনি সারা দেশ জুড়ে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল ও দলে দলে স্ত্রীপুরুষ প্রিয়জন-বিয়োগের চিহ্ন স্বরূপ কালো কাপড়ের পট্টি হাতে বেঁধে বেড়াতে লাগল, সকলের মুখেই এক কথা, 'শুনেছেন ? আমাদের শার্লক হোম্‌স্ নাকি মারা গেছেন।' প্রতিদিন গাদা গাদা পত্র আসতে লাগল—শার্লক হোম্‌সকে মারা চলবে না , তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে। শোনা যায়, ইংলণ্ডের রাজপরিবার থেকেও অনুরূপ অনুরোধপত্র এসেছিল কোনান ডয়েলের কাছে।—শেষ পর্যন্ত কোনান ডয়েল শার্লক হোম্‌সকে পুনরায় বাঁচিয়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কোনান ডয়েল ও শার্লক হোম্‌স্ সম্বন্ধে ঝোঁকের মাথায় এত কথা লিখে ফেললাম শুধু এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যে গোয়েন্দা-কাহিনী মাত্রই নিম্নস্তরের সাহিত্য নয় , নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা গোয়েন্দা-চরিত্রও বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্রাবলীর সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পারে , এবং শুধু

গোয়েন্দা-কাহিনী লিখেও লেখকের পক্ষে অমরত্ব অর্জন অসম্ভব নয়। (কোনান ডয়েল অবশ্য অন্যবিধ সাহিত্যও প্রচুর রচনা করেছিলেন।)—আজ শার্লক হোমস্-কেন্দ্রিক গল্প ও উপন্যাসগুলি ইংরেজী সাহিত্যের একটা অতি মূল্যবান অংশ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং মাভৈঃ। গোয়েন্দা-কাহিনীরচয়িতাদের লজ্জিত বা শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষাংশ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর ব্যাপী যুগটাকে ইংরেজী গোয়েন্দা-কাহিনীর স্বর্ণযুগ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। কোনান ডয়েলের দৃষ্টান্তে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু সংখ্যক লেখক ও লেখিকা এই সময়ে গোয়েন্দা-কাহিনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন—বহু বিচিত্র তাঁদের কাহিনী-পরিকল্পনাপদ্ধতি ও রচনাশৈলী, তাঁদের সৃষ্ট গোয়েন্দা-চরিত্রগুলিও অনুরূপভাবে বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ। তা ছাড়া এই সময়কার ডিটেক্‌টিভ গল্পে ও উপন্যাসে দুটো নতুন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া গেল—শুধু সখের গোয়েন্দারা নন, সরকারী গোয়েন্দা-পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরাও ডিটেক্‌টিভ-কাহিনীর নায়করূপে বইএর পাতায় এসে আবির্ভূত হলেন, এবং, তার চেয়েও বড় কথা, এই সব কাহিনীর লেখকেরা তাঁদের রচনায় একাধিক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-চিত্রণ-প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন—শুধু গোয়েন্দা-চরিত্রটি অঙ্কন করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। ফলে যে-জাতীয় সাহিত্য এক সময়ে শুধু রোমাঞ্চ ও রহস্য সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হত, পাঠকের মনের কৌতূহল-প্রবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিকে ঈষৎ উত্তেজিত করে তোলা ছাড়া যার আর কোন প্রতিক্রিয়াই অনুভূত হত না, তাই এখন রূপে রঙে রসে অনেক বেশি পরিপূর্ণতর হয়ে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি-পদবাচ্য হয়ে উঠল।

এই সব গোয়েন্দা-কাহিনীরচয়িতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অতি শক্তিশালী লেখক-লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল। এইখানে তাঁদের অন্ততঃ কয়েকজনের নামোল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। ডরোথি এল্. সেয়ার্স, জি. কে. চেস্টারটন, নাইয়ো মার্শ, মার্জারি অ্যালিংহাম, আর্নেস্ট ব্রামা, ফ্রীম্যান উইল্‌স্ ক্রফ্‌ট্‌স্, এইচ্. সি বেলি, জন ডিক্‌সন কার (কার্টার ডিক্‌সন), নিকোলাস ব্লেক, অ্যাণ্টনি গিলবার্ট, এলারি কুইন প্রভৃতি লেখক-লেখিকারা শুধু যে পাঠকদের তৃপ্তিবিধানে সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়, গোয়েন্দা-কাহিনীর নতুন নতুন শিল্পসম্ভাবনার দ্বারও তাঁরা তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে খুলে দিয়েছিলেন।

এই স্বর্ণযুগের স্বর্ণসিংহাসনে বহুকাল ধবে সম্রাজ্ঞীব একচ্ছত্র মহিমায় যিনি অধিষ্ঠিতা ছিলেন তাঁর নাম আপনাদেব সকলেবই পবিচিত—তিনি হলেন ডেম আগাথা ক্রিস্টি (স্বামীব পবিচয়ে লেডি ম্যালোয়ান)। তাঁব লেখিকাজীবন শুরু হয়, যতদূর মনে পড়ে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, এবং শেষ হয় মাত্র সেদিন, মৃত্যুব (১৯৭৭) কয়েক মাস পূর্বে। তাঁব বচিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থেব সংখ্যা প্রায় আশিখানি—সবগুলিই অতি সুপবিকল্পিত সুরচিত ও সুখপাঠ্য। এদেব মধ্যে আবাব এমন কয়েকখানি বই আছে যা সত্যই অতুলনীয় এবং অবিস্মবণীয়, যেমন 'The Hollow', 'Death Comes as the End', 'Ten Little Nigger Boys', 'The ABC Murders', ইত্যাদি। তাঁব বচনার যে বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই সকলকে মুগ্ধ কবে তাব মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁব বিস্ময়কব উদ্ভাবনী প্রতিভা, অপূর্ব চবিত্রচিত্রণনৈপুণ্য, অতি সহজে নাটকীয়তা সৃষ্টিব ক্ষমতা, সামান্যকে অসামান্য কবে তোলাব শক্তি—এবং সর্বোপবি ভাষাব ঐন্দ্রজালিক ব্যবহাব, 'She wrote King's English like a Queen' এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটিব মাপকাঠি দিয়ে বিচাব কবলে একমাত্র কোনান ডয়েল ছাড়া আব কাবও সঙ্গে তাঁব তুলনা কবা চলে না।—তাঁব সৃষ্ট গোয়েন্দা-চবিত্রেব মধ্যে ইংলণ্ড-প্রবাসী বেলজিয়ান এর্কুলে পোয়াবো এবং চিবকুমাবী গ্রাম্য মহিলা মিস্ মাবপ্‌লের নাম বিশ্বেব প্রায় সর্বত্রই সুপবিচিত।

সাম্প্রতিকতব যুগে প্রকাশিত গোয়েন্দা-কাহিনীব সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় এবং তাব মধ্যে মাইকেল ইন্‌স্, জোসেফিন বেল প্রভৃতিব দ্বাবা বচিত গ্রন্থগুলি নানা দিক দিয়ে প্রশংসা দাবী কবতে পাবে। তথাপি একথা আমবা অনায়াসে বলতে পাবি যে আজকাল যে-সব ডিটেক্‌টিভ গল্পোপন্যাস বচিত হচ্ছে আগেকাব যুগেব এই জাতীয় বচনাবলীব তুলনায় তাবা ধাবে ও ভাবে উভয়তঃ নিকৃষ্টতব। গোয়েন্দা-কাহিনীব স্বর্ণযুগ সত্যই অতীত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা-কাহিনীব ইতিহাস অনেক বেশি সংক্ষিপ্ততব। বস্তুতঃ ইংরেজী গোয়েন্দা-সাহিত্যেব অনুকবণ কবেই এই জাতীয় সাহিত্য-রচনা শুরু হয়েছিল বাংলাভাষায়, এবং সেও মাত্র সত্তব পঁচাত্তব বছব আগেকাব কথা। সর্বপ্রথম যিনি গোয়েন্দা-কাহিনীরচয়িতা হিসাবে কিছু খ্যাতিলাভ করেছিলেন বাঙালী পাঠকসমাজ আজ তাঁর নাম পর্যন্ত ভুলতে বসেছে, হয়তো বা ভুলেই গেছে। কিন্তু আমাদের শৈশবকালে পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের নাম বাংলাদেশেব পাঠক-পাঠিকাদেব সকলেরই অতি-পরিচিত ছিল এবং তাঁব রচিত 'গোবিন্দরাম',

'নীলবসনা সুন্দরী,' 'হত্যাকারী কে ?,' 'হত্যাবিভীষিকা' প্রভৃতি গোয়েন্দা-উপন্যাস প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। আজ এ-সব বই পড়তে কেমন লাগবে বলতে পারি না, কারণ এখন এগুলি একান্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে, তবে তখনকার দিনে আমরা পাঁচকড়ি দে-র লেখা উপন্যাস পেলেই গোগ্রাসে গিলতাম এবং দেখতে পেতাম, আমাদের বয়স্ক গুরুজনেরাও একান্তে বসে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে সেগুলি পড়ে চলেছেন। তাঁর রচনায় দু-জন ডিটেক্‌টিভের কীর্তিকলাপের বর্ণনা পেতাম আমরা—গোবিন্দরাম ও তৎশিষ্য দেবেন্দ্রবিজয়। পাঁচকড়ি দে-র খ্যাতি শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর রচিত প্রত্যেকটি গ্রন্থই হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, এই দুইখানির উর্দু অনুবাদের কথাও শুনেছি।—প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এইখানে জানিয়ে রাখি : পাঁচকড়ি দে-র 'হত্যাবিভীষিকা' নামক গ্রন্থখানি কোনান ডয়েলের 'The Hound of the Baskervilles'-এর ঈষৎ পরিবর্তিত অনুবাদ মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনীকার স্বর্গত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু এই সেদিন মাত্র তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন—এখনও আমরা তার সাহিত্যকৃতির উত্তাপ-পরিমণ্ডলের মধ্যেই বাস করছি বলা চলে। সুতরাং সামান্য কিছু তথ্যমূলক মন্তব্যাদি ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু এখানে বলার প্রয়োজন বোধ হয় নেই। তাঁর রচনাবলী এখনও সহজলভ্য—যথাসম্ভব সত্বর সেগুলি যোগাড় করে পড়ে ফেলুন আপনারা। পরের মুখে ঝাল খাবার প্রয়োজন কি ?

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্ট ডিটেক্‌টিভ সত্যান্বেষী ব্যোমকেশকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের সামনে এসে আবির্ভূত হলেন পাঁচকড়ি দে-র কথাও তারা সেদিন পুরোপুরি ভুলে গেছে। হঠাৎ ব্যোমকেশের আবির্ভাব সেদিন সত্যই আমাদের চমকে দিয়েছিল। এমন শক্তিশালী রচনা, এমন বিস্ময়কর রহস্য, এমন সুনিপুণ কাহিনী-গ্রন্থনা, এমন সুকৌশলী সমাধান—বাংলাভাষায় এসব সম্ভব হল কি করে ?

প্রথম দুটি-চারটি গল্পে অবশ্য কোনান ডয়েল ও শার্লক হোম্‌সের ছায়া খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় খুব শীঘ্রই সে প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন—এবং তারপর শুরু হয়েছিল তাঁর মৌলিক প্রতিভার দানসত্র। সে সব গোয়েন্দা-কাহিনী প্রথম পড়ার অভিজ্ঞতার কথা মনে হলে এখনও মনের গায়ে রোমাঞ্চ ফুটে ওঠে। 'চোরাবালি', 'ব্যোমকেশ ও বরদা' (ভৌতিক কাহিনী নয়) 'পথের কাঁটা', 'অগ্নিবাণ', 'মাকড়সার রস', 'অচিন্‌ পাখি', 'চিত্রচোর', 'শজারুর

কাঁটা' প্রভৃতি গল্প কতকাল আগে পড়েছি, কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে—কোনদিন ভুলতে পারব কিনা সন্দেহ। আর তাঁর পূর্ণাঙ্গ গোয়েন্দা-উপন্যাস 'চিড়িয়াখানা' সত্যই অতুলনীয় সৃষ্টি, ইংরেজী ভাষাতেও এমন কাহিনী খুব অল্পই লেখা হয়েছে। (দোহাই পাঠক! ছায়াচিত্র দেখেই বইএর উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করে বসবেন না—মূল বইখানা একবার পড়ে দেখবেন।)...

নীহাররঞ্জন গুপ্তের কথা আপাততঃ মুলতুবি থাক। তার আগে একজন নিতান্ত অবহেলিত লেখকের সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আজ যেসব পাঠক-পাঠিকার বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে তাঁদের কাছে হেমেন্দ্রকুমার রায় একটি অতিপরিচিত নাম। ছোটদের জন্যে বহু-জাতীয় বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার—তার মধ্যে গোয়েন্দা-কাহিনীর সংখ্যাও বড় কম নয়। এমন একদিন ছিল যখন জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবুর নাম ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ফিরত সর্বক্ষণ। একথা অবশ্য অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে তাঁর গোয়েন্দা-গ্রন্থাবলীর সবগুলিই মৌলিক সৃষ্টি নয়, কিন্তু মৌলিক অ-মৌলিক যাই হোক না কেন, তাঁর সব লেখাই তাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গির মুদ্রাচিহ্নে চিহ্নিত। তাঁর রচনাকে অপরের রচনা বলে ভুল করার সম্ভাবনা খুবই কম।—তা ছাড়া গোয়েন্দা-কাহিনীর অন্তর্নিহিত অকথিত সামাজিক নীতিটিকে তাঁর ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকাদের পুনঃ পুনঃ শুনিয়ে তিনি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই নীতিটি হল—Crime doesn't pay, অপরাধ করলেই তার শাস্তি পেতে হয়।

প্রশ্ন করা হয়ে থাকে—কেন আমরা গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ি? এবং গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে কি লাভ হয়? প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া খুব শক্ত নয়। আংশিক উত্তর পূর্বেই একবার দেওয়া হয়েছে—গোপন ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্যই আমরা গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে থাকি। আরও একটা কারণ হল এই যে মানুষ রোমাঞ্চ উৎকণ্ঠা আতঙ্ক প্রভৃতি মূলতঃ অপ্রীতিকর অনুভূতি থেকে এক ধরনের বিচিত্র আনন্দ আহরণ করতে পারে, যদি আগে থেকেই তার জানা থাকে যে পরিণামে এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি প্রশমিত হবে, উৎকণ্ঠার অবসান হবে, এবং আতঙ্কের কালো ছায়া অপসারিত হয়ে যাবে। এই মনস্তাত্ত্বিক আনন্দ-সন্ধানের জন্যই আমরা গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ি—মন নিয়ে এই ছেলেখেলা না করে আমরা পারি না। দ্বিতীয় প্রশ্নটিরও আংশিক উত্তর হেমেন্দ্রকুমার সংক্রান্ত আলোচনায়

আমি দিয়েছি—ব্যক্তিগতভাবে পাঠক-পাঠিকার মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং সমষ্টিগতভাবে সমাজের নৈতিক কল্যাণসাধনের জন্য গোয়েন্দা-কাহিনীর প্রয়োজন আছে। তা ছাড়াও একটা লাভ আছে। পান্‌সে প্যান্‌পেনে পারিবারিক উপন্যাসের মিইয়ে-যাওয়া নিমকি-শিঙাড়া, রাজনৈতিক ঝাল-মশলাদার সমাজ-সচেতন কথা-সাহিত্যের চপ্‌-কাট্‌লেট, অথবা নানা ঢঙের ষড়গুণবলিজারিত প্রেমকাহিনীর রসগোল্লা-পান্তুয়া ক্রমাগত খেয়ে খেয়ে পাঠক-পাঠিকাদের যখন মগজের অগ্নিমান্দ্য জন্মায় তখন বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনরায় সুস্থ করে তোলার জন্য গোয়েন্দা-কাহিনীর Catharsis বা বিরেচনের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এও স্বাস্থ্যরক্ষা বটে, তবে এখানে প্রশ্নটা moral hygiene-এর নয়, intellectual hygiene-এর।

গোয়েন্দা-কাহিনী নানা জাতের হতে পারে—বস্তুতঃ অনেকে বলেন কোন দুইজন লেখকের রচিত গোয়েন্দা-কাহিনী কখনও ঠিক একরকম হতে পারে না। কথাটা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তবু মোটামুটিভাবে সমগ্র গোয়েন্দা-সাহিত্যকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা যায়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যুক্তি-ভিত্তিক কাহিনীর। একমাত্র ফ্রীম্যান উইল্‌স ক্রফ্‌ট্‌স এবং কতকগুলি বিশেষ ধরনের গল্পে কোনান ডয়েল ও আগাথা ক্রিস্টি ব্যতীত বিশুদ্ধ ratiocinative পদ্ধতিতে গোয়েন্দা-কাহিনী লিখে আর কেউ সাফল্য লাভ করেছেন বলে আমার জানা নেই।—দ্বিতীয়তঃ উৎকণ্ঠা বা suspense- ভিত্তিক কাহিনী। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমরা দেখতে পাই নিকোলাস ব্লেক (কবি সিসিল্‌ ডে লুইস্‌-এর ছদ্মনাম) ও জেফারসন ফারজিয়নের উপন্যাসে এবং ডরোথি এল্‌ সেয়ার্সের ছোটগল্পে। কিন্তু এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ হত্যারহস্য বোধ হয় আগাথা ক্রিস্টির 'Ten Little Nigger Boys'—আতঙ্ক-ভিত্তিক কাহিনী অনেকেই লিখেছেন। পরিবেশ ও ঘটনাবলীর মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ও বীভৎস ভয়ঙ্করত্ব সঞ্চার করাই এই জাতীয় কাহিনী রচনার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে শেষ রক্ষা করা খুব সহজ হয় না। দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: ডিক্‌সন্‌ কার রচিত উপন্যাস 'It Walks by Night' এবং কোনান ডয়েলের ছোটগল্প 'The Specked Band'. বাংলাভাষায় শরদিন্দুর 'চোরাবলি' গল্পটিরও উল্লেখ করা যেতে পারে।—চরিত্রভিত্তিক গোয়েন্দা-কাহিনীতে অনেক সময় গোয়েন্দার চরিত্রই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, যেমন কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌স্‌, জি. কে চেস্টারটনের ফাদার ব্রাউন, ডরোথি এল্‌. সেয়ার্সের লর্ড পিটার উইম্‌জি এবং আগাথা ক্রিস্টির মিস্‌ মারপ্‌ল। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য পার্শ্বচরিত্র-চিত্রণের মুন্সিয়ানাও আমাদের মুগ্ধ করে থাকে, যেমন আগাথা

ক্রিস্টি বা জোসেফিন বেল রচিত গোয়েন্দা উপন্যাসে।—কিন্তু সাধারণতঃ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হন কাহিনীভিত্তিক ডিটেকৃটিভ গল্পোপন্যাসের লেখক-লেখিকারা। এই জাতীয় তিনখানিমাত্র উপন্যাসের নাম করেই আপাততঃ আমাকে ক্ষান্ত হতে হবে, শুধু শুধু পুঁথি বাড়িয়ে কোন লাভ নেই: কোনান ডয়েল রচিত 'The Hound of the Baskervilles', আগাথা ক্রিস্টির 'The ABC Murders' এবং কার্টার ডিকসনের 'The Judas Window', লক্ষণীয় এই যে তিনখানি উপন্যাসের প্রত্যেকটিতেই রহস্য-সমাধান-প্রক্রিয়ার চেয়ে ঘটনা-বৈচিত্র্যের ও বর্ণনার নাটকীয়ত্বের আকর্ষণ অনেক বেশি প্রবলতর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েক বৎসর আগে (১৯৩৬) যখন হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় তাঁর জয়ন্ত ও মানিকের কীর্তিকাহিনী অবলম্বনে ছোটদের জন্য বহু গোয়েন্দা-কাহিনী রচনা করে ফেলেছেন এবং আরও রচনা করে চলেছেন সেই সময়ে ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এসে আবির্ভূত হলেন 'কালো ভ্রমর, প্রথম ভাগ' হাতে নিয়ে। কিছুদিন বাদে দ্বিতীয় ভাগও প্রকাশিত হল। যারা হেমেন্দ্রকুমারের বই-এর পাঠক-পাঠিকা, নীহাররঞ্জন ঠিক তাদের জন্য লেখেননি। 'ছোটদের জন্য নয় 'কালো ভ্রমর' পরিকল্পিত ও রচিত হয়েছিল একটু বেশি বয়সের তরুণ-তরুণীদের জন্য। যতদূর মনে পড়ে বইএর বিজ্ঞাপনে বোধহয় 'কিশোর উপন্যাস' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছিল। [পরে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছিল, শুধু কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণী নয়, 'কালো ভ্রমর' বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই একখানি প্রিয়তম গ্রন্থ।

নীহাররঞ্জনের শখের গোয়েন্দা কিরীটি রায়ের সেই প্রথম আবির্ভাব। আর সে কি আবির্ভাব। সেদিন সে সত্যসত্যই ঘোষণা করতে পারত, 'Veni vidi vici'—'আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম'। কিরীটীর সেই জয়যাত্রা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

নীহাররঞ্জন কাদের জন্য তাঁর কিরীটী-কাহিনীগুলি লেখেন? যতদূর মনে হয়, 'কালো ভ্রমর' লেখার সময় তিনি একটা বিশিষ্ট age-group-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্যই বইখানা লিখেছিলেন, কিন্তু পাঠক-সমাজের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা-চরিত্রের এবং সেই চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত গোয়েন্দা-কাহিনীগুলির আবেদন ও সম্ভাবনা অনেক বেশি সুদূর-প্রসারী। তাই তার

পর থেকে সকল বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের লক্ষ্য করেই তিনি তাঁর গল্পোপন্যাসের জাল বুনতে শুরু করেন। এর ফল ভালই হয়েছে—কাহিনীগুলিতে তিনি নূতন নূতন বৈচিত্র্যের স্বাদ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন যা হয়তো শুধু কিশোর-কিশোরীদের জন্য লিখলে—তিনি করতে পারতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অমনিবাস'-এর বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'নিরালা প্রহর' বইখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বইএর রঙ্ ও রস দুইই 'পূর্ণবয়স্কদের জন্য'।

নীহাররঞ্জন কাদের জন্য লেখেন না সেটাও এই প্রসঙ্গে বুঝে রাখা ভাল। এক শ্রেণীর সাহিত্যপাঠক আছেন যাঁরা নিজেদের রুচিগত উন্নাসিকতা সম্বন্ধে অতিসচেতন, সদাসর্বদা অতিসংস্কৃত সূক্ষ্মবুদ্ধির বড়াই করে থাকেন—যা-কিছু জনসাধারণের মনোরঞ্জনে সক্ষম তাই-ই তাঁদের কাছে অমার্জিত, সরলতাকে তাঁরা বোকামিরই নামান্তর বলে মনে করেন। তাঁদের মতে যে-রচনায় তথাকথিত সমাজ-সচেতনতার ভড়ং নেই, অপমনস্তত্ত্বের অকারণ জটিলতা নেই, অস্বাভাবিক যৌন-সমস্যা-রূপ গরম মশলার ফোড়ন নেই তাঁদের মত বিদগ্ধ sophisticated-দের পাঠযোগ্য বস্তু তা নয়। এঁদের জন্য নীহাররঞ্জন লেখেন না বস্তুতঃ তাঁর লেখার রস উপভোগ একমাত্র তাঁরাই করতে পারেন যাঁদের মন এখনও পুরোপুরি blase হয়ে যায়নি, বিস্ময়বোধের ও রোমাঞ্চিত হবার ক্ষমতা যাঁরা একেবারে হারিয়ে ফেলেননি—বয়স বেশি হলেও যাঁদের মন বাল্যের সারল্য ও সরসতা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বজায় রাখতে পেরেছে।

'কিরীটি অমনিবাস'-এর এই দ্বাদশ খণ্ডটিতে আছে চারখানি ছোটবড় উপন্যাস ও একটি নাতিহ্রস্ব গল্প।

'বত্রিশ সিংহাসন' গল্পটির গঠনে বেশি জটিলতা না থাকলেও পারিপাট্যের অভাব নেই। যেভাবে সেতারের মেরজাপের একটিমাত্র সূত্র অবলম্বন করে ধাপে ধাপে পিছিয়ে গিয়ে কিরীটী সম্মোহিত রাজাবাহাদুরের আড়ালে অবস্থিত তাঁর শ্যালকের কুক্রিয়া-কাহিনী একটা আবিষ্কার করে ফেলল তা সত্যই প্রশংসনীয়।

গোয়েন্দা-কাহিনীর একটা অতি-পরিচিত ফর্মুলা হল সমাপ্তিপর্বে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিকে অপরাধী বলে প্রমাণিত করা। 'সর্পিল' গ্রন্থে আংশিক ভাবে এই কৌশলটি প্রযুক্ত হয়েছে। এ কাহিনীর পরিবেশটি একটু বিচিত্র ধরনের। পরান্নভোজী চার ভাইএর মেরুদণ্ডহীন আত্মসমর্প ও ভগিনী স্বাতীর দৃপ্ত বিদ্রোহ প্লটের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার ফলে সন্দেহের পরিধি অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবীর মৃত্যুর জন্য সুরতিয়াকে দায়ী করার কথা কারও

মনে পড়েনি। গল্পের প্রেক্ষাপটের তাৎপর্য একমাত্র কিরীটীই বুঝতে পেরেছিল।—সুধন্যর চরিত্রটি সুচিত্রিত।

'রক্তলোভী নিশাচর' বইখানি দুই কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ এ বইকে 'কালো ভ্রমর'-এর তৃতীয় ভাগ বলে অনায়াসে বর্ণনা করা চলে—যে কালো ভ্রমর বা ডাঃ সান্যালের ভয়ঙ্কর ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগে, এই গ্রন্থের উপসংহারে তারই চরম পরিণাম আমরা দেখতে পাই। কাজেই যাঁরা নীহাররঞ্জনের গ্রন্থাবলীর অনুরাগী পাঠক তাঁদের কাছে এ গ্রন্থের একটা বিশেষ মূল্য আছে।—দ্বিতীয়তঃ বইখানি আতঙ্ক-ভিত্তিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত, এর পরিবেশ ও ঘটনাবলী দুইই সমান বীভৎস ও ভীতিজনক। এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় 'রক্তলোভী নিশাচর'-এরও কাহিনী-অংশ অত্যন্ত জটিল—খুব মনোযোগের সঙ্গে ঘটনা-পারম্পর্য অনুধাবন না করলে খেই হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। তবে কিরীটী সব জটিলতার গ্রন্থিমোচন করে শেষরক্ষায় সক্ষম হয়েছে।

কোন একজন বিদেশী অপরাধ-বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, স্ত্রীহত্যার জন্য স্বামীকে অপরাধী বলে সন্দেহ করাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। 'নিরালা প্রহর' গ্রন্থে এই স্বাভাবিক সন্দেহই শেষ পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তার আগে গাইয়ে সমীরণ দত্ত ও মি স্বামীনাথনরূপী দুটি Red Herring-কে টেনে এনে কাহিনীর জল বেশ ঘুলিয়ে তুলেছেন গ্রন্থকার। পরিশেষে স্ত্রীর অন্যাসক্তির আশঙ্কা কি ভাবে মণিশঙ্করকে হত্যায় প্রণোদিত করেছিল কিরীটীর অনুসন্ধানকর্মের মাধ্যমে তা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে সমস্ত নাটকটার ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছেন তিনি।—এই গোয়েন্দা-কাহিনীটি পড়ে আমি পরিতৃপ্তি লাভ করেছি প্রধানতঃ তিন কারণে: ঘটনাবিন্যাসের স্বাভাবিকতার জন্য, রচনাশৈলীর পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং সুনিপুণ সংলাপ-সন্নিবেশের জন্য। শ্রেণী-বিচারের দিক দিয়ে এই হত্যারহস্যটি অংশতঃ যুক্তিভিত্তিক ও অংশতঃ কাহিনী-ভিত্তিক।

অমনিবাসের বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির মধ্যে আমার মতে 'রত্নমঞ্জিল'-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রাচীন বনেদী পরিবারের পুরাতন ভদ্রাসনের আশেপাশে সঞ্চিত গুপ্তধন সম্বন্ধে স্বদেশী-বিদেশী বহু কাহিনী রচিত হয়েছে। তবু নীহাররঞ্জনের কাহিনীটি কিছু নূতনত্ব দাবী করতে পারে। প্রথমতঃ কিরীটির মত অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ডিটেক্‌টিভের আদ্যন্ত উপস্থিতি সত্ত্বেও এ কাহিনীকে তিনি পুরোপুরি গোয়েন্দা-কাহিনীতে পরিণত হতে দেননি, এবং দ্বিতীয়তঃ শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনের কোন হদিস পাওয়া যায়নি—সজ্জন বা অসজ্জন কারও তা ভোগে লাগেনি। গল্পটি মূলতঃ

উৎকণ্ঠা-ভিত্তিক, এবং সেই উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রাখার ও বাড়িয়ে তোলার জন্য প্লটে জটিলতারও অভাব ঘটে নি কখনও—গ্রন্থির পর গ্রন্থি গেঁথে গ্রন্থকার যেন আমাদের সমস্ত মনটাকে প্লটের সঙ্গে এক করে বুনে দিয়েছেন।—কিন্তু এ কাহিনীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল অপূর্ব মুন্সিয়ানার সঙ্গে চিত্রিত এর পার্শ্ব-চরিত্রগুলি। সবচেয়ে অবিস্মরণীয় চরিত্র হল যোগানন্দের, যার মধ্যে ভালমন্দের অপূর্ব সহাবস্থান দেখে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হই। অনিলের উন্মত্ত অর্থলোভ, সবিতার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি, রাণীর অসমসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার, পিয়ারীর নির্ভেজাল শয়তানী, মায় পুরাতন ভৃত্য মনোহরের বিশ্বাসঘাতকতা—প্রত্যেকটি চরিত্র গ্রন্থকারের নিপুণ তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।—পিছনে হাজার হাজার টাকা নিয়ে অদৃষ্টের সঙ্গে জুয়া খেলতে বসেছে গুজরাটি রাণা, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সেখান থেকে পিছলে পালিয়ে এসে এই অপূর্ব চরিত্র-চিত্রশালায় মোহমুগ্ধের মত ঘুরে বেড়াতে থাকে।

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সর্পিল

॥ এক ॥

জয়ন্ত চৌধুরী যখন প্রথম চিঠিটা কিরীটীর হাতে তুলে দিয়েছিল কিরীটী চিঠিটা একবার পড়েছিল—যেমন কোন মানুষ কোন চিঠি পড়ে ঠিক তেমনি করেই এবং সত্যিই তার মনে কোন কৌতূহলের উদ্রেক করেনি।

সে চিঠিটা ভাঁজ করে যে বইটা তখন সে বসে বসে পড়ছিল সেই বইটার মধ্যে ভাঁজ করে রেখে দিতে দিতে বলেছিল, কাল-পরশু একসময় একবার আসবেন তখন কথা হবে।

জয়ন্ত চৌধুরী কিরীটীকে কিছুটা চিনত তাই দ্বিতীয় আর কোন অনুরোধ করেনি—সেদিনকার মত বিদায় নিয়েছিল।

সেইদিনই রাত্রে দ্বিতীয়বার চিঠিটা আবার পড়ে কিরীটী।

হাতের লেখাটা সামান্য একটু কাঁপা কাঁপা হলেও স্পষ্ট, পড়তে কষ্ট হয় না আদৌ। লেখিকার হাতের লেখা যে কোন একসময় মুক্তোর মত পরিষ্কার ও ঝরঝরে ছিল, আজও সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না যেন। পাতলা নীল রঙের চিঠির কাগজে লেখা চিঠিটা। চিঠির কাগজটা দামী এবং বিলিতি। চিঠির কাগজের ডানদিকে ওপরে মনোগ্রাম করে লেখা ইন্দ্রালয়।

খুব দীর্ঘ নয়—এক পৃষ্ঠার একটা চিঠি।

লেখিকা, মনে হয় কিরীটীর, চিঠিটা লিখতে লিখতে কখনো যেন থেমে গিয়েছে, কখনো আবার দ্রুতই কয়েকটা লাইন লিখে গিয়েছে। অক্ষরগুলোও সব সমান নয়, লাইনগুলোও মধ্যে মধ্যে বেঁকে গিয়েছে। ঠিক যেন সোজা হয়নি।

স্পষ্টই বোঝা যায়, একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে যেন লেখিকা চিঠিটা কোনমতে লিখে শেষ করেছে। এবং সে-উদ্বেগটা লেখিকাকে বেশ একটু যেন বিচলিত করেছে। বিশেষ করে চিঠির মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে সেই মানসিক উদ্বেগটা যেন বেশ স্পষ্টই হয়ে উঠেছে।

যত দিন যাচ্ছে ব্যাপারটা যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আমাকে হত্যা করবার একটা স্পৃহা—স্পৃহা না বলে বোধ হয় ইচ্ছাই বলা উচিত—অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। এবং তাতেই আমার মনে হচ্ছে ওরা যেন প্রত্যেকে আমাকে হত্যা করবার জন্য ওৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষা করছে। সেই জন্যই আমি স্থির করেছি, ওদের সে সুযোগটা দেবো। এভাবে মনের সঙ্গে অহর্নিশি

যুদ্ধ করতে সত্যিই আব আমি পারছি না জয়ন্ত। মনে হচ্ছে যা হবার তা হয়ে যাক। আমি ভাল কবে খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না—এভাবে এ বয়েসে আমাব নার্ভেব সঙ্গে এই যুদ্ধ কবাব চাইতে মনে হচ্ছে যা ওবা চাইছে, আমি বোধ হয় সেই অবশ্যম্ভাবীকে এমনি কবে বেশিদিন ঠেকিয়ে বাখতে পাবব না। তাই আমি মনে মনে স্থির করেছি ওবা যদি হত্যা কবে আমায় শান্তি পায় তো করুক ওবা আমাকে হত্যা। সত্যি এইভাবে সর্বক্ষণ বসে বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কবতে আব আমি পারছি না। ওদেব কারো হাতেই যদি আমাব মৃত্যু আমাব ভাগ্যে লেখা থাকে তো তাই হোক।

আমিও নিষ্কৃতি পাই, ওদেবও ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়।

পবেব দিনই জয়ন্ত এসে আবাব উপস্থিত হল।

কিবাটী আবাম-কেদাবাটাব ওপব গা এলিয়ে দিয়ে চিঠিটাব কথা ভাবছিল।

বসুন জয়ন্তবাবু—

কি ঠিক কবলেন ? জয়ন্ত প্রশ্ন কবে।

কিবীটী সামনে উপবিষ্ট জয়ন্ত চৌধুবীব দিকে তাকাল।

ভদ্রলোকের বয়স বেশি হবে না—ত্রিশেব নীচে নয়, পঁয়ত্রিশেব উর্ধ্বে নয়। সাধাবণ দোহাবা চেহাবা। গাযেব বং উজ্জ্বল শ্যাম। চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা বুদ্ধিব দীপ্তি। পবনে গবম স্যুট—স্যুটটা দামী, দেখলেই বোঝা যায়।

ভদ্রলোক মাকুন্দ—দাড়ি-গোঁফেব চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ে না ভদ্রলোকেব ডান চোখটা সামান্য টেবা—ভাল কবে লক্ষ্য কবে না দেখলে চট কবে সেটা বুঝবাব উপায় নেই অবিশ্যি।

এ চিঠিটা আপনি কবে পেয়েছেন মিস্টাব চৌধুবী ? কিবীটী প্রশ্ন কবে।

দিন তিনেক হল।

চিঠির লেখিকা ভদ্রমহিলা, মানে চিত্রাঙ্গদা দেবী আপনাব কে হন যেন বলছিলেন ?

জেঠিমা।

বয়স কত হয়েছে তাঁব ?

আটষট্টি-উনসত্তর হবে। কিন্তু অত বয়স হলে কি হবে, দেহেব বাঁধুনি এখনো এমন আঁটসাঁট যে, দেখলে মনে হয পঞ্চাশেব বেশি নয়। তাছাড়া এখনো রীতি-মত কর্মঠ। দু-দুটো কলিয়ারী, ব্যাপাব—অত বড় বিবাট দুটো অফিসের,

একটা ধানবাদে একটা কলকাতায়—সবকিছু তাঁর নখদর্পণে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোথায় কি হবে না হবে—সব কিছুর তিনি খবর রাখেন ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

হুঁ। আচ্ছা, ওই যে চিঠির মধ্যে উনি লিখেছেন—জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, শচীন্দ্র, স্বাতী প্রভৃতির কথা, ওরা কারা? ওদের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা দেবীর কি সম্পর্ক?

ওরা সব আমার মেজ জেঠামশায় হীরেন্দ্র চৌধুরীর ছেলেমেয়ে।

তার মানে, ওঁর দেওরের ছেলেমেয়ে? কিরীটী শুধাল।

হ্যাঁ। আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা আপনার বোধ হয় একটু জানা দরকার মিস্টার রায়। জয়ন্ত চৌধুরী বলে।

সংক্ষেপে বলুন।

হ্যাঁ, সেটা আপনার বোধ হয় জানা দরকার।

অতঃপর জয়ন্ত চৌধুরী বলতে শুরু করে।

পৌষের শেষ। শহরে শীতটা যেন বেশ দাঁত বসিয়েছে। তার ওপরে দিন দুই হল আকাশটা মেঘলা-মেঘলা, এবং টিপটিপ করে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও পড়ছে। আর থেকে থেকে এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে।

জয়ন্ত চৌধুরী বলতে লাগল—কিরীটী চুরুটটায় আবার অগ্নিসংযোগ করে নিল।

জেঠামশাইরা তিন ভাই ছিলেন, জিতেন্দ্র, হীরেন্দ্র ও নীরেন্দ্র চৌধুরী। ঠাকুরদা তাঁর ছেলেদের সাধ্যমত লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

জয়ন্ত চৌধুরী বলতে লাগল একটু থেমে, চিরদিনের জেদী ও ডানপিটে স্বভাব ছিল বড় ছেলে জিতেন্দ্র চৌধুরীর। পড়াশুনায় আদৌ মন ছিল না, দিবারাত্র গান-বাজনা নিয়েই থাকত।

বাপের সঙ্গে তাই নিয়ে প্রায় খিটিমিটি, চেঁচামেচি চলত তাঁর। অবশেষে একদিন সেই খিটিমিটি চরমে ওঠায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যান জিতেন্দ্র চৌধুরী। বয়স তখন তাঁর মাত্র আঠারো বছর। বয়সের আন্দাজে দেহের গঠনটা ছিল বলিষ্ঠ। প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা। টকটকে গায়ের রঙ। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য। যেমন সাহসী, তেমনি দুর্দান্ত বেপরোয়া প্রকৃতির।

ঘুরতে ঘুরতে বিহার অঞ্চলে গিয়ে হাজির হন একসময় ভাগ্যান্বেষণে জিতেন্দ্র চৌধুরী। এবং সেখানেই শিল্পপতি রায়বাহাদুর হরপ্রসাদ ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। প্রাণচঞ্চল, বলিষ্ঠ চেহারার কন্দর্পসদৃশ যুবকটিকে দেখে কেন যেন রায়বাহাদুর হরপ্রসাদের ভারী ভাল লেগে যায়।

চমৎকার হিন্দীতে কথা বলছিলেন জিতেন্দ্র, তাই বোধ হয় একটু সন্দেহ হওয়ায় রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন, তুমি বাঙালী ?

হ্যাঁ।

কি জাত ?

ব্রাহ্মণ।

কতদূর লেখাপড়া করেছ ?

বলতে পারেন, কিছুই না।

কেন ?

ভাল লাগেনি কখনো লেখাপড়া করতে, তাই।

হরপ্রসাদ একটু হাসলেন তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, কিছুই শেখনি ? বলার মত কিছুই নয়—তা নামধামটা লিখতে পার তো ?

তা অবিশ্যি জানি। বলছিলাম, লেখাপড়া বলতে যা বোঝায়—আপনারা যা বোঝেন—কোন পাসটাস নই।

রায়বাহাদুর মৃদু হাসলেন আবার।

হুঁ—তা কে কে আছেন ?

আছেন সবাই—মা বাবা, দুই ভাই। কিন্তু—

কি ?

তাঁদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কেন ?

মতের সঙ্গে মিল হল না।

রায়বাহাদুর আবার হাসলেন।

তা লেখাপড়া তো করোনি, আর কিছু পার ?

দৌড়তে পারি, সাঁতরাতে পারি, বন্দুক, লাঠি চালাতে জানি। যে কোন রকম দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারি। আর একটু-আধটু গান গাই।

আমার কয়লার খনি আছে। খনি থেকে সাঁওতালদের সঙ্গে কয়লা কেটে তুলতে পারবে ?

চেষ্টা করলে যে পারব না তা নয়। কিন্তু—

রায়বাহাদুর যুবকের সরলতায় ও স্পষ্টতায় আবার হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, এখন আপাততঃ চলো আমার বাড়িতে, তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যাবে—তোমার উপযুক্ত একটা কাজ যোগাড় করা যায় কিনা।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর সেই রায়বাহাদুরের বিরাট প্রাসাদোপম আবাস ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ।

রায়বাহাদুর হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি এবং বিরাট কলিয়ারীর বিজনেস। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের সমারোহ, কিন্তু খাবে কে? ভোগ করবে কে? আপনার জন বলতে একটিমাত্র মেয়ে—চিত্রা অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা ব্যতীত আর কোন আপনজনই নেই। নিজে, স্ত্রী—সারদা ও একমাত্র সন্তান ওই চিত্রা।

চিত্রাঙ্গদার বয়স তখন বারো কি তেরো—কিশোরী চিত্রাঙ্গদা। কন্দর্পের মত দেখতে তরুণ জিতেন্দ্রকে দেখে চিত্রাঙ্গদার কেন যেন ভারী ভাল লাগে—বোধ হয় প্রথম যৌবনেরই নেশা।

সে যাই হোক জিতেন্দ্র থেকে গেলেন ইন্দ্রালয়ে।

জয়ন্ত চৌধুরী থামল।

তারপর? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জয়ন্ত চৌধুরী আবার শুরু করে: তারপর একদিন বছরখানেক বাদে প্রচুর ঘটা করে রায়বাহাদুর ওই ঘর-থেকে-পালানো যুবকটি জিতেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গেই তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন তবে—

কিরীটী জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

জয়ন্ত চৌধুরী বলে, একটা কথা—একটু ইতস্তত: করে বলে জয়ন্ত চৌধুরী, পরে জানা যায় অবিশ্যি কথাটা—চিত্রাঙ্গদা রায়বাহাদুরের মেয়ে হলেও সে কিন্তু তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর কন্যা ছিল না।

আপনার জেঠামশাইও জানতেন না কথাটা?

জানতেন।

তবে তিনি সব জেনেশুনেই বিয়ে করেছিলেন বলুন?

হ্যাঁ।

মানে বলতে চান ওঁর স্ত্রী সারদা দেবীর কন্যা নয়?

সারদা দেবীর কন্যা—

তবে?

যদিও সবাই জানত সারদা দেবী হরপ্রসাদের বিবাহিতা স্ত্রী—পশ্চিমে একবার বেড়াতে গিয়ে বিয়ে করে এনেছিলেন। কিন্তু আসলে তা নয়।

তবে কি?

সারদা ওঁর আসল নামও নয়—আসল নাম যমুনা। লক্ষ্ণৌর এক বিখ্যাত বাইজীর

মেয়ে।

বাইজীর মেয়ে ?

হ্যাঁ। বাইজী-মায়ের গান শুনতে গিয়ে সেখানে তার যুবতী বাইজী-কন্যা যমুনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান হরপ্রসাদ, এবং বহু টাকার বিনিময়ে যমুনাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। যখন দেশে ফেরেন, সবাই জানল পশ্চিম থেকে বিয়ে করে এলেন হরপ্রসাদ।

রায়বাহাদুরের সত্যিকারের কোন বিবাহিত স্ত্রী ছিল না ?

না।

হুঁ, বলুন।

আবার বলতে লাগল জয়ন্ত চৌধুরী : যমুনার নতুন নাম হল সারদা। কিন্তু হরপ্রসাদ সারদার সত্য পরিচয়টা জিতেন্দ্রর কাছে কিন্তু গোপন করেননি, সে কথা তো একটু আগেই আপনাকে আমি বললাম—স্পষ্ট করেই সব কথা বলেছিলেন বিবাহের পূর্বে তাঁকে।

তবু বিবাহ আটকায়নি কারণ হয়ত হরপ্রসাদের মতই জিতেন্দ্রও চিত্রার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি সানন্দেই বিবাহ করলেন চিত্রাঙ্গদাকে। এবং শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সম্পত্তির মালিকও হয়ে বসলেন।

তারপর ?

জেঠামশাই কিন্তু বেশিদিন বাঁচেননি। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একদিন হাজারীবাগের জঙ্গলে বাঘের হাতে জখম হয়ে সেপটিক হয়ে মারা যান।

ওঁদের কোন সন্তানাদি হয়নি ?

না।

তারপর ?

এদিকে জিতেন্দ্রর অন্য দুই ভাই হীতেন্দ্র ও নীরেন্দ্র চৌধুরী—একজন তখন ওকালতি করেন, ও একজন অধ্যাপনা করে জীবন কাটাচ্ছিলেন। দুজনেই বিবাহ করেছিলেন। ছোট ভাই নীরেন্দ্র চৌধুরীও জিতেন্দ্র চৌধুরী মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান। তাঁর একটিমাত্র ছেলে আমি—বি এ পাস করে জীবনবীমা অফিসে চাকরি করছি সেও তো আপনি জানেন। শ'তিনেক টাকা মাইনে পাই। বিয়ে-থা করিনি। একা মানুষ, মোটামুটি সচ্ছলতার মধ্যেই দিন কাটছে। কিন্তু যাক যা বলছিলাম—জিতেন্দ্র চৌধুরীর মেজ ভাই হীরেন্দ্র চৌধুরী ওকালতি করে তেমন একটা কিছু উপার্জন করতে কোন দিনই পারেননি।

তাঁরই পাঁচটি ছেলেমেয়ে—জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র ও শচীন্দ্র—চার ছেলে এবং একমাত্র মেয়ে স্বাতী।

তাঁরও অকালেই মানে নীরেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর বৎসর দুয়েকের মধ্যেই মৃত্যু হয়। ওদের মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। এদিকে হীরেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা দেবী দয়াপরবশ হয়ে ওদের নিজের কাছে নিয়ে যান ইন্দ্রালয়ে।

সেও আজ বারো-তেরো বছর আগেকার কথা।

হীরেন্দ্রর একটি ছেলেও বলতে গেলে মানুষ হয়নি—মেয়ে ওই স্বাতী বি, এ পাস করেছে।

॥ দুই ॥

অতঃপর জয়ন্ত চৌধুরী তার জেঠতুতো ভাই-বোনদের একটা মোটামুটি পরিচয় দিল।

বড় জগদীন্দ্র, বয়স ত্রিশ-একত্রিশ হবে—চিরদিনই রুগ্ন—ক্রনিক হাঁপানীর রোগী। ম্যাট্রিক পরীক্ষা বার দুই দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি।

বাড়িতে সর্বক্ষণ বসে থাকে—এবং বসে বসে পেসেন্স খেলে তাস নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু বিলাসী ও লোভী।

দ্বিতীয় মণীন্দ্র চৌধুরী—বড় ভায়ের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হবে। জগদীন্দ্র তবু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল, সে তাও দেয়নি। খেলাধূলায় খুব নেশা। ওই অঞ্চলের একজন নামকরা ফুটবল প্লেয়ার। সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলে। স্বাস্থ্য ভাল এবং সৌখিন প্রকৃতির—বেশভূষা ও সাজসজ্জার দিকে বিশেষ নজর।

তৃতীয় ফণীন্দ্র—ডান পা-টা খোঁড়া। চলার সময় পা-টা একটু টেনে টেনে চলে। ফণীন্দ্রর নেশা গান-বাজনায়। ভাল তবলা বাজায়। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্য মোটামুটি—এবং সেও তার দাদার মতই ভোজনবিলাসী।

চতুর্থ শচীন্দ্র—ভাইদের মধ্যে সে-ই দেখতে সবচেয়ে বেশি সুন্দর। ভাইদের মধ্যে ও-ই ম্যাট্রিকটা পাস করেছে। কবিতা লেখা ও রহস্য-রোমাঞ্চের বই পড়া তার একটা নেশা।

স্বাতী—বোন, স্থানীয় কলেজ থেকে বি এ পাস করেছে—গত বছর। এম এ. পড়ার ইচ্ছা। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবী স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, না—যথেষ্ট হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা দেবী তার বিয়েব জন্য পাত্রেব সন্ধান করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ প্রকাশ পেলো চিত্রাঙ্গদা দেবীব ধানবাদ অফিসেব যে তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারটি বছর দুই হল তাঁর ধানবাদ অফিসে যোগ দিয়েছে—অনিন্দ্য চক্রবর্তী—তাকেই নাকি স্বাতী বিয়ে করতে চায়।

অনিন্দ্যও সেকথা চিত্রাঙ্গদা দেবীকে জানিয়ে ছিল।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবী বাজী হননি, শোনামাত্রই কথাটা নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, অসম্ভব—হতে পারে না।

তবু স্বাতী জিজ্ঞাসা কবেছিল তাব বড়মাকে, (চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সকলে 'বড়মা' বলে ডাকে ববাবব) কেন, অসম্ভব কেন ?

'কেন'ব জবাব তোমাকে আমি দেবো না। অসম্ভব—এইটাই শুধু মনে বেখো।

তবু তর্ক তুলেছিল স্বাতী। বলেছিল, অনিন্দ্য তোমাব অফিসে চাকবি কবে বলেই কি এ বিয়ে হতে পাবে না ?

তর্ক কবো না স্বাতী। চিত্রাঙ্গদা দেবী বলেছিলেন।

ওর সঙ্গে আমাব বিয়ে হলে সেটা তোমাব ভুয়ো অর্থহীন ভ্যানিটিতে লাগবে, তাই কি—

চুপ কব, ডেঁপোমি কবো না—দুটো পাস কবে ভাব যেন কি একটা হয়ে গিয়েছ, তাই না ?

ডেঁপোমি আমি কবছি না—ববং তুমিই অন্যায় জুলুম কববাব চেষ্টা কবছ।

স্বাতী ?

তোমার ঐ চোখরাঙানোকে আব যে ভয় করুক আমি কবি না তুমি জান—

অকৃতজ্ঞ।

কেন আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে পবিয়ে মানুষ কবেছ বলে ? কিন্তু ভুলে যেও না পায়ে ধবে আশ্রয় দিতে আমরা তোমাকে সাধিনি—তুমিই—

হ্যাঁ, অন্যায় হয়েছে আমাব। পথে ভেসে বেড়ানোই তোমাদেব উচিত ছিল। সেটা হয়ত সুখেবই হত।

ক্রোধে যেন অতঃপব একেবাবে ফেটে পড়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা দেবী। বলেছিলেন যেমন অপদার্থ অমানুষ ছিল বাপ তেমনিই হবে তো তোমবা—একপাল ভেড়া জন্ম দিয়ে গিয়েছে—

হ্যাঁ, বাপ আমাদেব অপদার্থ অমানুষ তো হবে—কাবণ তুমি যে তার সন্তানদের প্রতি কৃপা দেখিয়ে আশ্রয় দিয়ে বাহাদুরী কুড়োবাব সুযোগ পেয়েছ !

স্বাতী, তুমি স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘন করছ। চাপা কণ্ঠে তর্জন করে উঠেছিলেন চিত্রাঙ্গদা দেবী অতঃপর।

ভাগ্যে মণীন্দ্র ওই সময় সামনে এসে পড়েছিল, সে কোনমতে বোনকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

কিরীটী প্রশ্ন করে, আপনি কার কাছে শুনলেন এসব কথা? আপনি তো সেখানে থাকেন না?

না, স্বাতীই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল সব কথা।

তারপর কি হল?

কি আর হবে, ব্যাপারটা ওইখানেই চাপা পড়ে গেল। জয়ন্ত চৌধুরী বললে।

আর ওই অনিন্দ্য চক্রবর্তী—তার কি হল?

সে এখনো চাকরি করছে।

তা আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন মিস্টার চৌধুরী এবার বলুন তো?

কেন, আপনি চিঠিটা পড়েছেন তো। বড়মার ধারণা হয়েছে এই মাসের পনেরো তারিখে তাঁর জন্মদিন—এবং তাঁর কোষ্ঠীতেও আছে নাকি এই সময়টা তাঁর অপঘাতে মৃত্যুযোগ, কাজেই তিনি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

কোষ্ঠীতে মৃত্যুযোগ আছে বলে?

হ্যাঁ, তাঁর কোষ্ঠীতে যা যা ছিল, সব ফলে গিয়েছে আজ পর্যন্ত একেবারে ঠিক ঠিক। তাই—

কিন্তু এক্ষেত্রে আমি তাঁকে কি সাহায্য করতে পারি?

দেখুন কথাটা তাহলে আপনাকে আমি আরো একটু স্পষ্ট করে বলি—জেঠিমার ঐ চিঠিটা পাবার পর থেকেই আমারও মনে হচ্ছে সত্যিই হয়ত জেঠিমাকে ঘিরে একটা ষড়যন্ত্র ঘন হয়ে উঠছে—

ষড়যন্ত্র!

হ্যাঁ। আর তাই আমি আপনার কথা জেঠিমাকে ফোনে জানিয়েছিলাম—বলেছিলাম আপনার সাহায্য নিলে হয়ত সব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু—

মিঃ রায়, তাই জেঠিমা ও আমার দুজনেরই ইচ্ছে বিশেষ করে ঐ সময়টা সেখানে আপনি উপস্থিত থাকুন—আপনি অমত করবেন না।

কিরীটী অতঃপর কী যেন ভাবে কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলে, আপনার কথা হয়ত মিথ্যে নয় কিন্তু সেখানে আমি কি ভাবে যেতে পারি?

সেটা আপনিই ভেবে বলুন।

আচ্ছা জয়ন্তবাবু, কোষ্ঠীর ব্যাপারে বুঝি চিত্রাঙ্গদা দেবীর খুব বিশ্বাস? কিরীটী মৃদু হেসে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, সত্যিই যদি তাঁর এই সময় অপঘাতে মৃত্যুযোগ থাকে, কারো সাধ্য আছে কি তাঁকে রক্ষা করার?

সে কি আর আমি বুঝি না। তাছাড়া তাঁরও ধারণা—

কি?

তাঁর মৃত্যু যদি ঘটেই তো ওরাই তাঁকে হত্যা করবে। তাই আরো বেশি করে ওদের গতিবিধির ওপর সর্বক্ষণ প্রখর দৃষ্টি রাখবার জন্যই একজনের সাহায্য আমরা চাই।

কিরীটী আবারও হাসল। তারপর বলল, ঠিক আছে মিস্টার চৌধুরী, আমি যাব। অন্য কোন কারণ নয়—ব্যাপারটা সত্যিই বিচিত্র, তাই যাব। কিন্তু আপনার কি ধারণা বলুন তো?

আমার?

হ্যাঁ।

খুব একটা অসম্ভব নয় কিছু।

কি?

বড়মাকে ওদের কারো পক্ষে হত্যা করা।

কিন্তু কেন বলুন তো?

একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি মিস্টার রায়—

কি বলুন তো?

আমার যে পাঁচজন জেঠতুতো ভাইবোনের কথা একটু আগে আপনাকে বললাম তাদের অবস্থাও আজ কোণঠাসা জন্তুর মত।

কি রকম?

বড়মাকে আপনি দেখেননি—কিন্তু দেখলে বুঝবেন স্ত্রীলোক হলেও তাঁর অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এবং আছে প্রত্যেকের উপরে প্রভুত্ব করবার একটা অদ্ভুত লিপ্সা।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তাঁর ধারণা চিরদিন, ধারণাই বা বলি কেন মনে হয় স্থির বিশ্বাস যে াঁর মত সুন্দরী নেই—তাঁর মত বুদ্ধিমতী নেই—তিনি যা করবেন বা করেন, সেটাই

ঠিক। তিনি যা বোঝেন, সেটাই শেষ বোঝা। সবাইকে তাঁবই নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বলতে পাবেন তাঁব এটাই বিচিত্র একটা সুপিবিযবিটি কমপ্লেক্স—তাঁব যে গুণ নেই তা নয়—ববং অনেক গুণই আছে—তাছাডা মনে স্নেহ-মমতাও আছে তবু ঐ কমপ্লেক্সটুকুই তখন তাঁব যা কিছু বাহুব মত গ্রাস কবেছে—শোনা যায়, ওই কারণেই জেঠামশাইয়েব সঙ্গেও কোন দিন যাকে বলে সত্যিকাবেব মিল তো হয়নি—দুজনেব মধ্যে কোন দিন সত্যিকাবেব একটা প্রীতিব সম্পর্ক গডে উঠতে পাবেনি।

Interesting। তাবপব ?

কিবীটীব চুরুটটা একসময় নিভে গিয়েছিল, পুনবায় সে তাতে অগ্নি-সংযোগ কবে নিল।

জয়ন্ত চৌধুবী বলতে লাগল, এবং আমাব কি মনে হয় জানেন মিস্টাব রায় ?

কি ?

আমাব ধাবণা আমাব মেজ জেঠামশাইয়েব মৃত্যুব পব স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে বড়মা তাঁব ছেলেমেযেদেব নিজেব কাছে আশ্রয় দিযেছিলেন, তাব মধ্যেও বড়মাব অসহাযদেব জন্য মমতা বা দাযিত্ববোধেব চাইতেও হয বেশি ছিল কতকগুলো অসহায ছেলেমেয়েব উপব তাঁব সেই আধিপত্য বিস্তাব বা dominate কববাব লিপ্সাটাই। কিন্তু হাজাব হলে ওবাও তো মানুষ—দুর্ভাগ্যেব জন্যে ওদেব বড়মাব আশ্রযে যেতে হলেও দিনেব পব দিন তাঁব ওই নিষ্ঠুব বিলাস তাদেব সহ্যশক্তিব ওপব মর্মান্তিক ভাবে পীড়ন কবেছে হযত এবং যাব ফলে আজ তাবা সত্যিই মবীয়া হযে উঠেছে, এবং সত্যিই হযত ওবা আজ বডমাকে হত্যাও কবতে পাবে তাঁব হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবাব জন্যেই। হযত আমাবও অবস্থা ওদেবই মত হত আমাব বাবাব মৃত্যুব পব ওঁব ইচ্ছাক্রমে ওঁব ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে, কিন্তু thank God—ভগবান আমায় বাঁচিয়েছেন। মামাবা আমাকে আশ্রয় দিয়ে মানুষ কবে তোলেন।

কিন্তু একটা ব্যাপাব বুঝতে পাবছি না মিস্টাব চৌধুবী, একদিন না হয় ওবা অসহায ছিল কিন্তু আজ তো ওদেব বযস হযেছে, আজও তাহলে ওবাই বা কেন দিনেব পব দিন ওইভাবে পীডন সহ্য কবে ওখানে পড়ে আছেন ?

সেটা তো খুবই স্বাভাবিক—জেঠিমাব সম্পত্তিব লোভে। শুনলেন তো সব কটাই অপদার্থ—নিজেব পায়ে নিজে দাঁড়াবাব মত কোন শক্তি নেই।

কিন্তু আপনাদেব বডমা যে ওদেবই তাঁব সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন, তাবই বা স্থিবতা কোথায় ? তিনি যেবকম বিচিত্র প্রকৃতিব স্ত্রীলোক—হয়ত একটি কপর্দকও কাউকে দেবেন না তাঁর বিপুল সম্পত্তিব—

না, তিনি already উইল করে দিয়েছেন।

কি উইল করেছেন ?

শুনেছি ওদের প্রত্যেকের জন্যেই একটা মোটা মাসোহারা ও নগদ টাকার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর উইলে।

ওঁরা কি সেকথা জানেন ?

নিশ্চয়ই জানে।

কিরীটী অতঃপর চুপ করে থাকে।

তারপর বলে, কিন্তু সত্যিই কি আপনি মনে করেন জয়ন্তবাবু—তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাত্রী জেঠিমাকে শেষ পর্যন্ত মাত্র ঐ কারণেই হত্যা করতে পারেন।

অন্ততঃ আমি হলেও পারতাম মনে হয়—

ঠিক আছে। কবে সেখানে যেতে হবে বলুন ?

আজ আপনি পারলে কাল নয়।

বেশ। আমি সামনের শনিবার যাব।

আমি এসে আপনাকে তাহলে নিয়ে যাব।

না, আমি একাই যাব। আপনি কেবল আপনার বড়মাকে গোপনে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবেন।

গোপনে !

হ্যাঁ। আমার সেখানে যাবার ব্যাপারটা যেন তাঁরা কেউ না জানতে পারেন।

কিন্তু—

কি ভাবে, কি পরিচয়ে যাব বুধবার আপনাকে জানাব।

বেশ। জয়ন্ত চৌধুরী উঠল।

॥ তিন ॥

ধানবাদ শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরেই ইন্দ্রালয়।

পাহাড়ের মত একটা উঁচু জায়গায় ইন্দ্রালয়। বাড়িটা যেন দূর থেকে অবিকল একটা দুর্গের মত মনে হয়। বড় রাস্তা থেকে পাথরের তৈরী একটা চওড়া রাস্তা ঘুরে ঘুরে সোজা রাস্তা যেন ইন্দ্রালয়ের গেটের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটা। তিনতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে বাগান, তার মধ্যেই রেস্ট-হাউস, আস্তাবল, গ্যারাজ ও চাকর-দারোয়ানদের থাকবার আস্তানা।

বাড়ির চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমানা প্রায় দেড় মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

একতলা, দোতলা ও তিনতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর। নিচের তলায় অফিস ও বসবার একটা বড় হলঘর। ওপরে দোতলায় চার ভাই থাকে চারটি ঘরে, এবং একটা ঘরে থাকেন চিত্রাঙ্গদা দেবী।

তিনতলার একটা ঘরে থাকে স্বাতী একা। স্বাতী বরাবর তার বড়মার লাগোয়া পাশের ঘরটাতেই ছিল, বছরখানেক আগে সে তিনতলায় চলে গিয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর আদৌ ইচ্ছা ছিল না, স্বাতী তিনতলায় গিয়ে থাকে। বাধাও দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু স্বাতী শোনে নি। বলেছিল, না, তোমার পাশের ঘরে আর আমি থাকব না।

কেন থাকবি না শুনি ?

সত্যি কথাটা শুনতে চাও ?

হ্যাঁ, বল্, কেন থাকবি না ?

সর্বক্ষণ আমার ওপরে তোমার ওই শকুনের মত চোখ মেলে থাকাটা আমার সহ্য হয় না।

কি বললি।

হ্যাঁ, তাই। আমি চলব ফিরব কথা বলব—জেগে থাকি বা ঘুমোই তুমি যে তোমার ঐ শকুনের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে আমার সামনে পিছনে আড়ালেও খবরদারি করবে—সেটা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

তা হবেই। আমার চোখের সামনে থাকলে বজ্জাতি করবার সুবিধে হয় না কিনা।

কি বললে, বজ্জাতি ?

হ্যাঁ—নষ্ট মেয়েমানুষ, তোর চরিত্রের কথা তো জানতে কারো বাকি নেই।

তুমি অতি নোংরা, অত্যন্ত ছোট মন কিনা তোমার।

কি বললি ? আমি নোংরা, আমার ছোট মন ?

একশবার বলব, হাজারবার বলব—অত্যন্ত ছোট মন।

মুখ তোর থেঁতো করে দেব হারামজাদি !

চেষ্টা করেই দেখ না একবার—কে কার মুখ থেঁতো করে দেয় দেখবে।

পিছমোড়া করে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখা উচিত—তোর মত হারামজাদি নষ্ট মেয়েমানুষকে।

আমাকে নয়—বাঁধা উচিত তোমাকে। জবাব দিয়েছিল স্বাতী।

কি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি কবো না—আমাকে তুমি আমার ওই ম্যাস্তামুখো ভীতু দাদারা পাওনি।

চুপ কর্ হাবামজাদি—ছেনাল—

কেন চুপ কবব, শুনি? তোমাব অত্যাচাব অনেক সহ্য করেছি, আব করব না। আজই আমি তেতলায় চলে যাব, দেখি তুমি কি কবতে পার।

ঠ্যাং ভেঙে দেব—একবার গিয়ে দেখ্ না।

আমিও তোমার ঠ্যাং ভাঙব তাহলে।

উঃ, দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি। সব—

সে তো পুষেছই। সেটা আবো ভাল কবে টেব পাবে, যখন সেই কালসাপেব ছোবল খাবে।

কথাগুলো বলে স্বাতী গটগট কবে সিঁড়ি বেয়ে ওপবে চলে গিয়েছিল। এবং সত্যি সত্যি সেইদিনই সে তেতলায় চলে যায়। চাকবদেব ডেকে জিনিসপত্র সব তাব তেতলাব ঘবে নিয়ে যায়।

জগদীন্দ্র বলেছিল বোনকে, বডমা খুব চটেছেন স্বাতী।

বয়েই গেল তাতে আমাব। আমি ওই ডাইনী শকুনি বুড়ীকে একটুও পবোযা কবি না।

ছিঃ, ওকথা বলে না।

ডাইনীকে ডাইনী বলব, শকুনিকে শকুনি বলব—তাব আবার ছিঃ কি। দেখ দাদা, তোমবা কেন পুরুষ হয়ে জন্মেছ বলতে পাব?

কিন্তু—

তোমাদেব গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

তা কি কবব বল্?

কববে আব কি। আব কববাব কিছু সাধ্যই কি আছে নাকি তোমাদের কাবো অবশিষ্ট? যাও যাও, বডমার পা চাটো গিয়ে। তোমাদের মত যদি পুরুষ হয়ে জন্মাতাম, তাহলে দেখতে ঠিক ওই ডাইনী বুড়ীকে এতদিনে আমি খুন কবতাম।

স্বাতী! চিৎকাব করে উঠেছিল জগদীন্দ্র সভয়ে বোনেব মুখের দিকে তাকিয়ে।

চাব-চারটে পুরুষ তোমরা বয়েছ, পাব না একদিন ওই শকুনি ডাইনী বুড়ীটাকে গলা টিপে শেষ কবে দিতে?

মেজ ভাই মণীন্দ্র যে ওই সময় দ্বারেব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা টের পায়নি।

হঠাৎ মণীন্দ্র বলে ওঠে পারব না কেন, খুব পারি।

পাব, পার মেজদা ?

খুব পারি।

মণীন্দ্র বলতে বলতে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

জগদীন্দ্র তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। ভয়ে তাব গলা শুকিয়ে এসেছে।

মণীন্দ্র আবো বলে, তুই দেখে নিস স্বাতী, একটু সুযোগ পেলেই—

হঠাৎ শুকনো গলায় ওই সময় কোনমতে জগদীন্দ্র ধমকে ওঠে ছোট ভাইকে, মণি, কি হচ্ছে কি।

আমাকে চোখ বাঙাচ্ছ কি দাদা, আমি জানি তুমিও—

মণি।

হ্যাঁ—তুমিও সুযোগ পেলে ওঁকে হত্যা কববে।

কি বললি, আমি—

হ্যাঁ, তুমি।

ভুলে যাস না মণি, বডমা না থাকলে আজ আমবা কোথায় ভেসে যেতাম।

সেও বোধ হয় এর চাইতে ভাল হত দাদা। এব নাম বাঁচা বল তুমি ? স্বাতী তো মিথ্যা বলেনি, ঠিকই বলছে—এব চাইতে জেলেব কয়েদীদেব জীবনেও স্বাধীনতা আছে। একবাব ভেবে দেখ তো ? আমাদের আশ্রয় দেবাব ছল কবে কিভাবে আমাদেব পাঁচ ভাই-বোনকে বড়মা বন্দী, পঙ্গু কবে বেখেছে। শোন দাদা, তোমাকে আমি শেষবাবেব মত বলে বাখছি—

কি ?

ভয়ে ভয়ে তাকায় জগদীন্দ্র ছোট ভাইয়েব মুখেব দিকে।

তোমবা এখানে পড়ে থাকতে পাব কিন্তু আমি এখান থেকে চলে যাব।

চলে যাবি ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

যেখানে হোক, পথে-ঘাটে।

কিন্তু খাবি কি ?

কলেব জল খাব।

বোকাব মত কথা বলিস না মণি, কলেব জল খেয়ে মানুষ বাঁচে না।

বাঁচে—বাঁচবে না কেন, এ বাজভোগেব চাইতে সে অনেক ভাল—অনেক

সম্মানের। বলে ওঠে স্বাতী।

পাগলামি করিস না মণি—ওসব গল্প-কবিতাতেই লেখা থাকে। জগদীন্দ্র বলে।

স্বাতী বড় ভাইয়ের সে কথায় কান না দিয়ে মেজ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, যাবে—যাবে মেজদা, সত্যি চল এখান থেকে আমরা চলে যাই।

যাব—সুযোগ এলেই যাব। মণীন্দ্র বলে।

ছেলেমানুষি করিস না মণি,—জগদীন্দ্র বলে ওঠে আবার ভীতকণ্ঠে, পৃথিবীটা এত সোজা নয়। ভুলে গেছিস? মনে নেই, বাবার সেই রোজগারের জন্য উদয়-অস্ত পরিশ্রম—তবু দুবেলা পেট ভরে আমাদের আহার জুটত না, মা'র সেই কান্না—

তবু সে কান্নার মধ্যে ইজ্জত ছিল, সম্মান ছিল দাদা। এরকম গ্লানি আর অপমানের জ্বালা ছিল না। স্বাতী বলে।

চতুর্থ ভাই শচীন্দ্র ওই সময় এসে ঘরে ঢোকে: ব্যাপার কিরে স্বাতী, হঠাৎ ওপরে চলে এলি কেন? বড়মা ভীষণ রেগে গেছে মনে হল—

তাই বড়মার জন্য বুঝি ওকালতি করতে এসেছ ছোটদা।

তার মানে?

মানে আর কি, তুমি বড়মার ভয়ে যেমন সর্বদা জুজুবুড়ী হয়ে আছ, তেমনিই থাক না গিয়ে—এখানে কেন?

স্বাতীর কথাবার্তাগুলো আজকাল কেমন শুনছ বড়দা? শচীন্দ্র বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিযে বলে।

সত্যি কথা বলছি কিনা তাই শুনতে খারাপ লাগছে ছোটদা।

ওঃ, দুটো পাস করে যে একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস রে। শচীন্দ্র টিপ্পনী কাটে।

তা তো করবই—এ তো আর গল্প-কবিতা লেখার মত সহজ নয়।

আগে লিখে নে একটা—তারপর অমন বড় বড় কথা বলিস, শচীন্দ্র বলে ওঠে।

ও যত খুশি তুমিই বসে বসে লেখ গে আর দু বেলা বড়মার দেওয়া রাজভোগ খাও গে।

তুই নিমকহারাম ছোটলোক কিনা—তাই বড়মার সব উপকার ভুলে গেছিস আজ।

তারপর একটু থেমে বলে, গলাধাক্কা দিয়ে যখন বড়মা এ বাড়ি থেকে বের করে দেবে, তখন বুঝবি।

বুঝতেই তো আমি সেটা চাই। বল গে না তোমার বড়মাকে কথাটা।

দেখ স্বাতী, এত তেজ মেয়েমানুষের ভাল না।

যাও যাও, আর উপদেশ দিতে হবে না। কবিতা লেখ গিয়ে, আর তোমার বড়মায়ের পায়ে তেল দাও গে—অপদার্থ কাপুরুষ।

ঘৃণাভরে কথাগুলো বলে স্বাতী মুখ ফিরিয়ে নেয় তার ভাইয়ের দিক থেকে।

কিন্তু আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল চিত্রাঙ্গদা দেবী যেন স্বাতীর তিনতলায় যাবার ব্যাপারটা মেনেই নিলেন।

প্রথমটায় যতই হাঁকডাক করুন না কেন, স্বাতী ওপরে চলে যাবার পর যেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

বরং বাড়ির বুড়ী ঝি লখিয়ার মাকে বলে দিলেন, রাত্রে স্বাতীর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে শুয়ে থাকতে।

স্বাতী যেন তিনতলায় গিয়ে কতকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, প্রতি মুহূর্তে এখন আর চিত্রাঙ্গদা দেবীর মুখোমুখি হতে হবে না।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর দুই চোখের সন্দিগ্ধ কুটিল দৃষ্টি তাকে কাঁটার মত বিঁধবে না। বাতের জন্য বেশি হাঁটা-চলা আর এখন করতে পারেন না চিত্রাঙ্গদা দেবী—সিঁড়ি বেয়ে যখন-তখন তিনতলায় উঠে আসাটা তো একপ্রকার দুঃসাধ্যই তাঁর পক্ষে।

॥ চার ॥

চিত্রাঙ্গদা দেবীর আসন্ন জন্মদিন উৎসব উপলক্ষ্যে ইন্দ্রালয়ের সবাই ব্যস্ত।

খুব হৈ-চৈ করে রীতিমত সমারোহের সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদা দেবীর জন্মোৎসব পালন করা হয়—৩রা মাঘ।

আর উৎসবটা রায় বাহাদুর হরপ্রসাদের আমল থেকেই হয়ে আসছে। একমাত্র সন্তান—আদরিণী কন্যার জন্মদিনটা খুব সাড়ম্বরেই যেন স্মরণ করিয়ে দিতেন সকলকে প্রতি বছর।

ইন্দ্রালয়ের পিছনে যে বাগান, সেখানেই পর পর সব তাঁবু পড়তো—চারদিকে নানারঙের আলোর উৎসব—যাত্রা থিয়েটার পুতুলনাচ ছাড়াও আর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

হরপ্রসাদ নিজে তিনি বরাবর গানবাজনা ভালবাসতেন—নিজেও গাইতে বাজাতে পারতেন—তাই তিনি মেয়ের জন্মদিনটিকে উপলক্ষ্য করে এক বিরাট জলসার ব্যবস্থা

করতেন প্রতি বছর—নানা জায়গা থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনতেন গুণীদের, আট-দশ দিন ধরে একটানা গান-বাজনার আসর চলত—আনন্দের স্রোত বইতো।

হরপ্রসাদ তাঁর যেখানে যত আত্মীয় আছে, সকলকেই সেই উৎসবে যোগ দিতে আহ্বান জানাতেন। তাদের যাতায়াত ও ওই কদিন ইন্দ্রালয়ে থাকার সব ব্যবস্থা করতেন, এবং ওই উৎসবের ব্যাপারটা হরপ্রসাদের মৃত্যুর পরও চলে এসেছে—চিত্রাঙ্গদার স্বামী জিতেন্দ্র চৌধুরীর প্রচেষ্টাতেই এবং সেটা আরো বেশি জাঁক-জমকের হয়েছে। জিতেন্দ্রর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ সরকার যোগজীবনবাবু—যাকে চিত্রাঙ্গদা বরাবর জীবনকাকা বলে ডেকেছে, তিনিই করে এসেছেন।

অবশেষে জগদীন্দ্রদের আমলে জগদীন্দ্রই সেটা নিজের হাতে তুলে নেয়।

ক'টা দিনের ওই উৎসবে প্রচুর টাকা খরচ করা হয়। আর বিশেষ একটা ব্যাপার হচ্ছে, ওই উৎসবের কটা দিনের জন্য চিত্রাঙ্গদা দেবী তাঁর আভিজাত্য ও দাম্ভিকতার সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে অত্যন্ত সহজ সরল স্বাভাবিকতার মধ্যে যেন নেমে আসেন। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন, সহজ ভাবে হাসেন, আনন্দ করেন—সকলের মধ্যে তাদেরই একজন যেন হয়ে যান।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর সে যেন সম্পূর্ণ অন্য এক রূপ। এ যেন সকলের পরিচিত চিত্রাঙ্গদাই নয়। হাসিখুশি ভরা সম্পূর্ণ অন্য একটি মানুষ।

একটি ছোট মেয়ে—যে তার জন্মতিথি উৎসবে আনন্দে মেতে উঠেছে।

কিরীটী যখন ইন্দ্রালয়ে এসে পৌঁছল সোজা কলকাতা থেকে তার গাড়িতেই, ইন্দ্রালয় তখন আলোয় আলোয় ঝলমল করছে চিত্রাঙ্গদা দেবীর আসন্ন জন্মতিথি উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়ে।

যোগীনবাবু করিডরের একপাশে দাঁড়িয়ে একজন কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর পাশে ছিল জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্র।

কিরীটীর পরিধানে ইউ পি র পোশাক ছিল—চোস্ত পায়জামা, গ্রে কলারের শেরওয়ানী, মাথায় কালো টুপি। চোখে চশমা। মুখে পাইপ।

যোগীনবাবুই সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন কিরীটী গাড়ি থেকে নামতেই তার সামনে।

নমস্তে। কিরীটী বলে যোগীনবাবুকে সম্বোধন করে।

নমস্তে। যোগীনবাবু বলেন, অর্জুনপ্রসাদ মিশ্র বোধ হয় আপনি।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ।

জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্র চেয়েছিল কিরীটীর দিকে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা—মাথার চুলে রগের দু পাশে রুপালী ছোঁয়া লেগেছে যদিও, তবু মনে হয় বার্ধক্য যেন ঠিক আজও ওর দেহকে ছুঁতে পায়নি।

মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

নিশ্চয়ই। আপনি বসবেন চলুন, আমি খবর দিচ্ছি ভিতরে।

চলুন।

জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্রই প্রশ্ন করে, ইনি ?

যোগীনবাবু তাড়াতাড়ি থেমে বলেন, পরিচয় করিয়ে দিই—এরা স্বর্গত মিঃ চৌধুরীর ছোট ভাইয়ের দুই ছেলে—জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্রকুমার চৌধুরী।

ও, নমস্কার। কিরীটী হাত তুলল।

ওরা দুই ভাইও প্রতিনমস্কার জানায়: নমস্কার।

আর ইনি—অর্জুনপ্রসাদ মিশ্র—আমাদের বিজনেস অ্যাডভাইসার হয়ে শীগগিরই আসছেন—উনি—

জগদীন্দ্র ও শচীন্দ্র পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না।

নিচের তলাতে গেস্টরুমেই কিরীটীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

যোগীনবাবু যেতে যেতে গেস্টরুমের দিকে তাকিয়ে একসময় কিরীটীকে প্রশ্ন করলেন, কিছুদিন আপনি এখানেই থাকবেন তো ?

হ্যাঁ, বুঝতেই তো পারছেন, সব কিছু বুঝে নিতে হবে সর্বপ্রথম মিসেস চৌধুরীর কাছ থেকে। এত বড় বিজনেস বুঝতে হলে মাসখানেক খুব কম করেও সময় তো লাগবেই।

তা তো লাগবেই।

হ্যাঁ, ভাল কথা, যে গাড়িটা করে আমি এলাম, সেটা আমার গাড়ি নয়—আমার এক বন্ধুর গাড়ি। কাল সকালেই আবার গাড়ি নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে।

আপনি কিছু ভাববেন না, সব ব্যবস্থা আমি করব।

গাড়ির ক্যারিয়ারে আমার দুটো স্যুটকেস আছে—

সে আমি নামিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি।

কথা বলতে বলতে দুজনে এসে ইন্দ্রালয়ের গেস্টরুমে প্রবেশ করল।

পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি বড় সাইজের, অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজের। একটিতে শয়ন ও অন্যটিতে বসবার ব্যবস্থা। দুই ঘরে যাতায়াত করবার জন্য মধ্যবর্তী

একটি দরজা আছে, এবং ওই দরজাটি শয়নকক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

সর্বপ্রকার আধুনিক ও আরামদায়ক আসবাবপত্রে ঘর দুটি সুন্দর করে সাজানো, ঠিক যেন কলকাতা শহরের কোন বড় হোটেলের সুইট। শয়নকক্ষের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম।

যোগীনবাবু ওই কক্ষে কিরীটীকে পৌঁছে দিয়ে বললেন, আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন, চা পান করুন, ভেতরে আমি খবর দিচ্ছি।

যোগীনবাবু চলে গেলেন।

একটু পরে একজন ভৃত্য কিরীটীর স্যুটকেস দুটো ওই কক্ষে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

কিরীটী শয়নকক্ষে প্রবেশ করে কক্ষের মধ্যবর্তী দরজাটা বন্ধ করে পথের বেশভূষা বদল করে নিল। পায়জামা ও পাঞ্জাবির ওপর একটা গরম শাল গায়ে জড়িয়ে নিল।

বেশভূষা বদল করে একটা সোফায় বসে সবে পাইপটায় নতুন করে অগ্নিসংযোগ করেছে, মধ্যবয়সী একটি ভৃত্য কক্ষে এসে প্রবেশ করল চায়ের ট্রে হাতে। ট্রের ওপরে শুধু চায়ের সরঞ্জামই নয়, ঐ সঙ্গে দু-তিনটে প্লেটে বিস্কিট, পেস্ট্রি, স্যাণ্ডউইচ, দু-চার রকম মিষ্টি এবং কিছু ড্রাই ফ্রুটস্। লোকটির চেহারা দেখে কিরীটীর বাঙালী বলেই মনে হয়, তবু হিন্দিতেই জিজ্ঞাসা করে তাকে, কেয়া নাম তুমারা?

বাবুজী, আমি বাঙালী, আমার নাম গণেশ সরকার। তারপর একটু থেমে শুধোয়, চা ঢালি বাবুজী?

ঢালো।

আপনি বাঙালী?

না গণেশ, তবে বহু বছর বাংলাদেশে আছি, বলতে পারো এক প্রকার বাঙালীই বনে গিয়েছি।

গণেশ মৃদু হাসল। হাসিটা যেন খুশিরই মনে হয়।

বয়েস গণেশের পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বলেই মনে হয়। মাথার ২।৩ অংশ চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। সামনের দিকে অনেকটা টাক।

বেঁটে গোলগাল চেহারা। পরিষ্কার একটা ধুতি ও হাফশার্টের ওপর মোটা একটা সোয়েটার গায়ে।

ক' চামচ চিনি দেবো বাবুজী?

দু' চামচ দাও।

রাণীমা আমাকেই বলেছেন আপনাকে দেখাশোনা করতে। আপনি তো এখন

কিছুদিন এখানে থাকবেন ?

হ্যাঁ, কিন্তু রাণীমা কে ?

আজ্ঞে, এ বাড়ির কর্ত্রী।

তাঁকে বুঝি তোমরা রাণীমা বলে ডাকো ? কিরীটী চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্নটা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

আজ্ঞে, চাকরবাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার আমরা সকলেই ওঁকে রাণীমাই বলি।

আর সরকারবাবু ?

তিনি শুধু মা বলেই ডাকেন।

আর দাদাবাবুরা ?

তারা ডাকে সবাই বড়মা বলে।

ওরা তো সকলে তোমাদের রাণীমার দেওরের ছেলেমেয়ে, তাই না গণেশ ?

আজ্ঞে।

গণেশ।

আজ্ঞে ?

এ বাড়িতে তুমি কতদিন কাজ করছো ?

তা বাবুজী, জীবনটা তো একরকম এখানেই কেটে গেল। কুড়ি-বাইশ বছরের সময় এসেছিলাম—

ও, তবে তো তুমি তোমাদের কর্তাবাবুকেও দেখেছ ?

দেখেছি বৈকি। যেমন চেহারা তেমনি রূপ—আর তেমনি ছিল দরাজ মন, ঠিক রাজা-মহারাজাদের মতই।

তোমাকে খুব ভালবাসতেন মনে হচ্ছে।

শুধু আমাকে কেন বাবুজী, সকলের প্রতিই তাঁর সমান দয়া ছিল। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কারো কখনো এতটুকু ভয় করেনি।

আর তোমাদের রাণীমা ?

রাণীমা! ওরে বাবা, না ডাকলে কারো সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস আছে নাকি।

খুব ভয় করো বুঝি সবাই তাঁকে ?

শুধু ভয়। বাঘের মত সবাই ভয় করে তাঁকে। তবে আমাকে খুব স্নেহ করেন।

ওই সময় জয়ন্ত চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

নমস্কার, মিস্টার মিত্র।

নমস্কার।

জয়ন্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে গণেশ ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

বসুন মিঃ চৌধুরী। কিরীটী জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

না, বসব না। আপনাকে ডাকতে এসেছি—বড়মা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। চলুন, ওঠা যাক্। জয়ন্ত চৌধুরী বললে।

তাহলে চলুন, দেখা করেই আসি। কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

দরজার দিকে এগোচ্ছিল কিরীটী, কিন্তু জয়ন্ত চৌধুরী বাধা দিলে, বললে, না, ও দরজা দিয়ে নয়। আসুন, এইদিকে।

কিরীটীকে নিয়ে জয়ন্ত শয়নঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

শয়নঘরের মধ্যে আর একটি দরজা ছিল।

কিরীটী ভেবেছিল, সে দরজাটা বুঝি পাশের ঘরে যাবার জন্য, কিন্তু দরজাটা খুলতেই দেখা গেল, তার অনুমান ভুল—ঘর নয় সরু একটা বারান্দা। বারান্দাটা অন্ধকার ছিল—সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জেলে দিল জয়ন্ত চৌধুরী।

জয়ন্ত চৌধুরী আগে আগে চলল, কিরীটী তাঁকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে। বারান্দার শেষপ্রান্তে সিঁড়ি। সিঁড়িটাও অন্ধকার ছিল—সিঁড়ির আলোটা জ্বালিয়ে দিল জয়ন্ত চৌধুরী।

সিঁড়িটা খুব চওড়া নয়। এবং দেখলেই বোঝা যায় সিঁড়িটা বহুদিন ব্যবহৃত হয়নি—ধাপে ধাপে ধুলো জমে আছে, আর বদ্ধ হাওয়ায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

আগে আগে জয়ন্ত চৌধুরী, পশ্চাতে কিরীটী ধাপের পর ধাপ বেয়ে উঠতে থাকে। জয়ন্ত চৌধুরীই একসময় বলে, যে-ঘরে আপনাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেটা আগে গেস্টরুম ছিল না। ওই ঘরেই যে সব বাঈজী ইন্দ্রালয়ে মুজরা নিয়ে আসত, রায় বাহাদুর হরপ্রসাদের আমলে তাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল। এবং এই সিঁড়িপথেই রাত্রে প্রয়োজন হলে হরপ্রসাদ শোনা যায় নাকি সবার চোখের আড়ালে ওই ঘরে যাতায়াত করতেন।

এবং এখন আর ব্যবহার হয় না—তাই না? কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

না। রায় বাহাদুরের মৃত্যুর দু বছর আগেই ও-পাট শেষ হয়ে গিয়েছিল।

কেন ?

জীবনের শেষ দুটো বছর তো পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন তিনি যে।

পক্ষাঘাত ?

হ্যাঁ। সারাটা জীবন ধরে যেমন প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন ব্যবসা করে, তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতারও চরম করে গিয়েছেন। গানের নেশা ছিল—নিজে যেমন গাইতে পারতেন, তেমনি শুনতেও ভালবাসতেন, আর সেই সঙ্গীতের নেশার পথ ধরেই দুটি জিনিস তাঁর জীবনে এসেছিল—সুরা আর নারী।

কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে থাকে।

এবং সেই সুরা আর নারী শেষটায় তাঁকে বুঝি গ্রাস করেছিল, এবং পরবর্তীকালে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল জিতেন্দ্র চৌধুরীর বেলাতেও।

জয়ন্ত চৌধুরী বলতে থাকে : তবু একটা কথা কি আমার মনে হয় জানেন মিস্টার রায় ?

কি ? কিরীটী তাকাল জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে।

জয়ন্ত চৌধুরী বলে, মনে হয় জিতেন্দ্র চৌধুরী যা হয়েছিলেন, হয়তো তিনি তা হতেন না—সম্পূর্ণ অন্য মানুষ একজন হতে পারতেন, যদি না রায় বাহাদুরের কন্যা চিত্রাঙ্গদা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হত।

একথা বলছেন কেন ?

কিরীটীর প্রশ্নের আর জবাব দেওয়া হল না—সিঁড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে জয়ন্ত বলে, এই যে আমরা এসে গিয়েছি।

জয়ন্ত চৌধুরীর কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর নজরে পড়লো—সিঁড়ির শেষ সরু একটা ল্যাণ্ডিং আর তার পরই বন্ধ একটা দরজা।

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে জয়ন্ত চৌধুরী দরজার ফোকরে চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

সরু একফালি বারান্দা সামনেই।

আসুন।

কিরীটী এগিয়ে গেল। জয়ন্ত চৌধুরী পুনরায় আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বারান্দাটা অন্ধকার।

একটু এগুতেই বাড়ির পশ্চাৎভাগ চোখে পড়ল।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ির পশ্চাৎভাগে বাগান—তার মধ্যে মধ্যে যে খোলা

জায়গা, সেই সব জায়গা জুড়ে সব তাঁবু পড়েছে।

তাঁবুতে তাঁবুতে আলো জ্বলছে।

বাগানের মধ্যে ওই সব তাঁবু কেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

বড়মার জন্মতিথি উৎসবের জন্য সব তাঁবু খাটানো হয়েছে, আসুন।

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে সামনেই একটা বন্ধ দরজার গায়ে ঠুক ঠুক করে কয়েকটা মৃদু টোকা দিল জয়ন্ত চৌধুরী।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাটা খুলে গেল।

জয়ন্ত চৌধুরী আহ্বান জানাল, আসুন মিস্টার রায়।

কিরীটী ভেতরে পা দিল।

পায়ে চপ্পল থাকলেও পায়ের তলায় একটা নরম কোমল স্পর্শ পায় কিরীটী। দামী পুরু কার্পেটে পা যেন ডুবে গিয়েছে।

উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল ঘরের মধ্যে। সেই আলোতেই ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল কিরীটী। মনে হল তার ঘরটা বসবার ঘর।

চারদিকে পুরনো আমলের ভারী ভারী সব সোফা ও কাউচ। গোটা দুই আধুনিক ডিভানও আছে সেই সঙ্গে। জানলায় জানলায় সব হাফ গোলাপী রঙের পর্দা ও ভারি পর্দা ঝুলন্ত ক্রীম রঙের।

ঘরের আবহাওয়া বেশ উষ্ণ ও আরামদায়ক—কিরীটী চেয়ে দেখলো ঘরের মধ্যে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছে।

পাশেই একজন বয়স্ক দাসী দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ই ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল। তার দিকে তাকিয়েই জয়ন্ত প্রশ্ন করল, সুরতিয়া, বড়মা কোথায়?

আপনারা বসুন, রাণীমা গোসলঘরে ঢুকেছেন—গোসল হয়ে গেলেই আসবেন।

অদ্ভুত মিষ্টি ও সুরেলা কণ্ঠস্বর যেন সুরতিয়ার। কথা তো বলল না, কিরীটীর মনে হল, যেন সে গান গেয়ে উঠল। কারো সামান্য কথাও এমন মিষ্টি সুরেলা হতে পারে এ যেন কিরীটীর ধারণার বাইরে এবং সেই কারণেই বোধ হয় সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুরতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

সুরতিয়ার বয়স হয়েছে। চল্লিশ-পয়তাল্লিশের নীচে নয় বলেই মনে হয়। গায়ের বর্ণ শ্যাম হলেও দেহের গড়নটি কিন্তু ভারি চমৎকার। এবং এখনো বেশ আঁটসাঁট। মুখের কোথায়ও যেন এখনো বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। বেশভূষা রাজপুতানী মেয়েদের মত।

সুরতিয়া ওদের বসতে বলে মধ্যবর্তী দরজাপথে অন্তর্হিতা হল।

বসুন মিস্টার রায়।

কিরীটী বসে না। ঘরের দেওয়ালে যে খানতিনেক বড় বড় অয়েল-পেন্টিং ছিল, সেইগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ওই অয়েল-পেন্টিংগুলো কাদের ?

কিরীটীর প্রশ্নে জয়ন্ত চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে একটি ছবির সামনে দাঁড়াল এবং বললে —এ হচ্ছে রায় বাহাদুর হরপ্রসাদ ব্যানার্জির তৈলচিত্র। দক্ষিণ দিককার দেওয়ালে ওটা চিত্রাঙ্গদা দেবীর মা—সারদা দেবী। আর ওই যে উত্তরের দেওয়ালে—উনি আমাদের বড় জেঠামশাই জিতেন্দ্র চৌধুরী।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর দিকে তাকিয়ে কিরীটী যেন সত্যিই মুগ্ধ হয়ে যায়। গায়ের রঙটা একেবারে টকটকে গৌর। মুখের ও দেহের গঠনটি যেন সত্যিই অনিন্দনীয়। পরনে শ্বেতশুভ্র দামী সিল্কের থান। অনুরূপ ফুলহাতা ব্লাউজ গায়ে। সম্পূর্ণ নিরাভরণা। কিন্তু তথাপি তাঁর চেহারার মধ্যে এমন একটা আভিজাত্য আছে যে, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

চোখে সোনার ফ্রেমের সৌখীন চশমা। চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী।

বাঁ হাতে একটা সাদা হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা লাঠি।

গত কয়েক বছর ধরে বাতে ভুগছেন, বেশি হাঁটা-চলা করতে পারেন না। এবং হাঁটা-চলা যতটুকু করেন, তাও ওই লাঠির সাহায্যেই।

বড়মা।

জয়ন্ত চৌধুরীই সসম্ভ্রমে ডাকে।

চিত্রাঙ্গদা দেবী কিরীটীর মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

বড়মা, ইনিই মিস্টার রায়। জয়ন্ত চৌধুরী কথাটা শেষ করে—মানে, অর্জুন মিশ্র।

নমস্কার। হাত তুলে নমস্কার জানালেন চিত্রাঙ্গদা দেবী।

কিরীটীও প্রতিনমস্কার জানায়।

বসুন। বস জয়ন্ত।

সকলেই উপবেশন করে, মুখোমুখি সোফায়।

জয়ের কাছে শুনেছেন নিশ্চয়ই সব কথা, মিস্টার মিশ্র ?

হ্যাঁ।

আপনি অন্য নামে, অন্য পরিচয়ে এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি মিস্টার

মিশ্র। বলে চিত্রাঙ্গদা দেবী জয়ন্তর দিকে তাকালেন : ওর যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়, তুমি কিন্তু দেখো জয়ন্ত।

আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না বড়মা। জয়ন্ত বলে।

তুমি কটা দিন এখানে থাকছ তো? চিত্রাঙ্গদা দেবী শুধালেন।

উৎসব পর্যন্ত আছি।

কেন, কটা দিন বেশি থাক না?

না বড়মা, ঐ সময় আমার পক্ষে বেশি দিন থাকা—

জয়ন্ত চৌধুরীর কথা শেষ হল না, সুরতিয়া এসে ঘরে ঢুকল, রাণীমা।

কি? ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন চিত্রাঙ্গদা দেবী সুরতিয়ার দিকে।

সুধন্য এসেছে।

কে—কে এসেছে?

সুধন্য। বললাম, রাণীমা এখন ব্যস্ত আছেন, দেখা হবে না। কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শুনছে না—

সুরতিয়ার কথা শেষ হল না, খোলা দরজাপথে একজন এসে ঘরে ঢুকে পড়ল ঐ সময়।

সকলেরই দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে আগন্তুকের ওপর পড়ে।

আগন্তুকের চেহারা ও বেশভূষা সত্যিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোগা পাতলা চেহারা। এককালে গায়ের রঙটা হয়ত অত্যন্ত ফর্সাই ছিল, এখন কেমন যেন তামাটে বর্ণ হয়েছে।

একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—লালচে তৈলহীন রুক্ষ। কতকাল যে তেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কে জানে। ছোট ছোট পিঙ্গল চোখ, উন্নত নাসা, ঠোঁট দুটো একটু পুরু। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল ও দাড়ির রঙ তামাটে। পরনে একটা কালো গরম প্যাণ্ট ও গায়ে গলাবন্ধ খয়েরি রঙের গরম কোট। হাতে একটা ফেল্ট ক্যাপ। পায়ে বুট জুতো।

নমস্তে রাণীমা। আগন্তুকই প্রথমে কথা বললে।

আবার কেন এসেছ? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আগন্তুককে চিত্রাঙ্গদা দেবী।

কি করি বলুন, পকেট যে খালি হয়ে গেল।

কথাগুলো বলতে বলতে আগন্তুক হাসল। ময়লা একসারি দাঁত যেন ঝিকিয়ে উঠল।

বিরক্তিভরা কণ্ঠে চিত্রাঙ্গদা বললেন, তুমি না বলেছিলে সেদিন টাকা নেবার সময়

আর ছ'মাসের মধ্যে টাকা চাইতে আসবে না ?

বলেছিলাম তো। লেকিন টাকা যে সব ফুরিয়ে গেল।

একটা পয়সাও আর তোমাকে আমি দেব না। যাও—বের হয়ে যাও।

গোসা করছেন কেন রাণীমা! সুধন্য is a poor man—তার ওপর গোসা করে কি ফায়দা বলুন! তাছাড়া আপনার কাছে দু-পাঁচশ তো nothing—কিছুই না। কিছু টাকা দিয়ে দিন, চলে যাই। জানি, আমার এ সুরৎ আপনি দেখতে চান না। টাকা দিন কিছু, চলে যাই।

একটা পয়সাও আর দেব না তোমাকে আমি। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন চিত্রাঙ্গদা দেবী।

দেবেন—দেবেন। আমি জানি, শেষ পর্যন্ত আপনি দেবেনই।

সুরতিয়া ? চিত্রাঙ্গদা দেবী ডাকলেন।

রাণীমা! সুরতিয়া এগিয়ে এল।

সুধন্য তাড়াতাড়ি সুরতিয়ার দিকে চেয়ে বলে ওঠে, তুমি যাও সুরতিয়া—অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, বহুত পিয়াস লেগেছে, এক কাপ গরম চা তৈরি করে আনো। আরো কিছু মিঠাই—ভুক ভি লেগেছে।

ব্যাপারটাকে যেন অত্যন্ত লঘু করে সুধন্য সুরতিয়ার দিকে চেয়ে কথাগুলো বললে।

ওকে এখান থেকে বের করে দে সুরতিয়া! চিত্রাঙ্গদা দেবী সুরতিয়ার দিকে চেয়ে বললেন।

সুরতিয়া কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে। বিব্রত, কেমন যেন মুহ্যমান তাকে মনে হয়।

যাও সুরতিয়া, চা আর মিঠাই নিয়ে এস। সুধন্য আবার বলে সুরতিয়ার দিকে চেয়ে।

সুরতিয়া! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার ডাকেন চিত্রাঙ্গদা দেবী। কি বললাম শুনতে পাচ্ছিস না!

সুধন্য এবার হঠাৎ এগিয়ে এসে একটা সোফার ওপর বসে পড়ল। এবং এতক্ষণে বোধ হয় তার ঘরের মধ্যে উপস্থিত কিরীটী ও জয়ন্তর দিকে নজর পড়ল।

তাড়াতাড়ি সে আবার সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল, ওঃ, আপনারা এখানে আছেন! আচ্ছা, তাহলে আমি পাশের ঘরেই যাচ্ছি। আপনার কাজ সেরে আপনি আসুন রাণীমা।

সুধন্য কথাগুলো বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুব্রতিয়া আব চিত্রাঙ্গদা দেবী দুজনেই যেন পাথব। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন ঘবের মধ্যে থমথম কবে।

কাবো মুখে কোন কথা নেই। আকস্মিক ঘটনাটা যেন সকলকেই কেমন স্তব্ধ কবে দিয়েছে।

॥ ছয় ॥

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন চিত্রাঙ্গদা দেবীই। বললেন, মিস্টাব মিশ্র, আপনাবা একটু বসুন, আমি আসছি—

কথাগুলো বলে চিত্রাঙ্গদা দেবী সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং লাঠি হাতে আস্তে আস্তে ঘব থেকে বেব হয়ে গেলেন।

কিবীটী বুঝতে পাবে, চিত্রাঙ্গদা দেবী যেন বেশ একটু বিচলিত। বিব্রত।

মিস্টাব চৌধুবী।

কিবীটীব ডাকে জয়ন্ত চৌধুবী ফিবে তাকাল, কিছু বলছিলেন?

এই লোকটি কে?

চিনতে পাবলাম না ঠিক। জয়ন্ত চৌধুবী মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল।

আগে কখনো ওকে এখানে দেখেননি? কিবীটী পুনবায় প্রশ্ন কবে।

না, এই প্রথম দেখলাম।

কিন্তু মনে হল লোকটাব এ বাড়িতে আসা-যাওয়া আছে।

আমাবও সেই বকম মনে হচ্ছে, তবে আমি তো এখানে থাকি না।

এবং আপনাব বড়মাব বিশেষ পবিচিতও মনে হল। কিবীটী আবাব বলে।

বিশেষ পবিচিত। বিস্মিত হয়েই তাকাল জয়ন্ত চৌধুবী কিবীটীব মুখেব দিকে।

হ্যাঁ, দেখলেন না—কেমন কবে এ ঘবেব মধ্যে এসে সোজা ঢুকে পড়ল, ঢুকে টাকা চাইল। ওব এ ঘবে ঢোকা ও চাওয়াব ধবনটা দেখে মনে হল মধ্যে মধ্যে এসে ও ওইভাবে আপনাব বড়মাব কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়—আব আপনাব বড়মাব কথা শুনেও তো তাই মনে হল।

সেই বকমই তো মনে হল। জয়ন্ত চৌধুবী মৃদু কণ্ঠে বলে।

মনে হল না মিস্টাব চোধুবী, তাই—কিন্তু কেন? আপনাব বড়মা ওকে মধ্যে মধ্যে টাকা দেন কেন?

শেষেব কথাগুলো যেন কতকটা স্বগতোক্তিব মতই মনে হল জয়ন্তব।

কি বললেন ? জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করে।

না, কিছু না। কিন্তু লোকটা কে হতে পারে ? আপনাদের পরিচিত বা আপনজন কেউ নয়, তাহলে তো আপনারা চিনতেনই। অথচ একেবারে নিঃসম্পর্কীয় বাইরের কেউ হলেই বা ওইভাবে অন্দরে এই রাত্রে সোজা একেবারে রাণীমার খাসমহলে এসে প্রবেশ করবেই বা কি করে, আর অমন করে নিঃসঙ্কোচে টাকার দাবিই বা করে কি করে ?

দাবি।

নয় কি—ওর টাকা চাওয়ার ধরনটা দেখলেন না। শুধু দাবিই নয়, ও যে মধ্যে মধ্যে টাকা পেয়েও থাকে, তা তো শুনলেন আপনার বড়মার মুখেই।

হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম।

এই সময় সুরতিয়া এসে আবার ঘরে ঢুকল। হাতে তার ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। ট্রে-টা সামনের একটা গোল টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, চা তৈরী করে দেব বাবুজী ?

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও।

সুরতিয়া চা তৈরি করতে থাকে। ঝুঁকে পড়ে নীচু হয়ে সুরতিয়া কাপে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞাসা করে, কত চিনি দেব বাবুজী ?

দু' চামচ। কিরীটী বলে।

জয়ন্ত চৌধুরীকে চিনি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে না সুরতিয়া। কিরীটী বুঝতে পারে সুরতিয়া জানে জয়ন্ত চায়ে কতটুকু চিনি খায়, তাই হয়ত ও সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

সুরতিয়া চা তৈরি করছে নীচু হয়ে ঝুঁকে। মুখটা তার ভাল করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার হাত নাড়া দেখে কিরীটীর মনে হয় সুরতিয়া যেন একটু চিন্তিত—একটু বিচলিত।

চা সে তৈরি করছে বটে ওদের জন্য, কিন্তু মনটা তার বোধ হয় চা তৈরি করার মধ্যে নেই। অন্য কোথাও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল সুরতিয়াকে।

চা তৈরি করে দিয়ে সুরতিয়া আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটীর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সুরতিয়াকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করে। কিরীটীর মনে হল যেন একটু দ্রুত এবং চঞ্চল পায়েই ঘর ছেড়ে গেল সে।

কিরীটী এবার জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আবার ডাকল, মিস্টার চৌধুরী।

কিছু বলছিলেন ?

হ্যাঁ। এই দাসীটি অনেকদিন ইন্দ্রালয়ে আছে, না ? মানে ঐ সুবতিয়া—

হ্যাঁ, অনেক দিনকার দাসী।

আপনার স্বর্গীয় জেঠামশাইয়ের আমলের বোধ হয় ?

মৃদু কণ্ঠে এবার জবাব দেয় জয়ন্ত, হ্যাঁ, ওর যখন ভরা যৌবন, তখন ও এখানে আসে।

এখন বয়স কত হবে ওর ?

তা ধরুন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ তো হবেই।

সেই রকম আমারও মনে হল।

একটা কথা বোধ হয় আপনাকে আমার বলা উচিত,—একটু ইতস্তত করে যেন জয়ন্ত চৌধুরী।

কি বলুন তো ?

আপনাকে তো একটু আগেই বলছিলাম, শ্বশুরের মত জামাইয়ের—অর্থাৎ আমার জেঠামশাইয়ের স্ত্রীলোকের ব্যাপারে একটু দুর্নাম ছিল—

কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকাল।

জয়ন্ত চৌধুরী বলে, ওই সুবতিয়া কিন্তু এ দেশের মেয়ে নয়, একদিন এসেছিল ওর স্বামীর সঙ্গে রাজপুতানা থেকে।

রাজপুতানা।

হ্যাঁ, জিতেন্দ্র চৌধুরীর ঘোড়ার শখ ছিল। সেই ঘোড়ার দেখাশোনা করবার জন্য জশলমীর থেকে ভূপৎ সিং আসে, সঙ্গে আসে তার তরুণী বউ সুবতিয়া। তখন সে উদ্ভিন্নযৌবনা। সুবতিয়া এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলা বাহুল্য জিতেন্দ্র চৌধুরীর নজরে পড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের কাজে বহাল হল সে।

তারপর ?

ভূপৎ সিং কৃতার্থ হয়ে গেল। বেচারী জানত না তো যে জিতেন্দ্র চৌধুরীর ওই বদান্যতার অন্তরালে কি উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। যা হোক, সুবতিয়া অন্দরে এসে ঢুকল একেবারে চিত্রাঙ্গদা দেবীর খাস চাকরাণী হয়ে—

বলেন কি !

হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে থেকেই জিতেন্দ্র চৌধুরী পৃথক ঘরে শয়ন করতেন।

কেন, চিত্রাঙ্গদা দেবীর সঙ্গে কি তাঁর সদ্ভাব ছিল না ?

না, এবং সেটা বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর বাবা জানতেন না সে-কথা ?

মৃত্যুর বৎসর দুই পূর্বে জানতে পেরেছিলেন এবং মেয়ে-জামাইয়ের মনোমালিন্যটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। আর তার কারণও বড়মা—

কি রকম ?

সে তো আপনাকে আগেই বলেছি—আমার ধারণা, তার মানে বড়মার চিরদিনের ঐ উদ্ধত দাম্ভিক প্রকৃতি ও অন্যকে সর্বক্ষণ দাবিয়ে রাখবার সেই বিচিত্র complex-এর জন্যই—

মনোমালিন্যের কারণটা কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, সেটাই আপনি মনে করেন ?

তাছাড়া আর কি হতে পারে ?

হুঁ, তারপর ?

তারপর বড়মার বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্থাবর-অস্থাবর একমাত্র মেয়ের নামে লিখে দেন।

আপনার জেঠামশাই তাতে কিছু বলেননি ?

না।

আশ্চর্য।

ব্যাপারটা শোনার পর আমরাও কম আশ্চর্য হইনি। যাই হোক, তারপর বড়মার বাবা রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর জেঠামশাই আরো বছর পাঁচেক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর শিকার, মদ্যপান, গান-বাজনা ও মেয়েমানুষ নিয়েই থাকতেন—বিজনেস বা সংসারের কোন ব্যাপারে কোনদিন মাথা গলাননি। সব কিছু থেকে দূরে দূরে থেকেছেন। নীচের মহলেই জেঠামশাই থাকতেন শুনেছি—কদাচিৎ কখনো কালে-ভদ্রে হয়ত ওপরে আসতেন।

কিরীটীর কাছে যখন জয়ন্ত চৌধুরী অতীত ইতিহাস বলছিল—চিত্রাঙ্গদা দেবীর শয়নঘরে তখন অন্য এক পর্ব চলছিল।

চিত্রাঙ্গদা সুধন্যকে নিয়ে তাঁর শয়নঘরে এসে ঢুকলেন।

গতবার টাকা নেওয়ার সময় কি বলেছিলে তুমি ? ঘরে ঢুকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চিত্রাঙ্গদা সুধন্যকে প্রশ্ন করেন।

কি জানি, ঠিক মনে পড়ছে না কি বলেছিলাম। কি বলেছিলাম বলুন তো রাণীমা ? সুধন্য স্মিতহাস্যে প্রশ্নটা করে চিত্রাঙ্গদার মুখের দিকে তাকাল।

ভুলে গেছো, না ?

মুক্তি নেই।

এতকাল বয়ে এসেছেন সে লজ্জা, এবং যতদিন বাঁচবেন তাঁকে টেনে যেতে হবে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জিতেন্দ্রর দোষ কি? তাঁর জন্মের জন্য তো জিতেন্দ্র দায়ী নন?

দায়ী যদি কেউ হয় তো তাঁর জন্মদাতা—তাঁর বাবা হরপ্রসাদ। যার অবস্থ লালসা এক নর্তকীর কন্যার গর্ভে তাঁর জন্ম দিয়েছিল।

হঠাৎ মনে পড়ে, পাশের ঘরে কিরীটী আর জয়ন্ত এখনো তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আর তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না চিত্রাঙ্গদা দেবীর।

চিত্রাঙ্গদা ডাকে, সুরতিয়া।

সুরতিয়া ঘরে এসে ঢুকল, ডাকছিলে রাণীমা?

হ্যাঁ। শোন্, ওঘরে গিয়ে জয়ন্তকে বলে দে, শরীরটা ভাল লাগছে না আমার, আজ আর ও ঘরে যাব না।

সুরতিয়া মাথা হেলিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পাশের ঘরে গিয়ে যখন ঢুকল, জয়ন্ত আর কিরীটী তখনো গল্প করছে।

রাণীমা বললেন, তাঁর শরীরটা ভাল লাগছে না, এখন আর আসবেন না।

জয়ন্ত আর কিরীটী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল নিঃশব্দে।

সুরতিয়া সংবাদটা দিয়ে আর অপেক্ষা করে না, ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিরীটী জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে চলুন মিস্টার চৌধুরী, ওঠা যাক।

হ্যাঁ, চলুন।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল।

পূর্বের সেই সিঁড়িপথেই পুনরায় দুজনে নীচে নেমে এল। এবং কিরীটীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে জয়ন্ত চলে গেল।

কিরীটী পাইপটা ধরিয়ে একটা আরাম-কেদারার ওপর গা ঢেলে দিল—মনের মধ্যে তখন তার একটি মুখ বার বার ভেসে ভেসে উঠছে।

সুধন্য।

কে ওই ছেলেটি? চিত্রাঙ্গদা দেবীর কাছ থেকে বোঝা গেল প্রায়ই এসে কিছু কিছু টাকা নিয়ে যায়, চিত্রাঙ্গদা দেবীও ওকে টাকা দেন।

মুখে দেবো না বললেও শেষ পর্যন্ত ওকে দেন।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর মত লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে—কোন গূঢ় কারণ না থাকলে নিশ্চয়ই চিত্রাঙ্গদা দেবী ওকে অমন করে বার বার টাকা দিতেন না।

কেন দেন ওকে চিত্রাঙ্গদা দেবী টাকা?

ভয়ে যে টাকা দেন না, তা বোঝা যায়। ভয় পাবার স্ত্রীলোক চিত্রাঙ্গদা দেবী নন। তাঁকে ভয় দেখিয়ে অর্থাৎ ব্ল্যাকমেইল করে টাকা নিচ্ছে সুধন্য, মনে হয় না কিরীটীর।

কিন্তু তার কারণটা কি? কি কারণ থাকতে পারে?

আর একটা মুখও মধ্যে মধ্যে কিরীটীর মনের পাতায় আনাগোনা করছিল। চিত্রাঙ্গদা দেবীর বসবার ঘরে দেওয়ালে টাঙানো ওঁর স্বামী জিতেন্দ্র চৌধুরীর ফটোর মুখখানা।

জিতেন্দ্র চৌধুরী জেনেশুনেই চিত্রাঙ্গদা দেবীকে একদিন বিবাহ করেছিলেন। এক বাঈজীকন্যার ঔরসজাত চিত্রাঙ্গদা দেবী—কথাটা হরপ্রসাদ গোপন করেননি জিতেন্দ্র চৌধুরীর কাছে।

জিতেন্দ্র চৌধুরী লোকটাও একেবারে শান্তশিষ্ট গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতাটি ছিলেন না। গান-বাজনার শখের সঙ্গে নারীপ্রীতিও ছিল তাঁর—প্রীতি না বলে নারীর প্রতি দুর্বলতা বললেই বোধ হয় ভাল হয়। তার প্রমাণ এখনো ইন্দ্রালয়েই রয়েছে—ওই বিগতযৌবনা ভূপৎ সিংয়ের স্ত্রী সুরতিয়া—রাজপুতানী।

এখনো যার দেহের গড়ন অমন, সে যে যৌবনে সত্যিকারের আকর্ষণীয় ছিল বুঝতে কষ্ট হয় না। জিতেন্দ্র চৌধুরীর ওর যৌবনের প্রতি আকর্ষণ হওয়াটা এমন কিছু বিচিত্র নয়।

কে জানে ওই সুরতিয়া শেষ পর্যন্ত জিতেন্দ্র ও চিত্রাঙ্গদা—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ কিনা।

হঠাৎ—হঠাৎই যেন একটা সম্ভাবনা কিরীটীর মনের পাতায় উঁকি দেয়। আশ্চর্য। হ্যাঁ—সত্যিই তো, আশ্চর্য রকমের একটা মিলও আছে দুটো মুখে। তবে—তবে কি ওইটাই কারণ?

গণেশ এসে ঘরে ঢুকল।

বাবুজী!

কে?

খাবার দেব কি?

খাবার? রাত কটা হল?

রাত সোয়া নটা।

তাহলে একটু পরে।

গণেশ কিন্তু তথাপি ঘর থেকে যায় না, দাঁড়িয়েই থাকে।

কিছু বলবে গণেশ ?

আজ্ঞে—কোন ড্রিঙ্ক দেব কি ?

ড্রিঙ্ক !

হ্যাঁ।

হুইস্কি আছে ?

আছে।

দাও এক পেগ। সোডা দিয়ে দিও।

গণেশ চলে গেল।

পরের দিন কিরীটীর ঘুম ভাঙল সানাইয়ের শব্দে। ভৈরো রাগে সানাই বাজছে। মনে পড়ল বাণীমার জন্মতিথি-উৎসব আজ থেকেই।

॥ আট ॥

সত্যই চিত্রাঙ্গদা দেবীর জন্মতিথি-উৎসব রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গেই সানাইয়ের মাঙ্গলিক দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বিখ্যাত সানাই বাজিয়ে রহিম এসেছিল।

ভোর হল, চিত্রাঙ্গদা দেবী তাঁর বসবার ঘরে স্নান করে একটা দুধ-গরদের থান পরে এসে বসলেন—একে একে সকলে তাঁকে শুভকামনা জানিয়ে যায়

সকলকেই হাসি মুখে চিত্রাঙ্গদা দেবী সম্ভাষণ জানান—এ যেন এক নতুন চিত্রাঙ্গদা। প্রশান্ত সৌম্য সুন্দর হাস্যময়ী—আভিজাত্য ও দম্ভের খোলসটা যেন আজ তিনি খুলে ফেলে দিয়েছেন।

সকাল থেকে সারাটা দিন দলে দলে কত যে লোক আসে চিত্রাঙ্গদাকে শুভকামনা জানাতে। কেউ কিছু ফুল, কেউ অন্য কোন উপঢৌকন, কেউ কিছু মিষ্টি। চিত্রাঙ্গদাও উদ্যানে বড় বড় দুটো তাঁবুতে অতিথি-অভ্যাগতদের জলযোগ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুদিন ধরে হালুইকরেরা সব মিষ্টান্ন তৈরি করেছে—ভারে ভারে সব মিষ্টান্ন।

তারপর ক্রমশঃ সন্ধ্যা নামল। লাল নীল সবুজ হলুদ—হরেক রকম আলোয় সারা ইন্দ্রালয় যেন ইন্দ্রপুরীর মতই ঝলমল করে ওঠে।

প্রথম দিন যাত্রার ব্যবস্থা ছিল। সারাটা রাত ধরে যাত্রাগান হল।

দ্বিতীয় দিনও অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়। রাত্রে বসল গানের আসর। অনেক সব বড় বড় ওস্তাদ গাইয়েরা এসেছে।

পর পর তিন রাত্রি এবার গানের জলসা চলবে।

প্রথম রাত্রে আধুনিক, দ্বিতীয় রাত্রে রাগসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, তৃতীয় রাত্রে ওস্তাদদের আসর।

রাত আটটা থেকেই আসর বসেছিল। কিরীটীও উপস্থিত ছিল আসরে। চিত্রাঙ্গদা দেবীকেও কিরীটী দেখেছে আসরে বসে গান শুনতে। তারপর যে কখন একসময় আসর ছেড়ে উঠে গেছেন, টের পায়নি কিরীটী—গানের সুরে বোধ হয় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

রাত তখন বোধ হয় এগারোটা বেজে কয়েক মিনিট হবে—

বড়ে গোলাম আলি মাত্র কিছুক্ষণ আগে আসরে নেমেছেন—গণেশ এসে কিরীটীর পাশে দাঁড়াল।

বাবুজী।

ফিস্ ফিস্ করে ডাকে গণেশ।

কে, গণেশ। কি খবর?

জয়ন্ত দাদাবাবু আপনাকে এখুনি একবার ডাকছেন।

জয়ন্তবাবু। কোথায় তিনি?

রাণীমার ঘরে।

কিরীটী নিঃশব্দে সঙ্গীতের জমাটি আসর ছেড়ে উঠে পড়ল। প্রায় শতাধিক শ্রোতা—সবাই গানের সুরের মধ্যে ডুবে রয়েছে।

কিরীটীর পূর্বেই স্বাতী ও তার ছোটদা শচীন্দ্র ছাড়া মণীন্দ্র, জগদীন্দ্র ও ফণীন্দ্র আসরেই উপস্থিত আছে। তারাও তন্ময় হয়ে গান শুনছিল।

চিত্রাঙ্গদা দেবীও তাঁর আসনে বসেছিলেন, কিন্তু আসর ছেড়ে যাবার সময় তাঁকে দেখা গেল না। তাঁর আসনটি শূন্য। কখন যে এক সময় তিনি উঠে চলে গেছেন, সে জানতে পারেনি।

আগের দু-রাত্রিতেও চিত্রাঙ্গদা দেবী যাত্রাগান শেষ হবার আগেই মাঝামাঝি সময় উঠে চলে গিয়েছিলেন যাত্রাগানের আসর ছেড়ে।

আজও হয়তো গেছেন—

যেতে যেতে লক্ষ্য পড়ল, সুধন্যও একপাশে শ্রোতাদেব মধ্যে বসে গান শুনছে।

কিরীটী চিন্তা করতে করতে অগ্রসর হয়, এত রাত্রে চিত্রাঙ্গদা দেবীব ঘবে কেন তাব ডাক পড়ল।

জয়ন্ত চৌধুরী ডেকে পাঠিয়েছে তাকে।

আজ সন্ধ্যাব সময় জয়ন্ত চৌধুরী একবাব তার ঘবে এসেছিল, বলেছিল কাল সকালেই সে নাকি কলকাতা ফিবে যাবে।

চিত্রাঙ্গদা দেবীব সঙ্গে সেই যে প্রথম দিন এখানে পৌছবাব পব সন্ধ্যায় তাঁব ঘবে আলাপ শুরু হতেই ঘবে সুধন্যব আবির্ভাব ঘটল এবং চিত্রাঙ্গদা দেবী একটু পবে ঘব ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন, তারপব আব চিত্রাঙ্গদা দেবীব সঙ্গে কোন আলাপ বা কথাবার্তা হয়নি। যদিও গত দুদিন যাত্রাব আসবে ও আজ সঙ্গীতেব আসবে দূব থেকে তাঁকে সে দেখেছে।

সাধারণেব সিঁড়িপথেই কিবীটী গণেশকে অনুসবণ কবে দোতলায় গিয়ে হাজিব হল একসময়। সিঁড়িব আলোতে ও বাবান্দাব উজ্জ্বল আলোয় সব কিছু চোখে পড়ে—নির্জন, একেবারে খাঁ খাঁ কবছে চাবদিক।

দূর থেকে গানেব সুর ভেসে আসছে।

বসবার ঘরের দিকে নয়, গণেশ চিত্রাঙ্গদাব শয়নঘরেব দিকেই এগিয়ে গেল—

কিবীটীও এগোয়।

দবজাটা ভেজানো ছিল।

গণেশ হঠাৎ ভেজানো দবজাব সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে কিবীটীব দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, ভেতবে যান, জয়ন্ত দাদাবাবু ভেতবেই আছেন।

কিবীটী দবজা ঠেলে ঘরের মধ্যে পা দিল।

ঘরেব মধ্যেও আলো জ্বলছিল—এবং ঘরে পা দিয়ে সামনের দিকে ভূমিতলে দৃষ্টি পড়তেই কিরীটী যেন আচমকা নিজেব অজ্ঞাতেই থমকে দাঁড়াল। তাব গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বের হয়ে এল শুধু—তাবপবই সে যেন বোবা হয়ে গেল।

ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরেব মসৃণ মেঝেব ওপব পড়ে আছে চিত্রাঙ্গদার দেহটা। পবনে সেই সন্ধ্যার দুধ-গরদ থান। সাদা মার্বেল পাথরের মেঝের অনেকটা জায়গা ও পরনের দুধ-গবদ থান রক্তে একেবাবে লাল—যেন বক্তস্রোতেব মধ্যে ভাসছে একটি শ্বেতপদ্ম।

উপুড় হয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছেন মুখ থুবড়ে চিত্রাঙ্গদা দেবী। তাব হাতটা

সামনের দিকে ছড়ানো, বাঁ হাতটা ভাঁজ করা বুকের কাছে।

মাথার কেশভার খানিকটা পিঠের ওপর পড়ে ও খানিকটা দুপাশে ছড়িয়ে আছে। আর অদূরে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত চৌধুরী।

দৃশ্যটা এমনি মর্মন্তুদ ও আকস্মিক যে কিরীটী কয়েকটা মুহূর্ত বিহ্বল বোবা দৃষ্টিতে সামনের দিকে কেমন যেন অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে।

কোন শব্দই তার মুখ দিয়ে বের হয় না। তারপর একসময় নিজের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকায়, ধীরে ধীরে এগিয়ে ভূপতিত রক্তাক্ত দেহটার সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রথমে শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করে, যদিও ভূপতিত দেহটার দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পেরেছিল চিত্রাঙ্গদা দেবী আর বেঁচে নেই।

তবু একবার ক্ষণেকের জন্য ভূপতিত দেহটা পরীক্ষা করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিরীটী।

কখন জানতে পারলেন আপনি মিস্টার চৌধুরী ?

কিছুক্ষণ আগে ঘরে ঢুকেই। মৃদু কণ্ঠে বললে জয়ন্ত চৌধুরী।

কখন আপনি এ ঘরে এসেছেন ?

এগারোটা বাজবার বোধ হয় মিনিট কয়েক আগে—কারণ ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্য দেখবার একটু পরেই বারান্দার ঘড়িতে এগারোটা বেজেছিল। আমিও ঠিক আপনার মত প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেছলাম, মিস্টার রায়। কি করব বুঝতে পারিনি, তারপর হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ল—গণেশকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠাই।

গণেশ কোথায় ছিল ?

গণেশ আমাকে ডাকতে গিয়েছিল।

আপনি কোথায় ছিলেন ?

ঘরে। সন্ধ্যেবেলা থেকেই মাথাটা ধরেছিল, তাই দোতলায় নিজের ঘরে শুয়েছিলাম।

আপনি গানের আসরে যাননি ?

না।

হুঁ। গণেশ আপনাকে ডাকতে গিয়েছিল কেন ?

বড়মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। শুয়ে শুয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল, গণেশের ডাকাডাকি ও দরজার গায়ে ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ি।

তারপর ?

আমাব আসতে বোধ হয় মিনিট দশ বাবো লেগে থাকবে। এসে দেখি, ঘরের দবজাটা ভেজানো। দবজা ঠেলে ঘবে পা দিয়েই দেখি ওই বীভৎস দৃশ্য। তখনো প্রাণটা একেবাবে বেব হয়ে যায়নি, মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু আক্ষেপ কবছেন যন্ত্রণায়। ঝুঁকে পড়ে ওঁব মুখেব দিকে তাকালাম, কিন্তু বাব দুই ঠোঁটটা কাঁপল, তারপরই সব শেষ হয়ে গেল।

গণেশ জানে ব্যাপারটা ?

জানে।

তাকে ডাকুন তো একবাব। কোথায় সে ?

বোধ হয বাইবে দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত ডাকল অতঃপব, গণেশ—গণেশ—

গণেশ ভেতবে এল।

তাব দু চোখে জল—বেচাবী কাঁদছিল তখনো।

॥ নয় ॥

গণেশ। কিবীটী ডাকল।

বাবুজী—

সব কথা আমাকে বল গণেশ, তোমাকে তোমাব বাণীমা কেন জয়ন্তবাবুকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন এবং কখন ?

গণেশ কাঁদতে কাঁদতে ধবা গলায যা বললে, তাব সাবার্থ হচ্ছে : গানেব আসর থেকে আধঘণ্টাটাক আগে বাণীমা উঠে আসেন। এসে সুবভিযাকে দিয়ে গণেশকে ডেকে পাঠান নীচেব থেকে। গণেশ এলে তাকে বলেন জযন্তকে ডেকে আনতে। গণেশ প্রথমে ভেবেছিল, জযন্ত দাদাবাবু বুঝি নীচে গান শুনছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে খোঁজ করে না পেয়ে তাঁব ঘবে এসে তাঁকে ডাকে।

তুমি এই ঘবে এসেছিলে ?

হ্যাঁ, ঘবে ঢুকে দেখি,—গণেশ বলে, বাণীমা জানলাব কাছে পিছন ফিবে দাঁড়িয়ে আছেন।

তারপব ?

বাণীমা আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলেন জয়ন্ত দাদাবাবুকে ডেকে দিতে।

সুরভিয়া কোথায় ? তাকে দেখছি না কেন ? কিরীটী প্রশ্ন কবে।

কেন, সে তো বাণীমার কাছেই ছিল!

কোথায় গেল সুরতিয়া—দেখ তো। ডেকে আনো তাকে।

তাহলে বোধ হয় নীচে গেছে গান শুনতে। রাণীমা ফিরে এলে তো সে নীচে যেত গান শুনতে।

যাও, দেখ—তাকে ডেকে আনো জলসা থেকে।

গণেশ চলে গেল।

মৃদু কণ্ঠে জয়ন্ত বলে, শেষ পর্যন্ত বড়মার আশঙ্কাটাই সত্যি হল।

কিরীটী জয়ন্তর কথার কোন জবাব দেয় না। সে তখন আবার নীচু হয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করছিল।

পিঠের বাঁদিকে একটা গভীর ক্ষত। বোঝা যায় কোন ধারাল তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা অতর্কিতে পেছন দিক থেকে আঘাত করা হয়েছে। মনে হয় ছোরা জাতীয় কোন ধারাল তীক্ষ্ণ অস্ত্র।

মিস্টার রায়।

উঁ।

এখন কি করা যায় বলুন তো?

কিরীটী সে কথার জবাব না দিয়ে কতকটা যেন আপন মনেই বলে, মনে হচ্ছে অতর্কিতে পিছন দিক থেকে কেউ ছোরা জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করেছে—

আপনার তাই মনে হয়?

হ্যাঁ। তারপর একটু থেমে আবার কিরীটী বলে, রাত তখন কত হবে? যদি এখন থেকে আধঘণ্টা আগে গানের আসর থেকে চিত্রাঙ্গদা দেবী উঠে এসে থাকেন, তাহলে রাত সোয়া দশটা মত হবে—

কিরীটী কথাগুলো কতকটা যেন আপন মনেই উচ্চারণ করে কি যেন চিন্তা করতে থাকে।

মিস্টার চৌধুরী?

বলুন।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল জয়ন্ত।

আজ আপনার সঙ্গে শেষবার কখন ওঁর দেখা হয়েছিল?

সন্ধ্যার সময়।

আন্দাজ কটা হবে তখন?

বোধ হয় ছটা—আমাকে ডেকে পাঠান সুরতিয়াকে দিয়ে।

তারপর ?

ঘরে ঢুকে দেখি বড়মা যেন অত্যন্ত উত্তেজিত—বিচলিত—

কেন ?

তা তো জানি না, তবে আমাকে বললেন, মণিদা—মানে মেজ জেঠামশাইয়ের মেজ ছেলেকে তিনি এক কপর্দকও দেবেন না ঠিক করেছেন এবং তাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন।

কেন ?

তা জানি না। আরো বললেন, আমি যেন আপনাকে বলে দিই তার ওপর একটু নজর রাখতে—

আর কিছু ?

না। এ কথাটা বলার জন্যই বোধ হয় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু গতকাল তো আপনি বলছিলেন, ওই মণীন্দ্রবাবুকেই চিত্রাঙ্গদা দেবী চার ভাইয়ের মধ্যে একটু বেশি পছন্দ করতেন ও স্নেহ করতেন।

আমার ধারণা তো তাই ছিল। হঠাৎ যে কেন মণিদার ওপর চটে গেলেন জানি না।

ঘরে সেই সময় আর কেউ ছিল ?

সুরতিয়া ছাড়া আর কেউ ছিল না।

ওই সময় কে যেন মনে হল দরজাপথে উঁকি দিয়েই সরে গেল। কিরীটী চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কে—কে ওখানে ?

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না, শোনা গেল একটা দ্রুতপায়ের শব্দ। কিরীটী ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় পড়ে।

কে যেন সিঁড়ির দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে।

এ কি—সুধন্যবাবু।

ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে। সুধন্য কিরীটীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

দাঁড়ান। আসুন আমার সঙ্গে ঘরে।

ঘরে ?

হ্যাঁ—চিত্রাঙ্গদা দেবীর শোবার ঘরে।

জয়ন্ত চৌধুরীও ততক্ষণে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল বারান্দায়।

কি ব্যাপার। কে ও—এ কি, সুধন্য না ?

হ্যাঁ। চলুন—ঘরে চলুন।

না না, ও-ঘরে আমি যাব না। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে।

চলুন।

কিরীটী একপ্রকার জোর করেই টানতে টানতে যেন সুধন্যকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। এবং সুধন্য ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর রক্তস্রোতের মধ্যে শায়িতা চিত্রাঙ্গদা দেবীর মৃতদেহটা দেখে অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে।

কিরীটীর হাত থেকে মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার আবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়।

ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন আমাকে—যেতে দিন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে গণেশের সঙ্গে সুরতিয়া এসে ঘরে পা দিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা দেবীর রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা দেখে অস্ফুট ভয়ার্ত কণ্ঠে একটা চিৎকার করে ওঠে।

সুধন্য তখনো নিজেকে ছাড়বার চেষ্টা করছে।

দাঁড়ান। পালাবার চেষ্টা করলে এখুনি আপনাকে পুলিসে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেব। কিরীটী কঠিন কণ্ঠে বলে।

কেন, কেন—পুলিসে ধরিয়ে দেবেন কেন আমাকে? আমি তো খুন করিনি ওঁকে।

সুরতিয়া হঠাৎ ওই সময় বলে ওঠে, না না, ও খুন করেনি। ওকে ছেড়ে দিন আপনারা, ওকে ছেড়ে দিন।

কিরীটী ফিরে তাকাল সুরতিয়ার মুখের দিকে তার কণ্ঠস্বরে। সুরতিয়ার সমস্ত মুখটা যেন রক্তশূন্য—ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে আতঙ্কে।

কি করে তুমি জানলে যে ও খুন করেনি?

ও তো নীচে গান শুনছিল।

তাই যদি তো, ও পালাচ্ছিল কেন অমন করে ছুটে ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে একটু আগে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

তারপরই সুধন্যর দিকে তাকিয়ে কিরীটী প্রশ্ন করে, কেন একটু আগে ঘরে উঁকি দিচ্ছিলে?

আমি—আমি—

বল—কেন এসেছিলে?

আমি রাণীমার কাছে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

এত রাত্রে কথা বলতে এসেছিলে। সত্যি বল, কেন এসেছিলে ?

টাকা—

টাকা।

হ্যাঁ—টাকা চাইতে এসেছিলাম রাণীমার কাছে।

এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছিলে ?

হ্যাঁ। সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন, কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাব বলে টাকা চাইতে এসেছিলাম।

তাই যদি তো, টাকা না চেয়ে ঘরের দরজা থেকে অমন করে উঁকি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন ?

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সুধন্য মেঝেতে পড়ে থাকা চিত্রাঙ্গদা দেবীর রক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে তাকাল।

বল ?

ভয় পেয়ে। আমি—আমি জানতাম না—

মিস্টার চৌধুরী।

কিরীটী জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল।

বলুন।

এ বাড়িতে ফোন আছে তো ?

হ্যাঁ—পাশের ঘরেই আছে।

যান, থানায় একটা ফোন করে দিন।

জয়ন্ত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শোন সুধন্য, তুমি পাশের ঘরে গিয়ে বসে থাক, পালাবার চেষ্টা কোরো না।

আমাকে ছেড়ে দিন—সত্যি বলছি, আমি কিছু জানি না স্যার।

যাও। যা বললাম পাশের ঘরে গিয়ে বসে থাক। পালাবার চেষ্টা করো না—কারণ পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারবে না জেনো। তাহলে পুলিস তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করে এনে একেবারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে মনে রেখো।

ফাঁসি।

হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। যাও, পাশের ঘরে গিয়ে বসো।

সত্যিই ফাঁসি দেবে ?

যদি পালাও বা পালাবার চেষ্টা কর।

সুধন্য আর কোন কথা বলে না, নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে যায় দু-ঘরের মধ্যবর্তী

দরজাপথে ধীরে ধীরে ভূপতিত দেহটার দিকে তাকাতে তাকাতে।

কিরীটী এবার ফিরে তাকাল সুরতিয়ার দিকে, সুরতিয়া।

বাবুজী।

তুমিই তো বরাবর রাণীমার খাস দাসী ছিলে?

জী।

সব সময় তাঁর কাছে-কাছেই থাকতে?

জী।

তবে আজ থাকনি কেন?

রাণীমা বলল গণেশকে ডেকে দিয়ে নীচে গিয়ে গান শুনতে। তাই গণেশকে ডেকে দিয়ে গান শুনতে গিয়েছিলাম।

তার আগে পর্যন্ত তো তুমি রাণীমার কাছে-কাছেই ছিলে?

জী।

আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কে কে রাণীমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল মনে করে বলতে পার?

কেন পারব না।

বল কে কে এসেছিল?

সকালে নটায় প্রথম আসেন এখানকার অফিসের ম্যানেজারবাবু—চক্রবর্তী সাহেব।

কে, অনিন্দ্য চক্রবর্তী?

নাম তো জানি না তার—সবাই বলে তাঁকে চক্রবর্তী সাহেব—আমিও তাই বলি।

তারপর কতক্ষণ ছিলেন চক্রবর্তী সাহেব রাণীমার ঘরে?

তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক।

অফিসের কাজে এসেছিলেন বোধ হয় চক্রবর্তী সাহেব?

না।

তবে?

তিনি আর চাকরি করবেন না, তাই বলতে এসেছিলেন।

তাতে রাণীমা কি বললেন?

তাঁদের সব কথাবার্তা তো শুনিনি। তবে একবার রাণীমাকে বলতে শুনেছিলাম, চাকরি ছেড়ে দিলেও দিদিমণির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কোন আশা নেই।

তাতে চক্রবর্তী সাহেব কি জবাব দিলেন?

বলেছিলেন, বিয়ে তাদের হবেই—রাণীমার সাধ্য নেই তাদের বিয়ে আটকান।

বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ দশ ॥

চক্রবর্তী সাহেব ছাড়া আর কে এসেছিল আজ রাণীমার কাছে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

বড়দাদাবাবু এসেছিলেন দুপুরে—খাওয়ার পর রাণীমা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বড়দাদাবাবুর সঙ্গে রাণীমার কি কথা হচ্ছিল জানি না, তবে মনে হয়েছিল রাণীমা বড়দাদাবাবুকে খুব বকাবকি করছেন, দাদাবাবু একসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

আর কেউ আসেনি?

ওই সময় জয়ন্ত চৌধুরী এসে ঘরে ঢুকল। মিস্টার চৌবেকে ফোন করে এলাম, তিনি এখুনি আসবেন বললেন।

কিরীটী সুরতিয়ার দিকে আবার তাকাল, আর কে এসেছিল?

মেজদাদাবাবু আর জয়ন্তদাদাবাবু।

আর কেউ আসেনি?

না।

ঠিক করে মনে করে দেখ।

না—আর কেউ আসেনি।

তোমার দিদিমণি?

দিদিমণি।

হ্যাঁ, দিদিমণি আসেননি?

না তো।

হুঁ। আচ্ছা, মণিদাদাবাবুর সঙ্গে রাণীমার কি কথা হয়েছিল, কিছু শুনেছিলে?

না। তবে—

কি?

একটা কথা কানে এসেছিল। রাণীমা চিৎকার করে মেজদাদাবাবুকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছিলেন।

আর কেউ আসেনি রাণীমার সঙ্গে দেখা করতে, তোমার ঠিক মনে আছে?

কিরীটী আবার প্রশ্নটা করে।

ঠিক মনে আছে। তবে—

কি ?

আসর থেকে রাণীমা ফেরবার পর আমি যখন গণেশকে ডেকে বাগানে যাচ্ছি, তখন সিঁড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হয়েছিল কে যেন ওপরে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে।

মনে হয়েছিল কেন, দেখনি ?

দেখেছি।

তবে ?

পিছন থেকে দেখেছি। ঠিক চিনতে পারিনি।

পুরুষ, না স্ত্রীলোক ?

পুরুষই—গায়ে একটা কালো রঙের ওভারকোট ছিল। আর—

আর ?

লম্বা লম্বা পা ফেলে একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে টপকে যেন লোকটা ওপরে চলে গেল।

তুমি দেখলে না কেন, কে ওপরে যাচ্ছে ?

না, দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম—

কি—কি ভেবেছিলে ?

সুরতিয়া জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল, যেন ইতস্তত করছে একটু—

কি, বল। কি ভেবেছিলে ?

ভেবেছিলাম বুঝি জয়ন্তদাদাবাবুই ওপরে যাচ্ছেন।

জয়ন্তবাবু। কিরীটীর মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হয়।

জয়ন্তও সবিস্ময়ে বলে ওঠে, আমি।

হ্যাঁ।

আশ্চর্য। তা হঠাৎ তোমার মনে হল কেন যে সে আমিই ? জয়ন্তই আবার প্রশ্ন করে সুরতিয়াকে।

আপনার ছাড়া তো কালো ওভারকোট এ বাড়িতে কারো নেই। তাই মনে হয়েছিল।

কিরীটী এবার জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল, আপনার কালো রঙের ওভারকোট আছে নাকি সত্যিই মিস্টার চৌধুরী ?

হ্যাঁ। গ্রেট কোট আমি একটা বড় ব্যবহার করি না, তবে এখানে এ সময় খুব শীত বলে কোটটা সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু একদিনও এসে পর্যন্ত ব্যবহার করিনি—

হুকে দেওয়ালে ঝোলানোই রয়েছে।

হুঁ। কি যেন এক মুহূর্ত ভাবল কিরীটী। তারপর জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললে, যান, দেখে আসুন তো কোটটা আছে কিনা?

এখুনি দেখে আসছি।

জয়ন্ত দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুরতিয়া।

বাবুজী।

জয়ন্তবাবুর সঙ্গে তোমাদের রাণীমার কি কথা হয়েছিল, জান?

শুনিনি। তবে একটা কথা কানে এসেছিল রাণীমার।

কি কথা?

জয়ন্ত, আমি তোমাকেও এখন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

বলেছিল ওই কথা রাণীমা?

হ্যাঁ। আরো বলেছিল রাণীমা, মনে হচ্ছে—এখন মনে হচ্ছে, তোমরা সবাই আমাকে মারতে পার। মারবার জন্য সবাই তোমরা আমাকে ওৎ পেতে বসে আছ।

জয়ন্তবাবু তার কি জবাব দিলেন?

জয়ন্তদাদাবাবু বললেন তোমাকে দেখছি সত্যিসত্যিই মৃত্যু-বিভীষিকায় পেয়েছে বড়মা। তোমার মাথা সত্যিসত্যিই খারাপ হয়ে গেল বলে আমার মনে হচ্ছে।

জয়ন্ত ওই সময় হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল, আশ্চর্য—strange—

কি হল?

কোটটা ঘরে নেই।

নেই?

না।

সারাদিন কোটটা ছিল কিনা মনে আছে আপনার?

মনে আছে স্পষ্ট, দিনের বেলায় দেখেছি। তবে সন্ধ্যার পর বড়মার ঘর থেকে ফিরে এসে মনে পড়ছে না দেখেছি কিনা।

কিরীটী কোটটা সম্পর্কে আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করে না বা কোন প্রশ্ন করে না। মনের মধ্যে তখন তার অন্য একটা চিন্তা ক্রমশ যেন একটা নির্দিষ্ট রূপ নেবার চেষ্টা করছে।

রাত সোয়া দশটা নাগাদ চিত্রাঙ্গদা দেবী গানের আসর থেকে উঠে ভেতরে চলে

আসেন। তাবপব চিত্রাঙ্গদা দেবী তাঁব খাস দাসী সুবতিয়াকে বলেন গণেশকে ডেকে দিতে। গণেশ সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় বাণীমাব এই ঘবে যদি এসে থাকে, তাহলে সেটা দশটা কুড়ি-পঁচিশ খুব জোব হবে। চিত্রাঙ্গদা দেবী তখনো বেঁচে ছিলেন। কাবণ গণেশ এসে এই ঘবে ঢুকবাব পব তাকে চিত্রাঙ্গদা দেবী বলেন, জয়ন্তকে গানেব আসব থেকে ডেকে আনবাব জন্য। গণেশ বেব হয়ে যায়। ধবা যাক সময় তখন ঘডিতে সাড়ে দশটা মত হবে।

গণেশ প্রথমে জয়ন্তবাবুকে ডাকতে গানেব আসবে যায—সেখানে খোঁজ না পেয়ে ফিবে আসে আবাব বাডিব মধ্যে। জয়ন্ত চৌধুবীব ঘবে যায, তাকে ডাকাডাকি কবে তোলে—যেহেতু জয়ন্ত চৌধুবী তখন ঘুমোচ্ছিল।

জয়ন্ত চৌধুবী এসে মিনিট পনেবো-কুডিব মধ্যেই এই ঘবে ঢোকে এবং ঢুকে দেখতে পায়—চিত্রাঙ্গদা দেবী মৃত।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগাবোটা—ওই পনেবো মিনিট সমযেব মধ্যেই কোন এক সময হত্যাকাবী এই ঘবে ঢুকে তাব কাজ শেষ কবে চলে গিয়েছে।

বাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগাবোটা।

শেষেব কথাটা কিবীটী মৃদু কণ্ঠে উচ্চাবণ কবে কতকটা বুঝি স্বগতোক্তিব মতই।

কিছু বলছেন মিস্টাব বায ? জযন্ত চৌধুবী প্রশ্ন কবে।

বলছি চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সম্ভবত বাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগাবোটাব মধ্যে কোন এক সময হত্যাকাবী পিছন দিক থেকে অতর্কিতে ছোবাব দ্বাবা আঘাত কবে সবে পড়েছে বলেই আমাব মনে হচ্ছে। অর্থাৎ সে সময় দোতলায় একমাত্র চিত্রাঙ্গদা দেবী তাঁব ঘবে ও আপনি আপনাব ঘবে ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না বাড়িব মধ্যে। কাজেই—

কি ?

যদি অতর্কিতে আঘাত পেয়ে একটা চিৎকাব কবেও উঠে থাকেন সেই মুহূর্তে চিত্রাঙ্গদা দেবী, একমাত্র আপনি ছাড়া আব কাবো কানে পৌঁছবাব কথা নয—কিন্তু আপনিও ঘুমিযে ছিলেন।

জয়ন্ত কোন জবাব দেয না।

নিঃশব্দে কিবীটীব মুখেব দিকে চেযে থাকে। কিবীটী কি তাকে সন্দেহ কবছে নাকি।

কিরীটী আবার বলে, গণেশ গানের আসরে আপনাকে খুঁজে না পেয়ে যখন ওপরে এসেছে, তখন আততায়ী তাব কাজ শেষ কবে চলে গিয়েছে। গণেশ কি চিত্রাঙ্গদার এই ঘবে আর ঢোকেনি? হযতো ঢুকেছিল—ঢুকে এই দৃশ্য দেখে ভয়ে তাড়াতাডি আপনার কাছে ছুটে যায়।

কিন্তু গণেশ তো—

বলেনি সে ধবনেব কোন কথা জানি। আমিও সেই বকমই যে কিছু ঘটেছে তা বলছি না। আমি বলছি, ওই রকমও কিছু হয়ে থাকতে পারে মাত্র।

বাইরে দালানে ওই সময় ঘডিতে ঢং করে বাত সাড়ে বারোটা ঘোষণা কবল।

গানেব আসব তখনো পুবোদমে চলেছে। মধ্যবাত্রিব স্তব্ধতায় এতদূর থেকেও গানের লাইনগুলো যেন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

কিবীটীব মনে হয, কি বিচিত্র পবিবেশ।

বাডিব একাংশে যখন সঙ্গীতেব সুধা ঝবে পডছে, অন্য অংশে তখন বাড়ির কর্ত্রী নিহত হয়ে বক্তস্রোতে ভাসছেন।

জীবন ও মৃত্যু।

॥ এগার ॥

গণেশ। কিবীটী ডাকে।

গণেশ নিঃশব্দে একপাশে ঘবেব মধ্যেই তখনো দাঁডিয়ে ছিল। গণেশ কিবীটীব ডাকে ফিবে তাকাল তাব মুখেব দিকে।

তুমি একবাব নীচে যাও, গানেব আসব থেকে জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র ও ফণীন্দ্রবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।

কি বলব তাঁদেব? গণেশ জিজ্ঞাসা কবে।

কি বলবে? বল—বল—হ্যাঁ বল, তাদেব বডমাব বিশেষ জরুবী ব্যপার, তাদেব ডাকছে। হ্যাঁ শোন, একসঙ্গে নয, পাঁচ-ছ মিনিট পব পব এক-একজনেব কাছে গিয়ে কথাটা বলবে, বুঝলে?

আজ্ঞে।

যাও, ওদেব ডেকে দিযে সবকাবমশাইকে ডেকে দেবে। সুবতিয়া, আপাতত তুমি এ ঘবে থাক।

গণেশ বেব হয়ে গেল।

কিরীটী আবার জয়ন্তর দিকে ফিরে তাকাল।

মিস্টার চৌধুরী।

বলুন?

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলুন পাশের ঘরে যাই, ওখানেই কথাবার্তা হবে।

চলুন।

মৃতদেহ যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইল, সুরতিয়াকে ঘরে রেখে দুজনে মধ্যবর্তী দরজার দিকে অগ্রসর হল।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে কিরীটী আর একবার চিত্রাঙ্গদা দেবীর শয়নঘরটার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

নিভাঁজ শয্যা—বোঝা গেল সেরাত্রে খাটের ওপরে বেচারী শয়নেরও আর সুযোগ পাননি। ঘরের মেঝেতে কেবল খাটের কাছে দামী পুরু একটা কার্পেট বিছানো, বাকি মেঝেটা এমনি—আ-ঢাকা।

এক কোণে একটা বিরাট দু-পাল্লার আলমারি—সেকেলে সেগুন কাঠের তৈরি এবং কারুকার্য করা। তার পাশেই একটা গোলাকার বেশ বড় সাইজের শ্বেতপাথরের টপ টেবিল—টেবিলের ওপরে নানা টুকিটাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

উল্টো দিকে ঘরের সংলগ্ন বাথরুম।

কিরীটী ইতিমধ্যে বাথরুমটাতে পরীক্ষা করে দেখছিল। বাথরুমের দরজা, যেটার বাইরের ঘোরানো লোহার সিঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে, সেটা ভেতর থেকে বন্ধই ছিল।

বাথরুমটাও বেশ প্রশস্ত। আগাগোড়া ইটালিয়ান গ্লেজটাইলের দেওয়াল—মেঝেও ইটালিয়ান মোজাইকের। বাথ্‌টাব, শাওয়ার, বেসিন—সব ঝকঝকে তকতকে।

ঘরের মধ্যে শ্বেতপাথরের গোলাকার টেবিলটা ছাড়াও একটা মাঝারি আকারের টেবিল আছে। কিছু বই ও নানা ধরনের ফাইল খাতাপত্র টেবিলের ওপরে সাজানো।

সামনে একটা দামী কুশন-মোড়া চেয়ার। একটা আরাম-কেদারাও ঘরের মধ্যে আছে। আর একটা লোহার দেওয়ালে গাঁথা সিন্দুক। সিন্দুকটার একেবারে গা থেকে শোবার খাটটা।

আগে আগে চলেছিল জয়ন্ত—পিছনে কিরীটী, হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ে

ঘরের মেঝেতে মধ্যবর্তী দরজার একেবারে গা থেকে কি একটা পড়ে আছে—চিকচিক করছে।

কিরীটী ঝুঁকে নীচু হয়ে জিনিসটা মেঝে থেকে তুলে নিল। রঙিন কাচের চুড়ির একটা ভাঙা টুকরো।

কি হল? জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়ায়।

না, কিছু না। চলুন।

দুজনে এসে পাশের ঘরে ঢুকল।

সুধন্য একা একা ঘরের মধ্যে বসেছিল—ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল।

আমি নীচে যেতে পারি? সুধন্য জিজ্ঞাসা করে।

পালাবার চেষ্টা করবে না তো?

না।

তাহলে যাও। ডাকলেই যেন পাই।

হ্যাঁ, নীচের গেস্টরুমের পাশের ঘরেই আমি থাকব।

যাও তাহলে। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

সুধন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মনে হল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ওকে যেতে দিলেন মিস্টার রায়, যদি পালিয়ে যায়? জয়ন্ত চৌধুরী বলে কিরীটীকে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, না, পালাবে না। তাছাড়া পালালে তো ক্ষতি নেই কিছু।

ক্ষতি নেই।

না। সুধন্য হত্যা করেনি।

কি করে বুঝলেন?

স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসীকে হত্যা করবে নিজের হাতে, অন্তত এত বড় গর্দভ সুধন্য নয়।

স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসী।

হ্যাঁ—চিত্রাঙ্গদা দেবী তো ওর কাছে তাই ছিলেন। এলেই টাকা পেত—তা সে যে কারণেই হোক। আর সেই টাকাই যে ওর ভরসা, সেও আমি জানি।

কিন্তু—

না মিস্টার চৌধুরী, হত্যাকারী শুধু ক্ষিপ্রগতিসম্পন্নই নয়, অসম্ভব তার নার্ভ এবং বুদ্ধি। এবং তার হত্যার পিছনে বড় রকমের কোন মোটিভ রয়েছে

জানবেন।

কিন্তু—

হ্যাঁ—আপাততঃ যা আমাব মনে হচ্ছে, হত্যাকাবী পূর্ব হতেই প্রস্তুত হযে সুযোগেব অপেক্ষায ছিল এবং সে সুযোগ পাওযা মাত্র এতটুকুও দেরি কবেনি আব—সঙ্গে সঙ্গে চবম আঘাত হেনেছে, তাবপব সবে পড়েছে।

বাইবে ওই সময় পদশব্দ পাওযা গেল।

দেখুন তো কে এল।

জযন্তকে উঠে দেখতে হল না, থানাব অফিসাব মিঃ চৌবে ও চিত্রাঙ্গদা দেবীর সবকাব যোগেন বা যোগীন মিত্র ঘবে এসে ঢুকল।

এই যে জযন্তবাবু,—যোগেন মিত্রই প্রথমে কথা বলে, কি ব্যাপাব? আমাকে ডেকেছেন কেন? আব মিস্টাব চৌবেই বা—

কথা বললে এবাবে কিবীটী, প্রযোজন ছিল মিত্রমশাই।

কি বলুন তো? একটু যেন বিস্মিত হয়েই যোগেন মিত্র কিবীটীব মুখেব দিকে তাকায়।

বিস্মযেব তাব কাবণ ছিল, কাবণ কিবীটীব সত্যি পবিচযটা সে জানে না এখনো। অথচ এত বাত্রে এ ঘবে—

কিবীটী আবাব বলে, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনা!

হ্যাঁ। মিসেস চৌধুবী অর্থাৎ আপনাদেব বাণীমা—

কি—কি হযেছে তাঁব? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন কবে যোগেন মিত্র।

তিনি খুন হযেছেন।

সে কি!

হ্যাঁ।

কিবীটীই তখন সংক্ষেপে ব্যাপাবটা বিবৃত কবে।

চৌবেজী এবাব বলে, কিন্তু আপনি কে?

এবাবে জয়ন্ত তার পবিচয় দিল, উনি বিখ্যাত বহস্যসন্ধানী কিরীটী বায়।

সত্যি! নমস্তে—নমস্তে বাবুজী। চৌবেজীব কণ্ঠস্বব শ্রদ্ধায় একেবারে বিগলিত, কি সৌভাগ্য, আপনাব দেখা পেলাম।

যোগেন মিত্র বলে এবাবে, তাহলে আপনি যে বলেছিলেন জয়ন্তবাবু—

জয়ন্তবাবু তখন সংক্ষেপে কিবীটীব এখানে আসার ব্যাপারটা বলে গেল, বড়মার

ইচ্ছাক্রমেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মৃতদেহ পরীক্ষা করল চৌবে।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর সমস্ত শয়নকক্ষটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তাজ্জব কি বাত—এইসা কেইসে হো সেকৃতা মেরে সমঝ মে নেহি আতা রায় সাহাব। আপকো রায় কেয়া হ্যায়?

কিরীটী বলে, যতদূর বুঝতে পারছি, আততায়ী মিসেস চৌধুরীর কোন অপরিচিত জন নয়—কোন বাইরের লোকও নয়।

তব কৌন হো সেকৃতা?

সেটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—সকলের সঙ্গে কথাবার্তা না বললে—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, জগদীন্দ্র প্রথমে ও তার পশ্চাতে মেজ মণীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল, এবং ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ ওদের কণ্ঠ হতে একটা অস্ফুট আর্তচিৎকার নির্গত হয়, এ কি!

তারপরই যেন দু ভাই বোবা হয়ে গেল। প্রস্তরমূর্তির মত ভূপতিত প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গানের আসর তখনো ভাঙেনি। গানের সুর তখনো শোনা যাচ্ছে।

একপাশে সুরতিয়া তখনো পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

চৌবেজীই কথা বলে, চলিয়ে সাব, ও কামরামে চলিয়ে।

চৌবেজীর সঙ্গে সঙ্গে জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, যোগেন মিত্র ও জয়ন্ত পাশের ঘরে চলে গেল।

কিরীটী চৌবেজীকে সম্বোধন করে বললে, আপ যাইযে চৌবেজী, ম্যায় আতা হুঁ।

॥ বারো ॥

সুরতিয়া!

কিরীটীর ডাকে সুরতিয়া ওর মুখের দিকে তাকাল। ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখ।

সুরতিয়া!

বাবুজী!

তুমি তো ভূপৎ সিংয়ের স্ত্রী, তাই না?

কথাটা শুনে হঠাৎ যেন চমকে ওঠে সুরতিয়া, কয়েকটা মুহূর্ত কোন জবাব দিতে পারে না। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

শোন সুরতিয়া, আমি তোমার অনেক কথাই জানি—

সুরতিয়ার দু চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা অজানিত আশঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে ও।

কিরীটী আবার বলে, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তার ঠিক ঠিক জবাব দাও। জবাব না দিলে জানবে যাকে তুমি বাঁচাবার চেষ্টা করছ, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

সুরতিয়া তথাপি নীরব।

রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, সত্যি কিনা?

সুরতিয়া নীরব। নিঃশব্দে সে কেবল চেয়ে আছে কিরীটীর মুখের দিকে।

আমি জানি ছিল,—কিরীটী বলতে থাকে, আর সে ঘনিষ্ঠতার কথা রাণীমা জানত, তাই না?

সুরতিয়া পূর্ববৎ নীরব।

এবার বল ওই সুধন্য কে?

আ—আমি জানি না বাবুজী।

জান—বল কে?

আ—আমি জানি না।

তুমি বলতে চাও তুমি জান না কেন রাণীমা অমন করে সুধন্য এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেই তাকে টাকা দিতেন?

রাণীমা ওকে পেয়ার করতেন, তাই—

কিরীটী হেসে ফেলে, কি বললে, পেয়ার!

হ্যাঁ।

মিথ্যে কথা—ঝুট। উসসে রাণীমাকো বহুৎ নফরৎ থি।

নেহি বাবুজি—নেহি, সাচমুচ—রাণীমা—

শোন সুরতিয়া, তুমি যাই বল আমি জানি রাণীমা ঐ সুধন্যকে দুচক্ষে একেবারে দেখতে পারত না—বল, সত্যি কথা বল—রাণীমা কেন সুধন্যকে অমন করে টাকা দিতেন বল?

বিশ্বাস করুন বাবুজী, আমি জানি না।

আমি কিন্তু জানি কেন রাণীমা ওকে টাকা দিতেন!

আ—আপনি জানেন? গলার স্বরে যেন একটা চাপা আতঙ্ক ফুটে ওঠে স্পষ্ট হয়ে সুরতিয়ার হঠাৎ।

তুমি বলছ রাণীমা সুধন্যকে পেয়ার করত—কিন্তু কেন? কি সম্পর্ক ছিল সুধন্যর সঙ্গে রাণীমার? কে ও রাণীমার?

কেউ না।

তবে?

কিন্তু বাবুজী—

যাক সেকথা, এবার সত্যি করে বল তো, সিঁড়ি দিয়ে কোট গায়ে যে লোকটা ওপরে উঠছিল সে কে?

তাকে আমি চিনতে পারিনি।

আবার মিথ্যে কথা বলছ, তাকে তুমি চিনতে পেরেছ।

না, না, আমি চিনতে পারিনি।

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ঠিক আছে, এই ঘরেই তুমি থাক। কোথাও যেও না যেন।

কিরীটী কথাগুলো বলে মধ্যবর্তী দরজাপথে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

চৌবেজী তখন জবানবন্দি নিচ্ছেন এক এক করে ঘরে যারা উপস্থিত ছিল।

জগদীন্দ্র ও মণীন্দ্র চিত্রাঙ্গদা দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে যেন কেমন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। তারা যেন কিছু ভাল করে ভাবতেও পারছিল না।

তারা তাদের জবানবন্দিতে বলেছে, সন্ধ্যা থেকেই তারা গানের আসরে গিয়ে বসেছিল। এবং বাগানে গেস্টদের জন্য যে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানেই কয়েকজন পরিচিত স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে খেয়ে নিয়েছিল। খাবার জন্য বাড়ির মধ্যে পর্যন্ত আসেনি। গানের আসর ছেড়ে তারা একবারের জন্যও উঠে আসেনি। কিছুই তারা জানে না—কিছুই তারা বলতে পারে না।

আর জয়ন্ত কিরীটীর কাছে যা বলেছিল, চৌবেজীর প্রশ্নের জবাবেও তাই বলেছে—অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করেছে।

বাইরে গানের আসর তখনো পুরোদমে চলেছে। রাতও প্রায় পৌনে দুটো হল।

কিরীটী মণীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে তাকে এবার প্রশ্ন করে, কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মণীন্দ্রবাবু।

মণীন্দ্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আজ সন্ধ্যাব সময় আপনি আপনাব বড়মার ঘরে এসেছিলেন, না ?

হ্যাঁ।

কি কথা হয়েছিল আপনাব চিত্রাঙ্গদা দেবীব সঙ্গে ?

এমন বিশেষ কিছুই না—

কিন্তু আমি ষতদুব জানি, আপনাদেব পবস্পবেব মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং তিনি উত্তেজিত হযে উঠেছিলেন। তেমন বিশেষ কিছুই যদি না হবে তো—

হ্যাঁ—স্বাতীব বিয়েব ব্যাপাব নিযে আমাদেব মধ্যে একটু কথা-কাটাকাটি হযেছিল।

আব কিছু না ?

না। অনিন্দ্য আমাব পবিচিত—বন্ধু, স্বাতী তাকে বিয়ে কবতে চায়, অনিন্দ্যও স্বাতীকে বিয়ে কবতে চায। অথচ বডমা কিছুতেই বাজী নন। আমি কথাটা উথাপন কবতেই বডমা আমাকে যা-তা বলতে শুরু কবেন।

তিনি আপনাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন ?

হ্যাঁ।

হুঁ। আচ্ছা মণীন্দ্রবাবু, আপনাদেব ভাইদেব মধ্যে কাকে বেশি চিত্রাঙ্গদা দেবী পছন্দ কবতেন বলে আপনাব মনে হয় ?

সত্যি কথা বলতে গেলে কাউকেই তিনি আমাদেব সত্যিকাবেব পছন্দ কবতেন না। ভালবাসতেন বলে আমাব মনে হয় না।

আপনাদেব ছোট ভাই শচীন্দ্রবাবুকে ?

না।

জয়ন্তবাবুকে ?

ওকে তো তিনি দু'চক্ষে দেখতে পাবতেন না।

জগদীন্দ্রও মণীন্দ্রব কথাব পুনবাবৃত্তি কবল।

গণেশ।

কিবীটী এবাবে গণেশেব দিকে ফিবে তাকাল।

গণেশ একপাশে দাঁড়িয়েছিল। জবাব দিল, আজ্ঞে ?

শচীন্দ্রবাবুকে ডেকে নিয়ে এস তো। আব শোন, তোমাদেব স্বাতী দিদিমণিকেও একটা খবব দাও।

গণেশ বেব হয়ে গেল।

জগদীন্দ্রবাবু মণীন্দ্রবাবু, আচ্ছা আপনাদেব বড়মাব কোন শত্রু ছিল কি?

শত্রু!

হ্যাঁ।

মণীন্দ্রই এবাব বলে, না—তাঁব আবার কে শত্রু থাকতে পাবে?

কিন্তু এটা তো ঠিক মণীন্দ্রবাবু—আপনাবা ভাইবোনেবা কেউ আপনাদেব বডমাকে পছন্দ কবতেন না?

পছন্দ কবতাম না!

হ্যাঁ—কেউ আপনাবা সুখী নন।

না না—তা কেন হবে?

কিন্তু আমি যতদূব শুনেছি কেউ আপনাবা তাঁব ব্যবহাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

জগদীন্দ্র জিজ্ঞাসা কবে, কে বলেছে সেকথা আপনাকে? জয়ন্ত?

না।

তবে?

বলেছেন আপনাদেব বডমা।

বডমা!

হ্যাঁ—আর তাঁব ধাবণা হযেছিল—

কি?

তাঁকে আপনাবা হত্যাও কবতে পাবেন।

এসব আপনি কি বলছেন?

যা বলছি তা যে মিথ্যা নয় সে আপনাবা সকলেই জানেন,—আপনি মণীন্দ্রবাবু, শচীন্দ্রবাবু, স্বাতী দেবী—কেউ আপনাবা আপনাদের বডমাকে সহ্য কবতে পাবতেন না।

শচীন্দ্র আব স্বাতী একই সঙ্গে ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকল। গণেশ কোন কথাই তাদেব বলেনি। দুজনেই ঘবেব মধ্যে অত লোক ও থানা-অফিসাবকে দেখে একটু যেন অবাকই হয়।

শচীন্দ্র বলে, কি ব্যাপাব, কি হয়েছে বে বড়দা? জগদীন্দ্রব মুখেব দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা কবে শচীন্দ্র।

আমি বলছি শচীন্দ্রবাবু,—কিবীটীই বলে, আপনাদেব বড়মাকে কে যেন একটু আগে খুন করেছে।

খুন!

হ্যাঁ।

কি বলছেন আপনি?

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর হলেও সত্যিসত্যিই তাই ঘটেছে। She has been brutally murdered

স্বাতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে হঠাৎ বলে, এই রকমই যে কিছু একটা শেষ পর্যন্ত ওর ভাগ্যে ঘটবে, সে আমি জানতাম।

কি বললেন? কিরীটী স্বাতীর মুখের দিকে তাকাল।

বলছি ওর বরাতে যে শেষ পর্যন্ত এমনি একটা কিছু ঘটবে, সে তো জানাই ছিল।

কেন?

অমন দাম্ভিক, হৃদয়হীন স্ত্রীলোকের পক্ষে ওই রকম একটা কিছু ঘটাই তো স্বাভাবিক। আপনি তো জানেন না—কতটুকু পরিচয় ওর আর এ দু'দিনে পেয়েছেন? আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওর কাছে থেকে বুঝতে পেরেছি, কি টাইপের স্ত্রীলোক ছিল আমাদের বড়মা।

আপনাদের ওপর বুঝি খুব অত্যাচার করতেন?

কিন্তু আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারছি না, যদিও দু'দিন থেকে এ বাড়িতে আপনি আছেন আমি জানতে পেরেছিলাম। আজই সকালে গণেশের কাছ থেকে—

জয়ন্ত চৌধুরীই তখন পুনরায় কিরীটীর পরিচয়টা ওদের কাছে ব্যক্ত করে।

স্বাতী সব শুনে বলে, ও আপনি ওই ডাইনি বুড়ীর আমন্ত্রণ নিয়েই এখানে এসেছিলেন আমাদের ওপর খবরদারী করতে যখন, তখন তো তার সত্য পরিচয়টা নিশ্চয়ই আপনার সর্বাগ্রে জানা দরকার বিশেষ করে আমি নিশ্চয় জানি, সে পরিচয়টা আপনি তার পাননি যখন—

বেশ তো, বলুন না শুনি।

এক জঘন্য প্রকৃতির নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন তিনি।

কি রকম?

সে ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে পুরো একটা দিন লেগে যাবে। কিন্তু জয়ন্তদাও তো তাকে চিনত, তার কাছেও কিছু আপনি আগে শোনেননি?

শুনেছি কিছু কিছু, আপনিও বলুন না।

এই যে দেখছেন আমার সহোদর ভাই ক'টিকে, এদের চারটেকে একেবারে ভেড়া করে রেখেছিল মহিলা। এই যে বাড়িটা—ইন্দ্রালয় যার নাম—এর আসল নাম কি

হওয়া উচিত ছিল জানেন ? নবকালয়। কতকগুলো জ্যান্ত মানুষকে অনুকম্পা ও সাহায্য করার ভান করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত চরম জঘন্য নির্যাতন চালিয়েছে, আর তার ফলে যা হবার ঠিক তাই হয়েছিল, এরা সকলে মুখে যতই শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাক না কেন, মনে মনে করত প্রচণ্ড ঘৃণা।

ঘৃণা।

হ্যাঁ, ঘৃণা। অথচ মজা কি জানেন, তবু এরা কেউ বিদ্রোহ করতে পারেনি—এই বিচিত্র বন্দীশালা ছেড়ে চলে যেতে পারেনি। এর চেয়ে দুঃখ, লজ্জা ও ভীরুতার আর কি থাকতে পারে বলতে পারেন ?

একটু থেমে স্বাতী আবার বলে, কাজেই আজ যা ঘটেছে, সে তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আমার, আমি যখন এই বন্দীশালা ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটল।

আপনি কি—

হ্যাঁ, সকালেই অনিন্দ্যর আসার কথা—আমাকে সে নিয়ে যাবে এখান থেকে বলে গিয়েছে।

আপনার চলে যাবার কথাটা আপনার বড়মা জানতেন ?

হ্যাঁ।

আপনি বলেছিলেন বুঝি ?

হ্যাঁ, কাল দুপুরেই জানিয়ে দিয়েছিলাম।

তিনি কি বলেছিলেন ?

বলেছিল, তাহলে তার সম্পত্তির একটা কপর্দকও আমি পাব না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলাম তাকে—চাই না।

তাহলে দুপুরে আপনার সঙ্গে আপনার বড়মার দেখা হয়েছিল ?

হ্যাঁ।

আপনার মেজদা কথাটা জানতেন কি ?

হ্যাঁ, তাকে বলেছিলাম।

কিরীটী এবার শচীন্দ্রর দিকে ফিরে তাকাল, আপনার নামই শচীন্দ্র চৌধুরী ?

হ্যাঁ।

আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন এতক্ষণ বোধ হয় ?

হ্যাঁ।

গানের আসরে যাননি ?

না, ওসব আমার ভাল লাগে না।

আচ্ছা শচীনবাবু, শেষ আপনার বড়মার সঙ্গে কখন দেখা হয়?

গতকাল সন্ধ্যায়।

কি কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে আপনার?

বিশেষ কিছুই না।

ক্রমশ রাত শেষ হয়ে আসে।

আসর ইতিমধ্যে ভেঙে গিয়েছিল, অতিথি-অভ্যাগতরাও একে একে ইন্দ্রালয় ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

॥ তেরো ॥

দুঃসংবাদটা চাপা থাকে না। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ-কান ও-কান হতে হতে সংবাদ সমস্ত ইন্দ্রালয়ে ছড়িয়ে যায়।

কিরীটির অনুরোধে চৌবেজী ইন্দ্রালয়ে পুলিস-প্রহরা মোতায়েন করেছিলেন ইতিমধ্যে এবং নির্দেশ জারি করে দিয়েছিলেন তাঁর বিনানুমতিতে কেউ ইন্দ্রালয় ছেড়ে আপাততঃ যেতে পারবে না।

সকলকেই আপাততঃ নজরবন্দী থাকতে হবে। রীতিমত এক অস্বস্তিকর পরিবেশ।

উৎসব আরো ক'দিন হবার কথা ছিল, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবীর আকস্মিক মৃত্যু আততায়ীর হাতে হঠাৎ যেন সব কিছুর ওপর একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিল। আনন্দ-কোলাহল মুখরিত ইন্দ্রালয়ের ওপরে হঠাৎ যেন শোকের একটা কালো ছায়া নেমে এসেছে।

উৎসব থেমে গিয়ে যেন একটা শ্মশান-স্তব্ধতা নেমে এসেছে ইন্দ্রালয়ের ওপর।

দুটো দিন অমনি করে কেটে গেল আরো।

কিরীটী মধ্যে মধ্যে এক-একজনকে আলাদা করে তার ঘরে ডেকে এনে আরো কিছু কিছু প্রশ্ন করেছে এবং সবাই জানতে পেরেছে কিরীটীর কথায়, পুলিস এবং তার ধারণা, বাইরের কেউ চিত্রাঙ্গদা দেবীর নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী নয়।

হত্যা করেছে চিত্রাঙ্গদা দেবীকে বাড়ির মধ্যে যারা সে-রাত্রে উপস্থিত ছিল, অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা দেবীর কোন আপনজনই, বিশেষ করে যাদের অন্দরে ও চিত্রাঙ্গদা দেবীর ঘরে অবাধ গতিবিধি ছিল।

কথাটা শোনা অবধি সকলেই যেন হঠাৎ কেমন বোবা হয়ে গিয়েছে। সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে সর্বক্ষণ। একের অন্যের প্রতি কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের দিকে কেমন সন্দেহ নিয়ে তাকাচ্ছে।

কে—তাদের মধ্যে কে? কে হত্যা করল চিত্রাঙ্গদা দেবীকে?

জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, শচীন্দ্র ও জয়ন্ত, বিশেষ করে ওই পাঁচজন—পাঁচ ভাইয়ের মনেই যেন ওই কথাটা ঘুরে-ফিরে উদয় হয়।

স্বাতীও তাকায় তার ভাইদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

কে—কে হত্যা করল?

আর ওদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সুধন্যও।

কেউ কারো সঙ্গে মন খুলে কথা পর্যন্ত যেন বলতে পারছে না, কথা বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে।

সবাই যেন নিজের নিজের মনের মধ্যে গুমরোচ্ছে। বিশ্রী অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি।

সেদিন দুপুরে কিরীটী তার ঘরের মধ্যে বসেছিল, বাইরে ফণীন্দ্রর গলা শোনা গেল।

মিস্টার রায় আসতে পারি?

আসুন—আসুন।

ডান পা-টা খোঁড়া ফণীন্দ্রর। ডান পা-টা একটু টেনে টেনে আস্তে আস্তে চলে সে। পা টেনে টেনে ফণীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল।

বসুন।

মিস্টার রায়।

বলুন?

এরকম করে তো আর পারছি না মিস্টার রায়—এই যে সর্বক্ষণ এক সন্দেহের দুঃসহ যন্ত্রণা—সত্যি বলছি আর ক'টা দিন এভাবে থাকলে হয়ত পাগল হয়ে যাব।

আমি তো আপনাদের প্রত্যেককেই বলেছি ফণীন্দ্রবাবু, আপনারা যে যা জানেন—কোন কথা গোপন না করে অকপটে আমাকে জানতে দিন। তাহলে এভাবে আপনাদের কষ্ট পেতে হয় না—আমিও ব্যাপারটার একটা মীমাংসায় পৌঁছতে পারি।

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, সব কথাই আপনাকে অন্ততঃ আমি বলেছি।

না।

কি বললেন ?

আপনি সব কথা বলেননি।

বলিনি।

না।

কি কথা আপনার কাছে আমি গোপন করেছি ?

গোপন করেছেন সে-রাত্রে—মানে দুর্ঘটনার রাত্রে, রাত সোয়া নটা থেকে রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন।

আমি তো আমার ঘরে ঘুমিয়েছিলাম ওই সময়টা।

না।

হ্যাঁ, আপনি বিশ্বাস করুন—

বিশ্বাস আমি করতে পারছি না।

পারছেন না ?

না।

কেন ?

কারণ রাত দশটা নাগাদ আপনাকে আমি গানের আসরে দেখেছি।

না না, মানে—

অস্বীকার করবার চেষ্টা করছেন কেন ? আমি আপনাকে দেখেছি—বলুন, সে-রাত্রে আসরে আপনি যাননি ?

হ্যাঁ,—গিয়েছিলাম, বড়ে গোলাম আলি যখন গান ধরেন।

হ্যাঁ, রাত ঠিক দশটায়—আমার মনে আছে তিনি গান ধরেছিলেন।

হ্যাঁ, মিস্টার রায়, অস্বীকার করব না—গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু শরীরটা ভাল না থাকায় একটু পরে চলে আসি।

তাহলে আপনি যে বলছিলেন, সেদিন সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ডাকা পর্যন্ত আপনি ঘরে শুয়েছিলেন, সত্যি নয় ?

ফণীন্দ্র মাথা নীচু করে।

কথাটা আপনি সেদিন স্বীকার করেননি কেন ?

ভয়ে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, বড়মাকে খুন আমি করিনি। কেন করব—কি স্বার্থ থাকতে পারে আমার ?

সেকথা যদি বলেন তো স্বার্থ আপনার আছে বৈকি।

স্বার্থ আছে ? কি স্বার্থ ? বড় বড় চোখ করে তাকায় ফণীন্দ্র কিরীটীর মুখের দিকে।

প্রথমত ধরুন, বড়মার মৃত্যু হলে আপনি নিয়মিত মোটা একটা মাসোহারা পাবেন তাঁর উইল অনুযায়ী। অন্যান্য সম্পত্তির ভাগ ছাড়াও—আর সব চেয়ে বড় কথা, দিবারাত্র বড়মার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর ভয়ে জুজুর মত থাকতে হবে না—এই বন্দী-জীবন কাটাতে হবে না—এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন।

যন্ত্রণা থেকে মুক্তি।

নয়? ভেবে দেখুন, আপনারা প্রত্যেক ভাইবোনেরাই কি আপনাদের বড়মার প্রতি, নিরন্তর শাসন আর বিধিনিষেধ, সর্বক্ষণ তাঁর শাসনের ঝাপটা সয়ে সয়ে ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে ওঠেননি? মানুষ তো কেবল মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই ও সেই সঙ্গে দু-বেলা নিশ্চিন্ত আহার কিংবা খানিকটা অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চন্ততা নিয়েই তার জীবনের যা কিছু কাম্য পেয়ে যায় না বা তার মনটা সব দিক দিয়ে ভরে ওঠে না—তার সব অভাব অভিযোগ মিটে যায় না। সে চায়—শুধু সে কেন, প্রতিটি মানুষই চায়, তার ব্যক্তিস্বাধীনতা সবার ওপরে, এখানে সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের মধ্যে থেকেও সেই স্বাধীনতাটুকুর অভাবেই কি আপনারা প্রত্যেকে দিনের পর দিন এই ইন্দ্রালয়ের দেওয়ালে মাথা কুটে মরেননি? এই চার দেওয়াল থেকে মুক্তি চাননি?

চেয়েছি—চেয়েছি মিস্টার রায়—প্রতি মুহূর্তে চেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ফণীন্দ্র বলে ওঠে।

তার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।

কিরীটী বাধা দিল, কিন্তু পারেননি—এই বন্দীশালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে যেতে পারেননি। কারণ এখানকার এই স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম দিনের পর দিন যেমন করে খাঁচার পাখির ডানাকে অনভ্যস্ত থাকায় অবশ করে দেয়, আপনাদের ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল বলে।

তবু—তবু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—

বের হয়ে পড়েন, তাই না? তবু পারেননি। কারণ পা দুটোই যে আপনাদের অবশ হয়ে গিয়েছিল, তাই নয়? চৌকাঠ ডিঙোবার জন্য মনের যে সাহসের দরকার, সে সাহসের মেরুদণ্ডটাও ভেঙে দিয়েছিলেন আপনাদের ওই বড়মা। আর সেই অক্ষমতা ক্রমশ আপনাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে বড়মার প্রতি যে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল, তাতে করে কেবলমাত্র আপনি কেন, আপনাদের চার ভাইয়ের মধ্যে যে কারুর পক্ষেই চিত্রাঙ্গদা দেবীকে হত্যা করা শেষ পর্যন্ত আদৌ অসম্ভব ছিল না।

ফণীন্দ্র যেন বোবা হয়ে যায়। সে মাথা নিচু কবে বসে থাকে।

কিবীটী ফণীন্দ্রব মুখেব দিকে তাকিযে বলে, আপনাদেব ভাইবোনেদেব মনেব অবস্থাটা যে আমি বুঝিনি তা নয ফণীন্দ্রবাবু—মানুষ সহেব শেষ সীমাটুকু যখন অতিক্রম কবে যায, আমি জানি, তখন সে মবীয়া হযে ওঠে—আব তখন তাব পক্ষে কোন কাজই অসাধ্য থাকে না।

কিরীটীবাবু!

বলুন ?

সত্যিই কি আপনি—

কি ?

মনে কবেন আমাদেব মধ্যেই কেউ—

এই বাডিব মধ্যে সে-বাত্রে যাবা উপস্থিত ছিল তাদেব মধ্যেই একজন।

কে ?

আপনিই ভেবে দেখুন না কে হতে পাবে।

ফণীন্দ্র অতঃপব হঠাৎ যেন চুপ কবে গেল। একটু পবে যেন কেমন চোবেব মতই নিঃশব্দে ফণীন্দ্র ঘব থেকে বেব হয়ে গেল।

কিবীটী চেযে থাকে তাব গমনপথেব দিকে।

ডান পা-টা টেনে টেনে ফণীন্দ্র ঘব থেকে বেব হযে গেল। এসেছিল একটা প্রতিবাদ জানাতে, এখন যেন ভীত চোবেব মত মাথা নিচু কবে ঘব থেকে বেব হয়ে গেল।

॥ চোদ্দ ॥

কালো বঙেব গ্রেট কোটটা শেষ পর্যন্ত পাওযা গেল বাগানেব মধ্যে।

বাগানে একটা গাছেব ডালেব সঙ্গে ঝুলছিল, একজন পুলিসেবই বাগানটা অনুসন্ধান কবতে কবতে চোখে পড়ে। কোটটা হাতে পুলিসটা কিবীটীব ঘবেই এসে ঢুকল।

চৌবেজীও ওই সময় কিবীটীব ঘবেব মধ্যে বসেছিল। চিত্রাঙ্গদা দেবীব হত্যার ব্যাপাব নিয়ে আলোচনা কবছিল।

ইতিমধ্যে আবো একটা ব্যাপাব ঘটে গিযেছিল। পুলিস-প্রহবীব চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ গতবাত্রে সুধন্য ইন্দ্রালয় থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেচাবা

বেশি দূর যেতে পাবেনি। কাতবালগড ছাড়িয়ে তেতুলিয়া হল্টের কাছাকাছি পরের দিনই সন্ধ্যারই সুধন্ত ধবা পডে যায়।

সুধন্যকে পুলিস ধবে নিয়ে এসেছে।

চৌবেজীর ইচ্ছা ছিল সুধন্যকে নিয়ে গিযে একেবাবে হাজতে পোরেন, কারণ তাঁব ধাবণা চিত্রাঙ্গদা দেবীব হত্যাকারী আব কেউ নয়—এই সুধন্যই।

কিন্তু কিবীটী বলেছে, না চৌবেজী, তাড়াহুড়ো কবে কিছু করবেন না।

আপনি বুঝতে পারছেন না মিস্টাব বায়,—চৌবেজী বলেছিলেন, ওকে ছেড়ে রাখলে বিপদ হবে।

কিছু হবে না আমি বলছি। কিবীটী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছে।

কিন্তু গ্যাবান্টিই বা কি?

গ্যাবান্টি ওব নিজের চরিত্র।

বুঝলাম না আপনাব কথাটা মিস্টাব বায়।

ও পালিয়ে যেতে পাবে না—পালাবাব মত শক্তি ওর নেই।

কিন্তু—

আমি আপনাকে আগেও বলেছি চৌবেজী—আবাবও বলছি, হত্যাকাবী ও নয়।

তাই যদি নয় তো ওকে ছেড়ে দিলেই তো হয়, নজববন্দী কবে বাখবাবই বা দরকার কি?

দরকাব আছে। যে দাবাখেলা আমবা শুরু কবেছি, সেই দাবাব ছকেবই ও জানবেন মোক্ষম একটি ঘুঁটি—একটি বোড়ে। সেই বোডেব চালটি ঠিক সময়মত যখন দোব, দেখবেন সমস্ত কুয়াশা কেটে গেছে।

কুয়াশা।

হ্যা—লক্ষ্য কবেছেন, আজ কদিন থেকেই ভোবেব দিকে কি ঘন কুয়াশা নামছে। হঠাৎ কিরীটী বলে ওঠে।

হ্যা, দেখেছি। কথাটা বলে চৌবেজী কেমন যেন বোকাব মত ফ্যাল-ফ্যাল কবে তাকিয়ে থাকেন কিরীটির মুখের দিকে।

আজও চৌবেজী আবাব এসেছিল সুধন্যকে হাজতে নিয়ে গিয়ে পোরবাব জন্য, কারণ ধবা পডবাব পব সুধন্যকে আবার এনে ইন্দ্রালয়ের মধ্যে নজরবন্দী রাখা হয়েছিল কিবীটীবই অনুবোধে। যদিও চৌবেজীর এতটুকু ইচ্ছা ছিল না সুধন্যকে আবার ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করতে তিনি পারেননি। ওখানকার এস. পি. মিঃ সুন্দরায়া চৌবেজীকে ডেকে বলে

দিয়েছিলেন, কিরীটী যেমন বলবে, তাই যেন চৌবে করেন।

চৌবেজী বলেছিলেন, খুনীকো এই কোঠিমে রাখনা আচ্ছা নেহি।

লেকিন চৌবেজী, ম্যায়নে ত বহুত দফে কহা চুকা, উয়ো মুজলিম নেহি হ্যায়। কিরীটী বলে।

ম্যায়নে ভি ত ইতনা সাল বহি কাম কর রাহা হ্যায়—আগর উয়ো মুজলিম নেহি হোগা ত—ম্যায় পুলিসকো নোকরি ছোড দুঙ্গা।

কিরীটী হাসে।

আর ঠিক সেই সময় পুলিসটা কোটটা নিয়ে ঘরে ঢোকে, হুজুর, দেখিযে ইয়ে পেরকা উপরসে মিলা।

চৌবেজী বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান না ব্যাপারটায়। ওভারকোটটা কিরীটী যখন অনুসন্ধানের কথা বলেছিল, তখনো বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেননি চৌবেজী।

চৌবেজী বলেন, রাখ দো—আভি—

পুলিসটি চলে যাচ্ছিল কিন্তু কিরীটী বাধা দিল। ডাকল, দেখি, দাও তো কোটটা।

পুলিসটা কোটটা কিরীটীর হাতে তুলে দিল।

কিরীটী প্রথমেই কোটটার পকেটগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে একটার পর একটা—উল্লেখযোগ্য কিছুই মেলে না।

মেলে—একটা রুমাল, একটা দেশলাই আর একটা সিগারেট-কেস।

চৌবেজী চেয়ে চেয়ে কিরীটীর ব্যাপারটা দেখছিলেন—ঠোঁটের কোণে একটা অবজ্ঞার হাসির ক্ষীণ বিদ্যুৎ যেন।

কেয়া রায় সাহাব, কুছ মিলা?

কিরীটী কোন জবাব দেয় না। ওভারকোটটার কলারের কাছ থেকে একটা চুল টেনে বের করছে তখন সে।

চুলটা টেনে বের করে নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শোঁকে।

কি দেখছেন চুলটা নিয়ে অত রায় সাহেব,—চৌবেজী আবার বলে ওঠেন, বহি বালসেই কেয়া আপকো মালুম হো জায়গা খুনী কোন?

কিরীটী ফিরে তাকাল এবার চৌবেজীর মুখের দিকে। কিরীটীর দু চোখের দৃষ্টিতে যেন বিদ্যুতের আলো ক্ষণেকের জন্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

শান্ত গলায় সে বলে, বেশক, এই চুলটা থেকেই খুনীর পাত্তা আমি পেয়ে গেছি

চৌবেজী।

সাচ?

হ্যাঁ, মুঝে মিল গিয়া।

কৌন থা উয়ো?

দো দিন বাদ আপকো বাতায়েঙ্গে।

সাচ?

জরুর।

কেয়া ম্যায়নে হ্যাণ্ডকাফ লাউ?

আগর আপকো দিল চাহে ত—আচ্ছা চৌবেজী, আমার একটু কাজ আছে। বলতে বলতে কিরীটী সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

চৌবেজীকেও অগত্যা উঠে দাঁড়াতে হয়।

তাহলে ওই কথাই রইল, কাল আসবেন—সকালেই—আচ্ছা নমস্তে।

কিরীটী আর দাঁড়াল না, মধ্যবর্তী দরজাপথে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। চৌবেজী তারপরও কয়েক সেকেণ্ড ঘরের মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হল।

ওই দিনই সন্ধ্যার দিকে কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে বসে একটা বই পড়ছিল, মণীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল।

এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে মণীন্দ্র ঘরে এসে ঢুকল।

মিস্টার রায়।

আসুন মণীন্দ্রবাবু, আমি গত দুদিন ধরে আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। কিরীটী হাতের বইটা মুড়তে মুড়তে মণীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল।

আমার অপেক্ষা করছিলেন?

মণীন্দ্র কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, আপনারই পথ চেয়ে ছিলাম বলতে পারেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

মণীন্দ্র বসে না, কেমন যেন ইতস্তত করে।

আমি জানতাম মণীন্দ্রবাবু, আপনি আসবেন—বসুন।

আপনি জানতেন আমি আসব!

হ্যাঁ, জানতাম।

কিন্তু—

বলুন।

মণীন্দ্র মুখোমুখি বসল চেয়ারটায়। সে যেন কেমন চিন্তিত মনে হয়।

কি ভাবছেন—যা বলতে এসেছেন, বলুন। ভয় নেই আপনার, নির্ভয়ে বলুন।

মিস্টার রায়, ফণী এসেছিল আপনার কাছে, তাই না?

হ্যাঁ।

কি বলেছে সে?

অনেক কিছুই বলেছেন, যা পুলিসের কাছে জবানবন্দিতে সে-সময় তিনি বলেননি।

তাহলে সে সব কিছু বলে দিয়েছে আপনাকে?

হ্যাঁ, সব।

উইল বদলের কথা?

উইল।

হ্যাঁ, বড়মা যে সেদিন তাকে বলেছিলেন, তিনি তাঁর আগের উইল বদলে ফেলবেন।

বলেছেন বৈকি।

কথাটা অবিশ্যি বড়মা আমাদের তিন ভাইকেই জানিয়েছিলেন।

কিরীটীর চোখের মণি দুটো সহসা যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু মণীন্দ্রর সেটা নজরে পড়ে না।

আপনাকে কবে বলেছিলেন কথাটা তিনি?

যেদিন দুর্ঘটনাটা ঘটে, সেদিনই সন্ধ্যার সময়, যখন স্বাতীর জন্য আমি বড়মাকে অনুরোধ জানাতে যাই—

কি বলেছিলেন তিনি ঠিক?

স্বাতীর বিয়ের কথা বলতেই হঠাৎ তিনি চটে উঠলেন। বললেন, তোমাদের যার যা খুশি তোমরা করতে পার—যেখানে যার খুশি তোমরা এই মুহূর্তে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পার। পথের ভিখারী—তোমাদের এনে ক্ষীর আর ঘিয়ের বাটি মুখে তুলে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি সে দয়াটা তোমাদের প্রতি দেখানোই আমার ভুল হয়েছে। পথের কুকুর চিরদিন পথের কুকুর থাকে—তাই সব থাকো গে। দূর হয়ে যাও সব এখান থেকে, তোমাদের কারো সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক নেই—কালই আমি নতুন উইল করে তোমরা কেউ যাতে একটি কপর্দকও না পাও সে ব্যবস্থা

করছি।

তারপর ?

আমারও হঠাৎ রাগ হয়ে গেল—আমিও কড়া কড়া কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিলাম বড়মাকে।

কি বলেছিলেন তাতে তিনি ?

বলেছিলেন, তোমাদের সব চাবুক মারা উচিত থামের সঙ্গে বেঁধে, নিমকহারাম কুত্তার দল। তাতে আমি বলেছিলাম—

কি ?

তাহলে তোমাকে জ্যান্ত রাখব না জেনো।

বলেছিলেন আপনি ?

হ্যাঁ—যা কোনদিন হয় না—হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে আমার আগুন জ্বলে উঠেছিল। পরে নিজেই অবাক হয়েছি কি করে বলতে পারলাম ও কথাগুলো বড়মাকে।

মারতে মারতে নিরীহ একটা বিড়ালছানাকে কোণঠাসা করলে, সেও শেষ পর্যন্ত থাবা তুলে নখর বের করে শেষবারের মত ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করে মণীন্দ্রবাবু, আপনিও ঠিক তাই করেছিলেন।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে আমার মনের কথা নয়—রাগের মাথায় যাই বলে থাকি না কেন—

কিরীটী মৃদু হাসে।

মণীন্দ্র বলে, তাঁকে হত্যা করব আমাদের স্বপ্নেরও অতীত।

মণীন্দ্রবাবু, একটা কথা—

মণীন্দ্র কিরীটীর দিকে তাকাল।

সে-সময় ঘরে আর কে ছিল মনে আছে আপনার ?

সুরতিয়া ছিল।

আর কেউ না ?

না, তবে বের হয়ে যাবার মুখে জয়ন্তদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাই মনে হয়—

কি ?

সেও আমাদের সব কথা শুনেছিল।

ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন।

কিরীটিবাবু।

বলুন ?

আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, আমাদের ভায়েদের মধ্যেই কেউ একজন—

সেটা ভাবাই তো স্বাভাবিক।

কেন ?

কারণ তাঁর পূর্বের উইল বদল করবার ইচ্ছাটা। সেই আশঙ্কায় তাঁকে আপনাদের হত্যা করাটা খুবই তো স্বাভাবিক।

না না, তাই বলে হত্যা করব ?

মানুষ মানুষকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, একমাত্র দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল ছাড়া, চরম কোন উত্তেজনার মুহূর্তেই হত্যা করে বসে বা চরম আঘাত হেনে বসে।

মণীন্দ্র আর কোন কথা বলে না।

ধীরে ধীরে একসময় নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

আর কিরীটীও যেন নিজের চিন্তায় নিজে ডুবে যায়।

তার পরদিনই ভোরবেলা কিরীটী কলকাতায় চলে গেল এবং একদিন পরে আবার সন্ধ্যায় ফিরে এল।

কাল—আগামী কালই, কিরীটী চৌবেজীকে বলেছে আততায়ীকে ধরিয়ে দেবে।

কিরীটী ফিরে এসেছে শুনে জয়ন্ত চৌধুরী তার ঘরে এসে ঢোকে।

আসুন জয়ন্তবাবু।

মিস্টার রায়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

কি বলুন তো ?

এভাবে কতদিন আর নজরবন্দী হয়ে এই ইন্দ্রালয়ে থাকতে হবে ?

দুঃখের রাত্রি অবসান-প্রায় ?

অবসান-প্রায় ?

হ্যাঁ। বসুন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

তারপর কিরীটী ও জয়ন্তর মধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কথাবার্তা হল এবং রাত পৌনে আটটা নাগাদ জয়ন্ত কিরীটীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী তার ক্লান্ত দেহটা আরামকেদারার ওপর শিথিল করে দেয়।

॥ পনের ॥

পরের দিন রাত্রে।

রাত তখন বারোটা বেজে গিয়েছে।

সমস্ত ইন্দ্রালয় যেন একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গিয়েছে। কিরীটী আলো জ্বেলেই শুয়ে ছিল শয্যার ওপর চোখ বুজে। ঘুমোয়নি। ঘড়িতে রাত বারোটা বাজতে দেখে শয্যা হতে উঠে পড়ল।

প্রস্তুত হয়েই ছিল সে। উঠে প্রথমেই ঘরের আলোর সুইচটা টিপে নিভিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

বাইরের বাগানে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। একটানা ঝিঁঝির শব্দ নিষুতি রাতের কান্নার মতই যেন মনে হয়।

অন্ধকারেই কিরীটী তার শয়নঘরের মধ্যস্থিত গুপ্ত দরজা খুলে—যে দরজাপথে জয়ন্ত তাকে প্রথম রাতে গোপনে অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে চিত্রাঙ্গদা দেবীর বসবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়।

চিত্রাঙ্গদা দেবীর বসবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিরীটী।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিরীটী বন্ধ দরজাটার গায়ে টুক টুক টুক করে পর পর তিনটি মৃদু টোকা দিল। ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল।

ঘর অন্ধকার।

কিরীটী চট করে ঘরের দরজা খুলতেই ভেতরে ঢুকে যায়।

কে।

কিরীটী সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল।

সামনেই দাঁড়িয়ে সুরতিয়া।

সুরতিয়া কয়েকটা মুহূর্ত যেন বোবাদৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, বাবুজী আপ?

হ্যাঁ। সুরতিয়া, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

কেয়া আপ পুছনে চাহতে হে বাবুজী মুঝসে?

কিরীটী সুরতিয়ার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর তার জামার পকেট থেকে সেদিন চিত্রাঙ্গদা দেবীর শয়নঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পাওয়া ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরোটা বের করে সামনে মেলে ধরে বলে, দেখ তো সুরতিয়া, এটা কি।

সুরতিয়া একটু যেন অবাক হয়ে কিরীটীর হাতের পাতায় ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরোটার দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, কেয়া।

বুঝতে পারছ না?

মালুম হোতা হ্যায় চুড়িয়া কি টুকরো।

ঠিক। কিন্তু কোথায় পেয়েছি জান এটা?

কোথায় বাবুজী?

সে-রাত্রে রাণীমার ঘরের মেঝেতে। রাণীমার হাতে তো কাচের চুড়ি ছিল না আর তোমার দিদিমণির হাতেও নেই—আছে দেখছি তোমার হাতে।

কেয়া মতলব?

বুঝতে পারছ না সুরতিয়া?

নেহি ত।

এটা তোমারই হাতের একটা ভাঙা চুড়ির টুকরো।

আমার?

হ্যাঁ। যেটা সে-রাত্রে ভেঙে ঘরের মধ্যে পড়েছিল হয়ত।

আমার চুড়ি-ভাঙা।

হ্যাঁ, তোমারই। আর এটা কখন ভেঙেছিল জান?

কখন?

সে-রাত্রে—গণেশকে ডেকে দেবার পর, গণেশ তোমার রাণীমার ঘরে ঢুকে জয়ন্তবাবুকে ডাকতে বের হয়ে যাবার পর। এখন বল সে-রাত্রে রাণীমার নির্দেশ গণেশকে ডেকে দেবার পর তুমি কোথায় গিয়েছিলে

কেন, নীচে বাগানে যেখানে গানবাজনা হচ্ছিল—

না।

বিশোয়াস কিজিয়ে বাবুজী—

নেহি, তুম ঝুট কহেতে হো।

ঝুট।

হ্যাঁ ঝুট—সাচ্ সাচ্ বাতাও।

লেকেন বাবুজী—

সাচ্ বাত ছুপানেসে কুছ্ ফায়দা নেহি হোগা—বাতাও—

সুরতিয়া বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী বলে চলে, গণেশকে ডেকে দিয়ে সোজা তুমি বাগানে যাওনি সে-রাতে।

কোথায় গিয়েছিলে বল ?

স্বরতিয়া চুপ।

আমার ধারণা যদি মিথ্যা না হয় তো সে-রাত্রে তুমি নীচে আমার ঘরে ঢুকে যে পথ দিয়ে এইমাত্র আমি এসেছি, সে পথ দিয়ে গোপনে ওপরে উঠে আসো—, তারপর! বল তুমি কি করেছ ?

আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না বাবুজী। আমি কেন আবার ওপরে আসব ?

এসেছিলে তোমার কাজে এবং তার প্রমাণও আছে।

লেকেন কিঁউ ?

কিঁউ ? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে, সুধন্য কে ?

সুধন্য!

বল সে কে ?

ওকে আমি চিনি না।

চেন।

নেহি।

আমি তাহলে বলি সুধন্য তোমার কে, তোমার ছেলে।

বাবুজী।

হ্যাঁ—রাজাবাবুর ঔরসে তোমার গর্ভে ওর জন্ম।

না, না—

আর্ত চিৎকার করে ওঠে সুরতিয়া।

হ্যাঁ, তোমার ছেলে। আর সেকথা তোমার রাণীমাও জানতেন বলেই নিজের স্বামীর লজ্জাকে ঢাকবার জন্য—নিজের আভিজাত্যকে বাঁচানোর জন্য তোমার এবং পাছে তুমি সব কথা প্রকাশ করে দাও, সেই ভয়ে সুধন্যকে থোকে থোকে টাকা দিয়ে এসেছেন বরাবর। কেমন, তাই নয় কি।

সুরতিয়া একেবারে নিশ্চুপ।

সুধন্য তোমার ছেলে অবিশ্যি সে কথাটা এখনো জানে না। কিন্তু তোমার ব্ল্যাকমেলিং ক্রমশঃ যখন দিনের পর দিন বেড়েই চলতে লাগল, তখন তিনি আক্রোশের মাথায় বলে বসেন উইল তিনি বদল করবেন—যে উইলে সুধন্যরও একটা মোটা শেয়ারের ব্যবস্থা ছিল তাঁর সম্পত্তির—

কিরীটীর কথা শেষ হল না—একে একে ওই সময় ঘরে এসে ঢুকল জগদীন্দ্র, মণীন্দ্র,

মণীন্দ্র, শচীন্দ্র, স্বাতী, যোগেনবাবু, চৌবেজী ও সব শেষে জয়ন্ত।

এই যে আসুন আপনারা।

হঠাৎ জয়ন্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে যেন একটা ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতই কোমর থেকে ধারালো একটা ছোরা বের করে জয়ন্তর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুরতিয়া।

বেইমান।

সকলে মিলে সুরতিয়াকে ধরে ফেলবার আগেই ছোরাটা জয়ন্তর হাতে বিঁধে গিয়েছিল।

তবে বেশি আঘাত লাগেনি।

চৌবেজী ও মণীন্দ্র দুজনে সুরতিয়াকে দু হাতে শক্ত করে ধরে ফেলেন।

সুরতিয়া তখনো ক্ষিপ্র বাঘিনীর মত চেঁচাচ্ছে, ছোড় দো—ছোড় দো মুঝে—ও বেইমানকো হাম খতম কর দুঙ্গি।

চৌবেজীর ইঙ্গিতে দুজন পুলিস এসে ধরে সুরতিয়াকে।

কিরীটী বলে, বলেছিলাম চৌবেজী, আততায়ীকে আজ ধরিয়ে দেব। হাতকড়া লাগান, সে-রাত্রে সুরতিয়াই চিত্রাঙ্গদা দেবীকে হত্যা করেছিল আর ঐ ছোরাটা দিয়েই।

॥ ষোল ॥

ঘরের মধ্যে যেন সহসা বজ্রপাত হল।

সকলেই স্তম্ভিত, নির্বাক।

আরো কিছুক্ষণ পরে—সুরতিয়াকে পুলিস-ভ্যানে তুলে হাজতে পাঠাবার পর চিত্রাঙ্গদা দেবীর ঘরে বসেই কিরীটী ওদের সকলকে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে।

কিরীটী বলতে থাকে, প্রথম দিনই চিত্রাঙ্গদা দেবী সুধন্যকে নিয়ে তাঁর শয়নঘরে চলে যাবার পর আমার চিত্রাঙ্গদা দেবীর স্বামী জিতেন্দ্র চৌধুরীর ফটোটার দিকে নজর পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পাতায় ভেসে ওঠে সুধন্যর মুখটা।

দুটো মুখের মধ্যে আশ্চর্য মিল।

তারপরই সুধন্যর ওইভাবে চিত্রাঙ্গদা দেবীর কাছে বার বার এসে টাকার দাবি করা ও চিত্রাঙ্গদা দেবীর টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা মনের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকে আমার।

বুঝতে পেরেছিলাম আমি—কোন গূঢ় কারণ না থাকলে চিত্রাঙ্গদা দেবীর

মত মানুষ সুধন্যকে টাকা দেয় না। বিশেষ করে যাকে তিনি সবচাইতে বেশী ঘৃণা করতেন।

ভাবতে লাগলাম কিন্তু কি সে কারণ—কি ?

তারপর শুনলাম ভূপৎ সিং ও তার স্ত্রী সুবতিয়ার কথা ও সুবতিয়ার প্রতি জিতেন্দ্র চৌধুরীর আকর্ষণের কথাটা।

সঙ্গে সঙ্গে যেন দুয়ে দুয়ে চার মিলে গেল। সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

জয়ন্ত প্রশ্ন করে, কিন্তু ওকে আপনি সন্দেহ করলেন কি করে ?

কিরীটী বলে, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, আমি বার বার বলেছি সে-রাত্রে বিশেষ কোন পরিচিত জন, যার এ বাড়ির মধ্যে অবাধ গতিবিধি, তাদেরই কেউ একজন চিত্রাঙ্গদা দেবীকে হত্যা করেছে।

হ্যাঁ।

এবারে মনে করে দেখুন, সেরকম এ বাড়িতে কে কে ছিল—ওঁরা চার ভাই ও আপনি ছাড়া আর একজন, সে হচ্ছে ঐ সুবতিয়া—যে রাণীমার একপ্রকার প্রত্যক্ষ সহচরী ছিল সর্বক্ষণের। মণীন্দ্রবাবু ও জগদীন্দ্রবাবুকে অনায়াসেই বাদ দিয়েছি, কারণ ওই সময় তাঁরা গানের আসরে ছিলেন। অর্থাৎ যে সময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। শচীন্দ্র ও ফণীন্দ্রবাবুকেও পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাদ দিই সন্দেহের তালিকা থেকে। তাছাড়া ওঁরা চারজন আর যাই করুন, হত্যা করবার মত নার্ভ বা মনের জোর তাঁদের কারোরই ছিল না। তাহলে বাকি থাকে দুজন—জয়ন্তবাবু ও সুবতিয়া। এবং ওদের দুজনের মধ্যে সবচাইতে সে-রাত্রে হত্যা করবার সুবিধা কার বেশি ছিল। সেটা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ল সুবতিয়ার একটা কথা, কালো কোট পরিহিত যে লোকটিকে সুবতিয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে দেখেছিল তাকে নাকি তার জয়ন্তবাবু বলে মনে হয়েছিল।

তারপর ? জয়ন্তই জিজ্ঞাসা করে।

অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও দুঃসাহসিকা ছিল সুবতিয়া। কিন্তু সে একটা মারাত্মক ভুল করে—জয়ন্তবাবুর নাম করে ও কালো কোটের কথা বলে তার উপরে সন্দেহটা ফেলার জন্য। ওই কালো কোটের কথা না বললে, অত শীঘ্র সুবতিয়ার ওপরে গিয়ে সমস্ত সন্দেহ আমার হয়ত পড়ত না। বুঝলাম, কোটটার সঙ্গে রহস্য জড়িয়ে আছে। আর সুবতিয়াও ভেবেছিল, কোটের কথা বললে কোটের অনুসন্ধান আমরা করব, এবং পরে যদি প্রমাণিত হয় কোটটা জয়ন্তবাবুর, তাহলে তারই ওপর গিয়ে সকলের সন্দেহ পড়বে। সেই জন্যেই বা সেই উদ্দেশ্যেই সুবতিয়া ওইদিন হয়ত কোন একসময়

জয়ন্তর ঘরে ঢুকে কোটটা চুরি করে নিয়ে এসে গোপন সিঁড়ির ঘরে লুকিয়ে রেখে দেয়।

উ, কি শয়তানী। মণীন্দ্র বলে।

শয়তানির চাইতেও সে বাণীমার উইল বদলের কথা শুনে যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল—কারণ সে বুঝতে পেরেছিল আপনাদের কারো জন্যই নয়—ঐ সুরতিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই তিনি পূর্বের উইল বদলাতে মনস্থ করেছিলেন—যে উইলে হয়ত ঐ সুরতিয়ার চাপে পড়েই বাধ্য হয়ে একদিন তাঁকে উইলের মধ্যে সুধন্যর একটা ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তাঁর লজ্জার গোপন কাঁটা ঐ সুধন্য—যে লজ্জা চিরদিন তাঁর মনের মধ্যে গোপন রক্তক্ষরণ করিয়েছে।

সুরতিয়া অস্থির হয়ে উঠল। হয়তো বাণীমাকে সে নিরস্ত করবারও চেষ্টা করেছে, তারপর কিন্তু পারেনি—তখনই হয়ত মনে মনে বাণীমাকে সে হত্যার সংকল্প নেয় এবং সুযোগও এসে গেল তার অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ উৎসবের রাত্রেই।

অন্যান্য রাত্রের মত বাণীমা যে শেষ পর্যন্ত উৎসবে না উপস্থিত থেকে রাত দশটা নাগাদ ফিরে আসবেন তা সে জানত ও প্রস্তুত হয়েই ছিল—হলও তাই। বাণীমা রাত সোয়া দশটা নাগাদ যখন ফিরে এলেন—সুরতিয়া তখন দরজার আড়ালে ছোরা হাতে ওৎ পেতে আছে। বাণীমা যেই ঘরে ঢুকেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে বাণীমাকে ছোরা মারে সুরতিয়া।

জয়ন্ত প্রশ্ন করে, তাহলে গণেশ কার সঙ্গে দেখা করে কথা বলল?

গণেশ ভয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। আদৌ সে বাণীমার সঙ্গে দেখা করেনি। ঘরের ভিতর থেকেই সুরতিয়াই বাণীমার গলার স্বর নকল করে জয়ন্তকে ডেকে আনতে বলে আমার ধারণা। তাই না, গণেশ? তুমি ঘরে ঢুকেছিলে কি?

আজ্ঞে না, বাবু।

কিরীটী আবার শুরু করে, গণেশ চলে যাবার পরই ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সুরতিয়া বাগানে চলে যায়, বাণীমাকে হত্যা করে গোপন সিঁড়িপথ দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে গণেশকে ডেকে দিয়ে আবার গোপন সিঁড়িপথ ধরেই তাড়াতাড়ি সুরতিয়া ফিরে এসেছিল, গণেশ বাণীমার ঘরের সামনে পৌঁছবার আগেই—আমার ঘর দিয়ে।

জয়ন্তবাবুকে কাল সন্ধ্যায়ই সব কথা আমি খুলে বলি। এর এও বলি, সুরতিয়া এখন পালাবার চেষ্টা করছে এবং করবেই। কিন্তু পুলিসের জন্য সে পারছে না পালাতে। জয়ন্তবাবুকে বলে দিই, সুরতিয়ার সঙ্গে গিয়ে প্রেমের অভিনয় করে তাকে বলবেন সুরতিয়াকে তিনি ভালবাসেন—পুলিস তাকে সন্দেহ করছে—তারা পালাবে।

সুরতিয়া হাতে স্বর্গ পেল—রাজী হয়ে গেল। জয়ন্তবাবুর অভিনয়মত সুরতিয়া প্রস্তুত হয়েই ছিল—কথা ছিল রাত বারোটায় এসে জয়ন্তবাবু ঘরের দরজায় টোকা দেবেন তিনবার।

সুরতিয়া টোপটা সহজেই গিলে ফেলে। তার পরের ব্যাপারও সবই আপনারা জানেন।

জয়ন্ত এবারে প্রশ্ন করে, কিন্তু সুরতিয়া যে আমার কোটটা ব্যবহার করেছিল, জানলেন কি করে?

কোটের কলারে একটা স্ত্রীলোকের চুল লেগেছিল, সেই চুলে ছিল সুরতিয়ার মাথার তেলের গন্ধ। একটা উগ্র তেল সুরতিয়া ব্যবহার করত। গন্ধটাতেই আমি ধরতে পারি ব্যাপারটা।

কিরীটী থামল।

কিন্তু সুধন্য কোথায়?

বাড়িতে এত কাণ্ড— সে কি জানতে পারেনি?

গণেশকে খোঁজ নিতে পাঠাল কিরীটী।

একটু পরে গণেশ এসে বললে, সুধন্য ঘুমোচ্ছে।

কিরীটী মৃদু হাসল।

রক্তলোভী নিশাচর

কথামুখ

নিজ হাতে কালকূট নিজেব শবীবে সংক্রামিত কবে যে কালো ভ্রমব স্বেচ্ছামৃত্যুকে ববণ কবে নিয়েছিল মিয়াং মিয়াংযেব মৃত্যুগুহায় ও যাব প্রাণহীন (?) দেহ সাশ্রুনেত্রে ইবাবতীব জলে ভাসিয়ে দিয়ে কিবীটী ও সুব্রত পবম নিশ্চিন্তে আবাব কলকাতায় ফিবে এসেছিল, সেই সমাপ্ত কাহিনীবই যে আবাব নতুন করে জেব টানতে হবে কে ভেবেছিল। সত্যিই কি বিচিত্র এই মানুষেব চবিত্র।

একটা অত্যাশ্চর্য প্রতিভা নিয়েই ডাঃ এস সান্যাল—কালো ভ্রমব জন্মেছিল, কিন্তু যেন দুর্ভাগ্যেব অভিশাপে বাহুগ্রস্ত হযে নিজেব জীবনটাকে তো সে নিজে তছনছ কবে দিলই, সেই সঙ্গে অত বড একটা প্রতিভাবও ঘটল অপমৃত্যু।

এবং সেই অপমৃত্যু তিলে তিলে তাকে যেন গ্রাস কবছিল, অজগব যেমন তাব ধৃত শিকাবকে একটু একটু কবে গ্রাস কবে তেমনি কবেই।

দুইটি বৎসবেব ব্যবধান।

ইরাবতীকূলেব সেই প্রভাতেবই যেন সন্ধ্যা।

সুদূব বর্মা থেকে এবাবে কাহিনী শুরু হল কলকাতাব পটভূমিকায়।

মৃত্যুগুহা হতে টালিগঞ্জে স্যাব দিগেন্দ্রনাবায়ণেব মার্বল প্যালেসে।

সুব্রতব জবানীতেই এবাবেব কাহিনী।

শামুক যেমন খোলাব মধ্যে আপনাকে মাঝে মাঝে গুটিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি কিবীটীকেও মাঝে মাঝে দেখছি বাইবেব জগৎ থেকে যেন আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে অদ্ভুত আত্মস্বতন্ত্র এক জগতেব মধ্যে যেন সে নিজেকে নির্বাসিত কবত।

কয়েক মাস থেকে লক্ষ্য কবছিলাম কিবীটীব সেই অবস্থা। বাডি থেকে কোথাও বেব হয় না। হয নিজেব ল্যাববেটাবী ঘবে, না-হয় বসবাব ঘবে সমস্ত দিনটা তো কাটাযই, এমন কি কোন কোন দিন গভীব বাত পর্যন্তও কাটিয়ে দেয়।

ঐ সময়টা ও বন্ধুবান্ধব কাবো সঙ্গেই বড একটা দেখা কবে না। আমিও দুদিন এসে ফিবে গেছি, কিবীটীব সঙ্গে দেখা হয়নি।

দুদিন এসে জেনেছি কিরীটী লাইব্রেবী ঘবেই আছে। কিন্তু আমি জানতাম মনেব মধ্যে বাইবেব জগৎ থেকে সে যখন নিজেকে এভাবে নির্বাসিত করে, তখন কাউকেই সে সহ্য কবতে পাবে না। সেই কাবণেই আমিও তাকে বিরক্ত করিনি।

দিন দশেক বাদে গেলাম।

সেদিনও জানতে পারলাম কিরীটী সকাল থেকে তার ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যেই আছে।

জংলীর কাছে সংবাদ নিচ্ছি এমন সময় সহসা ল্যাবরেটারীর দরজা খুলে কিরীটী বের হয়ে এল এবং আমাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে বলল, এই যে সু, খবর কি? হঠাৎ? অনেক দিন এদিকে আসিস না।

আমি মৃদু হেসে বললাম, ঠিক উল্টোটি। আজকে নিয়ে তিনদিন। বরং তোরই পাত্তা নেই।

পাত্তা নেই মানে। আমি তো দু মাস ধরে বাড়ি থেকে কোথাও বেরই হই না।

আবার বুঝি কোন জটিল মামলা হাতে নিয়েছিস?

মামলা নয়। মামলা-কাহিনী। বলে জংলীর দিকে তাকিয়ে বললে, এই, চা নিয়ে আয়।

জংলী আদেশ পালনের জন্য ঘর হতে বের হয়ে গেল।

মামলা-কাহিনী মানে? বিস্মিত ভাবে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

একটা আত্মচরিত লিখছি।

আত্মচরিত লিখছ?

হ্যাঁ। তবে আত্মচরিত সাধারণত যে-রকমটি হয়, এ সে-রকম নয়। আত্মচরিতের 'আত্ম'টিকে বাদ দিয়ে কেবল জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে সাজিয়ে যাচ্ছি পর পর।

সত্যি?

হ্যাঁ।

॥ এক ॥

কিছু দিনের ব্যাপার।

হাতে কোন কাজকর্ম নেই বলে কিরীটী তার বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখছিল। রাত্রে সে লিখত এবং যতটুকু লেখা হত পরদিন প্রত্যুষে সেটা পাঠিয়ে দিত আমাকে পড়তে।

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই সমস্ত দুপুরে পড়ে সেটা আবার সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দিতাম।

সত্যিই ডায়েরীটা পড়তে বেশ ভাল লাগছিল।

গতকাল সকালে কী একটা জরুরী কাজে কিরীটী রাণাঘাট গেছে। ডায়েরীটা তাই আমার কাছেই রয়ে গেছে।

নতুন করে আর কিছু লেখা হয়নি।

বিকেলের দিকে সে আমাকে রিং করে জানিয়েছে—রাত্রে আমাদের দুজনের কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ আছে, সে এখানেই আসবে, তারপর সন্ধ্যার পর দুজনে একসঙ্গে বেরুব, আমি যেন প্রস্তুত হয়ে থাকি। ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বেজে গেল।

শীতের রাত্রি, তারপর আবার সন্ধ্যা থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। শীতের হিমেল হাওয়া মাঝে মাঝে উত্তর দিকের জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছে বেপরোয়া। ঠাণ্ডা গায়ে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে।

সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে কিরীটীর আত্মজীবনীটা আবার খুলে বসলাম।

গতকাল ডায়েরীর একটা জায়গা পড়তে পড়তে সত্যিই অদ্ভুত লেগেছিল।

সেই জায়গাটাই আবার পড়া শুরু করলাম।

এ জীবনে অনেক কিছুই বিচিত্র ও অদ্ভুত দেখলাম। কিন্তু নিশাচরদের মত ভয়ঙ্কর বোধ হয় আর কিছুই নেই। আধুনিক সভ্য সমাজে "নিশাচরে"র অভাব নেই। সাক্ষাৎ শয়তানের যেন প্রতীক এরা, দিনের আলোয় এদের দেখলে চিনতে পারবে না কেউ। অতি শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র, বিনয়ী, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন, কিন্তু যত রাতের অন্ধকার একটু একটু করে পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে আসে, চারদিক হয়ে আসে নিঝুম, ক্ষুধিত হায়নার মতই ঐ তথাকথিত নিশাচরেরা তখন যেন হয়ে ওঠে রক্তলোলুপ ও হিংস্র ভয়ঙ্কর। তখন এদের দেখলে আঁতকে উঠবে নিশ্চয়ই। তাই বলছিলাম, যদি কোন গভীর রাত্রে, কখনো এই শহরেও ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত শোন, দরজা

খুলো না। সাবধান, কে বলতে পারে

এই পর্যন্ত লিখেই হয়তো সে রাতের মত শেষ করেছে। কেননা এর পর আর কিছু লেখা নেই।

গায়ের মধ্যে যেন কেমন সিরসির করে ওঠে। গায়ের লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে ওঠে কি একটা দুর্জ্ঞেয় ভয়ে।

একটা অশরীরী ছায়ার মত অদ্ভুত আশঙ্কা যেন মনের মধ্যে মাকড়সার বাঁকানো বাঁকানো রোমশ সরু সরু কুৎসিত ঠ্যাং ফেলে ফেলে এগিয়ে আসে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

কে ? উঠে দরজাটা খুলে দিতেই কিরীটী এসে ঘরে প্রবেশ করল, সুব্রত, রেডি !

হ্যাঁ। মৃদুস্বরে জবাব দিলাম। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এক্ষুনি বের হবে তো ?

না। বাড়িতে ঢুকেই মাকে বলে এসেছি এক কাপ গরম কফি পাঠিয়ে দিতে। বলতে বলতে কিরীটী একটা সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিল, উঃ, কি ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছিস ? এক কাপ স্ট্রং এবং গরম কফি না হলে আর যেন যুৎ হচ্ছে না।

অদূরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পের আলোর খানিকটা কিরীটীর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। আজ কিরীটীর পরিধানে সার্জের অ্যাস্-কলারের স্যুট, গলায় সাদা শক্ত উঁচু কলার ও বড় বড় রক্তলাল বুটি দেওয়া টাই, ব্যাক্‌ব্রাশ করা চুল। সূক্ষ্ম মৃদু একটা অতিমিষ্টি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ ঘরের বাতাসকে আমোদিত করে তুলেছে।

কিরীটীর চিরকালের অদ্ভুত শান্ত মুখখানা যেন আজ আরো শান্ত ও গম্ভীর মনে হচ্ছিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এ বেশে কেন বন্ধু ? একেবারে বিলিতী !

আজ আমরা কোথায় নিমন্ত্রণে চলেছি জানিস ?

কোথায় ? প্রশ্ন করলাম।

বিশালগড়ের কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের জন্মতিথি উৎসব আজ।

কোন্ দীপেন্দ্রনারায়ণ ? সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম।

স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে নিশ্চয়ই ভুলিসনি। যাঁর মাথা খারাপ হয়েছে বলে বছর দুয়েক আগে রাঁচির পাগলা-গারদে রাখা হয়েছিল।

কোন্ স্যার দিগেন্দ্র, বিখ্যাত সেই সায়েন্টিস্ট, না ? আমি প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ। স্যার দিগেন্দ্র আর গণেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন দুই ভাই। গণেন্দ্রনারায়ণ বড়, আর দিগেন্দ্র ছোট। দিগেন্দ্র অবিবাহিত, আজন্ম ব্রহ্মচারী। গণেন্দ্রের একটি মাত্র

ছেলে—ঐ দীপেন্দ্র। দীপেন্দ্রর যখন বছর ষোল বয়স তখন হঠাৎ তাঁর ভয়ানক অসুখ হয়। স্যার দিগেন্দ্র শহরের সমস্ত বড় বড় ডাক্তারকে ডাকলেন, অনেক চেষ্টা করা হল, কিছুতেই কিছু হয় না। এমন সময় এক সন্ধ্যায় ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়ে গেলেন। বলতে বলতে কিরীটী থামল, বাইরে তখন সমগ্র আকাশ আসন্ন ঝড়ের ইশারায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

তারপর? রুদ্ধশ্বাসে কিরীটীর কথা শুনছিলাম।

তারপর সেই রাত্রেই দীপেন্দ্রনারায়ণ মারা গেলেন। সে রাত্রে ঝড়জলের বিরাম ছিল না। সেই ঝড়জলের মধ্যেই দাহকারীরা শবদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ভৃত্য এসে কাচের একটা প্লেটের ওপর ছোট একটা কাচের জাগে ভর্তি ধূমায়িত কফি দিয়ে গেল।

কিরীটী জাগটা তুলে নিল।

গরম কফিতে মৃদু চুমুক দিতে লাগল।

সারাটা শহর সে রাত্রে ঝড়জলে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। জনহীন রাস্তা, শুধু মাঝে মাঝে অল্প দূরে গ্যাসপোস্টগুলো একচক্ষু ভূতের মতই যেন এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। দাহকারীরা শবদেহ নিয়ে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে, দুর্যোগ মাথায় করেই। কেওড়াতলার কাছাকাছি আসতে সহসা একটা প্রকাণ্ড কালো রংয়ের সিডনবডি গাড়ি ওদের পথ রোধ করে এসে দাঁড়াল। গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা একটা লোক, হাতে তার উদ্যত একটা রিভলবার। রিভলবারের ইস্পাতের চোংটা চকচক করে ওঠে। লোকটা কঠিন আদেশের সুরে বললে, শবদেহ এখানে রেখেই তোমরা চলে যাও। লোকগুলো প্রাণের ভয়ে শবদেহ রাস্তার ওপরে ফেলে দিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

বাড়িতে যখন ওরা কোনমতে ফিরে এল, রাত্রি তখন অনেক। বাইরের ঘরে একাকী স্যার দিগেন্দ্র ভূতের মত পায়চারি করছিলেন। সব কথা ওরা স্যার দিগেন্দ্রকে একটু একটু করে খুলে বললে। স্যার দিগেন্দ্র ওদের মুখে সমস্ত কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, পুলিসে সংবাদ দেওয়া হল, কিন্তু শবদেহের কোন কিনারাই আর হল না। শবদেহের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা মিস্ট্রি হয়েই থেকে গেল।

কিরীটী নিঃশেষিত কফির কাপটা টিপয়ের ওপর নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, ওঠ্‌ সু, সময় হয়েছে, বাকিটা গাড়িতে বসে বসে শেষ করব। পাশের ঘরেই দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা ঘোষণা

করলে।

বাড়ির দরজাতেই রাস্তার কিরীটীর সদ্যক্রীত কালো রংয়ের সিডনবডি প্লাইমাউথ গাড়িখানা শীতের অন্ধকার বাদলা রাত্রির সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন একপ্রকার নিশ্চিহ্ন হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। শিখ ড্রাইভার হীরা সিং আমাদের দরজার একপাশে নিঃশব্দে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা দুজনে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম, হীরা সিংও আমাদের পিছু পিছু এসে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম দুজন ভদ্রলোক আগে থেকেই গাড়িতে চুপ করে বসেছিলেন। আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই কিরীটী বললে, এঁরা দুজন আমাদের সঙ্গেই যাবেন।

বুঝলাম কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওঁরা আমাদের সঙ্গে চলেছেন। গাড়ি স্টার্ট দিল।

কিরীটী হীরা সিংকে সম্বোধন করে বললে, বেহালা, কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের মার্বেল হাউস। নিঃশব্দ গতিতে গাড়ি ছুটল।

শীতের অন্ধকার রাত্রি কালো মেঘের ওড়না টেনে দিয়ে নিঃশব্দে টিপ টিপ করে অশ্রুবর্ষণ করছে। এর মধ্যেই শহরের দোকানপাট একটি দুটি করে বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। কিরীটী নিঃশব্দে গাড়ির সীটে গা এলিয়ে দিয়ে একটা চুরুট টানছিল। কিরীটীর ওষ্ঠধৃত চুরুটের জ্বলন্ত অগ্রভাগটা যেন একটা আগুনের চোখের মত অন্ধকারে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সহসা এক সময় সেই কঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই প্রথম কথা বললে, তারপর দীর্ঘ বারো বছর পরে সেই দীর্ঘ বারো বছর আগেকার শ্মশানরাত্রির স্মৃতি যেন আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। সহসা এক সন্ধ্যায় সেই মৃত দীপেন্দ্রনারায়ণ অকস্মাৎ সজীব হয়ে ফিরে এলেন। এসে বললেন, একদল নাগা সন্ন্যাসী সেই রাত্রিতে শ্মশান থেকে মৃত বলে পরিত্যক্ত তাঁর দেহ কুড়িয়ে এনে কি সব তন্ত্রমন্ত্র ও বন্য ঔষধ খাইয়ে বাঁচিয়ে তোলে। বছর পাঁচেক বাদে তাদের কবল থেকে কোনক্রমে তিনি পালিয়ে এসেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, হঠাৎ পথিমধ্যেই একদল দস্যুর পাল্লায় গিয়ে পড়লেন। আট বছর তাদের কাছে বন্দী থাকার পর এক রাত্রে অদ্ভুত উপায়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। বিচিত্র রহস্যময় সে কাহিনী।

কিছুক্ষণ থেমে আবার কিরীটী শুরু করে, তার দিগেন্দ্র অবিশ্যি প্রথমে ভাইপোকে বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু ভাইপো অনেক কিছু প্রমাণের দ্বারা কাকার সমস্ত সন্দেহের নিরসন করে দিলেন। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে নিঃসন্দেহে সত্যেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র সন্তান 'দীপেন্দ্র' বলে মেনে নিলেন। এবং অতঃপর তার

দিগেন্দ্র ভাইপো দীপেন্দ্রকে প্রাসাদে স্থান দিলেন। এরপর কিছুদিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন শোনা গেল, স্যার দিগেন্দ্রের নাকি কেমন মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। দিনের বেলায় লোকটি ধীরস্থির, অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক, কিন্তু রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর মাথায় খুন চাপে, ধারালো ছুরি বা ক্ষুর নিয়ে সামনে যাকে দেখেন তাকেই খুন করতে যান। ডাক্তার এল, বললে, রোগটা ভাল না। অত্যধিক চিন্তার ফলে নাকি এরকমটি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিলেন রোগীকে এখন সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হবে। এমনি করেই কিছুদিন চলল, সহসা এক রাত্রে স্যার দিগেন্দ্র কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণকেই ধারালো একটা ক্ষুর দিয়ে কাটতে উদ্যত হলেন।

হ্যাঁ, আমিও খবরের কাগজে এ ব্যাপারটা পড়েছি। বললাম, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলেন সেদিন কুমারসাহেব। এবং তারপরই স্যার দিগেন্দ্রকে রাঁচির পাগলা-গারদে ভর্তি করে দেওয়া হয়, না ?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

এখনও বোধ হয় পাগলা-গারদেই আছেন ? বেচারী। অত বড় একটা প্রতিভাসম্পন্ন লোক।

না, মোটেই না। কিরীটী মৃদু হেসে বললে, তোমরা জান লক্ষপতি স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে রাঁচির পাগলা-গারদে একটা প্রাইভেট সেলে বছর তিন আগে যেমন রাখা হয়েছিল, এখনও বুঝি তেমন আছেন।

তবে ? বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

বছর দুই হল সহসা এক রাত্রে স্যার দিগেন্দ্র সবার অলক্ষ্যে পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে যান।

বল কি। তারপর ?

তারপর,—তারপর আর কি ? পুলিস ও আই বি ডিপার্টমেন্টের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর টিকিটির দর্শন আজ পর্যন্ত পাননি। তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, কিন্তু মাত্র সপ্তাহখানেক হল একটা মজার সংবাদ পাওয়া গেছে। সংবাদটা অবিশ্যি অত্যন্ত গোপনীয়, আই বি, ডিপার্টমেন্টের এক 'কনফিডেন্সিয়াল' ফাইলেই মাত্র টোকা আছে।

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, কী ?

মাস দুই আগে খবরের কাগজে বিখ্যাত ডাঃ রুদ্রের অদ্ভুতভাবে নিহত হবার কথা পড়েছিলি, মনে আছে সু ?

মৃদু স্বরে বললাম, মনে আছে বৈকি।

কিরীটী প্রায়-নিভন্ত চুরুটটা গাড়ির জানলা গলিয়ে ফেলে দিল। তারপর বলতে লাগল, সমগ্র ভারতবর্ষে ডাঃ রুদ্রের মত Plastic surgery-তে (গঠনমূলক অস্ত্র-চিকিৎসা) অদ্ভুত পারদর্শিতা আর কারও ছিল না। তিনি দেহ ও মুখের ওপর অস্ত্র দিয়ে সামান্য কিছু কাটাকুটি করে দেহ ও মুখের চেহারা এমন ভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারতেন যে, তাকে পরে আর আগেকার সেই লোক বলে চিনবারও কোন উপায় পর্যন্ত থাকত না।

কিন্তু ডাঃ রুদ্র যেমন একদিকে ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন, অন্যদিকে ছিলেন তেমনি একটু বেশ আধপাগলাটে ধরনের ও খামখেয়ালী প্রকৃতির। লোকটার একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল, প্রত্যেক রবিবার রাঁচির পাগলা-গারদে গিয়ে বেছে বেছে যারা criminal পাগল তাদের সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা বলে বহু সময় কাটিয়ে আসা। ডাঃ রুদ্র আগে যখন কলকাতায় প্র্যাকটিস করতেন, শোনা যায় তখনও তিনি নাকি বছরের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ বার রাঁচি ও বহরমপুরের পাগলা-গারদে ছুটে যেতেন। শেষটায় বছর দুই হল কলকাতার প্র্যাকটিস তুলে দিয়ে রাঁচিতে গিয়েই সুন্দর চমৎকার একটা বাড়ি তৈরী করে নানবুমে স্থায়ীভাবে বসবাস ও প্র্যাকটিস শুরু করেন। ডাক্তার রুদ্র ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী। মাস দুই আগে অকস্মাৎ একদিন অতি প্রত্যূষে ডাঃ রুদ্রের দেহহীন মস্তকটি তাঁরই ল্যাবরেটারী-ঘরের কাচের টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা কাচের জারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পুলিস অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর দেহটি খুঁজে পায়নি। কাটা মাথাটা দেখে স্পষ্টই মনে হয়, কোন ধারালো অস্ত্র দিয়েই নিখুঁতভাবে দেহ থেকে মাথাটা পৃথক করে নেওয়া হয়েছিল। কিরীটী আবার একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল। গাড়ি তখন কালীঘাট ব্রীজ ক্রস করে ছুটে চলেছে বেলভেডিয়ার রোড ধরে।

শীতের জলসিক্ত হিমেল হাওয়া চলন্ত গাড়ির মুক্ত জানলা-পথে প্রবেশ করে নাকেমুখে আমাদের যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছিল। জ্বলন্ত সিগারের লাল আগুনের আভায় ঈষৎ রক্তাভ কিরীটীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চুপটি করে বসে রইলাম।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, পুলিসের ধারণা স্যার দিগেন্দ্রই নাকি হতভাগ্য ডাঃ রুদ্রের হত্যার ব্যাপারে অদৃশ্যভাবে লিপ্ত।

কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

কেন, তা ঠিক বলতে পারব না, কিরীটী বলতে লাগল, পুলিসের লোকেরা ডাঃ রুদ্রের অ্যাসিস্টান্ট ডাঃ মিত্রের কাছে কতগুলো কথা জানতে পারে। অ্যাসিস্টান্ট

ডাঃ মিত্র বলেন, একটি পেসেণ্ট নাকি ডাক্তারের নিহত হবার দিন দশেক আগে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্ম আসে এবং ডাক্তার নিজেই একা একা পেসেণ্টকে ক্লোরোফর্ম করে তার মুখে অপারেশন করেন—পেসেণ্টেরই ইচ্ছাক্রমে ডাঃ মিত্রের কোন সাহায্য না নিয়ে। অ্যাসিস্টাণ্ট ডাঃ মিত্র অবিশ্যি জীবনে কখনো স্যার দিগেন্দ্রকে দেখেননি বা চিনতেনও না এবং লোকটি যে ঠিক কেমন দেখতে তাও তিনি বলতে পারেননি। ডাঃ মিত্রের জবাববন্দি থেকে জানা যায়, সেই পেসেণ্ট ডাক্তারের সঙ্গে অন্ধকার ঘরে বসে নাকি কথাবার্তা বলত, তবে অপারেশনের পর রাত্রে একবার অ্যাসিস্টাণ্টটি পেসেণ্টকে পথ্য ও ঔষধ খাওয়াতে কয়েকবার গিয়েছিল তার সামনে, কিন্তু তখন পেসেণ্টের সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চিনবার উপায় ছিল না। অপারেশনের দিন দুই বাদে এক গভীর রাত্রে পেসেণ্ট ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। আগেই বলেছি, শহরের একধারে ছিল ডাঃ রুদ্রের বাড়ি।

তারপর ? আমি প্রশ্ন করলাম।

তারপর সেই রাত্রে একজন লোককে নাকি কালো একটা ওভারকোট গায়ে, মাথায় কালো একটা টুপি চোখের পাতা পর্যন্ত নামানো ডাক্তারের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে একজন প্রহরারত পুলিস দেখেছিল। প্রহরারত পুলিসটা তখন নাকি সেই রাস্তা দিয়েই ফিরছিল। পুলিস যাকে সেই রাত্রে ডাঃ রুদ্রের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছিল সেই লোকটি পুলিসের দিকে একটিবারও না তাকিয়ে তার পাশ দিয়েই রাস্তা ধরে নাকি চলে যায় খোসমেজাজে একটা গানের সুর শিস দিতে দিতে। পুলিস তাকে সন্দেহ করেনি, কারণ তাকে সে কোন একজন সাধারণ পথচারীই ভেবেছিল।

আগেই বলেছি, পরদিন ভোরবেলা ডাক্তারের মুণ্ডুটা তাঁরই ল্যাবরেটারী-ঘরে টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা কাচের জারের মধ্যে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, এই এতগুলো ঘটনাকে যদি এক সূত্রে গাঁথা যায় তবে একটা কথা বিশেষভাবে মনের মধ্যে স্বতঃই উদিত হয়।

কী ? আমি প্রশ্ন করলাম।

স্যার দিগেন্দ্র বোধ হয় এখনও জীবিত। এবং তাঁর সেই বিকৃত-মস্তিষ্কের কল্পনা—

কিরীটী হঠাৎ চুপ করে গেল।

কিরীটী কি বলতে বলতে থেমে গেল জানি না, তবে আমার মনে হল স্যার দিগেন্দ্র এখনও যেন রাতের অন্ধকারে বিকৃত একটা রক্ত-নেশায় কুমার দীপেন্দ্রর পিছু পিছু ছায়ার মতই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মনটার মধ্যে যেন সহসা কি একটা অজানিত আতঙ্কে হাঁক করে উঠল।

একটা অদৃশ্য ভয় যেন অন্ধকারে অক্টোপাশের মতই ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল অষ্টবাহু দিয়ে আমার চারপাশে ঘন হয়ে উঠছে।

গাড়ির মধ্যকার মৃদু নীলাভ আলোয় কিরীটীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম—কিরীটীর দুটি চক্ষু বোজা।

কি এক গভীর চিন্তায় যেন সে তলিয়ে গেছে।

বাকি দুজন ভদ্রলোক, যাঁরা ঠিক আমার পরেই সেই একই সীটে পাশাপাশি বসে, অন্ধকারে তাদের মুখগুলো যেন পাথরের মতই কঠিন ভাবহীন।

আমি চোখটা ফিরিয়ে নিলাম।

॥ দুই ॥

গাড়িটি একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। একটা মৃদু গোলমাল অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত আমাদের কানে এসে বাজল।

আমরা এসে গেছি সুব্রত। চল্, নামা যাক। কিরীটী বললে।

আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নামলাম প্রথমে এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুজন ভদ্রলোকও গাড়ি থেকে নামলেন।

কুমার দীপেন্দ্রর প্রাসাদতুল্য মার্বেল প্যালেস আজ নানা বর্ণের আলোকমালায়, ফুল ও পাতাবাহারে সুশোভিত। সবুজ, নীল, লাল নানা বর্ণ-বৈচিত্র্য আলোর নয়নাভিরাম দৃশ্য।

বহু সুবেশ ও সুবেশা নরনারীর কলকাকলীতে সমগ্র প্রাসাদটি মুখরিত।

দরজার গোড়ায় একজন ভদ্রলোক অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে সাদর আহ্বান জানালেন। বললেন, আসুন আসুন।

কিরীটী তার পরিচয় দিতেই সেই ভদ্রলোক বললেন, ওঃ, আপনি মিঃ কিরীটী রায়? কুমার সাহেব ওপরে আছেন—সোজা ওপরে চলে যান।

সামনে একটা সুপ্রশস্ত মার্বেল পাথরে বাঁধানো টানা বারান্দা গেছে। ডানদিকে প্রকাণ্ড একখানি হলঘর। সেখানে টেবিল চেয়ার পেতে আধুনিক কেতায় অতিথি-অভ্যাগতদের খাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই হলঘরের বাঁ দিকে একটি ছোট ঘর, কয়েকখানি সোফা পাতা, সাত-আটজন ভদ্রলোক গোলগল্পে মত্ত।

ঘরে ঘরে অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। বারান্দার এক পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি, সেটাও মার্বেল পাথরে তৈরী। ভদ্রলোকের নির্দেশমত আমরা সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলের দিকে অগ্রসর হলাম।

দ্বিতলে উঠে কিরীটী সঙ্গের সেই দুজন ভদ্রলোককে যেন নিম্নকণ্ঠে কি বললে, তারা সঙ্গে সঙ্গে নীচে চলে গেল। আমরা অতঃপর দোতলায় উঠেই সামনে যে প্রকাণ্ড হলঘর, সেই হলঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম। প্রচুর সাজসজ্জায় ও আলোক-মালায় যেন ইন্দ্রপুরীর মতই মনে হচ্ছিল ঘরটাকে।

ঘরের মেঝেতে দামী পুরু লাল রংয়ের কাশ্মীরী কার্পেট বিছানো। হলঘরের সংলগ্ন একটা নাতি-প্রশস্ত ঘর দেখা যায়। হলঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করে পর পর পাশাপাশি দুটি দরজায় দামী সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে, এবং পর্দা ভেদ করে সেই ঘর থেকে আনন্দ-কলরব কানে ভেসে আসে মাঝে মাঝে।

হলঘরের মধ্যে ছোট ছোট সব গোলাকার টেবিল পেতে তার চারপাশে চেয়ার রাখা হয়েছে। ভদ্রলোকেরা সেই চেয়ারে বসে চা ও সরবৎ সহযোগে খোসগল্পে মত্ত।

একজন ভদ্রলোককে দেখে কুমারসাহেবের খোঁজ নিতেই, কুমারসাহেব ঐ সামনের ঘরে আছেন বলে ভদ্রলোকটি দুই-দরজাওয়ালা ঘরটি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম।

ঘরের ঠিক নীচে দিয়েই ট্রাম-রাস্তা চলে গেছে। ট্রাম-রাস্তার দিকে মুখ করে ঘরে প্রায় পাঁচ-ছটি জানলা, প্রত্যেকটিতে দামী নেটের বাহারে পর্দা টাঙানো। ঘরের বাঁ দিকে কতকগুলো দেওয়াল-আলমারির মত আছে, তাতেও পর্দা ঝুলানো। বোধ হয় সেগুলিতে জিনিসপত্র রাখা হয়। ঘরের ডান দিকের দেওয়ালটা ঘরের ছাদ থেকে ডিমের মত ঢালু হয়ে যেন মেঝেতে নেমে এসেছে, মাঝখানে একটা দরজা। ঘরের মধ্যে সোফা ও চেয়ারে বসে কয়েকটি ভদ্রলোক গল্প করছেন। কুমারসাহেব সেখানে নেই।

মাঝে মাঝে উচ্চহাসির রোল উঠছে।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে দামী ফ্রেমে সব সুদৃশ্য ছবি ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের চারপাশে বসে চারজন ভদ্রলোক তাস খেলছেন।

ঘরে ঢুকে যেটাকে দেওয়াল-আলমারি মনে হয়েছিল, হঠাৎ সেই দিকের পর্দার আড়াল থেকে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল, কিরীটী আর আমি দুজনেই চমকে সেদিকে ফিরে তাকালাম।

ঐ যে কুমারসাহেবের গলা, চল্ পর্দার ওধারে বসে আছেন বোধ হয়। কিরীটী আমার হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করল।

দুজনে পর্দার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিরীটীর অনুমানই ঠিক। গা-আলমারি না হলেও অনেকটা গা-আলমারির মত খানিকটা জায়গা। সেখানে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি একটি ভেলভেট-মোড়া দামী সোফা পাতা। এবং তার সামনে ঐ আকারেরই একটি ছোট্ট টেবিল। টেবিলের ওপর নীল রংয়ের ঘেরাটোপে ঢাকা একটি ক্ষুদ্র টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলো সামনে ঝুলন্ত নীল র য়ের পর্দার সঙ্গে যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে—তাই ওদিক থেকে তেমন বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি।

সোফার ওপর সাহেবী বেশ পরিহিত চোখে কালো কাচের চশমা একজন ভদ্রলোক ও অন্য একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে মৃদুস্বরে গল্প করছিলেন, আমাদের দেখে সাহেবী বেশ পরিহিত ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়ালেন এবং সসম্ভ্রমে বললেন, হ্যালো মিঃ রায়, গুড ইভনিং। ইনিই বোধ হয় মিঃ সুব্রত রায়? আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

কিরীটী নমস্কার করে বলল, হ্যাঁ কুমারসাহেব, ইনিই সুবিখ্যাত মিলিওনিয়ার সুব্রত রায়, আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকারী।

কিরীটীর কথায় বুঝলাম বক্তাই কুমারসাহেব।

কুমারসাহেবের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। নাতি-দীর্ঘ সবল দেহাবয়ব, মাথায় লম্বা কাঁচা-পাকা চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা, পরিধানে দামী সার্জের সুট, চোখে একজোড়া রঙিন কাচের চশমা। তাছাড়া মুখের ভাব অত্যন্ত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির।

এই সময় দ্বিতীয় প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা তিনজনে সোফার ওপর কুমারসাহেবের নির্দেশক্রমে উপবেশন করলাম।

ইনিই আমাদের কুমারসাহেব দীপেন্দ্রনারায়ণ, সুব্রত। কিরীটী বললে আমার দিকে এবারে তাকিয়ে।

একজন বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ-ভর্তি ধূমায়িত চা ও প্লেটে করে কিছু প্লাম-কেক দিয়ে গেল। ট্রের ওপর হতে একটা ধূমায়িত চায়ের কাপ তুলে নিয়ে কাপে মৃদু চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বলল, জানিস, ভাবী বৈচিত্র্যপূর্ণ এঁর জীবন-কথা সুব্রত।

এমন সময় দামী সুট-পরা একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক পর্দা তুলে এসে সেখানে প্রবেশ করলেন।

হ্যালো ডাঃ চট্টরাজ। কলকাতায় কবে ফিরলেন? কিরীটী সোল্লাসে বলে উঠল।

এই তো কদিন হল। তারপর রায়, তোমার সংবাদ কী বল? ডাঃ চট্টরাজ কিরীটীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন এবং সহাস্যমুখে বললেন, দাও হে রহস্যভেদী, একটা বর্মা সিগার দাও তোমার। অনেক দিন খাই না। খেয়ে দেখি।

কিরীটী মৃদু হেসে তার পকেট থেকে সুদৃশ্য হাতীর দাঁতের সিগার কেসটা বের করে ডাক্তারকে একটা সিগার দিল।

কুমারসাহেব বললেন, ডাঃ রায়, আপনারা ততক্ষণ আলাপ করুন, আমি ওদিকটা একটু দেখে আসি।

কুমারসাহেব চলে গেলেন।

তারপর ডাক্তার, আপনি এক সময় স্যার দিগেন্দ্রর চিকিৎসা করেছিলেন, না? কিরীটী প্রশ্ন করলে ডাঃ চট্টরাজের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, সে প্রায় বছর তিন সাড়ে তিন আগেকার কথা। কিন্তু তাহলেও তাঁর সম্পর্কে সব কিছুই আমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

একটা কথা আপনাকে আজ জিজ্ঞাসা করব ডাঃ চট্টরাজ?

বলুন।

আচ্ছা, স্যার দিগেন্দ্রর কি সত্যিসত্যিই মাথার কোন গোলমাল হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

ডাঃ চট্টরাজ যেন অল্পক্ষণ কি একটু ভাবলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, দেখুন আমার যতদূর মনে হয়, ভদ্রলোকের Hyperoes-thisia ছিল। তাঁর মধ্যে প্রায়ই একটা খুনোখুনি করবার যে tendency জেগে উঠেছিল তাতে ও ধরনের ব্যাপারকে Lust Murder বলা যায়, অর্থাৎ যাকে সহজ ভাষায় খুন করবার একটা ইচ্ছা বলা চলে এবং স্যার দিগেন্দ্রর মত ঠিক ঐ ধরনের 'কেস' আমার ডাক্তারী-জীবনে চোখে বড় একটা পড়েনি। ডাক্তারী শাস্ত্র ও নানা প্রকারের নজির থেকে বলা যায়, এ ধরনের মনের বিকৃতি যাদের হয় তারা প্রিয়জনের বড় একটা ক্ষতি করে না। অথচ আশ্চর্য, স্যার দিগেন্দ্র তাঁর অতি প্রিয় ভাইপোকেই শেষটায় খুন করতে গিয়েছিলেন। ভাগ্যে বেচারা চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে, তা ছাড়া কুমারসাহেবের গায়েও অসীম ক্ষমতা ছিল। ভদ্রলোককে অমন হাবাগবা বোকাটে ধরনের দেখতে হলে হবে কি, গায়ে শুনেছি নাকি অসুরের মতই ক্ষমতা রাখেন।

ডাক্তার আবার বলতে লাগলেন, আমি তখন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পুরী বেড়াতে গেছি, সেই সময় হঠাৎ একদিন সকালে কুমারসাহেবের বাড়ি থেকে call পেয়ে স্যার

দিগেন্দ্রকে দেখতে যাই। সেও আজ বছর কয়েক আগেকার কথা। সকালবেলা রোগী দেখতে গেলাম। পুরীতে সমুদ্রের ধারেই ওঁদের সুন্দর একখানা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি আছে। স্যার দিগেন্দ্র তখন বারান্দায় একটা ডেকচেয়ারে বসে শেক্‌স্‌পীয়র পড়ছিলেন, কুমারসাহেবও তাঁর কাকার পাশেই বসেছিলেন, আলাপ পরিচয় হবার পর স্যার দিগেন্দ্র আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দীপু আমার জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ডাক্তার চট্টরাজ।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কেন ?

স্যার দিগেন্দ্র জবাবে বললেন, ওর ধারণা আমার কিছুদিন থেকে রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না বলে শীঘ্রই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়ব।

বলতে গেলে অতঃপর কুমারসাহেবের বিশেষ অনুরোধেই স্যার দিগেন্দ্রকে আমি পরীক্ষা করি এবং আশ্চর্য আমি স্যার দিগেন্দ্রকে খুব ভাল ভাবেই পরীক্ষা তো করলামই এবং অনেকক্ষণ ধরে সে-রাত্রে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও বললাম, দেখলাম মাথার কোন গোলমাল নেই, চিন্তাশক্তিও স্বাভাবিক শান্ত ও ধীর, মস্তিষ্কের কোন রোগের লক্ষণই পাওয়া গেল না। তবে পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানতে গিয়ে একটা জিনিস পাওয়া গেল।

কী ? কিরীটী সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, ওদের ফ্যামিলিতে নাকি কবে কোন্ এক পূর্বপুরুষের 'এপিলেপ্‌সি' (অনেকটা ফিটের মত ব্যারাম) ছিল। যাহোক স্যার দিগেন্দ্রকে পরীক্ষা করে দেখলাম, দেহ তার বেশ সুস্থ ও সবল এবং রোগের কোন লক্ষণমাত্রও নেই। তবে চোখের দৃষ্টি-শক্তি একটু কম ছিল। সম্ভবত অতিরিক্ত পড়াশুনার জন্যই সেটা হয়ে থাকবে। লোকটি উঁচু, লম্বা, বলিষ্ঠ গঠন। চোখের তারা দুটো অন্তর্ভেদী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ভদ্রলোক বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। কথায় কথায় একসময় স্যার দিগেন্দ্র বললেন, বিকালের দিকে সমুদ্রের ধারে একটিবার আসবেন ডাক্তার, আপনাকে আরও গোটাকতক কথা বলব।

জবাবে বললাম, বেশ তো। এবং কথামত বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে স্যার দিগেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হল। খানিকটা ঘুরে বেড়াবার পরই সন্ধ্যা হয়ে এল। সমুদ্রের ধারে একটু অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান দেখে নিয়ে বালুবেলার ওপরেই দুজনে পাশাপাশি বসলাম। নানা ধরনের গল্প করতে করতে সহসা একসময় স্যার দিগেন্দ্র আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, দেখুন ডাক্তার, দীপু যাই বলুক না কেন, আমার নিজের ব্যাপারটা আমি নিজেই আপনাকে বুঝিয়ে বলছি, শুনুন।

শান্ত গভীর কণ্ঠে স্যার দিগেন্দ্র বলতে লাগলেন, সত্যি বলতে কি, আমার মনে সত্যি সত্যি কোন abnormal idea বা instinct বা কোন কুৎসিত ভয়ঙ্কর গোপন ইচ্ছা লুকিয়ে আছে কিনা আমি নিজেই তা জানি না বা আজ পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও কোনদিন টেরও পাইনি। আর এও আমি মনে করি না, যদি বা অমন কুৎসিত ভয়ঙ্কর কোন গোপন ইচ্ছা আমার মনের কোথাও থাকেই, সেটা আমার পুরুষানুক্রমে পাওয়া। আমার নিজের যতদূর মনে হয়, ছেলেবেলা হতেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব বই পড়ে পড়ে ও-রকম একটা কুৎসিত ভয়ঙ্কর ইচ্ছা আমার মনে মাঝে মাঝে আমার চিন্তাশক্তির অজ্ঞাতে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মানুষকে যেমন ভূতে পায় এও অনেকটা তেমনি। এটা আমার অবচেতন মনের একটা ক্ষণিক পাগলামিও বলতে পারেন, কিংবা দুর্বলতাও বলতে পারেন।

একটু থেমে আবার স্যার দিগেন্দ্র বলতে শুরু করলেন, ডাক্তার, শিশু বয়স থেকেই আমি চিরদিন অনুভব করেছি, আমার মনের চিন্তাশক্তি যেন একটু বেশী প্রখর। সেটাকে অবিশ্যি সাধারণ অকালপক্কতাও বলতে পারেন। যে বয়সে যা ভাবা উচিত নয় চিরদিন আমি সেই সব ভেবেছি। অদ্ভুত ছিল আমার মনের ভাবনাগুলি। অন্য সকলের কাছে যেটা মনে হবে অসংবদ্ধ অসম্ভব এলোমেলো অর্থহীন, আমার কাছে সেগুলো ছিল একান্ত স্পষ্ট ও সত্য। যাহোক, কেন জানি না, ছোটবেলা হতেই মধ্যযুগের শক্তিমান ইংরাজ লেখকদের লেখা সব বই পড়তে আমার বড় ভাল লাগত। বিশেষ করে যেসব লেখকদের লেখা একটু বেশী রকম কল্পনাময়, সেইগুলিই আমি বেশী পড়তাম। যেমন ধরুন 'রডিলেয়ার' 'ডিকুইনসি' 'পোয়ে' ইত্যাদি। এদের বইগুলো পড়তে পড়তে আমার কি মনে হত জানেন? যেন একটা অদৃশ্য দুর্নিবার অদ্ভুত ইচ্ছা আমার সমগ্র চিন্তা ও মনের ভিতরকার ভাল-মন্দের বোধশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে, যেমন করে সাপুড়ের হস্তচালনায় সাপ হয়ে পড়ে মন্ত্রমুগ্ধ। বিশেষ করে, রাত্রের ঘন অন্ধকারে যেন একটা অদম্য রক্ত দেখবার লালসা ভূতের মতই আমায় তাড়া করে ফিরছে। সেই অদ্ভুত তাড়নায় কতদিন আমি পাগলের মতই হয়ে উঠেছি। রক্ত। রক্ত চাই। টাটকা, তাজা,' লাল টকটকে রক্ত, তা সে মানুষেরই হোক বা পশুপক্ষীরই হোক—রক্ত। রক্ত চাই। মনে হয়েছে রক্তের জন্য আমার সমগ্র দেহ ও মন যেন মরুভূমির মতই তৃষ্ণাকাতর হয়ে উঠেছে। আমি যেন কতকালের তৃষ্ণার্ত বুভুক্ষিত উপবাসী।

ডাঃ চট্টরাজ বলতে লাগলেন, আমরা সেই অন্ধকার সাগরকিনারে বালুবেলার ওপরে বসে, কেউ কোথাও নেই, শুধু মাথার ওপরে কালো আকাশপটে অগণিত

তারা ঝিটমিটি জ্বলছে আর নিভছে। অদূরে উচ্ছ্বসিত সাগর-তরঙ্গ সেই ম্লান নক্ষত্রালোকে যেন কোন এক ক্ষুধার্ত হিংস্র ভয়ঙ্কর পশুর ধারালো দাঁতের মত মনে হয়। একটা অশরীরী ভয়ে যেন সহসা বুকের মধ্যে শির শির করে ওঠে।

দুই হাতে হাঁটুটা জড়িয়ে স্যার দিগেন্দ্র বসে। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে তাঁকে যেন কেমন অশরীরী ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল। সহসা এক সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্যার দিগেন্দ্র কেমন যেন একপ্রকার কুৎসিত বীভৎস হাসি হাসলেন। অন্ধকারেও তাঁর চোখের তারা দুটো ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলছিল। ভদ্রলোকের গায়ের রং ছিল অস্বাভাবিক রকম ফরসা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

স্যার দিগেন্দ্র আবার বলতে লাগলেন, ডাক্তার, আপনার কাছে আমি গোপন করব না। খুন আমি অনেকগুলো করেছি, এবং প্রায় করি। রাত্রের নিঃশব্দ অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার শিক্ষা, সংযম, সভ্যতা, কৃষ্টি সব কিছু নিঃশেষে লোপ পায়। আমি যেন পাগল হয়েই রক্ত-তৃষ্ণায় ক্ষুধিত হায়েনার মত ছুটে বেড়াই। ডাক্তার, ডাক্তার, তুমি পালাও, পালাও, আমার কাছ থেকে শীঘ্র পালাও। Get away। Get away from me।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সহসা পাগলের মতই বুকপকেট থেকে একটা ধারালো কালো হাড়ের বাঁটওয়ালা ক্ষুর স্যার দিগেন্দ্র টেনে বের করলেন। অস্পষ্ট আলোয় ক্ষুরের ইস্পাতের ধারালো ফলাটা যেন মৃত্যু-ক্ষুধায় লক্‌লক্‌ করে উঠল। আমি বিদ্যুৎগতিতে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্দমনীয় অট্টহাসির বেগ সমুদ্রের একটানা গর্জনকে ছাপিয়ে হা হা করে সাগর-কূল সচকিত করে তুলল। উঃ, সে কী হাসি। যেন শরীরের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যাবে। সারারাত ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। ঐ দিনই গভীর রাত্রে আমার ঘরের দরজায় কার মৃদু করাঘাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন অতি মৃদু মিষ্টি কোমল স্বরে দরজার ওপাশ থেকে আমায় ডাকছে—দরজা খোল। দরজা খোল। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে মড়ার মত বিছানায় চোখ বুজে পড়ে রইলাম। ঘামে সর্বাঙ্গ আমার ভিজে যেতে লাগল। পরের দিন ভোরেই পুরী থেকে রওনা হয়ে এখানে ফিরে আসি। এরই দু-তিন দিন বাদে শুনলাম, স্যার দিগেন্দ্র ধারালো ক্ষুর দিয়ে নাকি নিজের ভাইপোকেই কাটতে উদ্যত হয়েছিলেন।

ডাঃ চট্টরাজ চুপ করলেন। বড্ড গরম বোধ হচ্ছিল, তাই সামনের পর্দাটা তুলে দিলাম।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, কুমার দীপেন্দ্র আমাদের দিকেই ধীর পায়ে এগিয়ে

আসছেন। চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন। যেন অনেকটা ঘুমক্লান্ত, তন্দ্রাতুর। মাথাটা নীচু করে তিনি এগিয়ে আসছেন।

আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন

ঘরের আলো তাঁর মুখের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র মুখখানি রক্তশূন্য ফ্যাকাশে, মনে হয় যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন কোন কারণে।

॥ তিন ॥

বরাবর আমাদের সামনে এসে কুমারসাহেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন অত্যন্ত ক্লান্তভাবে।

আমি, কিরীটী ও ডাঃ চট্টরাজ ওঁর মুখের দিকে নিঃশব্দে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ একসময় কঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কুমারসাহেব চাপা উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, মিঃ রায়, আপনাকে গতকাল ফোনে যা বলেছিলাম সেই রকম ব্যবস্থা করেছেন তো।

কিরীটী ম্লান একটু হেসে বললে, নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কুমারসাহেব। আপনি কি অসুস্থ? বলতে বলতে কিরীটী হাতীর দাঁতের সিগার-কেসটা পকেট থেকে বের করে নিজে একটা তুলে নিয়ে কুমারসাহেবের দিকে খোলা কেসটা এগিয়ে দিল, সিগার প্লিজ।

নো, থ্যাংকস্। বলে কুমারসাহেব নিজের জামার পকেট থেকে বহুমূল্য সুদৃশ্য সোনার ওপরে ডায়মণ্ডে নাম লেখা সিগারেট কেসটি বের করে তার থেকে একটি দামী সিগারেট তুলে ধরালেন।

টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলো কুমারসাহেবের মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। ডান হাতে সিগারেটটি ধরে বাঁ হাত দিয়ে কুমারসাহেব মাঝে মাঝে কপালটা বুলাতে লাগলেন।

সহসা কিরীটীই প্রথম প্রশ্ন করল, আপনার সেই নবনিযুক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ শুভঙ্কর মিত্র এখানেই আছেন, না?

কে, শুভঙ্কর? হ্যাঁ। মৃদুস্বরে কুমারসাহেব বলতে লাগলেন, বেচারী বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে। অবিশ্যি আমি তাকে দোষ দিই না। এক্ষেত্রে ওরকম না হওয়াটাই আশ্চর্য। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, আজ আবার স্বচক্ষে আমি এই বাড়িতেই কাকাবাবুকে স্পষ্ট দেখেছি। তিন-তিনখানা চিঠি তাঁর

কাছ থেকে আমি ডাকে পেয়েছি, আপনি তো সবই জানেন মিঃ রায়, আমাকে তিনি প্রত্যেক চিঠিতেই বারংবার সাবধান করে দিয়েছেন, আমার রক্ত তিনি দেখবেনই। এ নাকি তাঁর জীবন-পণ।

কিরীটী অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, ঠিক বোঝা গেল না। কাকে দেখেছেন?

অস্ফুট স্বরে কুমারসাহেব বললেন, যেন মনে হল দিগেন্দ্রনারায়ণ, স্যার দিগেন্দ্র-নারায়ণকে। ওই যে, আমার সেক্রেটারী মিঃ মিত্র আমার প্রাইভেট রুমে ঢুকছেন।

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ডান-দিককার দেওয়ালে যে ছোট দরজাটি ছিল, সেটার কপাট দুটো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। এবং যে ভদ্রলোক একটু আগে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল, তার শরীরের পিছন দিকের কালো রঙের কোটের খানিকটা অংশ দেখতে পেলাম। দরজার কপাট দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা।

সহসা আবার কুমারসাহেবের কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল, মিঃ রায়, আজ সন্ধ্যার দিকে স্বচক্ষে আমি কাকাকে দেখেছি।

আমি বা ডাঃ চট্টরাজ কোন কথা বললাম না। কিরীটী শুধু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, আপনি ঠিক জানেন কুমারসাহেব, দেখতে ভুল হয়নি তো?

আজ দুপুর থেকেই বাড়িতে আমার জন্মোৎসবের আয়োজন চলছিল। আমি আর আমার সেক্রেটারী মিঃ মিত্র বৈষয়িক কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। দুপুরের পর থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চারিদিক থমথম করছিল, মাঝে মাঝে কড়কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কাজ সারতে বোধ করি সন্ধ্যা সাতটা হবে তখন—আমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সব একে একে এখানে আসতে শুরু করেছেন, মিঃ মিত্রকে নীচে সকলের অভ্যর্থনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিজে পোশাক বদলাবার জন্য সাজ-ঘরে গিয়ে ঢুকেছি, বাইরে তখন ঘন অন্ধকার, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাজঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে একটা লাল ঘেরাটোপে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। মিঃ রায়, আমি যা বলছি তার একবর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়, পোশাক পরা হয়ে গেছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাইটা ঠিক করছি, এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল, কুমারসাহেব।

দরজা খুলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ মিত্র আর মিঃ কালিদাস শর্মা। মিঃ শর্মা এখানকার এক কলেজের প্রফেসার, কিছুদিন হল তাঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়েছে। মিঃ শর্মা মিঃ মিত্রের ছোটবেলার বিশেষ বন্ধু। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে

বলতে সহসা আমার মনে পড়ল বাথরুমে আমার মুখ ধোয়ার সময় হাতের অনামিকা থেকে হীরের আংটিটা খুলে সাবানের বাক্সের ধারে রেখেছিলাম, আসবার সময় নিয়ে আসতে ভুলে গেছি

কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে কুমারসাহেবের হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটা তিনি অ্যাসট্রেতে ফেলে দিলেন। পাশের হলঘর থেকে পিয়ানো সহযোগে সুমিষ্ট গানের লহরী ভেসে আসছিল।

কুমারসাহেব আবার বলতে শুরু করলেন, কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না মিঃ রায়, সে দৃশ্য কী ভয়ানক। ভাবতে গেলে এখনও আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো ঘরের কাচের জানলা দিয়ে হঠাৎ আলোর চমকানি লাগিয়ে যাচ্ছিল। মিঃ মিত্র ও মিঃ শর্মা দুজনে আমার সামনেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তাঁদের একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলাম।

বাথরুমের আলো নেভানো ছিল—অন্ধকার। দরজাটা যেমন আমি খুলেছি, সহসা অন্ধকার বাথরুমটা বাইরের বিদ্যুতের আলোকে ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, কড়কড় করে মেঘের গর্জন শোনা গেল, হঠাৎ চমকে উঠলাম। বিদ্যুতের আলোয় ঘরের জানলার দিকে চোখ পড়তেই আমি স্পষ্ট দেখলাম কাকা। হ্যাঁ, আমার কাকা স্যার দিগেন্দ্র জানালার কাচ দিয়ে রক্তচক্ষুতে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষছেন। আমি সভয়ে অস্ফুট চিৎকার করে চোখ বুজলাম।

কথা বলতে বলতে অধীর আগ্রহে কুমারসাহেব কিরীটীর হাত দুটো সজোরে চেপে ধরলেন, যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন। চোখেমুখে এ টা ব্যাকুল আতঙ্কের চিহ্ন পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। কপালে এই শীতের রাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে।

জানালার ধারে, কুমারসাহেব আবার বলতে লাগলেন, কাকা ছায়ার মত দাঁড়িয়েছিলেন মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে, একটা হাত ঝুলছে। তখনকার তাঁর সেই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা দানবীয় জিঘাংসা ফুটে বের হচ্ছিল।

ডাঃ চটরাজ আমাদের মুখের দিকে তাকালেন।

কুমারসাহেব নিঝুম হয়ে মাথা নীচু করে বসে আছেন।

সহসা যেন এক সময় কুমারসাহেব কেঁপে উঠলেন।

কিরীটী ধীর স্বরে প্রশ্ন করলে, তারপর ?

আমার অস্ফুট চিৎকার বোধ হয় পাশের ঘরে মিঃ মিত্র ও মিঃ শর্মার কানে গিয়েছিল, তাঁরা এক প্রকার ছুটেই বাথরুমে এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি

কুমারবাহাদুর ?

তাড়াতাড়ি তাঁরা সুইচ টিপে বাথরুমের আলোটা জ্বেলে দিলেন, আশ্চর্য, ঘরে কেউ নেই। একদম খালি, অথচ

বাথরুমের অন্য কোন দরজা ছিল কী ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

না। আমি যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সেটা ছাড়া বাথরুমে আর দ্বিতীয় দরজা নেই। যে জানালায় কাকাকে দেখেছিলাম, তারও সার্সি দুটো ঘরের ভিতর থেকে আটকানো ছিল।

ডাঃ চট্টরাজ বললেন, আপনার অবচেতন মনে আপনার কাকা সম্পর্কে যে অতীত দিনের আতঙ্ক সেটাই আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল কুমারসাহেব এবং সেই চিন্তা থেকেই আপনার এ বিভীষিকার সৃষ্টি। এটা আপনার স্বগত কৃত্রিম নিদ্রাচ্ছন্নতা বা ইংরাজীতে যাকে বলে 'self hypnosis'—আপনার স্নানঘরের মধ্যস্থিত আলো ও আপনার সংমিশ্রিত প্রভাবেই ওটা সৃষ্টি হয়েছিল।

ডাক্তারের কথা শেষ হতে না হতেই কুমারসাহেব বলে উঠলেন, ডাক্তার, আপনাকে আমি আগেই বলেছি, আমি যা দেখেছি বা শুনেছি সেটা আমার ভ্রান্ত ধারণা বা মতিভ্রম, যাকে আপনারা ইংরাজীতে hallucination বলেন, সে রকম কোন কিছুই নয়, আমি কাকাকে স্পষ্ট দেখেছি। সত্যিই তাঁকে আমি দেখেছি কিন্তু তারপর তিনি আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, অদৃশ্য হয়ে যান। আমার সেক্রেটারী ও মিঃ শর্মা চারিদিকে আশেপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অবিশ্যি তাঁদের আমি তখন বলেছিলাম, ব্যাপারটা আগাগোড়াই হয়তো আমার চোখের ভুলও হতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে তাদের আমি, বিশেষ করে আজকের উৎসবের দিনে, চিন্তিত করতে চাইনি। কিন্তু আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি মিঃ রায়, আমার ভুল হয়নি। আমি তাঁকে দেখেছি, সুস্পষ্ট ভাবেই প্রত্যক্ষ দেখেছি।

কিরীটী বললে, ভাল কথা, আচ্ছা ডাঃ চট্টরাজ, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের মনোবিজ্ঞানে এ ধরনের ব্যাপারকে কি বলে ?

ডাঃ চট্টরাজ প্রবলভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, কুমারসাহেব হয় আমাদের আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছেন, না হয় তামাসা করছেন নিছক আনন্দ দেবার জন্য। কিন্তু সে যাই হোক, এ ধরনের তামাসা না, উনি একেবারে অসম্ভব কথা বলছেন।

ঘরের আলোয় কুমারসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ভীত হয়ে পড়েছেন।

ধীরে ধীরে এক সময় কুমারসাহেব বললেন, দেখুন ডাঃ চট্টরাজ, বিশেষ করে এ ব্যাপারে আপনাদের চাইতেও আমি বেশী বুঝি। একদিন আমি আমার কাকাকে কতখানি শ্রদ্ধা করতাম ও ভালবাসতাম সে কথা কারও অজানা নেই, কাকার এই দুর্ঘটনার জন্য হয়তো জগতে আমার চাইতে আর কেউ বেশী দুঃখ পায়নি, শিশু বয়সে মা-বাবাকে হারাই, তারপর বারো বছর পর্যন্ত ঐ কাকার কাছেই আমি একাধারে মা ও বাবার স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে এসেছি। কাকা যে আমার কতখানি ছিলেন তা বুঝিয়ে আপনাদের বলতে পারব না। কিন্তু এখন তাঁকেই আমি পৃথিবীতে সব চাইতে বেশী ভয় ও ঘৃণা করি। আমার সুখ শান্তি সব গেছে। রাতের পর রাত আমি নিদ্রাহীন চক্ষে নিদারুণ ভয়ে বিছানার ওপরেই বসে কাটিয়েছি।

এমন সময় সুশ্রী দোহারা পাতলা চেহারার ডিপ ব্লু রঙের স্যুট পরা একজন ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে যেন কুমারসাহেব আপনাকে সামলে নিলেন এবং ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে সহাস্য মুখে বললেন, আসুন মিঃ শর্মা, এঁদের সঙ্গে বোধ হয় আপনার পরিচয় নেই, ইনি মিঃ কালিদাস শর্মা,—সিটি কলেজের প্রফেসার। আর ইনি মিঃ কিরীটী রায়—বিখ্যাত রহস্যভেদী, ইনি মিলিওনিয়ার মিঃ সুব্রত রায়—ওর বিশেষ বন্ধু আর ইনি ডাঃ চট্টরাজ, বিখ্যাত নিউরলজিস্ট (মনোবিজ্ঞান বিশারদ)।

আমরা প্রত্যেককে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার করলাম।

এতক্ষণ বরাবরই আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছিলাম, ওদিককার যে দরজা দিয়ে অল্প আগে মিঃ মিত্র গিয়ে ঢুকেছেন কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে, সেইদিকেই কিরীটী যেন সর্বক্ষণ তাকিয়েছিল এবং সেদিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই একসময় মৃদুকণ্ঠে বলল, আচ্ছা কুমারসাহেব, আপনি স্যার দিগেন্দ্রকে ঠিক চিনলেন কি করে? এক বছরে কি তাঁর দেহের কোন পরিবর্তনই হয়নি?

কি জানি তা বলতে পারি না ঠিক। কুমারসাহেব বললেন, ক্ষণিক আলোয় তাঁকে দেখেছি, তবে

আঃ, থামুন কুমারসাহেব। মিঃ শর্মা বাধা দিলেন, ঐ সব আজগুবী ব্যাপার নিয়ে এখনও আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন? আশ্চর্য, আপনার মত একজন শিক্ষিত আধুনিকের পক্ষে উঠুন, মিঃ মিত্র কফির অর্ডার দিয়ে অনেকক্ষণ হল আপনার প্রাইভেট-রুমে গিয়ে হয়তো অপেক্ষা করছেন একটু আগেই তিনি আপনার খোঁজে এদিকেই আসছিলেন। কি একখানা আপনার বিশেষ জরুরী চিঠি এসেছে, আপনাকে সেখানা এখুনি নাকি দেখানো দরকার। একজন বেয়ারাকে আমার সামনেই বলে গেলেন আপনাকে সেখানে

পাঠিয়ে দেবার জন্ত। বেয়ারা কি আপনাকে কোন খবর দেয়নি ?

কই, না। কুমারসাহেব ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন, আশ্চর্য, আমি নিজেই যে তাঁকে অনেকক্ষণ আগে আমার প্রাইভেট রুমে ঢুকতে দেখলাম। ভাবলাম হয়তো কোন বিশেষ জরুরী কাজে ওঘরে গেছেন তিনি। ক্ষমা করবেন, আমি এখুনি আসছি। বলতে বলতে কুমারসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

অ্যাসট্রেতে কুমারসাহেবের অর্ধদগ্ধ যে সিগারেটটি পড়েছিল, দেখলাম কিরীটী সেটি নিঃশব্দে হাত দিয়ে তুলে পকেটের মধ্যে রেখে দিল। কিরীটীর ব্যাপারটা ভাবছি, এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, খুন। খুন।

চমকে আমরা সকলে একসঙ্গে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। কুমারসাহেব তখনও ঘরের অর্ধেকটা গেছেন কিনা সন্দেহ, অদূরে দাঁড়িয়ে মিঃ শর্মা, একজন সাদা উর্দিপরা বেয়ারা, হাতে কফির ট্রে—সে-ই কুমারসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে।

ঘরের সকলে যেন সহসা সামনে ভূত দেখে চমকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

সকলের চোখেই উৎসুক ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি।

কিরীটী ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধানী হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে বেয়ারা ও কুমারসাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

শুনুন, আপনারা এখন গোলমাল করবেন না। এটা উৎসব-বাড়ি। আসুন কুমারসাহেব, আমার সঙ্গে আপনার প্রাইভেট ঘরে চলুন। এই বেয়ারা, তুমভি আও। এস সুব্রত, তুমিও এস। আর ডাঃ চট্টরাজ, আপনি ততক্ষণ লালবাজারে একটা আর বেহালা থানাতে একটা করে ফোন করে দিন।

আমরা তিনজনে দরজা ঠেলে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বেশ প্রশস্ত চতুষ্কোণ একটি ঘর। ঘরে ঢুকে আড়াআড়ি ভাবে চাইলেই দেখা যায়, ঘরের চারপাশে গদি-মোড়া সব চেয়ার পাতা। সিলিংয়ের বাতিটা নেভানো। অদূরে একটি ছোট টেবিলের ওপরে রক্ষিত লাল রংয়ের টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় ঘরখানি আলোকিত। টেবিলটার ঠিক পাশেই একটা বড় সোফা। ঘরের দেওয়ালে ফিকে গোলাপী রং দেওয়া, এবং দেওয়ালের গায়ে এঁদের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সব অতীত যুগের ঢাল তলোয়ার ঝুলছে। ঘরের লাল আলো সেগুলোর ওপর প্রতিফলিত হয়ে যেন কেমন এক বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে উঠেছে। ঘরের মেঝেয় দামী পুরু লাল রংয়ের কার্পেট বিছানো। হঠাৎ টেবিলের ওপরে যে ল্যাম্পটি বসানো ছিল তার আলোয়

সামনে নজর পড়তেই বিস্ময়ে আতঙ্কে যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

একজন কালো স্যুট পরা লোক উপুড় হয়ে কার্পেটের ওপর টেবিলের ঠিক সামনে পড়ে আছেন। তাঁর হাতের আঙুলগুলো যেন ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, মনে হয় যেন হাতের পাতায় দেহের ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন। হাঁটু মোড়া অবস্থায় তিনি পড়ে আছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের দেহের সঙ্গে মাথাটি নেই। রক্তাক্ত গর্দানটা শুধু ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় উঁচু হয়ে আছে। মাথাটা ঘরের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে কাটা গলার ওপরেই। কে যেন মাথাটাকে দেহ থেকে কেটে বসিয়ে রেখে গেছে মেঝের কার্পেটের ওপর। চোখের মণি দুটো সাদা, মুখটা হাঁ করা। সহসা পাশের খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকল। আমরা কেঁপে উঠলাম।

॥ চার ॥

কিরীটী কুমারসাহেবের রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে বললে, এ সময় আপনি নিজে এত নার্ভাস হয়ে পড়লে তো চলবে না কুমারসাহেব, বুকে সাহস আনুন।

আর সাহস। কুমারসাহেব ক্লান্ত অবসন্ন স্বরে বললেন, আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, মিঃ রায়। এ কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো। উৎসব বাড়ি—

কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সুব্রত, তুমি বাইরে গিয়ে ডাঃ চট্টরাজকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ি থেকে বাইরে যাবার সমস্ত দরজা এখুনি বন্ধ করে দাও। ওপরের কিংবা নীচের হলঘরের কেউ যেন এ ব্যাপারের একটুকুও না টের পায়। তারা যেমন গান-বাজনা স্ফূর্তি করছে তাই করুক।

আমি তখনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফিরে আসছি, হলঘরে কুমারসাহেবের ম্যানেজার পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন। ম্যানেজারবাবু ঘরে ঢুকে প্রথমেই বেয়ারাটাকে ভাঙা কাচের টুকরোগুলো নিয়ে যেতে বললেন। এ ঘর থেকে ভয় পেয়ে ছুটে বাইরে যাবার সময় চাকরটার হাত থেকে পড়ে ভেঙে ছড়িয়েছিল। চাকরটা আদেশ পালন করে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানা থেকে পুলিসের লোক এসে উপস্থিত হল। কিরীটী সংবাদ পেয়ে বাইরে গিয়ে তাঁদের যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে

আবার ঘরে ফিরে এল। তারপর আবার চুপচাপ সকলে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

কিরীটী এতক্ষণ পরে একটু একটু করে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাটা মুণ্ডুটার দিকে চেয়ে বুকটার মধ্যে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম। দেহের গর্দানের ঠিক কাছেই, মৃতদেহের বাঁ-হাতে একটা তীক্ষ্ণ তরবারি ধরা আছে। তলোয়ারটা দেখতে অনেকটা দেওয়ালে টাঙানো তরবারিগুলোর মতই। মনে হয় যেন দেওয়াল থেকেই একটা নেওয়া হয়েছে, কেননা দেওয়ালের গায়ে এক-একটা ঢালের দুদিকে আড়াআড়ি ভাবে দুটি করে তলোয়ার টাঙানো আছে। দেখলাম কেবল ঠিক টেবিলের সামনে উপরিভাগের দেওয়ালে ঢালের সঙ্গে মাত্র একটি তলোয়ার দেখা যাচ্ছে। মৃতদেহের হাতে ধরা তরবারিটাতে রক্ত মাখা।

উঃ, ভদ্রলোককে কসাইয়ের মত জবাই করা হয়েছে। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, একেবারে পাশবিক হত্যা। দেখ দেখ সু, তরবারিটায় বোধ হয় খুব শীঘ্রই শান দেওয়া হয়েছিল। বলতে বলতে কিরীটী ঘরের একটিমাত্র জানালার দিকে এগিয়ে জানালাটিকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বাইরের দিকে ঝুঁকে দেখেশুনে বললে, প্রায় চল্লিশ ফিট নীচে ট্রাম রাস্তা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে কারও লাফিয়ে নীচে যাওয়া বা প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিরীটী কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করতে লাগল, তারপর সহসা এক সময় কার্পেটের রক্ত এড়িয়ে মৃতদেহের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে ঝুঁকে কি যেন পরীক্ষা করতে লাগল। এমন সময় ওপাশের দরজাটা খুলে গেল। একটা লোকের মাথা দেখা গেল।

ম্যানেজারবাবু যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিরীটী বাধা দিল, ও আমার লোক —হরিচরণ। কী খবর হরিচরণ? ঐ পথ দিয়ে কেউ বেরিয়েছে?

আজ্ঞে না।

বেশ। নজর রাখ।

মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঐ দরজা দিয়ে এ-ঘর থেকে হলঘরে যাওয়া যায়, না ম্যানেজারবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ম্যানেজারবাবু মৃদুস্বরে জবাব দিলেন। জানালায় একটা লাল রংয়ের সিল্কের পর্দা টাঙানো ছিল, হাওয়ায় সেটা পতপত করে শব্দ করছিল।

আসুন ডাক্তার, মাথাটা একটু পরীক্ষা করা যাক। বলতে বলতে কিরীটী চুলের গোছা ধরে কাটা মুণ্ডুটা তুলে ধরল। তারপরে দুজনে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা পরীক্ষা করল। এটা এখানেই থাক। বলে আবার মুণ্ডুটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখল।

কুমারসাহেব একপাশে ভূতের মত নির্বাক নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিরীটী

তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, দেখুন তো কুমারসাহেব, ঐ তরবারিখানা এই ঘরেরই একখানা কিনা ?

কুমারসাহেব মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মজার ব্যাপার, কিরীটী বলতে লাগল, এইরকম ধারালো চকচকে তলোয়ারগুলো দিয়ে ঘর সাজিয়ে রেখেছেন—এইভাবে খুনের সাহায্য করতেই নাকি কুমারসাহেব ?

জবাবটা দিলেন ম্যানেজারবাবু, আজ্ঞে, উনি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। পিতামহ ও প্রপিতামহের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিটা উনি এমনি ভাবে সাজিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

চমৎকার যুক্তি, একেবারে অকাট্য। মৃদুস্বরে কিরীটী শুধু বললে, কিন্তু সে যাক গে, এই হতভাগ্য মৃত ব্যক্তিকে চেনেন আপনি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইনি আমাদের কুমারসাহেবের নবনিযুক্ত সেক্রেটারী মিঃ শুভঙ্কর মিত্র। ম্যানেজারবাবু জবাব দিলেন।

আজ রাত্রে আপনি এঁকে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন ?

আজ্ঞে না, সন্ধ্যার পরে ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল, তারপর আর হয়নি।

কোথায় দেখা হয়েছিল ?

আজ্ঞে, আমি তখন নীচে সিঁড়ির ওদিকে হলঘরে যাচ্ছিলাম, দেখলাম উনি সিঁড়ির কাছাকাছি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওঁর সঙ্গে আর কে কে ছিল ?

প্রফেসার কালিদাস শর্মা আর দীনতারণবাবু। দীনতারণবাবু তার একটু পরেই চলে যান।

বেশ, এবারে আপনি দয়া করে বাইরে গিয়ে প্রফেসার কালিদাস শর্মাকে একটু ডেকে আনুন। তিনি কিছু জানেন না, কোন কথা তাঁকে বলবেন না, শুধু বলবেন কুমারসাহেব একটিবার তাঁকে ডাকছেন।

ম্যানেজার ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

তারপর ডাক্তার, আপনার এ ব্যাপারটাকে কী মনে হয় ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

ডাঃ চট্টরাজ বললেন, দেখ রায়, এ ধরনের হত্যা করাটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, হত্যাকারীর খুন করবার ইচ্ছা ছিল এবং ধারালো অস্ত্র হাতের কাছে পেয়ে সেই ইচ্ছাই এই ভয়ঙ্কর হত্যায় পরিণত হয়েছে। কে বলতে পারে, হয়তো খুনীর মনে রক্ত দেখবার পিপাসা জেগেছিল ! তারপরই এই খুন।

দয়া করে একটু ভেবে দেখুন ডাক্তার, যতদূর সব দেখেশুনে মনে হয়, এক্ষেত্রে

খুনটা হঠাৎ একটা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে হয়নি। খুব সাবধানের সঙ্গে এবং আগে থেকে ভেবেচিন্তেই এই খুন করা হয়েছে। চেয়ে দেখুন, মৃতদেহের positionটা দেখেও কি আপনার মনে কোন কিছুই আসছে না ?

মৃতদেহ দেখে এইটুকু কেবল বোঝা যায়, খুনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের কোন রকম হাতাহাতি বা ঝটাপটি হয়নি।

নিশ্চয়ই না, মৃতদেহের position থেকে স্পষ্টই মনে হয় পিছন থেকে আচম্কা কেউ ওঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে, যে সময় হয়তো বেচারী কোন কারণে টেবিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু করতে যাচ্ছিল। তাছাড়া এক্ষেত্রে আর একটা জিনিস বিশেষ করে লক্ষ্য করবার আছে। টেবিলের ঠিক ওপরে দেওয়ালে ঝুলানো যে ঢাল তলোয়ার আছে, মেঝে থেকে ওর উচ্চতা প্রায় আট-ন ফিট হবে এবং একথা যদি ধরে নেওয়াই হয় মৃতদেহের হাতে ধরা ঐ ধারালো তলোয়ারটা সামনের ঐ দেওয়ালে টাঙানো ঢালের অন্য পাশ থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাহলে হত্যাকারীকে নিশ্চয়ই টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল দেওয়ালে টাঙানো তলোয়ারটা নামাতে, কেননা অতখানি লম্বা কোন মানুষ হতে পারে না। শুধু তলোয়ারটা নামানোই নয়, সেই তলোয়ার দিয়ে মিঃ মিত্রকে খুন করতে হলে মিঃ মিত্রকে নিশ্চয়ই সুবোধ শিশুটির মত গলাটা বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। আর তা যদি না হয়ে থাকে, অর্থাৎ মিঃ মিত্রের অজ্ঞাতেই যদি তাঁকে খুন করা হয়ে থাকে, তবে বলতে হয় মি মিত্র অন্ধ ও কালা, চোখেও তিনি কোন কিছু দেখতে পানর্নি, কানেও কোন শব্দ শুনতে পাননি। কিন্তু কুমারসাহেবের মত একজন ধনী গণ্যমান্য লোকের প্রাইভেট সেক্রটারী যে কালা ও কানা ছিলেন এ কথাই বা কি করে বলা যায় কী করে ? বলতে বলতে কিরীটী সহসা কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কী কুমারসাহেব, আপনিই বলুন না, আপনার সেক্রেটারী কি সত্যিসত্যিই অন্ধ আর কালা ছিলেন নাকি ?

না। মৃদুস্বরে কুমারসাহেব জবাব দিলেন।

যাই হোক, বেচারীর যে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে, এ একেবারে অবধারিত। ডাঃ চট্টরাজ বললেন।

আরো দেখুন, কিরীটী ডা. চট্টরাজকে আহ্বান করলেন, এই টেবিলের পাশের সোফাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখুন। সোফার ওপরে এই বড় বড় বালিশগুলো দেখেছেন ? এগুলো তুলে ধরছি দেখুন—এগুলোর গায়ে এখনো একটা লম্বালম্বি সরু চাপের দাগ রয়েছে। একটু ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে

এর তলাতেই তলোয়ারটা লুকানো ছিল। খুনী আগে থেকেই সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রেখেছিল এবং মনে হয় মিঃ মিত্র এ ঘরে ঢুকবার আগেই খুনী এখানে এসে অপেক্ষা করছিল। মনে হয় সে জানত মিঃ মিত্র নিশ্চয়ই এ-ঘরে আসবেন। আর এমন লোক খুন করেছে যে মিঃ মিত্রের বেশ পরিচিত। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আপনার সন্দেহ অমূলক, স্যার দিগেন্দ্র মিঃ মিত্রের একেবারেই অপরিচিত, তা ছাড়া যে খুনী, তার এ-বাড়িতে এবং কুমারসাহেবের এই প্রাইভেট রুমে বিশেষ রকম যাতায়াত আছে এবং সে এ ঘরে এলে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না—এক কথায় খুনী কোন অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি নয়। জানাশোনা বা পরিচিতের মধ্যেই কেউ, যার পক্ষে অনায়াসেই, মিঃ মিত্র যখন কোন কারণে দেয়ালের এদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, সেই অবসরে বালিশের তলা থেকে লুকানো তলোয়ারটা টেনে বার করে মিঃ মিত্রের গলাটা এক কোপে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলতে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু বন্ধু, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, ডাক্তার বললেন, মৃতদেহের position দেখে মনে হয় না কি যে মিঃ মিত্র যেন কোপটা ঘাড়ে নেবার জন্যে ঝুঁকে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন?

হ্যাঁ, সেই তো হচ্ছে কথা, কিরীটী বলতে লাগল, এর ঐ পয়েন্ট থেকেই ধরতে হবে খুনীকে। খুনী এখনও এই বাড়িতেই আছে। সে এখনো পর্যন্ত এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি, যদি অন্ততঃ আমার সহকারীরা সজাগ থেকে থাকে।

হলঘরে যাবার ঐ দরজাটা খুলে যদি কেউ এ-ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে ইতি-মধ্যেই? আমি প্রশ্ন করলাম।

অসম্ভব। হরিচরণ সাড়ে নটা থেকেই হলঘরে আছে, যদি কেউ গিয়ে থাকতই তার দৃষ্টিকে কোনমতেই ফাঁকি দিতে পারত না। ক'টার সময় আন্দাজ মিঃ মিত্র এই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন?

এবারে জবাব দিলাম আমিই, হ্যাঁ, আমার মনে আছে, রাত্রি তখন ঠিক সাড়ে নটা হবে, কেননা তখন আমি আমার হাতঘড়িটার সময় দেখেছিলাম। কিরীটী এবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল, ঠিক রাত্রি দশটা এখন। ঠিক যে সময় খুন হয়েছিল, অপরাধী সেই সময়টা যে অন্য জায়গায় উপস্থিত ছিল, এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্য যদি সব কিছু আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে থেকে থাকে, তা হলেও সে এই ফাঁকি দিতে পারত না। কিরীটী একটা সিগার বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিম্নস্বরে বলতে লাগল, আশ্চর্য, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। যতটুকু বুঝতে পারছি, কোন স্থিরমস্তিষ্ক বুদ্ধিমান

ব্যক্তিই এই কাজ করেছে, কিন্তু মাথাটা দেহ থেকে পৃথক হয়ে মেঝের ঠিক মধ্যিখানেই বা এল কি করে? আর ঐভাবেই বা ঠিক ঘাড়ের ওপর বসে ছিল কি করে?

বাইরের হলঘর থেকে একটা মৃদু গানের সুরের রেশ তখনও ভেসে আসছিল। কিরীটী কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ও-ঘরে যান কুমারসাহেব, অতিথিরা বেশীক্ষণ আপনাকে না দেখলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে।

আর গোলমাল! দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমারসাহেব বললেন, আমার মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত সব গেল মিঃ রায়, উঃ, কী দুর্দৈব। ভগবান, এ কি করলে প্রভু।

এমন অধীর হলে তো চলবে না কুমারসাহেব। ডাঃ চট্টরাজ বললেন।

উঃ, কাল সকালে আমি মুখ দেখাব কী করে? কী লজ্জা। চাপা স্বরে বলতে বলতে কুমারসাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

কুমারসাহেবের গমনপথের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে, আহা বেচারী, বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

সত্যি, মাথাটা কী ভাবে মেঝের মাঝখানে এল বল তো রায়? ডাক্তার বলতে লাগলেন, গড়িয়ে এসে তো আর ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

অনেক সময় অবিশ্যি এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে। কিরীটী জবাব দিল, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখুন ডাক্তার, মাথাটা যদি গড়িয়েই এই জায়গায় আসত, তাহলে দেহ থেকে মাথাটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই পর্যন্ত একটা রক্তের ধারা থাকত। তা নেই। তাতেই এক্ষেত্রে স্পষ্ট মনে হয়, খুনী নিজেই দেহ থেকে মাথাটা কেটে ফেলবার পর মাথাটা ঐখানে বসিয়ে রেখে গেছে। আমার মনে হয় কি জানেন ডাক্তার?

একটা দানবীয় উল্লাসে এবং নিজের শক্তির ওপর একটা স্থির বিশ্বাসে খুনী মাথাটা এখানে রেখে গেছে—এই কথা বলতে চাও তো? জবাব দিলেন ডাক্তার।

সহসা নীচু হয়ে কিরীটী মৃত মিঃ মিত্রের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পকেটগুলো পরীক্ষা করতে করতে একটা পকেট থেকে কতকগুলো কাগজপত্র টেনে বের করল এবং সেগুলো টেবিলের ওপরে রাখবার সময় তার মুখে মৃদু একটুকরো হাসি জেগে উঠল। চেয়ে দেখলাম কাগজপত্রের মধ্যে আছে অনেকগুলো খবরের কাগজের কাটিং, ফটোগ্রাফ, গোটা দুই হলুদ রংয়ের, ভাঁজকরা পুরু অনেকটা তুলোট কাগজের মত কাগজ,

একটা টর্চ, একটা পেনসিল ও ব্যাঙ্ক নোট এবং কিছু খুচরো টাকা পয়সা। ফটোগুলো দেখতে দেখতে কিরীটী সহাস্যমুখে জবাব দিল, ফটোগুলো দেখছি ভদ্রলোকের নিজেরই। নানা কায়দায় নানা পোজে তোলা ফটো। কিন্তু এত ফটোই বা পকেটে কেন? আর আজকের রাত্রের এই উৎসবের পোশাকের পকেটেই বা এগুলো রাখার তাৎপর্য কী?

এতে তো আশ্চর্য হবার কিছুই নেই রায়। ডাক্তার বললেন, যারা নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন বা এক কথায় সোজা ভাবে বলতে পার দাম্ভিক, তাদের পক্ষে নিজেদের ড্রাম পিটবার—নিজেকে প্রচার করবার এও একটা কাঠি বৈকি।

না বন্ধু না, ব্যাপারটা অত সামান্য নয়। এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। লক্ষ্য করেছেন, এর মধ্যে কিছু হারিয়েছে কিনা? কিরীটী ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

তার মানে? এ তোমার কোন্ দেশী প্রশ্ন কিরীটী? আমি কি আগে থেকে জানতাম নাকি মিঃ মিত্রের পকেটে কি আছে না আছে? আশ্চর্য! রাগতভাবে ডাক্তার জবাব দিলেন।

হ্যাঁ দেখুন, আমরা জানি ভদ্রলোক এখন পর্যন্ত অবিবাহিত এবং এঁর নিজের ঘর-বাড়িও আছে। সেখানে নিশ্চয়ই চাকরবাকরও আছে—এখানে তো আর উনি দিবা-রাত্রই উপস্থিত থাকেন না। এ কথাও হয়তো বললে নেহাৎ ভুল হবে না যে, ঘরের যাবতীয় চাবিই চাকরবাকরের হাতে দিয়ে তিনি আসেন না। অন্ততঃ দু-চারটে প্রাইভেট ঘরের চাবিও ওঁর পকেটে থাকা উচিত, যা হয়তো চাকরবাকরের হাতে বিশ্বাস করে রেখে আসা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মিঃ মিত্রের পকেটে সে ধরনের কোন চাবিই পাওয়া যাচ্ছে না। এঁর পকেট থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা বলতে আমি ঐ চাবির কথাই বলতে চাইছিলাম ডাক্তার।

তারপর সহসা কিরীটী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে, সুব্রত, অনুসন্ধানের ব্যাপারটা একটু চোখ মেলে সম্পন্ন করলেই অনেক কিছু গোলমাল চোখে পড়ে। একটা অনুসন্ধানের কাজে হাত দিলে সর্বদা চিন্তা করবে, কি থাকা উচিত ছিল, অথচ তা নেই বা পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমার চাবির কথাটাই মনে হচ্ছে, সেটাই যেন চুরি গেছে। চাবি চুরি যাওয়াটা খুবই আশ্চর্যজনক। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্যজনক অথচ সহজ একটা জিনিস হারিয়েছে বা পাওয়া যাচ্ছে না, এখুনি তোমাদের সেটা দেখাব। অথচ তোমরা দুজনেই অর্থাৎ ডাঃ চট্টরাজ ও তুমি অসাবধানতাবশতঃ লক্ষ্য করোনি, যা প্রত্যেক মানুষেরই পক্ষে, যাদের সামান্য একটু

বুদ্ধি আছে এবং যারা সেটা খাটাবার চেষ্টা করবে, এ ঘরে ঢোকামাত্রই লক্ষ্য করা উচিত ছিল, এমন একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না।

হত্যাকারীর সম্পর্কে কোন সূত্র কি? আমি প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, হত্যাকারী নিজে।

এমন সময় ক্যাঁচ করে দরজা খোলার একটা মৃদু শব্দে আমরা সকলে চমকে চোখ তুলে তাকালাম। এ ঘরের সঙ্গে হলঘরের যোগাযোগ করে যে দরজাটি, তার ফাঁক দিয়ে সাধারণ পোশাক পরা একজন লোকের মুখ ও দেহের অর্ধেকটা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে এবং তাকে একপ্রকার এক পাশে ঠেলেই একটি যুবক ঘরে এসে প্রবেশ করল।

চোখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দেখলেই মনে হয় যুবক ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েছে। যুবক ঘরে ঢুকেই থপ করে একটা গদিআঁটা চেয়ারে বসে পড়ল, এসব ব্যাপার কী? বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরুতে যাচ্ছি, গেটম্যান বললে, যেতে দেওয়া হবে না, পুলিসের অর্ডার। কুমারসাহেবের দেখা পেলাম না। তাঁর সেক্রেটারী মিঃ মিত্রই বা কোথায়?

সাধারণ পোশাক পরা যে লোকটি আমাদের সঙ্গেই গাড়িতে এসেছিল, সে যুবকের পিছু পিছু এই ঘরে এসে ঢুকল।

ইনি কে জান কালী? কিরীটী লোকটিকে প্রশ্ন করল।

না মিঃ রায়, তবে এঁকে মিঃ মিত্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম। তখনই শুনেছিলাম এঁর নাম নাকি বিকাশ মল্লিক। এমন সময় আবার দরজার বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। পরক্ষণেই প্রফেসার কালিদাস শর্মা ঘরে প্রবেশ করলেন।

সহসা একটা অস্ফুট ভয়চকিত শব্দ প্রফেসারের কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এল, উঃ কী ভয়ানক। এ কি? সমস্ত মুখ তাঁর ভয়ে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা ভারী বস্তুর পতনশব্দে সকলে সচকিত হয়ে উঠে দেখি—বিকাশ মল্লিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।

এই অপদার্থটাকে বাইরে রেখে এস। প্রফেসার শর্মা কালীকে আদেশ দিলেন।

কিরীটী আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি ও ডাক্তার দুজনে জ্ঞানহীন বিকাশ মল্লিকের অসাড় দেহটা ধরাধরি করে কোনমতে পাশের ঘরে নিয়ে এলাম।

এ ঘরের মধ্যেও মৃত্যুর মতই স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

একটা সামান্য ছুঁচ পড়লেও বোধ হয় শব্দ শোনা যায়। কিছুক্ষণ চোখেমুখে জল

দিয়ে হাওয়া করতে করতে একসময় ধীরে ধীরে বিকাশ মল্লিক উঠে সোফার ওপরে হেলান দিয়ে বসল এবং ক্লান্তিভরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিল।

ডাক্তার বললেন, এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি?

হ্যাঁ। মৃদু ক্লান্তস্বরে বিকাশবাবু জবাব দিলেন।

মিঃ শুভঙ্কর মিত্র বুঝি আপনার অনেক দিনের পরিচিত? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

না, খুব বেশী দিনের নয়, মাত্র কয়েক সপ্তাহ হবে। বিকাশ বলতে লাগল, ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অল্পদিনেই জমে ওঠে। মিঃ মিত্র একজন নামকরা স্পোর্টসম্যান ও শিকারী ছিলেন। প্রায়ই আমাদের দেশের বাড়ি ডায়মণ্ডহারবারে কি একটা কাজে যেতেন, সেখানেই প্রথম আলাপ হয়। তাছাড়া অনেকদিন থেকেই হিন্দীটাকে ভাল করে শিখবার আমার ইচ্ছা। শুভঙ্করবাবু চমৎকার হিন্দী বলতে ও লিখতে জানতেন। আমি ওঁর কাছেই একটু একটু করে হিন্দী শিখছিলাম। তারপর উনিই আমাকে একদিন এখানে এনে কুমারসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং কুমারসাহেবের দয়াতেই একটা অফিসে আজ দিন দশ হল একটা কাজ যোগাড় করেছি। তিনিই আজকের এই উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করে আনেন।

কিন্তু একটা সংবাদ বোধ হয় এখনও আপনি পাননি বিকাশবাবু। আমি বললাম।

কি? বিকাশ প্রশ্ন করলেন।

আপনার বন্ধু অর্থাৎ মিঃ শুভঙ্কর মিত্র খুন হয়েছেন।

সহসা যেন কথাটা শুনে বিকাশ মল্লিক আঁতকে উঠলেন, হ্যাঁ। তবে কি—তবে কি যে মৃতদেহ দেখে এলাম একটু আগে

হ্যাঁ, তারই মৃতদেহ।

এমন সময় কিরীটী ও প্রফেসার শর্মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

আপনি তাহলে এখন যেতে পারেন বিকাশবাবু, আমার লোকের কাছে আপনার ঠিকানাটা শুধু দয়া করে রেখে যাবেন।

বিকাশ মল্লিক কিরীটীর কথা শুনে একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সে ঘরে তখন আর কোন লোকজনই ছিল না, সেকথা আগেই বলেছি।

মাথার ওপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরখানি উদ্ভাসিত। একটু আগেও যে-ঘরটা কলহাস্যে মুখরিত ছিল, এখন সেটা শূন্য খাঁ-খাঁ করছে।

কিরীটী প্রফেসার শর্মাকে একটা চেয়ারে উপবেশন করতে বলে নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের আপনিই সব চাইতে বড় বন্ধু ছিলেন শুনেছি। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার কাছে যতটা সাহায্য পাব, আর কারও কাছ থেকেই তা পাব না। অবিশ্যি এত রাত্রে আপনাকে বেশী বিরক্ত করব না। সামান্য দু-চারটে কথা—বুঝতেই পারছেন, বিশেষ প্রয়োজনেই

না না, সে কি, জিজ্ঞাসা করবেন বৈকি। বিশেষ করে এখানে যখন উপস্থিত আছি।

আচ্ছা, আজ কটার সময় ঠিক আপনি এখানে এসে পৌছান মিঃ শর্মা ?

সঠিক আমার মনে পড়ছে না, তবে রাত্রি আটটা থেকে সোয়া-আটের মধ্যে।

বেশ, তারপর থেকে অর্থাৎ আপনার এখানে পৌছবার পর থেকে এখানে আপনার চোখে যা যা দেখেছেন বা ঘটেছে সব খুলে সংক্ষেপে আমায় বলুন।

সে আর এমন বিশেষ কঠিন কি। আমার নিজের যে এখানে আসবার খুব ইচ্ছা ছিল তা নয়, একপ্রকার দীনতারণের ইচ্ছাতেই এখানে আজ রাত্রে আমায় আসতে হয়, অথচ সে এসেই চলে গেল, তাছাড়া—হঠাৎ কথার মাঝে যেন একটু থেমে প্রফেসার শর্মা আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, তাছাড়া আমার ধারণা ছিল, দীনতারণের এখানে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আগে থেকেই কথা ছিল।

কারও মানে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে তো ? কিরীটী বললে।

প্রফেসার শর্মা যেন একটু চমকে উঠলেন। পরক্ষণেই কিরীটীর চোখের ওপর চোখ রেখে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

না, আমি তা ঠিক জানি না। প্রফেসার শর্মা আবার বলতে লাগলেন, তাছাড়া এখানে পৌছেই আমি নীচের হলঘরে ঢুকি, সেইখানেই মিঃ মিত্রের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমরা দুজনে কথা বলতে বলতে একটা টেবিলের সামনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসে দু গ্লাস 'জিনজার' খেতে লাগলাম। হঠাৎ এক সময় 'জিনজার' খেতে খেতে শুভঙ্কর হাসতে হাসতে গ্লাসের লাল রঙের তরল পদার্থের দিকে চেয়ে আমায় বললে, দেখছিস কালিদাস, কী টুকটুকে লাল। সত্যি ভাই, আজ রাত্রে এই লাল রংটা যেন আমার মনে একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। Oh red, it is simply charming! It is nice!

হঠাৎ কিরীটী মুখটা ঘুরিয়ে আমাকে বললে, সুব্রত, বেল বাজিয়ে একটা

বেয়ারাকে ডাক তো।

বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই, যে বেয়ারাটি প্রথম মৃতদেহ আবিষ্কার করে সে এসে দাঁড়াল।

কিরীটী তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আরে, তুমিই তো প্রথম মৃতদেহ দেখ, না? তুমি কফি নিয়ে যাবার ঘণ্টা শোন কখন?

আজ্ঞে, রাত্রি ঠিক সাড়ে-নটার সময়। কেননা আমি ঘড়ির দিকে নজর রেখেছিলাম।

তুমি তখন কোথায় ছিলে?

রান্নাঘরে হুজুর। রান্নাঘরের লাগোয়াই খাবার ঘর, এবং রান্নাঘর ও খাবার ঘর কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের ঠিক পিছনেই।

কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের মধ্যে যে তোমাদের ডাকবার জন্য বেল আছে, সেই বেল বাজাবার দড়িটা কোথায়?

প্রাইভেট রুম থেকে হলঘরে আসবার দরজার গায়েই হুজুর।

বেশ, বেল শোনা মাত্রই তুমি কফি নিয়ে চলে এলে না?

না। বাবুর্চি কফিটা তৈরী করতে একটু সময় নেয়। মিনিট দশেক বোধ করি দেরি হয়েছিল কফি নিয়ে আসতে।

কোন দরজা দিয়ে তুমি কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে ঢোক?

ঘরে যাবার হলের মধ্য দিয়ে যে দরজা আছে সেই দরজা দিয়ে। দরজার ঠিক সামনেই একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, বোধ হয় আপনারই লোক হবেন তিনি। আমি দরজায় শব্দ করলাম, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ ভেতর থেকে পেলাম না। এবার জোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম, কিন্তু তাতেও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। তখন আমি সামনে দাঁড়ানো সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, ঘরে কেউ আছেন কি? তাতে তিনি জবাব দেন, তার মানে? কারও ঐ ঘরে থাকবার কথা ছিল নাকি? আমি তাতে জবাব দিই আজ্ঞে সেক্রেটারী সাহেবের তো এ ঘরে থাকবার কথা। তাতে আমায় বললেন তবে যাও। আমি তখন দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করি। বেয়ারার গলার স্বর ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, সে কথা বলতে বলতে ঘন ঘন আমাদের সকলের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল।

তারপর? কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

আজ্ঞে, তারপর আমি কফি নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি। ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ পায়ে বাধা পেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। পড়েই

আমি চিৎকার করে উঠি ও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আপনাদের ঘরের দিকে যাই। আমি আল্লার নামে শপথ করছি, হুজুর এর চাইতে বেশী কিছুই আমি জানি না।। আমি খুন করিনি। বলতে বলতে লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কিরীটীর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল।

তোমার কোন ভয় নেই হে, তুমি উঠে বস। আমি জানি তুমি খুন করোনি। কিরীটীর কথায় কতকটা আশ্বস্ত হয়েই যেন লোকটা চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল

॥ ছয় ॥

কিরীটী সম্মুখে উপবিষ্ট প্রফেসার শর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ প্রফেসার আপনি যা বলছিলেন এবার বলুন।

প্রফেসার শর্মা বললেন ডিনার খাবার পর সেক্রেটারী শুভঙ্করকে নিয়ে আমি খাবার ঘরে যাই। সেখানে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে শুভঙ্কর নীচে চলে যায়।

অনুমান তখন রাত্রি কটা?

প্রফেসার শর্মা মৃদু একটু হাসলেন, ক্ষমা করবেন মিঃ রায়, আগে তো বুঝিনি আজকের রাত্রের প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মিনিটের হিসেবনিকেশ কারো কাছে দিতে হবে, তাহলে না হয় ঘড়ি ধরে সব কাজগুলো করে রাখতাম। তবে যতদূর মনে হয় রাত্রি তখন প্রায় নটা হবে বা নটা বাজবার মিনিট চার-পাঁচ আগেও হতে পারে। তারপর হঠাৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো মিঃ রায়, গরীবকে ফাঁসাবার মতলবে জেরা করছেন না তো?

কিরীটী ও-কথার কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলে আপনি তাহলে তারপর খাবার ঘরেই রয়ে গেলেন?

হ্যাঁ, খাবার ঘরে পরিষ্কার টেবিল চেয়ার পাতা ছিল, কেননা আজ খাবার আয়োজন হয়েছিল নীচে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ে, টেবিলের ওপর একখানি হিন্দী ভাষায় অনূদিত ছোটদের রূপকথা "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" পড়ে আছে। আমি হিন্দী ভাষা বেশ ভালই জানি এবং হিন্দীতে অনূদিত ছোটদের একখানি রূপকথা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, তাছাড়া রূপকথা পড়তে চিরদিনই বড় ভালবাসি। বইখানি হাতে পেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে একটা চেয়ারের ওপরে বসে

পড়লাম। বেশী লোকের গোলমাল আমি কোন দিনই পছন্দ করি না, ভাবলাম বাঁচা গেল। হাতের কাছে বইটা পেয়ে তাতেই মনঃসংযোগ করলাম। বইটা সত্যিই ভাল। রূপকথা পড়তে আপনার কেমন লাগে মিঃ রায় ?

ব্রাভো। চমৎকার। কিরীটী চাপা উল্লাসভরা কণ্ঠে বলে উঠল, এ যে দেখছি একটা মজার রহস্য উপন্যাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চারদিকে উৎসবের কলোচ্ছ্বাস, একজন ছায়ার মত এসে স্নানের ঘরে মাটি কোপানোর খুরপি ফেলে গেলেন, আর একজন খাবার ঘরে এসে "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" রূপকথা কুড়িয়ে পেলেন এবং তখনি সেই রূপকথা পড়ায় মত্ত হয়ে উঠলেন। এমন সময় এক সা ঘাতিক খুনী রক্ত দর্শনের নেশায় পাশের ঘরে হায়েনার মত হিংস্র হয়ে উঠেছে। সব কিছুর মধ্যেই একটা মানে থাকা দরকার। যদি এই পর পর ঘটনাগুলোর আদপে কোন মানেই না থাকে, তাহলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুরই মানে হয় না।

পরমুহূর্তেই যেন হঠাৎ কিরীটী আবার গম্ভীর হয়ে প্রফেসার শর্মাকে পুনঃপ্রশ্ন করল, খুব ভাল, ঘড়ির সময় নিয়ে আপনি একটু আগে আমাদের ঠাট্টা করছিলেন, আবার কিছু সময়-সম্পর্কীয় অতি আবশ্যকীয় দু-চারটে কথা এসে যাচ্ছে। ক্ষমা করবেন প্রফেসার, আমি সিঁড়ির ও খাবার ঘরের ঘড়ি মিলিয়ে দেখেছি। আমার ঘড়ি আর ওই দুটো ঘড়ি একই সময় দিচ্ছে—আপনার ঘড়িতে এখন কটা প্রফেসার ?

প্রফেসার শর্মা পকেট থেকে একটা মূল্যবান রৌপ্য-নির্মিত ঘড়ি বের করে হাতের উপর নিয়ে দেখে বললেন, ঠিক দশটা বেজে বারো মিনিট হয়েছে।

আমারও ঠিক তাই, কিরীটী আপন হাতঘড়ি দেখে বললে, তোমার ঘড়িতে কত সুব্রত ?

দশটা বেজে চব্বিশ মিনিট। আমার ঘড়ি দেখে বললাম।

বেশ। প্রফেসার, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে দয়া করে যদি বলেন, রাত্রি ঠিক সাড়ে নটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন ? কিরীটী প্রশ্ন করল প্রফেসারের মুখের দিকে চেয়ে, অর্থাৎ যখন মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট ঘরে গিয়ে ঢোকেন ?

নিশ্চয়ই। বলে সহসা প্রফেসার হা. হা. করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। তারপর কোনমতে হাসি চাপতে চাপতে বললেন, সাড়ে নটার সময় হলঘরে দাঁড়িয়ে আমি আপনারই পাহারাবত ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলছিলাম। তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় আট-দশ মিনিট কথাবার্তা বলেছি। তারপর তাঁর সামনেই এই ঘরে এসে ঢুকি এবং কুমারসাহেব এইখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সঙ্গে আমার

পরিচয় করিয়ে দেন, আশা করি আপনার মহামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি বন্ধুবর এত তাড়াতাড়ি সেকথা ভুলে যাননি।

কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম অসহ্য বিরক্তিতে সে এবার নিশ্চয়ই কোন কিছু বলে বসবে, কিন্তু হঠাৎ যেন সে নিজেকে সামলে নিয়ে সামনেই ঝোলানো ভৃত্যদের ডাকবার ঘণ্টার দড়িটায় ধীরে ধীরে একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিল।

আমরা সকলে নির্বাক বিস্ময়ে কিরীটীর মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম।

হরিচরণ ঘরে এসে ঢুকল।

প্রফেসারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কি ইঙ্গিত করতেই ঘাড় হেলিয়ে বললে, হ্যাঁ, স্যার, ঐ ভদ্রলোক আমার কাছেই ছিলেন। এক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই ঠিক এখন সময় কত বলতে পারেন? আমার মনে হচ্ছে আমার ঘড়িটা বোধ হয় একটু slow যাচ্ছে। আমি বললাম, আমার ঘড়ি ঠিকই আছে—সাড়ে নটা বেজেছে। আমরা দুজনে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ঘড়িটাও একবার দেখে নিজেদের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের ঠিক সামনাসামনি ওঠবার সিঁড়ি, আমরা দুজনেই সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমার ঘড়িটা সিঁড়ির সঙ্গে একই টাইম দিচ্ছে দেখে নিজের ঘড়িটা মিলিয়ে নিতে নিতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কিরীটী বাধা দিল, তাহলে তুমি তখন ঠিক সিঁড়ির মাথায় ছিলে। যখন মি. মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে প্রবেশ করেন?

হ্যাঁ। সেই সময় প্রায় পাঁচ মিনিট উনি আমার সঙ্গেই ছিলেন। তারপর তিনি এই ঘরে এসে প্রবেশ করেন।

ঐ সময় তুমি নিশ্চয়ই ঐ দিক থেকে প্রাইভেট রুমে যাবার দরজাটার প্রতি বেশ ভাল নজর রেখেছিলে, হরিচরণ, কী বল?

খুব কঠিন দৃষ্টিতে নজর না রাখলেও, মোটামুটি ভাল করেই নজর রেখেছিলাম স্যার। এবং বেয়ারা যখন ঘরে ঢোকে আমি তখনও তার পিছনেই দাঁড়িয়ে এবং আমি ওর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে মৃতদেহ দেখতে পাই। আপনি না আসা পর্যন্ত আমি একবারের জন্যও ওখান থেকে নড়িনি।

হঠাৎ প্রফেসার শর্মা বললেন, আচ্ছা! এবারে আমি আসতে পারি কি মিঃ রায়? রাত্রি অনেক হল। এই আমার নামের কার্ড রইল, যখন ইচ্ছা ফোনে একটু খবর দিলেই আমার দেখা পাবেন। বলতে বলতে একটা সুদৃশ্য কার্ড কিরীটীর হাতের দিকে প্রফেসার এগিয়ে ধরলেন। কিন্তু কিরীটী তাঁর কথার কোন জবাবই দিল না,

চুপচাপ বসেই রইল, যেন কথাগুলো কানেই যায়নি। তারপর নীরবে হাত বাড়িয়ে প্রফেসারের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ক্ষণেক ভাবল, তারপর মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, প্রফেসার শর্মা, আশা করি ও-দাবের তলোয়ারটার কথা এর মধ্যেই একেবারে ভুলে যাননি।

সহসা প্রফেসারের চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ ও উগ্র হয়ে উঠল। তিনি পলকহীন ভাবে কিরীটীর দিকে চাইলেন, কিরীটীও তার নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রফেসারের দিকে চেয়ে রইল।

চারজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ পরস্পর পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ অপলাক চেয়ে রইল। দুজনেই ভয়ঙ্কর রকম যেন সজাগ হয়ে উঠেছে।

তারপর সহসা আবার প্রফেসার প্রবলভাবে হেসে উঠলেন এবং চিবিয়ে চিবিয়ে অদ্ভুত ভাবে বলে উঠলেন, চমৎকার! তাহলে মানুষের ডিটেকটিভ বন্ধু আমার আমাকেই খুনী বলে সাব্যস্ত করলেন শয়তান! ওয়ানডারফুল! অবভাবনীয় চিন্তাশক্তি!

না। জলদগম্ভীর স্বরে কিরীটী বলে উঠল, অন্তত বর্তমানে আপনাকে খুনী বলে আমি সন্দেহ করিনি। কোন মানুষ আগে থেকে চিন্তা করে খুন করতে পারে, কিন্তু আগে থেকে চিন্তা করে শয়তান হতে পারে না। আমি শুধু কয়েকটা আবশ্যকীয় প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছি মাত্র। ও-কথা যাক প্রফেসার, বলুন, মিঃ মিত্র কি হিন্দী ভাষা বলতে-কইতে পারতেন?

সত্যি কথা বলতে কি, প্রফেসার বলতে লাগলেন, মোটেই না। হিন্দী ভাষায় তার জ্ঞান, 'করেঙ্গা' খায়েঙ্গা' পর্যন্তই। শুভঙ্কর ছিল আমার ছোটবেলার বন্ধু তার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে ছিল ও। লোকে জানত ও বিলাতফেরত, উচ্চশিক্ষিত, আসলে ওর পড়াশুনা তেমন ছিল না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত বিদ্যার দৌড়। চেহারাটা ছিল সুন্দর আর common sense ছিল প্রচুর, যার ফলে কিছু না জেনেও অনেক কিছুই জানবার ভান করতে পারত। কিন্তু খেলাধূলায় ওর মত ওস্তাদ বড় একটা দেখা যেত না। টেনিস খেলতে, সাঁতার কাটতে, ঘোড়ায় চড়তে, তরবারি বা ছোরা খেলতে, বন্দুক ছুঁড়তে, বড় বড় জানোয়ার শিকার করতে ও ছিল একেবারে যাকে বলে অদ্বিতীয়। আচ্ছা, এবারে Good Night জানাচ্ছি my friend! আশা করি ক্ষণিকের চেনা গরীব বন্ধুর কথাটা ভুলে যাবেন না।

নিশ্চয়ই না। বিশেষ করে না ভুলতে যখন আপনিই এত করে অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছেন! কিরীটী গম্ভীর স্বরে জবাব দিল।

ধীর মন্থরপদে জুতোর শব্দ তুলে প্রফেসার কালিদাস শর্মা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিরীটী এক সময় বললে, দেখ হরিচরণ, তুমি একবার এখানে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে জানবার চেষ্টা কর, তাঁদের মধ্যে কে কে আজ রাত্রে এখানে প্রফেসার কালিদাস শর্মাকে দেখেছেন। আর খাবার ঘরে গিয়ে একবার দেখ সেখানে "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" নামে বইখানা পাও নাকি। আর চেষ্টা কর জানতে কে ঐ বইখানা এনেছিল সঙ্গে করে? হ্যাঁ, আর যাবার সময় কুমারসাহেবের ম্যানেজারটিকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিও তো।

হরিচরণ ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই, কিরীটী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে আমি যতদূর জানি, এই কালিদাস শর্মারই বছর তিন-চার আগে কী একটা ব্যাপার নিয়ে দুর্নাম রটে, ফলে কলেজের চাকরি যায়, তারপর থেকেই লোকটা সম্পূর্ণ বেকার, কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থায় এত বাবুয়ানা ওর আসে কোথা থেকে? খুব সম্ভব কুমারসাহেবকে ও নেশার বস্তু যোগায়।

আমারও যেন তাই মনে হয়, ডাঃ চট্টরাজ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, বোধ হয় সেইজন্যই কুমারসাহেব যখন আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে উঠে গিয়ে দ্বিতীয়বার ফিরে এলেন, তখন তাঁকে একরকম যেন অসুস্থের মত দেখাচ্ছিল। মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে শ্লথ মন্থর গতিতে হাঁটছিলেন। তখনই আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক বোধ হয় কোন একটা নেশাটেশায় অভ্যস্ত।

আপনি ঠিকই বলেছেন ডাক্তার, কিরীটী বলে উঠল, খুব সম্ভবত দ্বিতীয়বার তিনি যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন কোন একটা কিছু নেশা করে এসেছিলেন। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি।

আমি বাধা দিলাম, উনি না লক্ষ্য করলেও, আমার দৃষ্টিকে তুমি এড়াতে পারনি বন্ধু। কুমারসাহেব যখন আমাদের দেওয়া সিগার না খেয়ে নিজের সিগারেট খেয়ে উঠে যান, তখন তার অ্যাসট্রের মধ্যে সেই নিক্ষিপ্ত নিঃশেষিত সিগারেটের টুকরোটা তুমি তুলে নিয়ে পকেটস্থ করেছ।

এতদিনে সত্যসত্যই সুব্রতর চোখ একটু সজাগ হতে আরম্ভ করেছে। কিরীটী হাসতে হাসতে বলতে লাগল, চেয়ে দেখুন ডাক্তার, কিরীটী পকেটে হাত চালিয়ে সিগারেটের টুকরো বের করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল, একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, এ সিগারেট কেনা নয়, হাতে পাকিয়ে তৈরী করা, তাছাড়া সিগারেটের মসলা যেমন হয় এর মধ্যকার মসলা ঠিক তেমন নয়, একটু

মোটা এবং কোনমতে কাগজ দিয়ে জড়িয়ে সিগারেট বানানো হয়েছে। শুঁকে দেখুন।
…বলতে বলতে কিরীটী সিগারেটটা খুলে ফেললে।

তাছাড়া দেখুন, মসলাটা কেমন ফিকে ব্রাউন রংয়ের 'মরিহুয়ানা' ('mori-huanna') কিংবা 'হ্যাস্হিস' ('hashish') ভাং সিদ্ধি বা গাঁজা জাতীয় জিনিস। তবে আসলে কোন্ জিনিসটা দিয়ে যে এই সিগারেটের মসলা তৈরী হয়েছে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষিত না হয়ে আসা পর্যন্ত সঠিক বলা চলছে না। তোমরা হয়তো জান না, ইজিপ্টের লোকেরা 'হ্যাস্হিসে'র সবুজ বা কাঁচা পাতা খায়। তাতে নাকি নেশা হয়। মেক্সিকোতে যে 'হ্যাস্হিস্' পাওয়া যায়, তার পাতা আরো তীব্র নেশা আনে। খুব সম্ভব প্রফেসার শর্মা এই ধরনের সিগারেট তৈরী করে কুমারসাহেবকে নেশায় পরিতুষ্ট করে থাকেন। প্রফেসার শর্মা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন বলে ওঁর সিগারেটের ওপরে সর্বপ্রথম আমার সন্দেহ জাগে, যে মুহূর্তে উনি আমার দেওয়া সিগারেটের অফার ফি রয়ে দিলেন, অথচ ঠিক সেই সময়েই নিজের কেস হতে সিগারেট বের করে ধূমপান শুরু করলেন। কোন সভায় বা দু-দশজন যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে কেউ সিগারেট কাউকে অফার করলে তাকে refuse করে পরমুহূর্তেই নিজের সিগারেট ব্যবহার করা এটিকেট-বিরুদ্ধ। একমাত্র সেই কারণেই আমি কুমারসাহেবের নিঃশেষিত স্ট্যাগ endটা অ্যাসট্রে হতে তুলে নিয়েছিলাম। তারপর একটু থেমে আবার বললে, হ্যাঁ ভাল কথা ডাক্তার, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে ভাং সিদ্ধি প্রভৃতির নেশা করলে কি কি লক্ষণ দেখা যায় বলে?

চোখের মণিতে অবস্থিত আলো প্রবেশের ছিদ্রপথ pupil সঙ্কুচিত (contracted) হয়ে যায়। জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করে, সামান্য একটু চলাফেরা করলেই exhaustion হয়ে গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কল্পনায় সব নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতে থাকে যাকে আমরা ডাক্তারী শাস্ত্রে hallucination বলি। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ রায় কুমারসাহেব যে অদ্ভুত গল্প আমাদের শোনাচ্ছিলেন তা ঐ নেশারই প্রভাবে।

অদ্ভুত আর তাকে বলা চলে না ডাক্তার, আজকের রাতের ঘটনার কথা ভাবতে গেলে কিছুই আর আশ্চর্য বা অদ্ভুত লাগে না। আমি এখনও স্থিরনিশ্চিত নই, কুমারসাহেবের গল্পটা নেশা থেকেই উদ্ভূত না কল্পনা মাত্র। আপনি যে জিনিসটার প্রভাবের কথা বলেছেন সেটাও ঐ গাঁজা বা ভাং জাতীয় গাছের পাতা থেকে হয় বটে কিন্তু সেও অধিক পরিমাণে খেলে তবে নেশা হয়, এবং ঐ ধরনের নেশার বস্তু একটা সিগারেটের মধ্যে যতটুকু থাকে তাতে করে অমন নেশা হতে পারে বলে আমার

কিন্তু মনে হয় না। সামান্য একটু উত্তেজকের কাজ করতে পারে মাত্র। আমার মনে হয় এ ধরনের নেশায় কুমারসাহেব অনেকদিন থেকেই বেশ অভ্যস্ত। না হলে তিনি এ ধরনের নেশা করে নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এই জাতীয় নেশায় অভ্যস্ত যেসব নেশাখোর, তাদের এই সামান্য একটু নেশার দ্রব্য সেবন করলে আর যাই হোক অন্ততঃ কল্পনায় স্বপ্ন যে দেখতে শুরু করবে না এটাও ঠিক। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে ঐ hallucination দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়তো না হওয়াটাই বেশী সম্ভব। আরো একটা কথা এই সঙ্গে আমাদের ভুললে চলবে না যে, এ জাতীয় জিনিসের লোককে মেরে ফেলবারও একটা ক্ষমতা আছে, তবে একটু দীর্ঘ সময় লাগে। যেমন ধরুন দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত ভাবে ঐ ধরনের নেশা করে আসলে, অনবরত এগুলো slow poisoningয়ের কাজ করতে পারে অনায়াসেই। এমনও হতে পারে যে, ঐভাবে নেশার মধ্য দিয়ে slow poisoning করে করে কেউ ঐ উপায়ে অনেক দিন ধরেই ওঁকে সবার অলক্ষ্যে এ জগৎ থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল।

এমন সময় ম্যানেজারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।—এমন করে আর কুমারসাহেবের সর্বনাশ করবেন না স্যার, আপনার লোকদের আদেশ দিন যাতে করে তাঁরা এবার এখানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতদের অন্ততঃ চলে যেতে বাধা না দেন। একেই তো তাঁরা সব নানা অদ্ভুত প্রশ্ন করে করে আমাদের প্রায় পাগল করে তোলবার যোগাড় করেছেন। এমন কি এর মধ্যে কেমন করে না জানি প্রকাশও হয়ে গেছে যে কুমারসাহেবের সেক্রেটারীকে কে হত্যা করেছে। আমি যদিও তাঁদের বুঝিয়ে বলেছি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন, কেউ তাঁকে হত্যা বা খুন করেনি, কিন্তু এ ধরনের কথা একবার রটলে কি কেউ আর কারও কথা বিশ্বাস করে বা করতে চায়?

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, বসুন। আপনার মনিবের সেক্রেটারী আত্মহত্যা করেছেন শুনলে নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর আত্মমর্যাদা বেড়ে যাবে, কি বলেন ম্যানেজারবাবু? কিন্তু সেকথা যাক, ব্যস্ত হবেন না, এখন বলুন তো দেখি, আজ রাত্রে এই উৎসবে এমন কি কেউ এখানে এসেছেন যাঁকে আপনি চেনেন না বা ইতিপূর্বে কোনদিন দেখেননি?

না, কই এমন কাউকে দেখেছি বলে তো আমার আজ মনে পড়ছে না। ম্যানেজারবাবু বলে উঠলেন, তাছাড়া এ উৎসবে আমন্ত্রিতদের প্রত্যেককেই নিমন্ত্রণ-লিপি দেওয়া হয়েছিল এবং নিমন্ত্রণ-লিপি ছাড়া কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সেক্রেটারীবাবুর এ বিষয়ে কড়া নজর ছিল।

সহসা আবার কিরীটী প্রশ্ন করল, আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, বলতে পারেন, আপনাদের কুমারসাহেবের সেক্রেটারী মিঃ মিত্র কতদিন থেকে আফিং খাওয়াটা অভ্যাস করেছিলেন? দেখুন অস্বীকার করবেন না বা অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। আপনি নিশ্চয়ই তাঁর অনেক কথাই জানেন, কেননা বেশীর ভাগ সময়ই দুজনে আপনারা সহকর্মী হিসাবে এখানে কাজ করছিলেন। বলুন না মশাই, চুপ করে আছেন কেন? খেতেন নাকি তিনি?

আ—জ্ঞে।

বলুন। কঠিন আদেশের সুর কিরীটীর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ ম্যানেজারবাবু মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন, তারপর একসময় মৃদু স্বরে বললেন, আজ্ঞে মাসখানেক হবে, তিনি আফিং একটু একটু করে গরম কফির সঙ্গে খেতেন। বলতেন, অন্য কোন বদ নেশার থেকে আফিং খাওয়াটা নাকি ভাল। তাছাড়া তাঁর পেটের গোলমাল আছে বলে ডাক্তার নাকি পরামর্শ দিয়েছিল প্রত্যহ একটু একটু করে আফিং খেতে। আফিং ধরবার পর উপকারও নাকি পাচ্ছিলেন।

ভাল কথা। খুব ভাল কথা। কিন্তু আপনাদের কুমারসাহেবও কি ঐ সঙ্গে কোন নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নাকি?

আজ্ঞে, তিনিও বোধ হয় ঐ একই সময় থেকে আফিং খাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় কুমারসাহেব আফিংযে অনেক দিন থেকে অভ্যস্ত।

বেশ। আচ্ছা আজ রাত্রে কুমারসাহেবকে আপনারা ভাং বা সিদ্ধি জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে সিগারেট তৈরী করে দিয়েছিলেন?

আজ্ঞে—

বলুন, জবাব দিন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেননা আমি ভেবেছিলাম সিদ্ধি খেলে তিনি একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। জানি না কেন যেন আজ চার-পাঁচদিন একটা চিঠি পেয়ে অবধি তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সর্বদাই মনমরা, যেন কি কেবলই ভাবছেন, তাই ভাবলাম, আজকের এই উৎসবের দিনে, সাধারণ সিদ্ধির সরবত-টরবত দিলে হয়তো তিনি আপত্তি করতে পারেন, তাই সিগারেট তৈরী করে রেখেছিলাম। এ রকম মাঝে আরো দুবার সিগারেট করে খাইয়েছিও তাকে। সন্ধ্যার অল্প পরেই আমি তখন কুমারসাহেবের লাইব্রেরী ঘরে বসে কয়েকটা হিসাবপত্র মিলিয়ে নিচ্ছি, কুমার-সাহেব যেন খুব উত্তেজিত হয়েছেন এমন অবস্থায় এসে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন, বললেন, এক কাপ গরম কফি খাওয়াতে পারেন ম্যানেজারবাবু? আর আপনার সেই সিগারেট

কয়েকটা দিতে পারেন ? তারপর তিনি আমাকে একটু আগে বাথরুমে কী দেখেছেন তাই বলতে লাগলেন। আমি নিজে তাঁকে কফি নিয়ে এসে দিলাম ও পকেট থেকে তৈরী করা গোটাপাঁচেক সিগারেটও দিলাম।

আজকেই আপনি তাহলে প্রথম তাঁকে ঐ ধরনের সিগারেট দিয়েছিলেন বোধ হয় ?

আজ্ঞে না। দিন পাঁচেক আগে একবার গোটাপাঁচেক তৈরী করে দিয়েছিলাম।

তবেই দেখুন ডাক্তার, ভাং বা সিদ্ধির প্রভাবে কুমারসাহেব কল্পনার বিভীষিকা দেখেননি, সিগারেট পান করবার আগেই দেখেছেন। তারপর ম্যানেজারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে বেশ। আচ্ছা মানেজারবাবু কুমারসাহেবের সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয় তখন ঠিক কত রাত্রি হবে বলতে পারেন ? মানে রাত্রি তখন কটা বাজে ?

আজ্ঞে রাত্রি নটা হবে।

আচ্ছা, তারপর আপনি কী করলেন ?

তারপর আরও কিছুক্ষণ আমি ঐখানেই ছিলাম, কেননা কুমারসাহেব সিগারেট নিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন দ্রুতপদে। তারপর হিসাবপত্র দেখা হয়ে গেলে প্রায় রাত্রি সাড়ে নটার সময় আমি নীচে নেমে যাই।

এর পর ম্যানেজারবাবুকে কিরীটী বিদায় দিল।

ভদ্রলোকও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, কেননা তিনি একপ্রকার দৌড়েই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ম্যানেজার ঘর থেকে চলে যাবার পর সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কিরীটীও বোধ করি কি ভাবছিল।

॥ সাত ॥

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সর্বপ্রথম কিরীটীর দিকে চেয়ে এবারে আমিই প্রশ্ন করলাম, আজকের ব্যাপারের অনেক কিছুই যেন তুমি এখনো চেপে রাখছ বলে মনে হচ্ছে কিরীটী ? একটা সূত্র অবিশ্যি পাওয়া যাচ্ছে, মিঃ শুভঙ্কর মিত্র নেশা করতেন।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, সেটা এমন বিশেষ একটা সূত্র নয়। কিন্তু এই case সম্পর্কে আপাতত যতটা জানতে পেরেছ, তাতে করে তোমার মতামতটা কী সুব্রত ? যতটুকু জেনেছ বা শুনেছ এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা অবিশ্বাস্য মনে হয় কী ?

একটা অসামঞ্জস্য খুব মোটা ভাবেই চোখে পড়ছে।

ডাঃ চট্টরাজ বাধা দিলেন, এক মিনিট সুব্রতবাবু। বলে হঠাৎ কিরীটীর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ একটা কথা রায়, তোমার ধারণা বোধ হয় স্যার দিগেন্দ্রই কারও ছদ্মবেশে আজ রাত্রের উৎসবে এসে যোগ দিয়েছিলেন ?

যদি বলি ডাঃ চট্টরাজ, তাই। এমন কোন বিশেষ ব্যক্তির ছদ্মবেশ নিয়ে তিনি এখানে আজ হয়তো এসেছেন, যার সঙ্গে মিঃ মিত্রের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তা ছাড়া কোন নিমন্ত্রণ-বাড়ির একটা কার্ড যোগাড় করে এখানে আসাটা এমন বিশেষ কিছুই একটা কঠিন ব্যাপার বলে কি মনে হয় ডা. চট্টরাজ ?

না। কিন্তু তাহলে তুমি স্থিরনিশ্চিত যে, স্যার দিগেন্দ্রই কারও ছদ্মবেশে এসে আজ রাত্রে হতভাগ্য শুভঙ্কর মিত্রকে খুন করেছেন ? কিন্তু—

মৃদু হেসে সহজ স্বাভাবিক স্বরে কিরীটী জবাব দিল, নিশ্চয়ই। এতে আমার দ্বিমত নেই।

কিন্তু বন্ধু, এক্ষেত্রে মিঃ মিত্রের মত একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে স্যার দিগেন্দ্রর খুন করবার কী এমন সার্থকতা থাকতে পারে সেটাই যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। অবিশ্যি কুমারসাহেবকে হত্যা করলেও না হয় বোঝা যেত, কেননা তাঁর মুখে শুনেছি স্যার দিগেন্দ্র প্রায় তিন-চারখানা চিঠিতে একাধিকবার কুমারসাহেবকে শাসিয়েছেন তাঁর প্রাণ নেবেন বলে। এবং যে কারণেই হোক কুমারসাহেবের ওপরে তাঁর একটা আক্রোশও আছে।

কিরীটী এবার বলে, জানেন কিনা আপনারা জানি না—গতকাল রাত্রে কুমারসাহেব শেষ চিঠি পেয়েছেন স্যার দিগেন্দ্রর কাছ থেকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সেক্রেটারী সাহেবও একখানি চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল বলতে বলতে একখানা চিঠি পকেট থেকে টেনে বের করে কিরীটী চিঠিটা পড়তে শুরু করে : আমাদের সাত পুরুষের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে তুমি যে এই দানধ্যানের ছেলে-খেলায় মেতে উঠেছ, এর সকল ঋণ কালই তোমার আপন বুকের রক্ত দিয়ে কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করতে হবে। বুকের রক্ত ঢেলে অর্জিত এ অর্থ অপব্যবহার করে যে পাপ করেছ, তা বুকের রক্তেই শেষ হয়ে যাক। আঃ, তাজা টুকটুকে লাল রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ঠাণ্ডা মাটির বুকের ওপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কী আনন্দ। লাল—লাল রক্ত I love it। I like it

ইতি—

তোমার একান্ত শুভার্থী

কাকা দিগেন্দ্রনারায়ণ

তারপর এই হচ্ছে সেক্রেটারীবাবুকে যে চিঠি লেখা হয় সেখানা, পড়ি শুনুন: পরের অর্থে পোদ্দারী করতে খুব আনন্দ, না? অন্যের বুকের রক্ত ঢেলে উপার্জন করা অর্থে হাসপাতাল গড়ে তুলতে চলেছ। Ideaটা চমৎকার বন্ধু! বোকা ভাইপোটির মাথায় হাত বোলাবার চমৎকার উপায় একটি বের করেছ তো। প্রস্তুত থেকো, কাল তোমারও তামাম শোধের দিন ধার্য করেছি।—রক্তলোভী 'দিগেন্দ্র-নারায়ণ'।

চিঠি দুখানা পড়া শেষ করে, আবার সে দুটো ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে কিরীটী বলে, এখন বোধ হয় সুব্রত বুঝতে পারছ, এখানে আসবার সময় কেন লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। এই চিঠি দুখানা আজ দুপুরেই কুমারসাহেব আমাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

বটে! এই ব্যাপার! ডাক্তার বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা তো তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল রাত্রি সাড়ে নটায়। তারপর তিনি কফি চেয়ে পাঠান, এবং ঠিক রাত্রি সাড়ে নটায় তিনি কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে পূর্ববর্ণিত অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রক্ষা করতে গিয়ে উপস্থিত হন। কেমন তো?

হ্যাঁ, এবং তারই অল্পক্ষণ পরে ঘণ্টা বেজে ওঠে, সে কথাটা ভুলবেন না যেন। কিরীটী বলে ওঠে ওঁর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে।

না, ঘণ্টা বেজেছিল তা ভুলিনি। খুনী ঘণ্টা বাজাবার আগে থেকেই সে ঘরে উপস্থিত ছিল এবং তলোয়ারটা খুন করবার জন্য তৈরী করেই বড় সোফাটার গদির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। Everything was kept ready—পূর্বপরিকল্পিত।

হ্যাঁ, কিন্তু এখন বলুন তো ডাক্তার, কোন্ দরজা দিয়ে খুনী তাহলে ঘরে গিয়ে ঢুকল?

কেন, দুটো দরজার যে কোনটা দিয়েই তো ঢুকতে পারে। ভুলে যাচ্ছ কেন এ কথাটা যে আমি বলেছি যে, খুনী ঢের আগে থেকেই সে ঘরে উপস্থিত ছিল।

বেশ। কিন্তু এবার বলুন তো ডাক্তার, তাহলে ঘরের কোন্ দরজা দিয়ে খুনী খুন করে বেরিয়ে গেল? কারণ যখন দেখতে পাচ্ছি খুনের ঠিক পরই আমরা কেউ তাকে সে ঘরে গিয়ে খুঁজে পেলাম না।

কিরীটীর প্রশ্নে সহসা ডাক্তার চুপ করে গেলেন। মনে হল যেন তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাঁর এই বিব্রত ভাব দেখে আমি বললাম, ডাঃ চট্টরাজ, আমি এই কথাটাই আপনাকে তখন বলতে চাইছিলাম কিন্তু।

দাঁড়ান ' দাঁড়ান ! ডাক্তার অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, খুনী হলঘরের সঙ্গে ওই ঘরে যাতায়াত করবার জন্য যে দরজা আছে, সে দরজা দিয়ে বের হয়নি, কারণ সেখানে আপনার নিযুক্ত লোক প্রহরায় ছিল এবং সেখানে থেকেই সে সর্বদা হলঘরের দরজায় নজর রেখেছিল, কেমন এই তো আপনার যুক্তি ?

খুনী এই ঘর অর্থাৎ এই ড্রয়িংরুমের দরজা দিয়েও বাইরে যায়নি। কারণ যেহেতু এ দরজার ওপর আমি নজর রেখেছিলাম, ঠিক যে মুহূর্তে আমি শুভঙ্কর মিত্রকে ঘরে ঢুকতে দেখি তারপর থেকেই সর্বক্ষণ, কেমন তো ? আচ্ছা তাহলে ডাক্তার এমন কি হতে পারে না যে, এই ব্যাপারটার মধ্যেই অর্থাৎ দরজার ওপর আমাদের নজর থাকা সত্ত্বেও একটা রীতিমত গোলমাল বা রহস্য লুকিয়ে আছে যা আপাতত আমাদের কারও দৃষ্টিতে আসছে না। কিন্তু আমি সত্যই আশ্চর্য হচ্ছি—এমন সহজ গোলমালটা আপনার বা সুব্রতর চোখে পড়ছে না কেন ? কেন আপনাদের ধরতে বা বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে ?

আমরা কিরীটীর কথার কোন জবাবই দিলাম না।

হাসতে হাসতে কিরীটী বলতে লাগল, তবে শুনুন। আপনারা জানেন ঐ ঘরে যাতায়াত করবার দু ধার দিয়ে দুটি দরজা আছে। একটি হলঘর দিয়ে, অন্যটি এই ঘর অর্থাৎ এই ড্রয়িং রুম দিয়ে, কেমন তো ? এখন একটা দরজায় পাহারা দিচ্ছিল হরিচরণ, অন্যটায় আমি নিজে। নিজেকে আমি যতটা বিশ্বাস করি, আমার সহকারী হরিচরণকে বা তার কথাও ঠিক ততখানিই আমি বিশ্বাস করি। ঐ দুটো দরজার কোনটি দিয়েই কেউ বের হয়ে গেলে, আমার বা হরিচরণের চোখকে ফাঁকি দেবার তার সাধ্য ছিল না। তাছাড়া ঐ প্রাইভেট ঘরের একটিমাত্র জানলাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি খুব ভাল করেই। নীচেই তার ট্রাম রাস্তা, এখনও হয়তো সে পথে লোকজন যাতায়াত করছে, তখন তো করছিলই। জানলার নীচে যে ধূলার পরত জমে আছে, তাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। কোন সামান্য এতটুকু দাগ বা চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে দেখতে পাইনি। আর বিশেষ করে জানলা থেকে ঘরের মাঝের ব্যবধান প্রায় চল্লিশ ফিট হবে বলে মনে হয়। মানুষ তো দূরের কথা কোন বানরের পক্ষেও এই পথ দিয়ে যাতায়াত করা একেবারেই দুঃসাধ্য। অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং ঘরেও কেউ লুকিয়ে ছিল না, সে তো আমরা নিজ চক্ষেই পরীক্ষা করে দেখেছি। অথচ সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে খুনী অন্যের অলক্ষ্যে ঘরে প্রবেশ করে, তারপর খুন করে আবার অন্যের অলক্ষ্যেই বেমালুম গা-ঢাকা দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল, ঠিক যেমন আজ সন্ধ্যায় কুমারসাহেবকে আবছা ছায়ার মত ভয় দেখিয়েই স্যার দিগেন্দ্র হাওয়ার

সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন—অনেকটা সেই রকম। এর পরেও কি ডাক্তার আপনি বলবেন না আপনার স্থিরবিশ্বাস যে এই ব্যাপারটাও একটা কল্পনাপ্রসূত ছায়াছবি মাত্র, অর্থাৎ আপনাদের ডাক্তারী ভাষায় hallucination।

উঃ অসহ্য, ক্ষোভে দুঃখে ডাক্তার বলে উঠলেন, অসহ্য। কিন্তু আমিও নিশ্চয় করে বলছি রায়, খুনী নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল। এবং আপনার অগাধ বিশ্বাসের পাত্র হরিচরণ হয় আসল ব্যাপার দেখতে পায়নি বা মিথ্যা বলছে, আর তা যদি না হয় বা আপনি তা মেনে নিতে না চান, তবে, I must say, ঐ ঘরে নিশ্চয়ই কোন গুপ্তদ্বার আছে যে পথ দিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে খুন করে চলে গেছে।

না, উত্তেজিত হবেন না ডাক্তার। ধীর গম্ভীর অচঞ্চল স্বরে কিরীটী বললে, খুনী লুকোয়নি আদপেই। আমি যা দেখছি তাও যেমন মিথ্যা নয়, হরিচরণের কথাও মিথ্যা নয়, এবং ঐ ঘরে কোন গুপ্তদ্বার থাকাও একেবারেই সম্ভবপর নয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে ভাল করে দেখে আসতে পারেন আর একবার। ঘরের একদিকে রাস্তা, আর একদিকে হলঘর, ওপরে তিনতলার ঘর, তার ওপরে খোলা ছাদ। একদিকে এই ড্রয়িং রুম, অন্যদিকে খাবার ও রান্নাঘর। তবে এর মধ্যে ভেবে দেখুন কোন গুপ্তপথ থাকা সম্ভব কিনা। এক কথায় ঘরের মধ্যে কোন গুপ্তপথ নেই। এবং সে জানলাপথেও পালায়নি, হলঘরের দরজা বা এই ড্রয়িংরুমের কোনটা দিয়েই বের হয়ে যায়নি। এর এখনও সেই ঘরের মধ্যে খুনী লুকিয়ে নেই। আসল কথা কি জানেন?

কিরীটীর মুখের দিকে ঔৎসুক্যভাবে চেয়ে একই সঙ্গে আমরা দুজনেই উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কী?

তবে শুনুন। আমরা যখন এখানে আসি তার ঢের আগেই খুনী তার কাজ শেষ করে গা-ঢাকা দিয়ে চলে গেছে। তাই আমরা কেউ তাকে দেখতে পাইনি ও-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। এবং দেহ ও মুণ্ডর positionটা দেখে এটাও বুঝতে পারা কঠিন নয় যে, ব্যাপারটা আদৌ আত্মহত্যা নয়। সহজ ও প্রাঞ্জল খুন—a murder।

হ্যাঁ, খুন।

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম কিরীটীর কথাটা কতখানি সত্য। এবং কত কঠিন সত্য।

কিন্তু এ কি নিদারুণ বিস্ময়! চোখের ওপর যেন ভাসতে থাকে একটা অশরীরী ছায়া, যে ছায়া এ বাড়ির প্রতিটি লোকের কাছে সুপরিচিত। যাকে তিলমাত্র কেউ সন্দেহ করে না। সে যেন মুখে একটা মুখোশ এঁটে এই হৃদয়হীন কাজটা করে গেল।

দয়া নেই, মায়া নেই। নেই এতটুকু বিবেক বিবেচনা। নির্মম খুন। পাশবিক লালসা। কে, কে? অথচ এই সমস্ত পরিচিতের মধ্যেই সেও একজন। কিরীটী বলেছে সকলেরই পরিচিত সে। তবে সে কে? আমি? কিরীটী? ডাঃ চট্টরাজ? কুমারসাহেব নিজে? ম্যানেজারবাবু? বিকাশ মল্লিক? দিনতারণ চৌধুরী? না প্রফেসার শর্মা? কে? কে? কে?

এমন সময় হরিচরণ ঘরে এসে প্রবেশ করল। কয়েকটা খোলা কাগজ ও একটা বই তার হাতের মধ্যে ধরা আছে। হরিচরণ বললে, এই নিন স্যার এখানে আজ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলেরই জবানবন্দি এই কাগজে টুকে এনেছি, এমন কি চাকরবাকরদেরও। আর এই নিন সেই বই। বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সেও বলতে পারল না কে এই বইটা সেখানে ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু একথা সে বললে হলফ করে যে বিকালে এই বই সে ঘরে দেখেনি। আমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের এবারে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন স্যার। আমার মনে হয় তাঁদের কাছ থেকে আর বিশেষ কোন খবর পাওয়া যাবে না।

হুঁ। আশ্চর্য। কিরীটী গম্ভীরভাবে বলতে লাগল, কিন্তু এই ছোটদের একটা 'রূপকথা'কে এখানে নিয়ে এল? ভাল কথা হরিচরণ, এই বইটা যাঁরা এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাঁদের কারও কিনা জিজ্ঞাসা করে একবার দেখেছিলে কি?

হ্যাঁ, তাও করেছিলাম স্যার। কেউই বললেন না যে, এটা তাঁর বই বা বইটা কেউ সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছেন।

অন্যমনস্ক ভাবে কিরীটী বইয়ের পাতাগুলো ওল্টাতে লাগল। কলকাতার ৫নং কলেজ স্কোয়ারের, আশুতোষ লাইব্রেরী কর্তৃক ছাপা বইয়ের প্রথম পাতায় যেন কার নাম হিন্দীতে লেখা ছিল, কিন্তু তারপর রবার দিয়ে ঘষে ঘষে আবার সেটা যেন বেশ যত্ন সহকারেই মুছে ফেলা হয়েছে।

সহসা ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিরীটী বললে, ডাক্তার, আপনি তো হিন্দী জানেন? দেখুন তো কি নাম লেখা ছিল বইটাতে? ইতিমধ্যে হরিচরণের জবানবন্দি নেওয়া কাগজগুলো একটু আমি উল্টেপাল্টে দেখে নিই।

কিরীটী হরিচরণের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল এবং মাঝে মাঝে নোট-বুকটা বের করে কী সব তাতে নোট করে নিতে লাগল। ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখলাম, ডাক্তার গম্ভীর হয়ে চশমার ভিতর দিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় মুছে দেওয়া অস্পষ্ট নামের লেখাটাকে উদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টা করছেন। ক্রমে যেন মনে হচ্ছিল একটা বিস্ময়ের ভাব তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে একটু একটু

করে। তারপর সেই পাতাটা উল্টে কী যেন মনোযোগের সঙ্গে পাতার অপর দিকে দেখতে লাগলেন।

কিরীটীর কাগজটা দেখা হয়েগিয়েছিল, হরিচরণের দিকে চেয়ে বললে, হরিচরণ, আজ এখানে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ওপরেই একজন করে লোক যেন আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নজর রাখে। আর এখুনি একজন লোকের বন্দোবস্ত কর, টালার শুভঙ্কর মিত্রের বাড়িতে পাহারা দেবার জন্য। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকবে। কোনক্রমেই কোন লোককে সে বাড়িতে যেন ঢুকতে বা বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া না হয়। কেউ যদি ঢুকতে চায় বা বের হতে চায় বাধা দেবে। বাধা না শুনলে গ্রেপ্তার করবে।

হরিচরণ মাথা হেলিয়ে বললে, তাই হবে স্যার।

এইবার কিরীটী তার এতক্ষণ লেখা নোটটা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল তাতে এইরূপ লেখা আছে :

৮-১৫ মি রাত্রি—মিঃ শুভঙ্কর মিত্র, কুমারসাহেব, প্রোফেসার কালিদাস শর্মা দীনতারণ চোধুরী—এঁরা সকলে কুমারসাহেবের শয়নঘরে কী একটা পরামর্শ করছিলেন বয় কফি দিয়ে আসতে গিয়ে দেখেছিল ওঁদের সকলকেই ও ঘরে।

৮-২০ মিঃ রাত্রি—দীনতারণ চৌধুরী এখান থেকে চলে যান ম্যানেজারবাবু ও দারোয়ান তাকে দেখেছে।

৮-২৫ মি—৮-৫৫ মিঃ— মিঃ শুভঙ্কর মিত্র ও প্রফেসার কালিদাস শর্মা দুজনে খাবার ঘরে বসে গোপনে কী সব কথাবার্তা বলছিলেন, বাবুর্চি তাদের দেখেছিল। কারণ সে সময় বেয়ারা না থাকায় বাবুর্চিই নিজে তাঁদের গরম কফি দিতে গিয়েছিল।

৮-৫০ কি ৫২ মিঃ—কুমারসাহেবের সঙ্গে সিঁড়িতে ম্যানেজারবাবুর দেখা হয়। ম্যানেজারবাবুই একথা বলেছেন আমাদের।

৮-৫০ মিঃ—৯-২৫ মি —ম্যানেজারবাবু একাই ওপরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, ম্যানেজারবাবুর স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারা যায়।

৮-৫৫ মিঃ—৯-৫৫ মিঃ—মিঃ মিত্র খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। সাক্ষী—বাবুর্চি ও প্রফেসার শর্মা।

৮-৫৫ মিঃ—৯-৩০ মিঃ— প্রফেসার শর্মা খাবার ঘরে উপস্থিত ছিলেন, সাক্ষী—প্রফেসার শর্মা নিজে। তাছাড়া একজন বয়ও সে কথা বলেছে।

৯-১৫ মিঃ সময়ে নাকি এক কাপ কফি বয় নিজে গিয়ে প্রফেসার শর্মাকে দিয়ে আসে।

৯-১৮ মিঃ রাত্রি—কুমারসাহেব নিজে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী—আমরা সকলে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি—মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে ঢোকেন আমাদের সকলেরই চোখের সামনে দিয়ে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মা হরিচরণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবং প্রফেসার শর্মা যখন হরিচরণকে সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, হরিচরণ জবাব দেয় এবং তারই কিছু আগে সে ঐখানে আমার আগেকার নির্দেশমত পাহারা দিতে উপস্থিত হয়। সাক্ষী—হরিচরণ ও ম্যানেজারবাবু, কেননা উনি ঐ সময় সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়েছিলেন।

৯-৩০—৯-৩৬ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মার সঙ্গে প্রাইভেট রুমের দরজার সামনে হরিচরণের দেখা ও কথাবার্তা হয়।

৯-৩৭ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মা ড্রয়িংরুমে আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করেন।

৯-৪০ মিঃ রাত্রি—খুনের ব্যাপারটা বেয়ারার চিৎকার শুনে এ ঘরের সবাই আমরা জানতে পারি।

মতামত বা টীকা ১নং—এমন কোন লোকই পাওয়া যাচ্ছে না যিনি অন্ততঃ স্মরণ করে বলতে পারেন যে, ঐ উপবিউক্ত ভদ্রলোকের মধ্যে কাউকেও ৮-২০ মিঃ থেকে ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ এই এক ঘণ্টারও বেশী সময়ের মধ্যে ওপরের হলঘরে দেখেছেন কিনা। আশ্চর্য।

২নং—এ বাড়িতে উপস্থিত যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ বলতে পারছেন না যে, তাঁরা কেউ মিঃ শুভঙ্কর মিত্রকে রাত্রি ৮-৫৫ মিঃ (যখন তিনি খাবার ঘর থেকে প্রফেসার শর্মার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসেন তখন) কিংবা ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে প্রাইভেট রুমে ঢুকতে দেখেছেন কিনা। এটাও আশ্চর্য।

৩নং—এটা হয়তো খুবই সম্ভব যে, এ বাড়ির পিছন দিকে অর্থাৎ ট্রাম-রাস্তার দিকে এ বাড়িতে প্রবেশের কোন গুপ্তপথ আছে, এবং সেই প্রবেশপথের কথা আমার নিযুক্ত লোক খুনের আগে পর্যন্ত অবগত না হওয়ার জন্য পাহারা দিতে পারেনি সেখানে।

কিরীটী হাসতে হাসতে নোট-খাতাটা ডাঃ চট্টরাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "এবারে বের করুন ডাক্তার, হত্যাকারী কে? যা কিছু জানবার বা বোঝবার সব এর মধ্যেই আছে।

ঐমনি সময় একজন পুলিস এসে জানাল, পুলিস সার্জেন্ট এসেছেন। আমরা সকলে

হলঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

। আট ।

হলঘরে ঢুকেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

সমগ্র হলঘরটি তখন আমন্ত্রিত অভ্যাগতের কলগুঞ্জনে মুখরিত। কিরীটী একজন পুলিস অফিসারকে ডেকে তখনি আদেশ দিল, এদের সকলকে এবার ছেড়ে দিন।

আদেশ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা যেন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত উন্মুক্ত দ্বারপথের দিকে হুড়মুড় করে অগ্রসর হল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই জনস্রোত মিলিয়ে গেল।

সিঁড়ির মুখে প্রকাণ্ড ওয়ালক্লকটা ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল।

এখন হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, কিরীটী, ডাক্তার চট্টরাজ, থানার পুলিস অফিসাররা, কুমারসাহেব, পুলিস সার্জেণ্ট, খানসামা ও বেয়ারা-বাবুর্চির দল।

পুলিস সার্জেনই প্রথম ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, বললেন, চলুন মিঃ রায়, মৃতদেহটা আগে দেখে আসি।

সকলে আবার এসে কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে প্রবেশ করলাম। জমাট বাঁধা রক্তস্রোতের মধ্যে একই ভাবে বীভৎস মুণ্ডহীন মৃতদেহটা তখনও পড়ে আছে। এবং পাশেই মুণ্ডুটা।

পুলিস সার্জেণ্ট মোটামুটি সব শুনে ও মৃতদেহ পরীক্ষা করে সঙ্গে একজন কর্মচারীকে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবার আদেশ দিলেন।

পুলিস সার্জেণ্ট বললেন, এবারে মিঃ রায়, আমাকে ব্যাপারটা একটু বলুন তো?

কিরীটী তখন পুলিস সার্জেণ্টকে মোটামুটি সব ব্যাপারটাই সংক্ষেপে আবার বললে তাঁর জ্ঞাতার্থে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, সুব্রত, তুমি তেতলায় গিয়ে ঠিক এই ঘরের ওপরের ঘরটা একবার ভাল করে দেখে এস তো দেখি। আর হরিচরণ, তুমি এর নীচের ঘরটা পরীক্ষা করে এস। হ্যাঁ, দেখ সুব্রত, তুমি এই ঘরের ঠিক ওপরের তলার ঘরে গিয়ে ঘরের মেঝেতে কোন কিছু দিয়ে ঠুকে শব্দ করবে, তা হলেই এই ঘরে দাঁড়িয়ে সে শব্দ আমরা শুনতে পাব। আর তুমি নিজেও ঘরের মেঝেতে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাও কিনা। ঘরের দেওয়ালে ঘা দিয়ে দেখবে কোথাও ফাঁপা-টাপা কিছু টের পাও কিনা। হরিচরণ, তুমিও ঐ একই ভাবে

নীচের ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবে। আমি ততক্ষণ এই ঘরটা আবার একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে সন্দেহ ভেঙে দিই সবার। যিনি যাই বলুন, আমার নিশ্চিত ধারণা, ওঘরের মধ্যে কোথাও কোন গুপ্তদ্বার নেই। শুধুই নিষ্ফল চেষ্টা এ, তবু আর একবার দেখব। প্রত্যেকটি ঘটনা যদি ভাল করে বিচার করা যায় তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোন বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির দ্বারা এভাবে খুন করা সম্ভবপর নয়।

ধীরে ধীরে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

কুমারসাহেবের আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই এ সংসারে। তিনতলার ঘরগুলো তাই খালিই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কোন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় এলে তেতলায় থাকেন। তা সেও কচিৎ কখনো।

তিনতলার হলঘরে ঢোকবার মাথায়ই সিঁড়ি। সিঁড়ির দরজাটা ভেজানো। দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঠেলতেই নিঃশব্দে দরজার কপাট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়ে খানিকটা জমাট বাঁধা অন্ধকার চোখকে যেন অন্ধ করে দিল মুহূর্তের জন্য।

হাতের টর্চ জ্বালিয়ে চারদিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এ হলঘরখানিও অবিকল নীচের হলঘরেরই অনুরূপ।

নিঃশব্দে একাকী সেই অন্ধকার নির্জন হলঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিক হতে জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন অদৃশ্য হাতে আমাকে এসে বেষ্টন করে ধরছে, অনুভব করছি অন্ধকারের হিমশীতল স্পর্শ। আশপাশে কোথাও এতটুকু গোলমাল বা শব্দ পর্যন্ত নেই। যেন যুগযুগান্তরের তন্দ্রাচ্ছন্নতা এইখানে এসে জমাট বেঁধে আছে অতলান্ত অন্ধকারের মধ্যে।

নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যায়।

এর পর কতকটা আন্দাজে ভর করে, যে ঘরটা ঠিক প্রাইভেট রুমের ওপরে হবে বলে মনে হল, সেই ঘরের দরজাটার হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম। নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকেই ওপরের দিকে তাকাতে স্কাই-লাইটের কাচের স্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে তারায় ভরা শীতের আকাশের একটুকরো চোখে পড়ল। যেন একটুকরো স্বপ্ন। দূরদূরান্তের মায়ায় ঘেরা। নাগালের বাইরে।

সহসা একটা মৃদু নিশ্বাসের চাপা শব্দ আমার সজাগ কানে এসে যেন আঘাত দিল। দেহের সমগ্র লোমকূপ পর্যন্ত যেন অভাবনীয় একটা পরিস্থিতির জন্য হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল।

হাতে ধরা টর্চটার বোতাম আবার টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বুকে সেই

টর্চের আলোয় যে অভাবনীয় দৃশ্য সহসা আমার চোখে পড়ল তার জন্য কণপূর্বেও এতটুকু আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সত্যিই চমকে উঠেছিলাম।

দেখলাম ঘবেব এক কোণে একটা সোফায় মুখ নীচু করে নিঃশব্দে একটি অল্পবয়সী যুবক বসে আছে।

আমাব মত সেও বোধ হয় আমাব অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চমকে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

কে? কে আপনি? কী চান এ ঘবে? বলতে বলতে ভীতত্রস্তভাবে যুবকটি উঠে দাঁড়াল।

ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে বিবক্ত কবতে এ ঘবে আসিনি। তা ছাড়া আমি ভাবতেও পারিনি এই নির্জন অন্ধকাব ঘবে এমনি কবে ভূতের মত চুপটি কবে কেউ বসে থাকতে পাবে। সত্যিই আমি একান্ত লজ্জিত। দুঃখিত মিঃ ·। আমি কেবল এ ঘরেব মেঝেটা একবার পরীক্ষা কবে দেখবাব জন্য শুধু এসেছিলাম। মানে

কিন্তু কে আপনি? হঠাৎ এ ঘরেব মেঝেটাই বা আপনি দেখতে এসেছেন কেন?

বর্তমানে আমি একজন পুলিসেব সহকাবী। আমি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম।

পুলিস। পুলিসের সহকারী। কিন্তু এখানে কেন? সে কি মরে গেছে নাকি?

যুবকেব অসংলগ্ন কথায় মুহূর্তে সমগ্র ইন্দ্রিয় আমাব যেন সজাগ হয়ে উঠল কোনমতে নিজেকে সংযত কবে বললাম, কাব কথা বলছেন? কে মরেছে?

কে আবাব, কুমাবসাহেবেব সেক্রেটাবী মিঃ শুভঙ্কর মিত্র। একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে কতকটা থেমে থেমে যুবক কথাগুলো বললে।

হ্যাঁ, মাবা গেছেন তিনি সত্যি। কিন্তু আপনি যখন এতটা জানেনই, আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা না করে সুস্থিব হতে পাবছি না যে।

আমি কথাটা বলতে বলতে আলোটা আবাব নিভিয়ে দিলাম। ঘর পূর্বের মত অন্ধকারে জমাট বেঁধে উঠল। অন্ধকারে সোফাব ওপব নড়েচড়ে বসবার খসখস আওয়াজ কানে এল।

কী জিজ্ঞাসা করবেন শুনি? কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার অসহিষ্ণুতার আভাস যেন ঝরে পড়ল, কে আপনাদের খুন হয়েছে বা মারা গেছে সেই সম্পর্কেই আপনি আমাকে আবোলতাবোল কতকগুলো অবান্তর প্রশ্ন করবেন তো? কিন্তু কেন বলুন তো? আমাকে একা একা এই অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে দেখে নিশ্চয়ই আপনার মনে ঐ

জানার ইচ্ছা জেগেছে, না ?

রাগ করবেন না। যদিও আপনি রাগলেও, আমার কথার জবাব আপনাকে দিতেই হবে।

দিতেই হবে কথার জবাব ? কেন শুনি ? জোর নাকি ?

আপনাকে তো আগেই আমি বলেছি, আমি একজন পুলিসের লোক।

যুবক যেন কি ভাবলে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, বেশ, জবাব দেব। করুন, কি জিজ্ঞাসা করবার আছে আপনার ! চটপট জিজ্ঞাসা করে ফেলুন। তারপর আবার একটু থেমে হঠাৎ বললে, আসুন না, চলুন ঐ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যাক, বলতে বলতে যুবক উঠে দাঁড়ায়। একটা মৃদু অথচ মিষ্টি গন্ধ সহসা আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যেন আলোড়িত করে তুলল। যুবক নিজেই এগিয়ে গিয়ে পথের ধারের জানলার কপাটটা খুলে দিল ধাক্কা দিয়ে।

মধ্যরাত্রির বর্ষণক্লান্ত শীতের আকাশ। অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যে পার্শ্বের দণ্ডায়মান যুবকের দিকে ফিরে তাকালাম। আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত। অত্যন্ত ফিটফাট, বয়স বোধ করি বাইশ-তেইশের মধ্যে হবে।

যুবকটিই প্রথমে কথা বললে, অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে একা একা চুপ করে বসে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক পুলিসের লোকের মত লাগছে না। পুলিস আবার এরকম ভদ্র ও সভ্য দেখতে হয় নাকি ? সত্যি চমৎকার চেহারা আপনার, যেন ঠিক গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর প্রতিমূর্তি। বাঙালীদের মধ্যে এত সুন্দর চেহারা বড় একটা আমি দেখিনি। সত্যি বলুন তো কে আপনি ? কি আপনার সত্য পরিচয় ?

বলেছি তো আমি পুলিসের লোক। কিন্তু এখন আমার চেহারার বর্ণনা স্থগিত রেখে আপনার কথাগুলো বলবেন কি ? আপনি এখানে কেন বসেছিলেন এমনি করে ভূতের মত একা একা ? নিশ্চয়ই কারও জন্যে বসে অপেক্ষা করছিলেন, না ?

বলছি। কিন্তু সত্যি বলছেন মিঃ মিত্র মারা গেছেন ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বললাম তো মারা গেছেন। মিথ্যে কথা আজ পর্যন্ত জীবনে একটাও বলিনি। মিথ্যাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি। এখন বলুন আপনার কথা।

আমিও জানি এবং টের পেয়েছি সে মারা গেছে। মৃদুস্বরে যুবকটি বললে।

কিন্তু তিনি যে মারা গেছেন, আপনি সেকথা জানলেন কি করে ?

আমি যে অনুভব করছি সে মারা গেছে। হ্যাঁ, সমগ্র চেতনা দিয়ে অনুভব করছি

সে মারা গেছে। আর তা না হলে—সে মারা না গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। উঃ, কী ভালটাই তাকে একদিন আমি বেসেছি, নিজের ভাইয়ের মত অগাধ শ্রদ্ধা করেছি। যাক, সে মরেছে। অত বড় একজন 'স্পোর্টসম্যান' সে কিনা তার সব সম্মান প্রভুত্ব ছেড়ে দিয়ে শেষটায় কুমারসাহেবের মত একজন লোকের কাছে যেচে চাকরি নিল। কুমারসাহেব আমাকে দু'চক্ষেও দেখতে পারেন না, অথচ তার কী একটা জরুরী কাজ নাকি আমার সঙ্গে আছে, তাই চুপে চুপে রাত্রি নটায় আমাকে এখানে আসতে বলেছিল। তাকে আমার বড় ভাল লাগত একদিন। অত চমৎকার আবৃত্তি করতে জীবনে আর কাউকে শুনিনি। বাংলা কবিতা কী চমৎকারই না আবৃত্তি করত, কিন্তু সেই সব আবৃত্তির মধ্যে সহসা যখন এক এক সময় এক-একটা হিন্দি কবিতা থেকে আবার আবৃত্তি শুরু করত, শুধু তখনই আমার বিশ্রী লাগত। যাক সে কথা, আজ যখন সকালে আমাদের বাড়িতে সে এখানে আসবার জন্য আমাকে বলতে যায়, তার মুখের ওপরে যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখেছিলাম —যেন মনে হচ্ছিল তার মুখের দিকে চেয়ে, সে বুঝি পাগল হয়ে উঠেছে। তার কথামত ঠিক রাত্রি নটা বাজবার কিছু আগেই এখানে এসে আমি তার অপেক্ষায় বসে আছি। এমন সময় যেন মনে হল, আমারই ঠিক নীচের ঘরে কিসের একটা গোলমাল—

তারপর? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম।

তারপর—তারপর আমার ঠিক মনে নেই। এক সময় আস্তে আস্তে এই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। স্পষ্ট বুঝলাম, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে যেন অন্ধকারেই এই ঘরে এসে ঢুকেছে। একটা অজানিত ভয়ে সমস্ত শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পদশব্দেই বুঝেছিলাম, আমি যার অপেক্ষায় এখানে বসে আছি এ সেই শুভঙ্করদা নয়। অথচ ঘন অন্ধকারে বন্য পশুর মত আগন্তুক তখন ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। বরাবর আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই খপ করে সে আমার ডান হাতটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল, তারপর চাপাস্বরে উত্তেজিত ভাবে বললে, বন্ধু বৃথা এত রাত্রে এখানে এখনও বসে আছ। তোমার শুভঙ্করদার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না, কেননা তোমার সঙ্গে দেখা করবার চাইতেও তার ঢের বড় কাজ "কালো ভ্রমরে"র সঙ্গে আছে। তারপরই যেমন সে এসেছিল তেমনিই চলে গেল।

কী, কী বললেন? তীব্র উৎকণ্ঠায় যেন আমার কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল।

হ্যাঁ, বললে কালো ভ্রমরের সঙ্গে কাজ আছে। চেনেন নাকি?

কালো ভ্রমর! কালো ভ্রমর! এ কি ভয়ানক আশ্চর্য! নিজের হাতে যার মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম, সত্যই কি সে তাহলে সেদিন মরেনি? আমার মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে শুরু করল। পাঁচ-ছয় বছর আগেকার কতকগুলো ঘটনা ছায়াছবির মতই মানসপটে বার বার ভেসে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগল পর পর।

তারপরই সে চলে গেল? আবার প্রশ্ন করলাম যুবকটিকে।

হ্যাঁ, আর দ্বিতীয় কথাটি সে বলেনি। এদিকে সে চলে যাবার পর মনে হল, যে হাতটা সে আমার চেপে ধরেছিল, সেটা যেন কেমন ভিজে-ভিজে লাগছে। ব্যাপার কী দেখবার জন্য পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালালাম। কিন্তু টর্চের আলোয় হাতের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আতঙ্কে মুহূর্তে যেন সর্বশরীর আমার ঝিম ঝিম করে উঠল। তাজা লাল রক্তে আমার হাতের কবজী ও জামার আস্তিনটা রাঙা টুকটুকে হয়ে গেছে। উঃ, মাথার মধ্যে এখনো আমার কেমন করছে।

বলতে বলতে সহসা আমার সামনে তার হাত দুটো প্রসারিত করে বললে, এই দেখুন, এখনও সেই রক্তমাখা হাতের স্পর্শটুকু আমার জামার আস্তিনে সুস্পষ্ট ভাবেই বর্তমান।

আমি টর্চের আলো ফেলে দেখলাম, যুবকের দুধ-গরদের পাঞ্জাবির আস্তিনে রক্তের দাগ দারুণ বিভীষিকায় এখনো সুস্পষ্ট।

আচ্ছা, আপনি সেই লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন?

না, তাকে আমি জীবনে আর কোন দিনও দেখিনি। তাছাড়া ঘর অন্ধকার ছিল।

গলার স্বর আপনার কি পরিচিত বলে মনে হয়েছিল সেই লোকটার?

না, অমন অস্বাভাবিক স্বর আমি জীবনেও শুনিনি। চাপা অথচ গমগম করছে, মনে হচ্ছিল যেন বহুদূর থেকে সমুদ্রের ক্রুদ্ধ অস্পষ্ট গর্জনের মত।

কাউকে সন্দেহও করেন না?

না, না, না। আপনাকে তো আমি বলেছি, তাকে আমি চিনি না।

এতক্ষণে আমি আমার গলার স্বর কোমল থেকে কঠিন করলাম, দৃঢ়ভাবে বললাম, শুনুন, আপনার কোন ভয় নেই। আপনি যা জানেন সব কিছু কথা গোপন না করে আমাকে খুলে বলুন। আপনাকে কথা দিচ্ছি, কেউ আপনাকে আঘাত করতে পারবে না। আপনার সমস্ত বিপদে আমরা বুক পেতে দাঁড়াব। আপনার কোন ভয় নেই।

দয়া করুন। অনুগ্রহ করে আমায় যেতে দিন। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। এরপর মামার বাসায় গেলে যদি ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতে পারেন যে আমি এতক্ষণ বাইরে ছিলাম, তবে জুতো মারতে মারতে আমাকে তাঁর বাসা থেকে দূর করে দেবেন

চিরদিনের মত। আর তাছাড়া বর্তমানে কথা বলবার মত আমার স্নেহ ও মনের অবস্থা এতটুকুও নয়। এখন আমায় যেতে দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি যখনই ডাকবেন তখুনি আমি আপনার কাছে গিয়ে হাজির হব। আমার নাম অরুণ কর। ·· নং গ্রে স্ট্রীটে আমি থাকি। আমায় ছেড়ে দিন। আমি এখুনি পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে বাগান দিয়ে চলে যাব, কেউ দেখতে পাবে না, বাগানে আমার সাইকেল রয়েছে।

হ্যাঁ, আমি আপনাকে যেতে দিলেও পুলিস আপনাকে জেরা করতে ছাড়বে না, তারা আপনার জবানবন্দি নেবে তবে ছাড়বে।

দুর্ভাগ্যক্রমে যখন এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিই, জবানবন্দি আমার পুলিসকে দিতে হবে বৈকি, আর না দিলেই বা শুনছে কে? কিন্তু আজকে রাতের মত আমায় যেতে দিন।

বেশ, তাহলে আপনি এখন যেতে পারেন।

যুবক আমার নির্দেশ পাওয়া মাত্র নিঃশব্দে ঘর থেকে নিক্রান্ত হয়ে গেল। কতক্ষণ সেই অন্ধকার হলঘরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই, সহসা কার মৃদু স্পর্শে চমকে ফিরে চাইলাম, কে?

ভয় নেই, আমি কিরীটী। নীচে চল, রাত অনেক হয়েছে। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

কিরীটী বললে, এই বুঝি তোমার কর্তব্যজ্ঞান সুব্রত। যে কাজের জন্য তোমাকে পাঠালাম, তা একেবারে দেখতেও বেমালুম ভুলে গেলে? যাক গে, গুপ্তদ্বার যে নেই ও-ঘরে সে বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চিত হয়েছি। সেই ঘরটায় আপাততঃ তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু যুবকটি কে?

কিরীটীর কথা শেষ হবার পূর্বেই বললাম, যুবকটিকে আমার এভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি, এই কথাই তো এখন তুমি বলবে কিরীটী?

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু যাক, তুমি তার ঠিকানা তো রেখে দিয়েছ, সেই যথেষ্ট, যদিও ঠিকানা তার জানবার তেমন দরকার ছিল না।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, তার মানে?

ছেলেটির এক সময় প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ও নগদ টাকাকড়ি ছিল; এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দু-চারজনে যা নিয়েছে তা গিয়ে এখনও হয়তো যা ব্যাঙ্কে আছে অনেকেরই তা নেই। কিন্তু ছেলেটি এর মধ্যেই দশজনের কৃপায় জাহান্নমে গেছে। আমার চিন্তাশক্তির যদি গলদ না থাকে, তবে নিশ্চয়ই ছেলেটি আমাদের মৃগাঙ্ক

বন্ধুবর কালিদাস শর্মার বর্তমান "মনিব্যাগ"। অর্থাৎ ওরই ঘাড় ভেঙে বর্তমানে বেকার প্রফেসার বন্ধুটির আমাদের থাওয়া থাকা ও বিলাস-ব্যসনের সমস্ত খরচ চলেছে।

অ্যাঁ! বলো কি?

তাই।

* * *

সে রাতের মত মার্বেল প্যালেস থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে গাড়িতে এসে উঠে বসলাম।

রাত্রি শেষ হতে বড় বেশী দেরি নেই। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ঝিরঝির করে বইছে। বর্ষণক্লান্ত মেঘমুক্ত আকাশটা যেন তারার মৃদু আলোয় ঝকঝক করছে।

॥ নয় ॥

নিঃশব্দ গতিতে জনহীন রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি হু-হু করে ছুটে চলল। গাড়িতে বসে আনমনে ভাবছিলাম। আজ রাত্রের সমগ্র ব্যাপারগুলো একটার পর একটা এখনো যেন চোখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে ছায়াছবির মত। এবং আমার সমস্ত চিন্তাকে আবর্তিত করে একটা দৃশ্য মানসপটে কেবলই ভেসে উঠতে লাগল—লাল রক্তস্রোতের যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর সেই রক্তের ঢেউয়ের মধ্যে কালো অক্ষরে একটা নাম মাথা তুলে জেগে উঠছে, আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে।···কালো ভ্রমর। কালো ভ্রমর।

আজ দীর্ঘ আট বছর ধরে একটা বিভীষিকার মতই ঐ নামটা যেন আমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

কিরীটী আনমনে কি ভাবছে তা সে-ই জানে।

আমাকে আমহার্স্ট স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে কিরীটী চলে গেল।

নিজেকে কেন জানি বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগছিল। কোনমতে গায়ের পোশাকগুলো খুলে সোজা এসে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলাম, রাজু বোধ হয় জেগেই ছিল, আমার পদশব্দে সে শয্যায় পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি রে সুব্রত?

বিছানার ওপরে গা-টা এলিয়ে দিতে দিতে বললাম, বন্ধু, আমাদের পুরনো বন্ধু

শ্রীযুক্ত কালো ভ্রমর আবার যে আবির্ভূত হলেন নাটমঞ্চে!

কে? চমকে রাজু শয্যার ওপরে উঠে বসল।—কে আবির্ভূত হয়েছে?

কালো ভ্রমর। কেন, এর মধ্যেই নামটা ভুলে গেলি নাকি?

রাজু আবার শয্যার ওপরে গা এলিয়ে দিল, ঠাট্টা করবার আর সময় পেলি না এই শেষরাত্রে এসে · যা বাথরুম থেকে মাথায় চোখে মুখে ভাল করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে আয়। কোথায় ঘুরিস এত রাত পর্যন্ত? বলতে বলতে রাজু বেশ ভাল করে পালকের লেপটা টেনে পাশ ফিরে বোধ করি চোখ বুজল।

আমিও আর কোন কথা না বলে খোলা জানলার দিকে ফিরে শুলাম। চোখের পাতায় যেন ঘুম আসছে না।

খোলা জানলাপথে শীতের অন্ধকার রাতের একটুকরো আকাশ চোখে পড়ল শুকতারাটা দপদপ করে জ্বলছে।

ঝিরঝির করে রাত্রিশেষের শীতল হাওয়া ঘরে এসে ঢুকছে।

ঢং ঢং ঢং—দালানের ওয়াল-ক্লকটা রাত্রি তিনটে ঘোষণা করল।

উঃ, রাত্রি তিনটে বাজে।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, পরদিন—

এই সুব্রত, ওঠ্, ওঠ্। কিরীটীর ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল।

কখন এলে কিরীটী? লজ্জিত স্বরে বললাম।

* * *

আকাশে বাতাসে নাকি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক মহাযুদ্ধের কালো ইশারা জেগে উঠেছে। ইংলণ্ড, জার্মান ও রাশিয়ার যে যুদ্ধ আজ সমগ্র ইউরোপকে তোলপাড় করছে, শীঘ্রই নাকি সারা পৃথিবীতে সেই যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। রাজু আর সনৎদা তাই ব্যবসায় নেমেছে। এত বড় সুবর্ণ সুযোগ।

বড়বাজারের মোড়ে প্রকাণ্ড লোহার কারবার—রায় অ্যাণ্ড রায় কোম্পানী দিবারাত্র ওরা দুজন তাই নিয়েই ব্যস্ত।

আমার ওসব ব্যবসা-ট্যাবসা ভালও লাগে না, আনন্দও পাই না ওতে, তা কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরি।

বসবার ঘরে এসে আমি আর কিরীটী দু কাপ চা ঢেলে নিলাম। চা পানের প—
কিরীটী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, চল সুব্রত, আমার সঙ্গে একটু বেরুতে হবে

চলই না, দেখবে'খন। আচ্ছা সুব্রত গত রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতামত কী ?

গত রাত্রের ঘটনাটা যে আমি তেমন বুঝে উঠতে পেরেছি একথা বললে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথাই বলা হবে কিরীটী। তাছাড়া আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়, গত রাত্রের ঘটনার মধ্যে এমন কোন একটা ব্যাপার সত্যিই লুকিয়েছিল যা হয়তো আমাদের কারও নজরে পড়েনি এবং অনেক ঘটনাই থাকা সম্ভব যা কারও নজরে পড়ছে না আপাততঃ।

তাহলে নিশ্চয়ই এমন ধরনের কোন একটা ব্যাপার তোমার মনে উঁকি দিয়েছে সুব্রত কালকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে—বল না—বলছ না কেন ?

কাল রাত্রে মিঃ মিত্রের হত্যা সম্পর্কে যাদের জেরা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন বলেছেন—একজন বিকাশ মল্লিক, আর একজন অরুণ কর, যে মিঃ শুভঙ্কর মিত্র হিন্দী ভাষা জানতেন, লিখতে, পড়তে, বলতে তাঁর আটকাত না। প্রফেসার কালিদাস শর্মাকেও তুমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, কিন্তু তিনি স্পষ্টই বললেন, শুভঙ্করবাবুর হিন্দী-জ্ঞান 'করেঙ্গা' 'খায়েঙ্গা'র বেশী নয়। অর্থাৎ তাঁর মতে মিঃ মিত্রের হিন্দী-জ্ঞান আমাদেরই মত। এঁদের মধ্যে হয় অরুণ ও বিকাশবাবু, নয় প্রফেসার শর্মা মিথ্যে কথা বলেছেন নিশ্চয়ই।

চমৎকার। বাঃ সুব্রত, সত্যই আমি দেখে সুখী হয়েছি যে দিন দিন তোমার দেখবার ও বোঝবার শক্তি প্রখর হয়ে উঠছে। তুমি একদিন সত্যিকারের রহস্যভেদী হতে পারবে বন্ধু—কিন্তু এবার বল তো বন্ধু আমার, সত্যিই যদি তোমার মতে ওদের মধ্যে কেউ একজন মিথ্যা কথাই বলে থাকে—কেন, কী কারণে সে মিথ্যা বললে ? উদ্দেশ্য কী ছিল তার ?

কী জানি ভাই, তা তো বলতে পারছি না। সত্যি সত্যি একজন ভদ্র ব্যক্তি কি করে যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন তা সহজ বুদ্ধির বাইরে। তবে আমার যা মনে হয়েছে তাই বললাম।

কিন্তু তোমার মনে হয় কি কে এদের মধ্যে মিথ্যা কথা বলতে পারে বন্ধু ?

মনে হয় প্রফেসারই যেন মিথ্যা বলেছেন। তারপর ধর, হিন্দী ভাষায় অনূদিত "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" বইখানা

চমৎকার। সত্য সত্যই যে সুব্রত তুমি ভাবতে শিখেছ। বল বল। কিরীটী উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

দেখ আমার অনুমান হয়, কুমারসাহেবের বাড়ির খাবার ঘরটায় গতরাত্রে

আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে বলতে গেলে কেউই একপ্রকার ঢোকেনি। কেননা খাবার বন্দোবস্ত গতরাত্রে নীচের হলঘরেই হয়েছিল এবং সে অবস্থায় দু-একজন কেউ সে ঘরে ঢুকলেও পাশের ঘরে যে বাবুর্চি ছিল তার নজরে পড়ত, আর হয়েছিলও তাই। শুভঙ্করবাবু যখন খাবার ঘর থেকে বের হয়ে যান, বাবুর্চি দেখেছিল। সেখানে এমন বেশী লোক থাকতে পারে না যারা হিন্দীতে অনূদিত বই পড়তে সক্ষম। তাছাড়া সকলেই একবাক্যে অস্বীকার করেছেন, ও বইটা সম্পর্কে কেউ কিছু জানেন না। অথচ প্রফেসার ও শুভঙ্করবাবু দুই বন্ধু খাবার ঘরে অনেকক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। আমার যতদূর মনে হয় শুভঙ্করবাবুই নিজে ঐ বইখানা খাবার ঘরে একটা চেয়ারের ওপর ভুলে ফেলে আসেন অবং অরুণ করের সঙ্গে দেখা করবার সময় ঐ বইখানা নিয়ে যেতেন, অরুণ করকে উত্তেজিত করে মজা দেখবার জন্য, কেননা অরুণ কর হিন্দী ভাষা মোটেই পছন্দ করে না। সে যাই হোক, আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না, সত্যি ব্যাপারটা যদি আমার অনুমান মত হয়ে থাকে, তবে প্রফেসার শর্মা কেন বললেন না যে, মিঃ শুভঙ্কর মিত্রই বইখানা ঐ ঘরে ফেলে গিয়েছিলেন!

তাছাড়া আরও ভেবে দেখ, সত্যিই যদি মিঃ মিত্রই বইখানা সে ঘরে ফেলে গিয়ে থাকেন প্রফেসার শর্মা নিশ্চয় তা জানতেন, কিন্তু তিনি তা স্বীকার করলেন না, কিংবা এমনও হতে পারে প্রফেসার শর্মা নিজেই বইখানা ফেলে গিয়েছিলেন।

কিরীটী কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, দেখ সুব্রত, আমরা যতদূর জানি ও শুনেছি শুভঙ্করবাবু একটুও ঘোরপ্যাচের লোক ছিলেন না। কিন্তু ঘটনাগুলো পর পর এমন ভাবে দাঁড়াচ্ছে যে, লোকটা অত্যন্ত প্যাঁচোয়া ছিলেন মনে হচ্ছে। আপাততঃ চল, একবার দীনতারণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

বেশ চল।

দুজনে আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

॥ দশ ॥

টালিগঞ্জেই দীনতারণ চৌধুরীর বাড়ি।

ফটকওয়ালা একটা দোতলা বাড়ি। সামনেই গেটে কালো পাথরের ওপর

সোনার জলে দীনতারণ চৌধুরীর নাম লেখা।

Mr D. C Chowdhury

M. A. Bar-at-law.

ছোটখাটো একটা ফুলের বাগান, তারপরই বৈঠকখানা। দীনতারণবাবু বৈঠকখানা ঘরেই টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একরাশ কাগজপত্র চারপাশে ছড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে যেন কী সব দেখছিলেন। মাঝারি গোছের দোহারা চেহারা, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথা ভর্তি সুবিস্তীর্ণ টাক চকচক করছে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

আমাদের পদশব্দে চোখ তুলে চাইলেন, কী চাই? কে আপনারা?

সুপ্রভাত। আমরা বোধ হয় মিঃ চৌধুরীর সঙ্গেই কথা বলছি। কিরীটী বললে।

হ্যাঁ, বসুন। আপনারা?

আমার নাম কিরীটী রায়, আর ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী সুব্রত রায়। আমরা গতরাত্রে কুমারসাহেবের সেক্রেটারীর হত্যার ব্যাপারে প্রাইভেট তদন্তভার নিয়েছি।

ও বেশ, নমস্কার। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। আজ সকালের কাগজেই কুমারসাহেবের সেক্রেটারীর নিষ্ঠুর হত্যা ব্যাপার সম্পর্কে পড়েছি, ভাবছিলাম আর একটু বেলায় কুমারসাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আপনারা মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের হত্যা সংক্রান্ত কোন কিছুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আমার এখানে এসেছেন মিঃ রায়।

হ্যাঁ। আমিই জবাব দিই।

কিরীটী বলে, আপনার সঙ্গে মিঃ মিত্রের অনেকদিন থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল, তাই না মিঃ চৌধুরী?

আজ্ঞে ঠিক তা নয়, তবে শুভঙ্করের বাপ ছিলেন আমার পরম বন্ধু। বরানগরে একসময় তাঁর মত ধনী দ্বিতীয় আর ছিল না। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির লিগাল অ্যাড্‌-ভাইসার আমিই ছিলাম। শুভঙ্করের পিতার মৃত্যুর পর থেকে আমি শুভঙ্করেরও 'লিগাল অ্যাড্‌ভাইসার' ছিলাম বটে, কিন্তু ইদানীং তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আমার বড় একটা হত না, কারণ আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়েছিল। তবে কানাঘুষায় শুনেছিলাম, কয়েক বছর ধরে সে অত্যন্ত যা-তা ভাবে টাকাকড়ি খরচ করতে শুরু করায় সম্পত্তি নীলামে ওঠে এবং সে প্রায় পথের ফকির হয়ে পড়ে। অবিশ্যি এ সংবাদ সঠিক

কিনা তা জানি না।

আচ্ছা, সেদিন সন্ধ্যায় আপনার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কুমারসাহেবের বাড়িতে ?

হয়েছিল, মানে সে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল, আর কী সব জরুরী কথাবার্তা বলবে বলেছিল।

কথাবার্তা কী হল তাঁর সঙ্গে ?

সে বলেছিল ভবিষ্যতে আর যাতে তাকে দুঃখ পেতে না হয় সেই বন্দোবস্তই এবার সে করবে মনস্থ করেছে। সেই সব কারণেই তার হাজার দশেক টাকার দরকার। সে একটা ব্যবসা শুরু করবে। সে ব্যবসায় নাকি এই যুদ্ধের বাজারে খুবই লাভের সম্ভাবনা। সেই টাকাটা আমি তাকে কারও কাছ থেকে ধার করে দিতে পারি কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছিল।

কিন্তু আপনিই তো একটু আগে বল ছলেন, বর্তমানে নাকি তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আপনি কি জবাব দিলেন ?

বলেছিলাম চেষ্টা করে দেখতে পারি, কারণ বরানগরে তাঁর পৈতৃক আমলের যে ঘরবাড়ি এখনও আছে, তা বাঁধা রেখে হাজার দশেক কেন হাজার কুড়ি টাকা পাওয়াও এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হত না মিঃ রায়।

মিঃ চৌধুরী, আপনি জানেন মিঃ মিত্রের বাগানের শখ ছিল কিনা ?

না তো ! হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মিঃ রায় ?

জানেন গত সন্ধ্যায় কুমারসাহেবের বাথরুমে একটা ধারাল মাটি কোপানো খুরপি পাওয়া গেছে।

তবে একটা কথা মিঃ রায—মাস পাঁচ ছয় আগে শুভঙ্কর তখন সবে কুমারসাহেবের বাড়িতে চাকরি নিয়েছে, সেই চাকরি উপলক্ষ্যেই সে একদিন রাত্রে তার বাড়িতে বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এক বিরাট ভোজ দেয়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলেই প্রায় তখন চলে গেছেন। যাইনি শুধু আমি ও শুভঙ্করের শিশু বয়সের বন্ধু প্রফেসার কালিদাস শর্মা। এখানে চাকরি নেবার আগে শুভঙ্কর বছরখানেক প্রায় দেশভ্রমণ করে বেড়ায়। সে রাত্রে আমাদের কাছে শুভঙ্কর তার ভ্রমণ-কাহিনী বলছিল তার শয়নঘরে বসে বসেই এবং কথায় কথায় সাহিত্যও এসে পড়ল। কালিদাস এক-সময় বললে, আগে থেকেই চিন্তা করে চমৎকার উপায়ে যেসব খুনী খুন করে তাদের খুনের ধারাটা পরীক্ষা করে দেখলে মনে হয় যেন একটা রহস্যপূর্ণ উপন্যাস পড়ছি। বলে সে হাসতে লাগল।

সামনেই বসে শুভঙ্কর বরফ দিয়ে জিনজাব খাচ্ছিল মনে হল সে যেন একবার কেঁপে উঠল কথাটা শুনে। কথায় কথায় ক্রমে ইতিহাস ও রহস্যময় উপন্যাসের কথা উঠল। বক্তা প্রফেসাবের বলবাব অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে, সে বলতে লাগল, বিখ্যাত লেখক পোঁয়ের মত কল্পনা-শক্তি আমি কোন বাংলা সাহিত্যিক কেন, ইংবাজ সাহিত্যিকদেব মধ্যেও পাইনি। 'অ্যামনটিলাভো'ব গল্পটা হয়তো পড়েননি আপনি মিঃ চৌধুরী। যখনই পোঁয়েব সেই গল্পটা আমাব মনে পড়ে, কল্পনায় দৃশ্যটা আমাব চোখেব ওপব ভাসতে থাকে—সেখানে 'মনট্রেসব' 'ফবচুনেটো'কে নিয়ে মাটির নীচে কবরঘরেব দেওয়ালেব তলায় সমাধি দিতে চলেছে চিবজন্মেব মত। শুভঙ্কব সে গল্পটা তো একদিন তোমাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম, মনে নেই ? সেই যেখানে হতভাগ্য 'ফরচুনেটো' তাব অবশ্যম্ভাবী ভয়ঙ্কব বিপদেব কথা ঘুণাক্ষবেও টেব না পেয়ে তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কবছে, বল না সত্যিসত্যিই কি তুমি ম্যামকেব মাতৃসঙ্ঘের একজন মেম্বাব ? তাব জবাবে মনট্রেসব বললে, হ্যাঁ। এবং তাতে ফবচুনেটো প্রশ্ন কবলে, সেই সঙ্ঘেব চিহ্ন কি বল তো ? জবাবে মনট্রেসব বিদ্যুৎগতিতে তাব জামার ভিতব থেকে একটা 'খুবপি' চট্ কবে বেব কবে দেখাল।

বলতে বলতে সে সহসা শুভঙ্কবেব দিকে তাকিয়ে বললে, কি এব মধ্যেই সে গল্পটা ভুলে গেলে ? শুভঙ্কবেব দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন একটা ভয়ঙ্কর উদ্বেগে তাব সমস্ত মুখটা কালো হযে উঠেছে। সহসা এমন সময শুভঙ্কর টলতে টলতে চেয়াব ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পরক্ষণেই আবাব সে টলে পড়ে গেল। পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘবেব মধ্যে টেবিলের ওপবে যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল সেটা গড়িয়ে পড়ে ভেঙে গেল। একটা বিশ্রী ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়ে ঘবটা অন্ধকাব হযে গেল। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে শুভঙ্কবকে তুলতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে শুভঙ্কব নিজেই কোনমতে আবাব টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার ঘবের মধ্যে বাইবেব খানিকটা চাঁদের আলো যেন একান্ত অনাহুত ভাবেই এসে প্রবেশ করে ঘবেব মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলো-ছায়াব সৃষ্টি কবেছে। সেই আলোছায়াচ্ছন্ন ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুভঙ্কর আর কালিদাস দুজনেই দুজনেব দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে যেন পরস্পবেব অন্তর পর্যন্ত দেখছে।··

মিনিট দু-তিন এরকম কাটবার পব দুজনে আবাব স্থির হয়ে যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

মিঃ চৌধুরী চুপ করলেন। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তখনকার মত আমরা মিঃ চৌধুরীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

*

সন্ধ্যার অল্প পরেই কিরীটী, আমি ও ডাঃ চট্টরাজ বরানগরে শুভঙ্কর মিত্রের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড চকমিলান প্রাসাদতুল্য বাড়ি। লোহার গেটটা ভেজানোই ছিল। মৃদু একটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

সামনেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা নানা জাতীয় দেশী-বিদেশী মরশুমী ফুলের বাগান।

বাড়ির কোথাও একটা আলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অন্ধকারে নিঃশব্দে ভূতের মতই যেন বাড়িটা একটা বিভীষিকার মত স্তূপ বেঁধে আছে। ভয় করে। গায়ের মধ্যে ছমছম করে ওঠে।

দরজার কড়া নাড়তেই দরজাটা খুলে গেল। সামনেই আধাবয়েসী একটি ছোকরা দাঁড়িয়ে।

কিরীটীই জিজ্ঞাসা করল, কি রে, তোর নাম কি?

আজ্ঞে, মাধব, বাবু।

এ বাড়িতে কতদিন চাকরি করছিস?

মাত্র কয়েক সপ্তাহ হল বাবু আমাকে তাঁর কাজে বাহাল করেছিলেন। আমি তাঁর বেয়ারার কাজ করতাম।

বেশ, বাড়ির আর সব চাকরেরা কোথায় মাধব?

আজ্ঞে, অন্য চাকরবাকর তো কেউ আর নেই। কর্তা অনেক দিন আগেই তাদের ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

কেন?

তিনি বলেছিলেন মাস চার-পাঁচেকের জন্য তিনি নাকি কুমারসাহেবের সঙ্গে সিঙ্গাপুর যাবেন কী একটা কাজে।

ও, তাহলে তুই তাঁর খাস-চাকর ছিলি বল্?

আজ্ঞে সাধ্যমত তাঁর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে কোনদিনই আমি কসুর করিনি কর্তা। আমারও আপাততঃ চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার কথা কিছুদিনের মত। তারপর তিনি বলেছিলেন, সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এলে আবার আমাকে সংবাদ দেবেন।

কাল রাত্রে তুই তাহলে এখানেই ছিলি মাধব?

আজ্ঞে। এত বড় একটা বাড়িতে একা একা—শেষে রাত্রি একটার সময় কোনে

খবর পাই—আমাদের বাবু মারা গেছেন। বড় ভাল লোক ছিলেন কর্তা কিন্তু বাবু আশ্চর্য, তারই ঠিক কিছুক্ষণ আগে যেন মনে হল শব্দ পেলাম সদর দরজায় চাবি দিয়ে যেন কে দরজা খুলছে বাবু কখনো কখনো অনেক রাত্রে বাসায় ফিরতেন বলে আর একটা চাবি তাঁর কাছে থাকত। রাত্রে তিনি সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেন। আমি তাড়াতাড়ি নীচে গেলাম, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। ভাবলাম আমার শুনবারই ভুল হবে হয়তো।

ডাক্তার একবার মাথাটা দোলালেন কথাগুলো শুনে।

কটা চাবি তোর কর্তার সঙ্গে থাকত মাধব?

আজ্ঞে, তাঁর শোবার ঘরের, লাইব্রেরী ঘরের, বাইরের দরজার, অন্যান্য ঘরের ও সিন্দুকের কয়েকটা চাবি একটা রিংয়ে ভরা সর্বদাই কর্তার কাছে থাকত বাবু। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বাবু?

কাল দুপুরে যখন তিনি বাড়ি থেকে যান, তখনও তাঁর কাছে চাবির সেই রিংটা ছিল কিনা তুই জানিস মাধব?

আজ্ঞে জামা-কাপড় পরবার পর আমিই তাঁর অন্য একটা কোটের পকেট থেকে চাবির রিংটা এনে তাঁর হাতে দিই।

কাল কত রাত্রে তোর মনে হয়েছিল তোর বাবু ফিরে এসেছেন? ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

রাত প্রায় দেড়টা হবে বাবু বোধ করি।

আচ্ছা তুই যে বলছিলি বাবুর সিন্দুক আছে, কোন্ ঘরে সেটা?

আজ্ঞে দোতলায় বাবুর শোবার ঘরে।

একবার দেখাতে পারিস সে ঘরটা?

চলুন না।

আমরা সকলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলাম। লম্বা একটা টানা বারান্দা, তার উত্তর দিকে এক কোণে শুভঙ্করবাবুর শয়নঘর। কিন্তু ঘরের সামনে এসে আমরা সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলাম। দরজার গা-তালায় তখনও একটা চাবি সমেত চাবির রিং ঝুলছে।

মাধব বললে, তাই তো বাবু, ঐ কর্তার চাবির রিং, কিন্তু এটা দরজার গা-তালায় ঝুলছে দেখছি। এখানে কী করে এল ওটা, আশ্চর্য। তবে কি সত্যিই বাবু ফিরে এসেছিলেন রাত্রে?

তুই সকালে আর ওপরে আসিস্নি মাধব, না? কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

আজ্ঞে না।

তোর অনুমান ভুল হয়নি মাধব। এখন বোঝা যাচ্ছে সত্যই কাল রাত্রে কেউ এ বাড়িতে এসেছিল।

কিরীটী চাবি ঘুরিয়ে ধাক্কা দিয়ে শয়নঘরের দরজাটা খুলে ফেললে এবং মৃদুস্বরে বলতে লাগল, সুব্রত, ডাক্তার, এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয় কেন কাল রাত্রে মৃত শুভঙ্কর মিত্রের পকেট সার্চ করে আমার সন্দেহ হয়েছিল। একজন অবিবাহিত অল্প-বয়স্ক যুবকের কাছে অন্তত তার প্রাইভেট চাবিটা থাকা দরকার, কিন্তু সেটা নেই। এখন বুঝতে পারছেন, সবার অলক্ষ্যে কেমন করে খুনী মৃতব্যক্তির পকেট থেকে চাবি চুরি করে সরে পড়েছিল এবং চাবি নিয়ে সে যখন বরাবর এখানেই এসেছে, নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। কিন্তু সেটা কী? সেটা কী?

মিঃ মিত্রের শয়নঘরটি বেশ প্রশস্ত। দামী মেহগনী কাঠের তৈরী একটি খাটে পাতা বিছানা চমৎকার একটি লাল রংয়ের বেডকভার দিয়ে ঢাকা। ঘরের মধ্যে আসবাপত্রের তেমন বিশেষ কোন বাহুল্য নেই।

ঘরের দেওয়ালে বড় বড় সব অয়েল পেন্টিং টাঙানো। দরজার সামনেই শিকারীর স্যুট পরা মিঃ মিত্রের কয়েক বছর আগেকার তোলা বোধ হয় একটি ফটো। মিঃ মিত্র যেমন একজন পাকা শিকারী ছিলেন, তাঁর শিকারের শখও ছিল তেমনি ভয়ানক প্রবল। কিরীটী কিছুক্ষণ ফটোটার কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফটোটা দেখতে লাগল। তারপর একসময় আবার মাধবের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, ওই ঘরের দরজার ওদিকে একটা ঘর আছে, না রে মাধব?

আজ্ঞে বাবু। ওই ঘরেই বাবুর লেখাপড়া করবার টেবিল ও সিন্দুকটা আছে। চলুন।

আমরা সেই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। অল্প-পরিসর একখানি ঘর। এক পাশে একটা মাঝারি সাইজের সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও গোটা দুই গদিমোড়া চেয়ার। অন্যদিকে একটা প্রকাণ্ড বহুদিনের পুরনো লোহার সিন্দুক। চাবির রিংয়ের মধ্যেই সিন্দুকের চাবি ছিল। কিরীটী আলগোছে অতি সন্তর্পণে চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলে ফেললে, কিন্তু আশ্চর্য, সিন্দুক একদম খালি, একটি কাগজের টুকরো পর্যন্ত নেই তার মধ্যে।

কিরীটী বললে, তোর বাবুর সিন্দুক যে একেবারে খালি দেখছি মাধব! ব্যাপার কি, এর মধ্যে কি কিছু থাকত না?

আজ্ঞে, সে কি বাবু—সিন্দুকের মধ্যে যে অনেক দরকারী দলিলপত্র ছিল! কালও

বাবু যাওয়ার আগে আমার সামনে সিন্দুক খুলে কী একটা কাগজ নিয়ে আবার সিন্দুক আটকে রাখলেন। বাবু, আর সন্দেহ নেই আমার, নিশ্চয়ই কাল রাত্রে কেউ এসেছিল এ বাড়িতে। তা না হলে—,আর বাকি কথাগুলো সে শেষ করে না।

খুব সম্ভব। দেখ., এই সিন্দুকের গায়ে হাত দিস না। আচ্ছা মাধব, দেখ্ তো এই চাবির রিংয়ের মধ্যে তোর মনে পড়ে এমন কোন চাবি খোয়া গেছে কিনা? মানে সব চাবিই ঠিক আছে কিনা?

চাবির রিংটা মাধব হাতে নিয়ে মনে মনে এক-একটা চাবি দেখে কী যেন হিসাব করতে করতেই সহসা সবিস্ময়ে বলে উঠল, বাবু, অস্ত্রঘরের সেই বড় পিতলের চাবিটা তো এর মধ্যে কই দেখছি না।

অস্ত্রঘর। এ বাড়িতে আবার অস্ত্রঘরও আছে নাকি?

আজ্ঞে। মাটির নীচে এ বাড়িতে একটা ঘর আছে বাবু, সেখানে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র সব দেওয়ালে সাজানো আছে। কত সব পুরোনো দিনের অস্ত্র। কী অদ্ভুত সব দেখতে এক-একটা অস্ত্র। কর্তা আমাদের একদিন সবাইকে ডেকে নিয়ে দেখিয়েছিলেন। বাবুদের পূর্ব-পুরুষের মধ্যে নাকি কে একজন অত্যাচারী জমিদার ছিলেন, তিনিই ঐ ঘরটা দুষ্ট প্রজাদের কয়েদ করে রেখে শাস্তি দেবার জন্য বানিয়েছিলেন বলেছিলেন, পরে আমাদের বাবু সেটাকে অস্ত্রঘর করেছিলেন। শুধু যে সে ঘরে অস্ত্রই আছে বাবু তা নয়, নানারকম পশু-পক্ষীর হাড়-চামড়া, কত কী। দেখবেন, চলুন না।

চল্।

আমরা সকলে অগ্রসর হলাম।

মাধবই আমাদের অস্ত্রঘর দেখাবার জন্য নীচের তলায় চলল। জমিদারি আমলের বাড়ি। এর গঠন-কৌশলই সম্পূর্ণ আলাদা। বাড়ির একটা রান্নাঘর এবং রান্নাঘরের পাশ দিয়েই একটা দরজা। সেই দরজা খুললেই একটা সিঁড়ি, সেখানে কোন আলোর বন্দোবস্ত নেই। ওপরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে যতটুকু আলোর প্রবেশাধিকার দিয়েছে তাও অতি সামান্য। এর সেই আলো-আঁধারে আধো-আলোয় বহুকালের তৈরী মাটির নীচের কুঠরীর সন্ধানে আমরা সিঁড়ি বেয়ে চললাম। সুদূর এক অতীতে এই নির্জন কুঠরীতে কত হতভাগ্যের মর্মন্তুদ কান্নার অশ্রুত বিলাপধ্বনি হয়তো আজিও নিশীথ রাতের আঁধার বায়ুলেশহীন মাটির তলায় এই গুপ্ত কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে নিরুপায়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করে মরে। কত খুন-খারাপি, কত নির্মম অত্যাচার এই নির্জন অন্ধ কুঠরীতে একদিন অবাধে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোটা কুড়ি সিঁড়ি ডিঙিয়ে একটা ছোট বারান্দার মত জায়গায় এসে সকলে আমরা দাঁড়ালাম।

সামনেই প্রকাণ্ড একটা লোহার দরজা, দরজার গায়ে দেখা গেল একটা ভারি জার্মান তালা ঝুলছে। কিরীটী সামনের দেওয়ালে টর্চের আলো ফেলল, মনে হল বারান্দার একপাশের দেওয়ালে যেন খুব শীঘ্র চুনকাম করা হয়েছে।

অন্ধঘর দেখে আবার আমরা সকলে এক সময় ফিরে এলাম ওপরে।

কিরীটী ও ডাক্তার আবার ওপরে চলে গেল। আমি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। রান্নাঘরের পিছন দিককার দরজাটা খোলা দেখে সেইদিকে এগিয়ে গেলাম।

সামনেই প্রকাণ্ড একটা আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল ও অন্যান্য ফল ও ফুলের বাগান। বহুকালের অব্যবহারে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে খুব সামান্যই সূর্যের আলো বাগানে প্রবেশ লাভ করেছে। এক পাশে একটা প্রকাণ্ড দীঘি—প্রকাণ্ড পাথরের বাঁধানো রাণা। একটা বকুল গাছ তার ডালপালার একটা অংশ রাণার দিকে হেলিয়ে দিয়েছে।

বাঁধানো রাণার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ও কি! রাণার ওপর ডান হাতের ওপরে চিবুক রেখে গভীর চিন্তামগ্ন কে ও?

চিনতে কষ্ট হল না, গত রাত্রে কুমারসাহেবের বাড়িতে স্বল্প-পরিচিত সেই ভীতকাতর যুবক অরুণ কর।

আরো একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, এ কি, অরুণবাবু যে! নমস্কার।

অরুণবাবু একান্ত নির্লিপ্তভাবে আমার দিকে চোখ তুলে একবার তাকালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশেই রাণার ওপর বসে পড়লাম। তিনি আমাকে প্রতি-নমস্কারও জানালেন না, যেমন চুপ করে বসেছিলেন তেমনিই রইলেন।

আজ দিনের আলোয় ভাল করে ভদ্রলোককে দেখলাম আবার।

সত্যিই অতি সুন্দর আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা। আজও পরনে একটা দামী শান্তিপুরী ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি। মাথার চুল এলোমেলো বিস্রস্ত। মুখে সুস্পষ্ট একটা বিষণ্ণ চিন্তার ছায়া যেন ফুটে উঠেছে।

অরুণবাবু! আবার ডাকলাম।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে রীতিমত রুক্ষগলায় ভদ্রলোক বলে ওঠেন, যান যান মশাই, খুব আপনার কথার ঠিক! বললাম আমাকে চুপিচুপি যেতে দিন, সারাটা পথ দুজন লোক আমার পিছু পিছু ছায়ার মত আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে গেছে—ভাবেন আমি কিছু টের পাইনি! কেন মশাই, আমি কি খুন করেছি নাকি যে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন?

ও, এই কথা। আমি হাসতে লাগলাম, তা ওরা তো আমার লোক নয় অরুণবাবু। বোধ হয় পুলিসের লোক কেউ আপনাকে অনুসরণ করে দেখছিল, সত্যই আপনি আপনার বাড়ির যে ঠিকানাটা তাদের দিয়েছেন সেটাই আপনার আসল ঠিকানা কিনা। কিন্তু সে কথা যেতে দিন। পুলিসের লোকগুলোই অমনি ধরনের, কিন্তু বলুন তো, এ সময়ে এ-বাড়িতে এমন জায়গায় আপনি এমনি করে ভূতের মত একা একা চুপচাপ বসে বসে কি এত ভাবছিলেন ?

কি আর ভাবব। মনটা খারাপ লাগছিল শুভঙ্করদার মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে। বাসায় মন বসল না, তাই কখন এক সময় হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছি। ভদ্রলোকের চোখের কোণ দুটো সহসা যেন উপচীয়মান অশ্রুধারায় সজল হয়ে এল, মনে পড়ছিল কতদিন এই নির্জন পুকুরের বাণায় আমরা দুজনে বসে তার জীবনের কত সব রোমাঞ্চকর শিকারের অদ্ভুত গল্প শুনেছি। কত ভালবাসতেন আমাকে শুভঙ্করদা। বলতে বলতে হঠাৎ আবার অরুণ কর চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর একসময় আবার বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা, জানেন আজ সকালের দিকে আমি একবার কুমারসাহেবের ওখানে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় ওঁর সঙ্গে মিঃ মিত্রের কথা উঠতে কুমারসাহেব কী বললেন জানেন ?

কী ? আমি প্রশ্ন করলাম।

কুমারসাহেব বলছিলেন, শুভঙ্করদার পক্ষে নাকি মরণই মঙ্গল হয়েছে। কি নিষ্ঠুর অথচ কি আশ্চর্য দেখুন। যে লোকটা কুমারসাহেবের জন্য এত করল, তার মৃত্যুতে তাঁর চোখে একটু জল পর্যন্ত নেই। অথচ আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, এক মুহূর্ত তাঁর শুভঙ্করদাকে না হলে চলত না, প্রতি কাজে তাকে তাঁর প্রয়োজন হত। এরপর অরুণ কর কিছুক্ষণ আবার একেবারে চুপচাপ বসে রইলেন, বোধ হয় অতীত স্মৃতির বেদনায় মনটা ওঁর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল খুব বেশীই। আমিও নীরবে ওঁর পাশে চুপচাপ বসে রইলাম। এমন সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আচ্ছা এখন চললাম—সেই সকালে বের হয়েছি। যাবেন না আজ রাত্রে আমার বাসায়। কেউ নেই, মামা-মামী পরশু মধুপুর গেছেন, একদম খালি বাড়ি, সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। আসবেন কিন্তু, আসবেন তো ?

যাব। মৃদু স্বরে জবাব দিলাম।

অরুণবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমিও উঠলাম।

॥ এগার ॥

গাড়িতে বসে ফিরবার পথে কিরীটীকে একসময় প্রশ্ন করলাম, অনুসন্ধানের মত কিছু পেলে ?

না। একটা হাতের লেখার মত কিছু খুঁজছিলাম, কিন্তু পেলাম না। লোকটা দারুণ চালাক, আগে থেকেই সাবধান হয়ে যা কিছু প্রয়োজনীয় সব সরিয়ে ফেলেছে, তবু দুটো জিনিস পাওয়া গেছে।

কি ? কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

একটুকরো কাগজ আর এইচ, এইচ এইচ, মার্কা একটা জন ফেবারের 'লেড' পেনসিল। বলে গভীর আনন্দে কিরীটী তার বুকপকেটটার গায়ে হাত বুলিয়ে নিল— যেন বহুমূল্য কোন একটা দ্রব্য সেখানে সে বহু যত্নে লুকিয়ে রেখেছে।

ডাক্তার আগেই চলে গিয়েছিলেন। কথা ছিল তিনি পুলিস সার্জেনের ময়না-তদন্তের রিপোর্টটা নিয়ে তাঁর বাসাতেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

তাই গোটা তিনেকের সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা একবার লালবাজার থানায় পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

বর্তমান কেস সম্পর্কেই কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কিরীটীর নানা কথাবার্তা হল। কিরীটীর সঙ্গে পুলিস কমিশনারের খুব বেশী বন্ধুত্ব, অন্যান্য কথাবার্তার পর সাহেব একসময়ে বললেন, কুমারসাহেব এ ব্যাপারে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন মিঃ রায়। তিনি গভর্ণমেণ্টকে দশ হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে গেছেন—যে খুনিকে ধরিয়ে দিতে পারবে সে-ই ঐ পুরস্কার লাভ করবে।

তা বৈকি, কিরীটী বললো, তাঁর মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে এ বড় কম অসম্মানকর কথা নয়। আজ সংবাদপত্রে দেখছিলাম, বর্তমানে শ্রীপুরে যে টি-বি হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে গঙ্গার ধারে লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং যার সব কিছু ব্যয়ভার তিনিই নিয়েছেন—সেটা নাকি তাঁর কাকা স্যার দিগেন্দ্রর নামেই 'দিগেন্দ্র স্যানাটোরিয়াম' নাম দেওয়া হবে—তিনি ঘোষণা করেছেন।

পুলিস কমিশনারের ওখান হতে বিদায় নিয়ে আমরা ডাঃ চট্টরাজের বাসায় গিয়ে দেখি, তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। তাঁকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবং সকলে আমরা বরাবর কুমারসাহেবের ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। কথায় কথায় একসময় কিরীটী প্রশ্ন করল কুমারসাহেবকে, আচ্ছা, প্রফেসার শর্মা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন বলুন তো কুমারসাহেব ?

প্রফেসার শর্মার নামে কুমারসাহেবের সমস্ত শরীরটা যেন সহসা একবার কেঁপে উঠল মনে হল। পরক্ষণেই উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, প্রফেসার শর্মা মানুষের দেহে একটি শয়তান, মিঃ রায়। He is a dirty snake। Blood-sucking Vampire।

প্রফেসার শর্মা আপনার মৃত সেক্রেটারী শুভঙ্কর মিত্রের পরম বন্ধু ছিলেন, তা জানেন বোধ হয় কুমারসাহেব?

ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে বন্ধুত্বের অবসান হয়েছে। ভয়ঙ্কর লোক। লোকটা নাকি কি একটা নাটক লিখেছে এবং চেষ্টা করছিল নিরীহ শুভঙ্করকে দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা থিয়েটার-পার্টি খুলতে।

শুনলাম ওরা দুজনে পরস্পর পরস্পরকে নাকি চিনতেন?

একটা মৃদু হাসি কুমারসাহেবের ওষ্ঠপ্রান্তে জেগেই মিলিয়ে গেল, বুঝতে পেরেছি মিঃ রায়, আপনি কি সন্দেহ করছেন—প্রফেসার শর্মাই ছদ্মবেশী আমার কাকা স্যার দিগেন্দ্র কিনা, না? কিন্তু আমি বলছি তা নয়, তবে সে একজন ভয়ঙ্কর শয়তান বটে। তারপর যেন একটু থেমে হঠাৎ আবার আত্মগতভাবে বললেন, কিন্তু কাকার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না মিঃ রায়। মনে হচ্ছে এ বাড়ির কোথাও না কোথাও তিনি এখনও মৃত্যু-তৃষ্ণায় ওৎ পেতে বসে আছেন। হ্যাঁ, he is somewhere here। Somewhere here।

কুমারসাহেব আবার বলতে লাগলেন, এখন আর অবিশ্যি আমার বলতে বাধা নেই মিঃ রায়—কাল সন্ধ্যায় আমার সেক্রেটারী শুভঙ্কর আমাকে বলছিল, শীঘ্রই নাকি সে কোথায় টাকা পাচ্ছে। আর সেই টাকা দিয়ে সে নাকি শীঘ্রই একটা থিয়েটার খুলছে, planও প্রায় তৈরী।

আচ্ছা, সন্ধ্যার পরে প্রফেসার শর্মার বাসায় গেলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে বলে আপনার কি মনে হয় কুমারসাহেব?

তা ঠিক বলতে পারি না, তবে শুনেছি দমদমার একটা বাগানবাড়িতে 'তলোয়ার সঙ্ঘ' নামে একটা নাকি গুপ্ত সঙ্ঘ আছে, সেইখানে সে ও আমার মৃত সেক্রেটারী প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তলোয়ার খেলতে যেত। সন্ধ্যার পর তার বাসায় না পেলেও, সেখানেই হয়তো তাকে পেলেও পেতে পারেন। ঠিকানা দিতে পারি যদি চান।

আমাদের অনুরোধে কুমারসাহেব ঠিকানাটা দিয়ে দিলেন।

কুমারসাহেব, আপনি অরুণ কর বলে কাউকে চেনেন?

আমার মৃত সেক্রেটারীর একজন পরম ভক্ত ছিল শুনেছি। বেশ ছেলেটি। তেমন

বিশেষ কিছু নয়, সামান্য একটু-আধটু জানাশোনা হয়েছিল একবার।

দেখুন কুমারসাহেব, কিরীটী বলতে লাগল, একটা খুনের মামলার তদন্ত করতে গেলে অনেক অপ্রিয় ব্যাপারের সামনে আমাদের যেতে হয়, সেই জন্যই আগে বলে দিচ্ছি, যদি কোন সময়ে অপ্রিয় কিছু বলি তো মনে কিছু করবেন না যেন। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না যে, আপনার কাকা এমন কারও ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন, যিনি হয়তো মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন? এমন কি হয়তো আপনার সঙ্গেও পরিচয় ছিল সেই লোকটির?

না, সম্ভব নয়।

অবিশ্যি একথা খুবই সত্যি যে, আপনার নিজের কাকাকে আপনি যতটা চেনেন, আর কারও পক্ষে ততটা চেনা একেবারেই সম্ভবপর নয়। আচ্ছা আপনার মনে কি হয়, এমনভাবে কোন পরিচিত ব্যক্তির ছদ্মবেশে আপনার কাকা স্যার দিগেন্দ্র এখানে আসতে পারেন বলে?

না, বললাম তো, একেবারেই তা অসম্ভব। তাছাড়া আমার চোখকে তাঁর পক্ষে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয় মিঃ রায়। এ চিন্তাও বাতুলতা।

যাহোক, কুমারসাহেবের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরই দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী আমরা দমদমায় 'তলোয়ার সঙ্ঘ' অভিমুখে যাত্রা করলাম।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর সিঁথির কাছাকাছি এক পুরাতন বাগানবাড়িতে ঐ সঙ্ঘ।

লোহার গেটের মাথায় একটা কেরোসিনের বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। বাগানের মধ্যে বড় বড় সব আম ও ঝাউ গাছ। অন্ধকারে সোঁ সোঁ করে ঝাউপাতার একঘেয়ে কান্না শোনা যায়।

সঙ্ঘের কর্তা রাম সিং একজন যুদ্ধ-ফেরতা পাঞ্জাবী হাবিলদার সৈন্য।

কিরীটী ভৃত্যকে দিয়ে তাঁর কাছে কার্ড পাঠাতেই রাম সিং পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দানবের মতই উঁচু লম্বা চেহারা, অন্ধকারে যেন মূর্তিমান বিভীষিকার মতই প্রতীয়মান হয়।

রাম সিং আমাদের নিয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট কামরার মধ্যে বসালেন। তারপর আমাদের পরিচয় জেনে বললেন, আমিও মিঃ মিত্রের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি বাবু। বাঙালীর মধ্যে অমন চমৎকার তলোয়ার খেলতে আজ পর্যন্ত বড় একটা রাম সিংহের চোখে পড়েনি বাবু। মনটা আমার বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। বহুৎ আচ্ছা

আদমি থা।

আমি আপনার যে ঘরে খেলা হয়, সে ঘরটা একবার গোপনে দেখতে চাই রাম সিংজী।

আসুন না।

পাশের বারান্দা দিয়ে আমরা একটা প্রকাণ্ড হলঘরের খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরের আলো বারান্দায় এসেও খানিকটা পড়েছে।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে তীক্ষ্ণ সব তলোয়ার টাঙানো।

ঘরের মেঝেতে প্রফেসার শর্মা দাঁড়িয়ে। পরিধানে দামী কালো সার্জের লংস্ ও ঝোলা একটা জামা গায়ে। মাথার চুলগুলো ব্যাকব্রাস্ করা। দেহের প্রতিটি মাংসপেশী যেন সজাগ শক্তির অহমিকায় সুস্পষ্ট। ঘরের পরিবেশে আজ প্রফেসার শর্মাকে যেন চমৎকার মানিয়েছে।

হাতে একটা তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে তিনি চারপাশে বনবন শব্দে ঘোরাচ্ছেন। হঠাৎ এদিকে চোখ পড়তেই আমাদের সকল গোপনতা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কোন ইঙ্গিত দিলেন না।

এমন সময় একজন ভৃত্য একটা থালায় করে বড় বড় সব কাচের গ্লাসে বাদামের সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

উপস্থিত যাঁরা ছিলেন সকলেই এক-একটা গ্লাস থালার ওপর থেকে তুলে নিলেন।

প্রফেসার শর্মা একটা সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে, সেটা মাথার ওপর তুলে ধরে আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, এস, যে বন্ধু আমাদের মারা গেল তার আত্মার কল্যাণে ও যে এর পরে মরবে তার শুভ কামনায় এই সরবত আমরা প্রাণভরে পান করি। হুররে।

সমস্ত সরবতটা এক চুমুকে পান করে, শূন্য গ্লাসটা সামনের একটা টেবিলের ওপরে শর্মা নামিয়ে রাখলেন সশব্দে। তারপর এক পাক ঘুরে আবার বললেন, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথা আপনারা অবিশ্বাস করবেন না, শীঘ্রই আর একজনের মৃত্যু আসন্ন হয়ে এসেছে আমি স্পষ্ট সেটা যেন অনুভব করছি। বলতে বলতে প্রফেসার শর্মা হস্তধৃত তলোয়ারটার বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরলেন, বন্ধু সকল, আপনাদের মধ্যে কেউ আজ আমার সঙ্গে অসিমুখে শক্তি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত? আসুন তবে। একদিন তলোয়ার না খেললে যেন শরীর আমার ঝিমিয়ে আসে।

প্রফেসার শর্মার চোখে যখন আমরা পড়েই গেছি, তখন আর গোপনতার প্রয়োজনও নেই, তাই আমরা সকলে ঘরের মধ্যে গিয়েই প্রবেশ করলাম।

ওর বুকে একটা সত্যিকারের শক্তি ঘুমিয়ে আছে বাবু। ও সত্যি বীর। সাবাস, বেটা। রাম সিং বললে।

যাক গে, আপনাদের মধ্যে আমার সঙ্গে অসি খেলতে কারও সাহস নেই দেখছি। এই যে আমার নতুন বন্ধু মিঃ কিরীটী রায় এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আসুন না, আপনার সঙ্গেই এক হাত খেলা যাক। অবিশ্যি আপনাকে যথেষ্ট সুযোগ দেব।

অশেষ ধন্যবাদ প্রফেসার শর্মা। ওটায় আমি তেমন বপ্ত নই। কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দিল।

তাহলে আর কি হবে, হতাশ হতে হল। আজ তবে আসি সর্দার। গ্রে স্ট্রীটের দিকে একটা জরুরী কাজ আছে এখুনি যেতে হবে একবার। প্রফেসার শর্মা বলে ওঠেন।

আরে তাই নাকি, আমার বন্ধুরও তো রাত্রে আজ ও পাড়াতেই নিমন্ত্রণ। কি হে সুব্রত, অরুণ বসের বাড়িতে আজ তোমার নিমন্ত্রণ না? কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললে।

কিরীটীর কথায় প্রফেসার শর্মার চোখ দুটো সহসা একবার তীক্ষ্ণ হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

এরপর আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাম সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে উঠে বসলাম। রাত্রির অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলল।

কিরীটী একসময় হীরা সিংকে ডেকে আদেশ দিল, হীরা সিং, পথে মেছুয়াবাজারে একবার ডাঃ রুদ্রের ল্যাবরেটরীর সামনে থেমো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা সুব্রত, এককালে তো তুমি কলেজ-জীবনে শুনেছি একজন খুব নামকরা 'অ্যাথলেট্' ছিলে?

কেন বল তো হঠাৎ এ প্রশ্ন?

আচ্ছা তোমরা যখন কোন জায়গায় শো দেখাতে যেতে, তোমাদের সঙ্গে বড় বড় লাগেজ থাকত না?

তা থাকতে বৈকি। আমি জবাব দিলাম।

কিরীটী মৃদুস্বরে বললে, হুঁ, এবারে পাকা বন্দোবস্ত। সন্দেহ হবার যোটি নেই। কিরীটী অন্যমনস্ক ভাবে কী যেন ভাবতে লাগল এর পর।

যথাসময়ে আমাদের গাড়ি ডাঃ রুদ্রের ল্যাবরেটরীর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ডাঃ রুদ্র ল্যাবরেটরীতে ছিলেন না। তাঁর একজন সহকারী আমাদের এসে

অভ্যর্থনা করে সমাদরের সঙ্গে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল, বললে, বসুন, ডাক্তার একটা জরুরী কাজে বের হয়েছেন, ফিরতে একটু দেরি হবে।

সহকারীর হাতে কিরীটী পকেট থেকে একটা লেড পেনসিল বের করে দিয়ে বললে, ডাঃ রুদ্রকে এই পেনসিলটা একটিবার পরীক্ষা করে দেখতে বলবেন তো অমিযবাবু। আমি শুধু জানতে চাই পেনসিলটা কোন্ গ্রুপের। হ্যাঁ ভাল কথা, যে বইটা দিযে গিয়েছিলাম, তার থেকে ফটো নিযে ডেভলাপ করে দেখবার কথা ছিল, সেটা করা হযেছে কি?

আজ্ঞে, ফটোর নেগেটিভটা শুকোচ্ছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, সাধারণ লেখবার কালি দিযেই বইযের ওপর নামটা লেখা হযেছিল। বইয়ের ওপর নামটা পড়া গেছে পরিষ্কার।

খুব সুখবর। প্লেটটা এখনি দেখব'খন। হ্যাঁ, পুলিসের রিপোর্টটা কি সার্জেন দিযে যায়নি?

হ্যাঁ, ডাক্তার বলছিলেন মৃত মিঃ মিত্রের রক্ত ও হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিনি আফিংযের নেশায নাকি অভ্যস্ত ছিলেন, প্রায অন্তত বছর খানেক ধরে।

হুঁ। কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের জানালার কাছে যে আঙুলের ছাপের ফটো তোলা হযেছিল সেটার রিপোর্ট কী?

হুবহু স্যার দিগেন্দ্রর আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে গেছে স্যার।

বেশ। যে তলোযারটা সেই ঘরে পাওয়া গিযেছিল তার গাযে কোন আঙুলের ছাপ পাননি, না?

আজ্ঞে না।

সবই আপনারা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন তো অমিয়বাবু?

হ্যাঁ স্যার, সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখেছি।

এবারে কিরীটী আমার দিকে ফিরে তাকিযে বললে, আমাদের কথাবার্তা শুনে সুব্রত বোধ হয় খুব আশ্চর্য হযে গেছ, না? ডাক্তারও হয়তো হয়েছেন। কিন্তু একটা কথা কি জানেন? একটা 'ক্রাইম'কে অনুসন্ধান করে তার গোপন কথা জানতে হলে অনেক ছোটখাটো ব্যাপারেরও সাহায্য নিতে হয়। কারণ অনেক সামান্য ব্যাপারের মধ্যে কত সময় যে আমরা প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান পাই ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। একজন খুনী বা দোষীকে খুঁজে বের করতে হলেই যে টনটনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে তার কোন মানে নেই—সামান্য বিচার বুদ্ধি ও common sense থাকলেই যে কেউ খুনীকে অনায়াসেই খুঁজে বের করতে পারেন।

অন্তত আমার বিশ্বাস তো তাই।

এরপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, জানি জীবনে শত পরাজয় আছে এবং সেইজন্যই হঠাৎ পাওয়া একটি দিনের জয়ের আনন্দ অতীতের সমস্ত পরাজয়ের বেদনায় যেন শান্তিবারি ছিটিয়ে দেয়। ঐ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সহজ বিচার-বুদ্ধি আছে বলেই জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কখনো হতাশ হইনি। যে কোন রহস্যই আমার কাছে বিচার ও বিশ্লেষণে অল্প সময়ের মধ্যে সহজ হয়ে গেছে। যা হোক, এবার আমাদের উঠতে হয়, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হল। বলতে বলতে কিরীটী আমার ও ডাক্তারের চোখের সামনে একটা টাইপ করা কাগজ মেলে ধরল, তাতে এই কটা কথা লেখা।

"প্রফেসার কালিদাস শর্মা,—খোঁজ নিয়ে দেখলাম লোকটার বাড়ি ও জন্মস্থান কাশীতে। ওইখানেই এবং পরে পাটনায় ও কাশীতে ওঁর জীবনের চব্বিশটা বছর কাটিয়েছেন। ওঁর পিতার নাম স্বর্গীয় জ্ঞানদাস শর্মা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে এম এ ডিগ্রী নেন। তার পর কলকাতায় ১৯৩৬ সন থেকে প্রফেসারী শুরু করেন। কিন্তু একটি বৎসর না যেতেই ১৯৩৭ সালে কলেজ সংক্রান্ত কতকগুলো কী ব্যাপার নিয়ে চাকরী যায়। বর্তমানে তিনি কোথাও কোন কাজ করেন না, তবে প্রায়ই দেখা গেছে অরুণ করের নাম সই করা চেক ব্যাঙ্ক থেকে উনি ভাঙিয়ে নিয়েছেন।"

কিরীটী আমাদের দিকে একবার চেয়ে অদ্ভুত একটু হেসে কাগজটা মুড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল। চল, আশা করি এর পর আর রহস্যের মূল সূত্রটি খুঁজে পেতে তোমাদের কারও কষ্ট হবে না।

গাড়িতে বসে কিরীটী বললে, তাহলে সুব্রত, তুমি তো অরুণ করের বাড়িতেই যাবে, না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা। আমার একটা জরুরী কাজ আছে অন্য জায়গায়, আমি আপাতত সেইখানেই যাব।

॥ বারো ॥

আমার গাড়িটা আজ ক'দিন হতে বিগড়ে আছে, অগত্যা বাসে চেপেই অরুণ করের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললাম। রাত্রি তখন সাড়ে আটটা হবে, গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে বাস থেকে নামলাম। অরুণ করের দেওয়া ঠিকানা মত তাঁর বাড়িটা খুঁজে নিতে আমার

বিশেষ কোন বেগ পেতে হল না। ট্রাম রাস্তার পিছনে একটা গলির মধ্য দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে অরুণ করের বাড়ি। চমৎকার আধুনিক প্যাটার্নের কংক্রীটের তৈরী মাঝারি গোছের একখানা দ্বিতল বাড়ি, লোহার গেট পার হলেই সামনেই একটা 'লন'—লাল সুরকি ঢালা রাস্তা বরাবর দরজা পর্যন্ত গেছে, দু'পাশে কেয়ারী করা মেহেদির বেড়া ও নানাজাতীয় প্রচুর মরসুমী ফুলের সৌন্দর্যের সমারোহ। তারপরই সাদা ধবধবে বাড়িখানি একটা সুমিষ্ট ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়ে আনে।

করিডোরের সামনেই বোধ করি ড্রয়িংরুম। সূক্ষ্ম সিল্কের নেটের সবুজ পর্দা ভেদ করে ঘরের আলোর আভাস এদিকে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ড্রয়িংরুমে নিশ্চয় কারা বসে আছে মনে হল আমার, কারণ মৃদু কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

সহসা একটা তীক্ষ্ণ গলার স্বর শোনা গেল, না, না—এ আমি সহ্য করব না। কিছুতেই সহ্য করব না। বুঝে দেখ অরুণ, ভেবে দেখ!

চমকে উঠলাম। প্রফেসার শর্মার গলা। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বরে অতি কষ্টে অরুণবাবু যেন জবাব দিলেন, কেন এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন মিঃ শর্মা? এর চাইতে একটুও বেশী আমি জানি না। আর জানতামও না।

তাহলে এই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, কর?

হ্যাঁ। কিন্তু প্রফেসার এবারে আপনাকে যেতে হবে। আমার একজন বন্ধুর এখানে আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে। হয়তো এখুনি তিনি এসে পৌছবেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

ভিতর থেকে আহ্বান এল, আসুন ভিতরে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, চমৎকার আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত একখানি ড্রয়িংরুম, চারদিকে সোফা-কাউচ। মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের টেবিলে প্রকাণ্ড একটা জয়পুরী ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা শুভ্র রজনীগন্ধা। বাতাসে তার মিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আসুন, আসুন সুব্রতবাবু। অরুণবাবু বললেন, এঁকে চেনেন তো? প্রফেসার কালিদাস শর্মা—আমার বিশেষ বন্ধু।

হ্যাঁ, চিনি বৈকি।

নমস্কার সুব্রতবাবু। তারপর প্রফেসার নিঃশব্দে টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আচ্ছা শুভরাত্রি অরুণ, শুভরাত্রি সুব্রতবাবু। আমার

গাড়ি গলির মুখেই আছে, আমি পিছনের দরজা দিয়েই চললাম।

প্রফেসার নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ অরুণবাবু চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ একসময় বললেন, চা আনতে বলি সুব্রতবাবু?

না, থাক। এত রাত্রে আর চা খাব না।

আপনিও একজন ডিটেকটিভ, না সুব্রতবাবু?

না।

ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকগুলোকে আমার চিরকালই খুব ভাল লাগে, জানেন সুব্রতবাবু।

কেন বলুন তো?

আমার কথার কোন জবাব দিলেন না অরুণবাবু, চুপপচাপ বসে রইলেন, তারপর সহসা একসময় বললেন, চলুন, পিছনের বাগানে আমাদের খাবার আয়োজন করেছি। বাগানের মধ্যে টেবিল-চেয়ার পাতা, মাথার উপরে চীনা-লণ্ঠনের পীতাভ আলো। চলুন। চমৎকার আইডিয়া, না?

আমরা দুজনেই উঠলাম।

বাড়ির পিছনে ছোটখাটো একটি ফুলের ও ফলের বাগান আছে। একটা কামিনী গাছের তলায় টেবিল-চেয়ার পেতে খাবার আয়োজন করা হয়েছে।

শীতের রাত্রে এই খোলা বাগানে বসে খাওয়া হাসি পাচ্ছিল। মাথার ওপরে গাছের ডালে ঝুলছে গোটাচারেক চীনা-লণ্ঠন। একটা পীতাভ আলোয় চারিদিক যেন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে।

এও এক অভিজ্ঞতা।

বাবুর্চি এসে টেবিলে খাবার দিয়ে গেল। গল্প করতে করতে আমরা খাওয়া শুরু করলাম। কথায় কথায় সাহিত্য নিয়ে তর্ক উঠল।

অরুণবাবু বলতে লাগলেন, রূপকথা পড়তে আমার বড় ভাল লাগে সুব্রতবাবু, একজন বন্ধুর মুখে একদিন আমি "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" রূপকথাটা শুনেছিলাম, বন্ধু আমাকে বইখানা এনে দেবেও বলেছিল। এনেও দিয়েছিল, অথচ বইখানা হিন্দীতে অনূদিত। উঃ, কি বিচ্ছিরি ঐ হিন্দী ভাষাটা। আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। শেষটা আমি নিজেই একটা বাংলায় লেখা বই কিনি।

অরুণ করের কথায় আমার সহসা যেন তরতর করে দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে উঠেছে বলে মনে হতে লাগল। তারপর আবার একসময় আত্মগতভাবেই তিনি বলতে লাগলেন, মানুষ মরেই, তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু আমি গোলমাল ভালবাসি

না। শান্তি চাই। সম্পূর্ণ শান্তি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর আমরা দুজনে বাগানে নানা গল্প করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মাথার উপরে নিঃশব্দ শীতের রাত্রি। রাতের চোরা হাওয়ায় বাগানের গাছপালার পাতায় পাতায় মাঝে মাঝে সিপ্‌ সিপ্‌ শব্দ জাগে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব।

বাগানের এক দিকে একটা কৃত্রিম ফোয়ারা থেকে ঝিরঝির করে জল পড়েছে। ফোয়ারার চার পাশ শ্বেতপাথরে গোল করে বাঁধানো।

ক্ষীণ অষ্টমীর চাঁদ মৃদু আলো বিকীরণ করছে শীতের আবরণের গায়ে। একটা বড় শিশু গাছের তলায় আসতেই সহসা অরুণবাবু পায়ে কি বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে উঃ বলে নিজেকে যেন কোনমতে সামলে নিলেন।

আমি শশব্যস্তে তাঁকে ধরে সামলাতে গিয়ে মৃদু চাঁদের আলোয় সামনের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গেলাম। রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ বাগানের মধ্যে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গলাটা ধড় থেকে প্রায় দু ভাগ হয়ে এসেছে, সামান্যর জন্য একেবারে পৃথক হয়নি।

সেই অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতেও চিনতে আমাদের কষ্ট হয়নি মৃতদেহটি কার। মৃতদেহটি প্রফেসার কালিদাস শর্মার।

একটা আর্ত চিৎকার করে হঠাৎ অরুণবাবু অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

অদৃশ্য আততায়ীর মরণ পরশ আবার নিঃশব্দে একজনকে গ্রাস করল।

উঃ কী ভয়ানক দৃশ্য। কী নিষ্ঠুর হত্যা। কী দানবীয় কাণ্ড।

একটা অশরীরী আতঙ্ক যেন মৃদু পদবিক্ষেপে বাগানের গাছের আড়ালে আড়ালে অন্ধকারে এগিয়ে আসছে। প্রথমটায় বেশ একটু যেন হকচকিয়েই গিয়েছিলাম, তারপর ঝরনা থেকে জল এনে জ্ঞানহীন অরুণবাবুর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগলাম, কিছুক্ষণ বাদে অরুণবাবুর জ্ঞান ফিরে এল। তারপর অরুণবাবু খানিকটা সময় গুম্‌ হয়ে বসে থেকে একসময় হঠাৎ পাগলের মতই হাঃ হাঃ করে অদ্ভুতভাবে হাসতে শুরু করলেন।

উঃ, সে কী তীব্র হাসি। কবর ভেঙে যেন কোন অশরীরী প্রেতাত্মা এসে এখানে উন্মাদের মত হাসছে।

আমি অরুণবাবুর হাত ধরে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কী হাসছেন পাগলের মত। থামুন, থামুন অরুণবাবু। অরুণবাবু, শুনছেন? আপনি কি পাগল হলেন? অরুণবাবু পূর্বের মতই উন্মাদ হাসি হাসতে হাসতে অদূরে একটা ঝোপের

দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলেন, আমি দেখেছি তাকে সন্ধ্যাবেলা ঐ ঝোপের ধারে। আমি দেখেছি। জানি সে কে। সে মরে গিয়েও আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসা। হাঃ হাঃ হাঃ।

আঃ, অরুণবাবু! থামাবেন আপনার হাসি?

এবারে যেন অরুণ কর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেললেন।

থেমেছি। আর হাসব না। কিন্তু আমি জানতাম যে সে মরবে। কিন্তু আমার বাড়িতেই বাগানের মধ্যে এমনি করে নিজেকে নিজে হত্যা করল।

কী পাগলের মত বকছেন যা-তা? আত্মহত্যা করলে মাথা ওরকম দেহ থেকে প্রায় পৃথক হয়ে আসতে পারে নাকি?

সহসা যেন অরুণবাবু আমার কথায় চমকে উঠলেন। কী বললেন সুব্রতবাবু - তবে সত্যি কি সে আত্মহত্যা করেনি? তবে কে তাকে এত রাত্রে খুন করে গেল অমন করে? সে নিজে নিজেকে তবে হত্যা করেনি? খুন করেছে ওকে। না, না, আত্মহত্যা করেছে ও, হ্যাঁ, আত্মহত্যাই করেছে, আপনি জানেন না।

না। আত্মহত্যা নয়, কেউ খুনই করেছে। ভাল করে দেখুন না।

তবে কে হত্যা করলে তাকে অমন করে? কে? কে?

তা কী করে জানব? নিশ্চয়ই কেউ করেছে।

সহসা যেন অরুণবাবুর সমস্ত মুখখানা রক্তহীন পাংশু হয়ে গেল। অর্থহীন দৃষ্টিতে অদূরে অন্ধকার ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অদূরে ঝোপের অন্ধকারে হঠাৎ একটা যেন সিগারেটের লাল আগুন দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দও শুনতে পেলাম যেন। তারপরই পরিচিত গলার আওয়াজ কানে এল।

সুব্রত, এখানে উপস্থিত থেকেও তুমি এমন করে খুন হতে দিলে? একটু বাধা দিতে পারলে না?

কালো সার্জের স্যুট পরা, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ঝোপের আড়াল থেকে ধীরপদে কিরীটী বের হয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

কিরীটী, তুমি এখানে! অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, হত্যাকারীকে তাহলে তুমি দেখতে পেয়েছ নিশ্চয়ই?

না, দেখিনি। কিন্তু অরুণবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আগে ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও। তারপর বলছি কেমন করে এখানে এলাম।

আমি অরুণবাবুকে তখন চাকরদের সাহায্যে তাঁর শোবার ঘরে পৌঁছে দিলাম।

কিরীটীও পিছনে পিছনে এসে ঘরে ঢুকল।—বেচারী অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন

এবং অসুস্থও হয়ে পড়েছেন। পাশের ঘরে ফোন আছে, একজন ডাক্তারকে ফোন করে দাও আগে সুব্রত। ইতিমধ্যে আমি একবার বাইরেটা ঘুরে আসি। ওঁর শ্বাসপ্রশ্বাস যে রকম ভাবে পড়ছে, এখুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

কিরীটী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। আমি অরুণবাবুর পাশেই বসে রইলাম।

একসময় চেয়ে দেখি, অরুণবাবু ক্লান্তিভবে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পাশেব ঘবেই টেলিফোন ছিল, গাইড দেখে একজন ডাক্তাবকে কল দিলাম, তাবপব কিবীটীব খোঁজে বাইবে গেলাম।

বাগানে ঢুকে দেখি অন্ধকাবে টর্চেব আলো ফেলে ফেলে কিবীটী বাগানেব মধ্যে কিসেব সন্ধানে যেন ঘুবে বেড়াচ্ছে।

পদশব্দে কিবীটী আমাব সামনে এসে দাঁড়াল। অস্থিব অসংযত চাপা স্বরে বললে, উঃ সুব্রত, আমি একটা আস্ত গাধা। সত্যি বলছি, আমি একটা গাধা। আমি ভুল লোককে পাহাবা দিচ্ছিলাম এতক্ষণ। সত্যি এ ভুলেব প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু কাল বাত্রেও আমি জানতাম না সত্যিকাবেব খুনী কে। আমি তোমাব কাছে প্রতিজ্ঞা কবছি সুব্রত, কাল বাত্রেব আগেই খুনীকে আমি ধবিযে দেব। আব তা যদি না পাবি, আমি কিবীটী বাযই নই। এস। উত্তেজনায কিবীটীব কণ্ঠস্বব শেষেব দিকে যেন কাঁপছিল।

কিছু বুঝতে পাবলে? আমি প্রশ্ন কবলাম।

এস তোমাকে দেখাই।

চল।

আমবা দুজনে মৃতদেহেব কাছে দাঁড়ালাম বাগানে।

কিবীটী বলতে লাগল, ভাল কবে চেয়ে দেখ, অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে এঁকে খুন করা হয়নি। প্রথমে কেউ প্রফেসাবকে দুবাব ছোবা মেবেছে, একবাব পিছন দিকে পিঠে, আব একবাব পাশেব পাজবায। তাবপব কোন ধাবালো অস্ত্র দিযে দেহ থেকে মাথাটা পৃথক কবে ফেলেছে। চেয়ে দেখ, দু'টি কশেরুকাব (vertıbra) মধ্যবর্তী তরুণাস্থিব (cartılage) মধ্য দিয়ে আঘাত কবা হযেছে। সাধাবণ লোক এভাবে আঘাত কবতে পাবে না। যে আঘাত করেছে, মানবদেহেব গঠন-প্রণালী সম্পর্কে তাব সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। অস্ত্রবিদ্যায (surgery) সুপণ্ডিত না হলে এভাবে হত্যা কবা একেবাবেই অসম্ভব। আব wound দেখে মনে হয় এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া কোন ভারী অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। অনেকটা বর্মার একপ্রকার অস্ত্রের মত। তারপর কিরীটী টর্চের আলো ফেলে দেখাল, ঐ যে সরু রাস্তাটা বরাবর

বাগানের মধ্য দিয়ে বাগানের পিছনের দরজা পর্যন্ত গেছে, দেখ ওখানে রক্তের দাগ রয়েছে। খুব সম্ভব দরজার কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে জানালা-পথে প্রফেসার তোমাদের লক্ষ্য করছিলেন, এমন সময় হত্যাকারী পিছনের দরজা দিয়ে এসে পিছন থেকে প্রফেসারকে ছোরা বসায় পিঠে। ছোরার আঘাত খেয়ে প্রফেসার সামনের দিকে চলে আসেন। সেই সময় পিছন থেকে হত্যাকারী হতভাগ্যের গলা কেটে ফেলবার চেষ্টা করে।

উঃ, আর কয়েক সেকেণ্ড আগেও যদি বাগানে আসতাম কিরীটী, তবে হত্যাটা হত না। কিন্তু আশ্চর্য, কোন চিৎকার বা শব্দও তো শুনতে পাইনি। দুঃখিত স্বরে বললাম।

পাওনি তার কারণ আহত ব্যক্তি চিৎকার করবারও সময় পায়নি—it was so sudden। কিন্তু সে কথা থাক। যা হয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। চল আর একবার সব ঘুরে ভাল করে দেখা যাক।

বাগানের পিছনের দরজা দিয়ে গলিপথে এসে দাঁড়ালাম দুজনে।

সামনেই একটা পোড়ো মাঠ। তার ওদিকে কতকগুলো খোলার বস্তি।

অনেক দূরে দূরে এক-একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। সাধারণতঃ এই অপ্রশস্ত পথটা কুলি-কামিন ছাড়া আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হয় না।

গতরাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই এই গলিপথের কাদা এখনও শুকোয়নি। ঐ দেখ অন্ধকারে এখনও প্রফেসারের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানতাম খুনী আজ এখানে আসবে, কিন্তু কেন? খুনী এখানে নিশ্চয়ই কোন ট্যাক্সিতে চেপে এসেছে, কিন্তু বাগানের দরজা পর্যন্ত আসেনি। পাছে তার ড্রাইভারের মনে কোনপ্রকার সন্দেহ জাগে। চল, এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক কতদূর পর্যন্ত ট্যাক্সি এগিয়েছিল।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরই আমরা গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেলাম ভিজে রাস্তার ওপর। তাহলে কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, আজ রাত্রে খুনী যখন এখানে আসে তখন সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, কিন্তু যে অস্ত্র দিয়ে সে হত্যা করেছে সেটা রক্তাক্ত অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে যায়নি, পাছে ড্রাইভারের মনে সন্দেহ জাগে। ফেলে রেখে গেছে সে সেটা নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায়? চল বাগানটা খুঁজে দেখি। থানায় খোঁজ নিলেই ট্যাক্সি এসোসিয়েশন থেকে আজ এমন সময় কোন ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছিল কিনা অনায়াসেই জানতে পারব।

সত্যিই বাগানে খুঁজতে খুঁজতে একটা বকুল গাছের গোড়ায় ছুরিটা পাওয়া গেল।

কিরীটী বললে, থাক, ছুরিটা ধরো না, চল অরুণবাবুর ঘরে যাই। এখুনি থানায় গিয়ে আমি হরিচরণকে এখানে পাঠাব। ভিজে মাটির বুকে অপরাধীর পায়ের দাগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কেননা ট্যাক্সি থেকে নেমে বাকি পথটা সে হেঁটেই বাগানে এসেছিল। এবারে চল, ভিতরে যাওয়া যাক।

ঘরে ঢুকে দেখি একজন ডাক্তার এসেছে, অরুণবাবুকে পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে তিনি বিদায় নিলে আমরা চলে এলাম।

* * *

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে কিরীটী ফোনে আমায় একবার ডাকল, এখুনি তার ওখানে একবার যেতে হবে, খুব জরুরী। ডাঃ চট্টরাজও তার ওখানেই অপেক্ষা করছেন।

কিরীটীর ওখানে গিয়ে তার গাড়িতেই আমরা সোজা কুমারসাহেবের বাড়িতে গেলাম। দরজার গোড়াতেই ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, কুমারসাহেব বাড়ি নেই, আজ দুপুরের ট্রেনে নাকি মধুপুর গেছেন কী একটা জরুরী কাজে। কাল রাত্রে ট্রেনে ফিরবেন।

একসময় কিরীটী বললে, শুনেছেন ম্যানেজারবাবু, প্রফেসার শর্মা কাল রাত্রে খুন হয়েছেন?

অ্যাঁ! সে কি—কেন? কেন খুন হলেন? লোক তো খারাপ ছিলেন না নেহাৎ, তবে—, তারপর হঠাৎ কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে বললেন, খুনীকে নিশ্চয় ধরেছেন, মিঃ রায়।

হ্যাঁ। আচ্ছা প্রফেসার শর্মা সম্পর্কে আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—আশা করি সঠিক জবাব পাব।

মৃদু হেসে ম্যানেজারবাবু জবাব দিলেন, কিরীটীবাবু কি মনে করেন, প্রফেসার শর্মার হত্যা সম্পর্কে কোন কিছু আমি জানি।

না, সেজন্য নয়, তাঁর সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানা প্রয়োজন, তাই। আচ্ছা শুনেছি নাকি ভদ্রলোকের জন্ম ও জন্মাবার পর অনেক দিন তাঁর কাশীতেই কেটেছিল? অথচ তিনি বলতেন, তিনি বহুকাল বাংলা দেশেই আছেন এবং জন্মও নাকি তাঁর এই দেশেই। তাছাড়া অরুণবাবু যে সমস্ত চেক শর্মাকে দিতেন, আপনি নাকি সেগুলো আপনার অ্যাকাউণ্টেই ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে দিতেন? একথা কি সত্যি ম্যানেজারবাবু?

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা মশাই। আমার নিজের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্টে কারও চেক আমি

কোনদিনই ভাঙাইনি।—

বেশ। শুনেছি তিনি একটা নাটক লিখেছিলেন এবং সেই নাটক নিয়ে থিয়েটার খুলবার জন্য কুমারসাহেবের কাছ থেকে শুভঙ্করবাবুর সাহায্যে টাকা আদায় করবার চেষ্টায় ছিলেন, এ কথা কি সত্যি?

হ্যাঁ, আমিও তা শুনেছি বটে।

* * *

আমরা 'মার্বেল হাউস' থেকে বের হয়ে গাড়িতে চেপে বিকাশ মল্লিকের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম।

বিকাশবাবু তখন বের হবার আয়োজন করছেন, আমাদের দেখে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন।

তারপর কিরীটীবাবু, কি মনে করে? আপনার 'কেস' কতদূর এগুলো?

আপনি প্রফেসার শর্মাকে চিনতেন, বিকাশবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করল।

সামান্যই চেনা-পরিচয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে প্রায়ই আমি অনেক কথা শুনতাম। উনি বেশ চমৎকার 'হিন্দী' বলতে কইতে পারতেন। শুভঙ্করবাবুর বাড়িতেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নেহাৎ মন্দ লোক বলে তাঁকে আমার কোনদিন তো মনে হয়নি। তবে একটু যেন 'হামবড়া' গোছের লোক ছিলেন। এরপর আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা বিদায় নিলাম।

* * *

গাড়ি কালীঘাট ব্রীজ পার হতেই কিরীটী হীরা সিংকে বললে, টালিগঞ্জে ব্যারিস্টার চৌধুরীর বাড়ি।

মিঃ চৌধুরীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমাদের গাড়ি বরাবর কলকাতা পুলিসের ময়নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

পুলিস সার্জেন ও একটা ডোম আমাদের জন্য ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিল।

পুলিস সার্জেন আমাদের আহ্বান জানালেন, শুভসন্ধ্যা, মিঃ রায়।

আপনার মৃতদেহগুলো কোন্ ঘরে থাকে? কিরীটী প্রশ্ন করল।

ঠাণ্ডি ঘরে।

শুভঙ্কর মিত্রের মৃতদেহটাও আছে বোধ হয় সেইখানেই?

হ্যাঁ, চলুন। এই কান্নু, পরশুকার সেই গলাকাটা দেহটা ও মাথাটা স্ট্রেচারে করে বাইরে নামা।

কান্নু চলে গেল।

সার্জেনের পিছু পিছু আমরা একটা অল্পপরিসর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলাম। একটা বিশ্রী উৎকট গন্ধে নাড়ি পাক দেয়। সামনেই একটা সেলফের মত আলমারিতে পর পর কতগুলো মৃতদেহ সাজানো। কান্থ স্ট্রেচারে করে শুভঙ্কর মিত্রের মৃতদেহটা সামনে এনে নামাল আর একজন ডোমের সাহায্যে।

কিরীটী মৃতদেহটার আপাদমস্তক বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বললে, না, ঠিক আছে। দেহটা lock up করে রাখুন। এই নিন পুলিস কমিশনারের অর্ডার। একটা বেলে রঙের ছাপানো কাগজ সার্জেনের হাতে কিরীটী এগিয়ে দিল।

* * *

ময়নাঘর থেকে বের হয়ে আমরা সকলে সোজা বরানগরে মিঃ মিত্রের বাড়িতে এসে হাজির হলাম।

কড়া নাড়তেই মাধব এসে দরজা খুলে দিল।

ভিতরে চল মাধব। একটা শাবল যোগাড় করে আনতে পার মাধব এখুনি ? কিরীটী বললে।

হ্যাঁ, কেন পারব না বাবু। চলুন।

শাবল। শাবল দিয়ে কী হবে মশাই ? বিস্মিত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

দরকার আছে, চলুন না। এস সুব্রত। হ্যাঁ, আর একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে এস মাধব।

॥ তেরো ॥

আমিও ভেবে পেলাম না কিরীটী হঠাৎ শাবল আনতে বললে কেন আর শাবল দিয়ে কী এমন কাজ হবে। যাহোক, একটু পরেই মাধব একটা শাবল ও একটা লণ্ঠন নিয়ে সেই ঘরের মধ্যে ফিরে এল। শাবলটা হাতে নিয়ে একটা টর্চ হাতে আমরা কিরীটীর পিছু পিছু রান্নাঘরের দিকে চললাম।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে শুভঙ্কর মিত্রের অস্ত্রঘরের দিকে চললাম। ব্যাপার কি ? কিরীটী কোথায় চলেছে ? সে বলেছিল আজ সন্ধ্যার আগেই খুনীকে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু এখানে কোথায় চলেছে ? তবে কি খুনী ঐ বন্ধ ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নাকি কোথায়ও ?

ঘরের সামনে এসে কিরীটী সন্ত চুনকাম করা দেওয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল। —আলো উঁচু করে ধর সুব্রত, এই দেওয়ালটা খুঁড়তে হবে।

দেওয়ালটা সত্যসত্যই সে শাবল দিয়ে খুঁড়তে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই কতকগুলো ইট ঝুরঝুর করে পড়ে গেল। পাগলের মত শাবল দিয়ে কিরীটী চারপাশের ইট খুলতে লাগল। দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে একটা গর্ত মত দেখা গেল।

সেই গর্তের মধ্যে পা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, কিরীটী শাবল দিয়ে কিসের ওপরে আঘাত করল। ঠক করে একটা শব্দ হল। শাবলের সাহায্যেই চাড় দিয়ে কি যেন ভেঙে ফেলল। তারপর পকেট থেকে টর্চটা বের করে সেই গর্তের মুখে ফেলে আমাদের ডাকল, আসুন মিঃ চৌধুরী, চেয়ে দেখুন ঐ কাঠের বাক্সর মধ্যে। চেয়ে দেখুন তো, আপনার মক্কেল সত্যিকারের শুভঙ্কর মিত্রকে চিনতে পারেন কি না? ঐ—ঐ হচ্ছে সত্যিকারের শুভঙ্কর মিত্র। আর একটু আগে ময়নাঘরে যাকে দেখে এলাম, সে কে জানেন? কিরীটী আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের কাকা—রাঁচি পাগলা গারদের পলাতক স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণ।

মিঃ চৌধুরী একপ্রকার চিৎকার করে উঠলেন, অসম্ভব। আপনি কি পাগল হলেন, মিঃ রায়?

না, পাগল আমি হইনি।

একটা ভীষণ দুর্গন্ধে সেখানকার সমস্ত বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। একটা পচা গলা মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে বীভৎস আকারে পড়ে আছে। কিন্তু বিকৃত হলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, একটু আগে যে দেহটা ময়নাঘরে দেখে এলাম তার সঙ্গে এই মৃতদেহের খুব সামান্যই পার্থক্য আছে। হুবহু একেবারে মিল, যেন দুটি যমজ ভাই।

এই কি তবে বিশ্বাস করতে বলেন মিঃ রায় যে, মিঃ চৌধুরী বলতে লাগলেন, স্যার দিগেন্দ্র আসল শুভঙ্করকে হত্যা করে এইখানে তার মৃতদেহ লুকিয়ে রেখে এতদিন ধরে শুভঙ্কর সেজে বেড়াচ্ছিল?

আমারও যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম, তাহলে অন্য কেউ স্যার দিগেন্দ্রকে খুন করেছে এবং তারপর প্রফেসার শর্মাকে সে-ই খুন করেছে?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, চলুন, সব কথা এবারে খুলে বলব—ওপরে চলুন।

আমরা সকলে ওপরে এসে শুভঙ্কর মিত্রের শয়নঘরে বসলাম। মাধব একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে গেল।

কিরীটী মাধবকে বললে, গাড়িতে আমার একটি অ্যাটাচি-কেস আছে, ড্রাইভারের কাছ থেকে সেটা নিয়ে এস তো মাধব।

মাধব কিরীটীর নির্দেশ পালন করতে চলে গেল।

এবারে কিরীটী বলতে লাগল, আপনারা সকলে খুব আশ্চর্য হয়েছেন না? প্রথম

থেকেই হত্যার ব্যাপারে আপনারা ভুল পথে ছুটে চলেছিলেন, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন।

স্যার দিগেন্দ্র কোন একটা কারণে শুভঙ্কর মিত্রের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। পাটনায় যখন আসল স্পোর্টসম্যান মিঃ শুভঙ্কর মিত্র ছিলেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে স্যার দিগেন্দ্রর কোন সূত্রে হয়তো আলাপ হয়। স্যার দিগেন্দ্র অত্যন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অবিকল তাঁর মত দেখতে এমন একটি লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় মিঃ মিত্রের সঙ্গে তাঁর বোধ হয় আলাপ-পরিচয় হয় এবং স্যার দিগেন্দ্র লক্ষ্য করলেন মিঃ মিত্র অবিকল তাঁরই মত দেখতে, শুধু তাঁর নিজের নাকটা একটু ভোঁতা আর মিঃ মিত্রের নাকটা চোখা। স্যার দিগেন্দ্রর ফ্রেঞ্চকাট কালো দাড়ি আছে, মিঃ মিত্রের তা নেই। নাকের খুঁতটা স্যার দিগেন্দ্র ডাঃ রুদ্রের সাহায্যে অপারেশন করে ঠিক করে নিলেন এবং চেহারা বদলাবার আগে স্যার দিগেন্দ্রর পক্ষে মিঃ মিত্রের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাঁর স্বভাবচরিত্র, ভাবগুলো অনুকরণ করে নিতে এতটুকুও বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু এত করেও একটা জিনিস স্যার দিগেন্দ্রর চোখে ধরা পড়েনি, সেটা হচ্ছে মিঃ মিত্রের ডান কানের কাছে ছোট্ট সিকি-ইঞ্চি পরিমাণ লাল জড়ুল-চিহ্ন। এই ঘরে মিঃ মিত্রের ফটো দেখে সেইটা আমার নজরে পড়ে, আমি তখনি মিলিয়ে দেখবার জন্য ময়নাঘরে ছুটে যাই। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ডান কানের নীচে কোন জড়ুল-চিহ্ন পাই না। এতেই বুঝলাম যে কুমারসাহেবের বাড়িতে যে খুন হয়েছে সে মিঃ মিত্র নিশ্চয়ই নয়, জন্মের দাগ কখনও মিলায় না। তখন ভাবতে লাগলাম মৃতব্যক্তি যদি মিঃ মিত্র নাই হয়, তবে আসল মিঃ মিত্রই বা কোথায় এবং এই মৃত ব্যক্তিই বা কে? এদিকে এই বাড়ির অস্ত্রঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম, একটা দেওয়ালে নতুন চুনকাম করা হয়েছে। সন্দেহ হল সমস্ত দেওয়াল বাদ দিয়ে এক জায়গায় মাত্র চুনকাম করা হয়েছে কেন? তবে কি ঐ চুনকাম করা দেওয়ালের আড়ালে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?

ভাবতে লাগলাম। এদিকে মিঃ মিত্র খুব ভাল হিন্দী জানতেন। অথচ স্যার দিগেন্দ্র হিন্দী জানতেন না। তিনি কয়েক মাস হয়তো পাটনায় থেকে কোন একজন মাস্টার রেখে হিন্দীটা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু তাতে করে কাজ চললেও ছদ্মবেশের কাজ চালানো যায় না।

তবে কি হিন্দীভাষায় অনূদিত "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" বইখানা তাঁরই? আমি এবারে উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ। কিরীটী আবার বলতে লাগল, এসব ছাড়াও তিনি নতুন করে আফিং

খেতে শুরু করেছিলেন, কেননা মিঃ মিত্রের নাকি আফিঙের নেশা ছিল। তাছাড়া এই ঘটনা ঘটবার আগের দিন নকল মিঃ মিত্র ও কুমারসাহেব স্যার দিগেন্দ্রর বেনামীতে দুজনে দুখানা চিঠি পান। সে হাতের লেখাও মিলিয়ে দেখেছি, সেই লেখা স্যার দিগেন্দ্রের হাতের লেখার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। পুলিশের ফাইলে স্যার দিগেন্দ্রর হাতের লেখার নমুনা ছিল। সেই চিঠিগুলো একপ্রকার সবুজ কাগজে পেনসিল দিয়ে লেখা। পেনসিল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পেনসিল সাধারণত চার শ্রেণীর হয়। 'কার্বন', 'সিলিকেট' ও 'লোহা' দিয়ে মিশিয়ে যে পেনসিলের সীস্ তৈরী হয় তার লেখা সাধারণত ধূসর কালো রংয়ের হয়। 'গ্রাফাইট', 'সিলিকেট' ও 'লোহা' দিয়ে যে পেনসিলের সীস্ তৈরী হয় তার লেখা সাধারণতঃ বেশ ঘন কালো রংয়ের হয়। রংয়ের পেনসিলগুলো সাধারণত ওর সঙ্গে রং মিশিয়ে তৈরী হয়। আর কপিং পেনসিল তৈরী হয় 'অ্যানিলিন রং', 'গ্রাফাইট' ও 'কেওলিন' দিয়ে। পেনসিল দিয়ে লেখা সেই চিঠিটার গায়ে 'অ্যাসিটিক এসিডের' ও ফেরোসায়োনাইডের একটা সলুশন ঢেলে দেওয়া হয়—তার ফলে লেখাগুলো একটা রাসায়নিক ক্রিয়ায় রঙীন হয়ে যায়। মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে পারা গেছে, ঐভাবে লেখা সাধারণত রঙীন হওয়া উচিত নয়। ঐ সলুশন দিলে এবং ঐ রং দেখেই আমরা ধরতে পেরেছি কোন্ শ্রেণীর পেনসিল দিয়ে চিঠিটা লেখা হয়েছিল। বোঝা যায় লেখাটা কপিং পেনসিল দিয়েই লেখা হয়েছিল এবং সাধারণত এইচ এইচ কপিং পেনসিল দিয়ে লিখলে ঐ ধরনের লেখা হয়। সুব্রত, বোধ হয় মনে আছে, ঐ ধরনের একটি পেনসিল এ বাড়িতেই আমি পেয়েছি ডেস্কে, গতকাল বলেছিলাম। এখন বুঝতে পারছ, সেই পেনসিলটা দিয়েই ওই দুখানা চিঠি লেখা হয়েছিল।

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী মাধবের আনীত অ্যাটাচি-কেস থেকে "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" বইখানা বের করল। এই বইখানা নিয়ে মিঃ মিত্র প্রায়ই অরুণ করের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং এই বইখানা কুমারসাহেবের খাবার ঘরে চেয়ারের ওপর পাওয়া যায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রথম পাতায় একটা নাম লেখা ছিল, তারপর রবার দিয়ে ঘষে সেটা তুলে ফেলা হয়েছে। আমরা এটারও ফটোগ্রাফ নিয়ে পরীক্ষা করেছি। ফটো নেওয়া হয়েছিল 'অরথোক্রোম্যাটিক প্লেটে', একটা নেগেটিভ তোলা হয় এবং তাকে ছোট করে 'পারক্লোরাইড অফ মারকারি' দিয়ে জোরালো করা হয়। তারপর সেটা শুকোলে ফ্রেমে বসিয়ে তার সঙ্গে লাগিয়ে আর একটা প্লেটে ফটো নেওয়া হয়। এইভাবে প্রায় ছ-সাত বার ফটো নেওয়া। ফটোয় কি নাম পাওয়া গেছে দেখুন!

আমরা সকলে নেগেটিভের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলাম। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাতে লেখা—দিগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। এরপরও অবিশ্বাস করা চলে না যে, স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণই স্বয়ং আমাদের ছদ্মবেশী মৃত মিঃ শুভঙ্কর মিত্র। তবে এখন প্রশ্ন ওঠে, আসল শুভঙ্কর মিত্র কোথায়? স্যার দিগেন্দ্র তাঁকে খুন করেন। কিন্তু কোথায় তবে মিঃ মিত্র খুন হলেন? বিকাশবাবু গত ডিসেম্বর মাসে পাটনা থেকে মিঃ শুভঙ্কর মিত্রকে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে ফিরে আসতে দেখেছিলেন। এবং পাটনা থেকে ফিরে এসেই কিছুদিন পরে মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র কুমারসাহেবের কাছে চাকরি নেন। তাহলে বোধ হয় ট্রেনের মধ্যেই স্যার দিগেন্দ্র কাজ সারেন এবং আসল মিঃ মিত্রের মৃতদেহটা খেলাধূলার সাজ-সরঞ্জাম রাখবার বড় বাক্সর মধ্যে ভরে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

বিখ্যাত শিকারী ও স্পোর্টসম্যান হিসাবে মিঃ মিত্র সর্বত্রই সুপরিচিত। অতএব বিনা হাঙ্গামায় বাক্সবন্ধ হতভাগ্য মিত্রের মৃতদেহটা নিয়ে আসতে তাঁকে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি। মৃতদেহ রাস্তায় ফেলতে পারেননি পাছে তাঁর প্ল্যান ভেস্তে যায়। মৃতদেহ সঙ্গে করেই এনেছেন। কিন্তু কোথায় রাখবেন—এই হল তাঁর সমস্যা। এইখানেই তিনি সব চাইতে বুদ্ধির খেলা দেখালেন, মিঃ মিত্রের মৃতদেহ মিঃ মিত্রের বাড়িতেই লুকিয়ে রাখলেন। এখানে এসেই আগে তিনি পুরাতন চাকরদের বিদায় করে মাধবকে রাখলেন, পাছে তাঁকে কেউ সন্দেহ করে। তারপর এখানে এসে যখন তিনি মিঃ মিত্রের বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে গেলেন তখন তিনি দেখলেন—সেদিনকার ঘটনা আমরা মিঃ চৌধুরীর মুখেই শুনেছি, কেননা মিঃ চৌধুরী সেদিন উপস্থিত ছিলেন, এবং সে রাত্রে প্রফেসার শর্মার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ মিঃ মিত্র কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যান তাও আমরা জানি। মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র নিমেষে বুঝতে পারলেন সে রাত্রে অসাধারণ চতুর আসল মিঃ মিত্রের শিশুকালের বন্ধু প্রফেসার শর্মার চোখে তিনি ধুলো দিতে পারেননি। তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছেন। এখানে এসে অরুণ করের সঙ্গে আলাপ হয়ে স্যার দিগেন্দ্র ঠিক করেন অরুণের মাথায় হাত বুলিয়ে বেচারীর টাকা কটা বাগাতে হবে, কেননা মিঃ মিত্রের অনুসন্ধান নিয়ে দেখলেন মিঃ মিত্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। খুনের রাত্রে বোধ করি টাকার কথা বলবার জন্যই তাঁকে লুকিয়ে ওপরের ঘরে এসে দেখা করতে বলেন এবং টাকা ধারের কথা মিঃ চৌধুরীকেও বলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আর একটা কোন জায়গা থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে এবং অরুণ কর ও হতভাগ্য মৃত মিঃ মিত্রের ঘরবাড়ি বন্ধক রেখে প্রভূত অর্থ নিয়ে এদেশ ছেড়ে চিরতরে চম্পট দেবেন।

মিঃ চৌধুরী কিরীটীর কথায় কেঁপে উঠলেন।

কিরীটী বলতে লাগল, কিন্তু এর মধ্যে তার চাইতেও চতুর আর এক চতুর চূড়ামণি এসে দেখা দিলেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের হতভাগ্য প্রফেসার শর্মা!

সেইজন্য প্রায়ই প্রফেসার শর্মা এখানে আসতে লাগলেন মৃতদেহের খোঁজে। কেননা তখনও তিনি বুঝতে পারেননি যে স্যার দিগেন্দ্র মৃতদেহ কোথায় কী ভাবে লুকিয়ে রাখতে পারেন। একটু ভাবলেই বোঝা যায় এবং তাই ভেবেই হয়তো মিঃ শর্মা অনুমান করেছিলেন নিশ্চয়ই, এ বাড়িরই কোথায়ও তাঁর মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কেননা সেটাই হবে সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু কোথায়? বাগানে? না, তাতে লোক-জানাজানি হবে। সবচাইতে ভাল হবে অস্ত্রাগারে। কেননা সেটা সব চাইতে নির্জন।

মিঃ মিত্র যে আসল নয় জাল এবং খুঁজতে খুঁজতে অস্ত্রঘরেই যে সে লুকানো আছে প্রফেসার শর্মা এই ঠিক করলেন এবং দেখলেন এ মজাই হল—তিনি কোন কিছু না ভেঙে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন, কেননা তাঁরও অবস্থা তখন চাকরিবাকরি না থাকার দরুন 'অষ্টভক্ষো ধনুর্গুণঃ'। তাছাড়া অরুণ করের টাকায় তাঁর মত একজন অতি বিলাসী লোকের চলাও সম্ভবপর ছিল না।

॥ চৌদ্দ ॥

কিরীটী অল্পক্ষণের জন্য এবারে একটু থামল। তারপর সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসতে হাসতে বললে, এবার চলুন বন্ধুরা, কুমারসাহেবের মার্বেল প্যালেসের দিকে যাওয়া যাক। অকুস্থানে বসেই আমার রহস্যের ওপর যবনিকা টানব।

তখুনি আমরা গাড়িতে চেপে রওনা হলাম। এবং রাত্রি প্রায় সোয়া বারোটায় আমরা সকলে বেহালায় কুমারসাহেবের মার্বেল প্যালেসের সামনে এসে নামলাম। একটা সুমধুর হাওইন গিটারে সুরের আলাপ কানে ভেসে এল। চকিতে অতীতের অন্ধকারে যেন আলোর রশ্মি এসে পড়ল। এই সুর কোথায় শুনেছি। এ যে বহুকালের চেনা। আশ্চর্য, এল রাত্রেও নীচের হলঘরে আলো জ্বলছে দেখতে পেলাম।

ঘরে ঢুকে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

কুমারসাহেব!

অথচ শুনেছিলাম আজই বিকেলে যে, তিনি আজ দুপুরে মধুপুর চলে গেছেন।

একটা সোফার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে কুমারসাহেব হাওইন গিটার বাজাচ্ছেন।

কিরীটী ঘরে ঢুকেই উল্লাসভরা কণ্ঠে বললে, শুভরাত্রি ডাঃ স্যান্যাল।

আমাদেব এতগুলো লোককে এত রাত্রে ঘরে ঢুকতে দেখে বাজনাটা হাতেই কুমারসাহেব সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর সহসা কিরীটীর হাতের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন যেন।

হাত তুলুন। কিরীটীর গলা শুনে তার হাতের দিকে চেয়ে দেখি কিরীটীর হাতে চকচক করছে একটা রিভলবার।

সুব্রত, এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে নাও। আর এই নাও, এই সিল্ক-কর্ডটা দিয়ে ওঁর হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে ফেলো।

আমি এগিয়ে গিয়ে কুমারসাহেবের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে হাত দুটো কিরীটীর দেওয়া সিল্ক-কর্ড দিয়ে বেঁধে ফেললাম।

এসবের মানে কি কিরীটীবাবু? ক্ষুণ্নস্বরে কুমারসাহেব বললেন।

বসুন আপনারা সবাই। শুনুন ডাক্তার সান্যাল ওরফে কালো ভ্রমর, ওরফে ছদ্মবেশী কুমারসাহেব। স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণ ও প্রফেসার শর্মার হত্যাপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম। কিন্তু ডাক্তার, এতখানি জঘন্যতা আপনার কাছে আমি আশা করিনি কোন দিনও। বরাবর একটা শ্রদ্ধা আপনার ওপরে আমার ছিল। আপনারা হয়তো ভাবছেন ওঁকে আমি চিনলাম কী করে, না? মাত্র দুটি কারণে, এক নম্বর ওঁর হাতে লেখা দেখে, যার নমুনা এখনও আমার কাছে আছে। মনে পড়ে তোমাদের, মৃত স্যার দিগেন্দ্রের পকেটে হলদে রংয়ের তুলট কাগজ গোটা দুই পাওয়া গিয়েছিল? এই দেখ সেই কাগজ। আর এই দেখ এতে ভ্রমর আঁকা। এই চিঠি পেয়েই গতরাত্রে মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র ওঁকে চিনতে পারেন যে উনি কালো ভ্রমর।

উনি যে কুমার দীপেন্দ্র নন, স্যার দিগেন্দ্র প্রথম দর্শনেই তা টের পেয়েছিলেন, পাঁচ বছর আগে প্রথম যেদিন উনি ভাইপোর পরিচয়ে তাঁর কাছে আসেন। কিন্তু তখন তিনি কোন কথা প্রকাশ করেননি। ইচ্ছা ছিল গোপনে একদিন তিনি এঁকে শেষ করবেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং পাগলা গারদে তাঁকে যেতে হয় এঁরই প্রচেষ্টায়। সেই থেকে তিনি উপায় খুঁজছিলেন কেমন করে সে অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এঁকে সরিয়ে টাকা হাতিয়ে সরে পড়বেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, যে পরিচয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অসাধারণ চতুর ও কৌশলী কালো ভ্রমরের চোখে তা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু প্রফেসার শর্মাও এঁর আসল পরিচয় পাননি। তার ফলেই তিনি এঁকে উৎসাহিত

করেছিলেন মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্রকে হত্যা করবার জন্যে। তিনি স্যার দিগেন্দ্রর আসল পরিচয় এঁর কাছে বলেছিলেন, এবং এও তাঁর ধারণা ছিল ইনি অর্থাৎ কুমারসাহেব নিজেও আসল কুমারসাহেব নন, এবং সে কথা এক দিগেন্দ্র ও প্রফেসার শর্মা ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু কেউই জানতেন না যে ইনি ছদ্মবেশী স্বয়ং কালো ভ্রমর। তাহলে হয়তো কেউ এতটা উৎসাহিত বোধ করতেন না। ভেবেছিলেন ইনি সামান্য একজন প্রতারক মাত্র। প্রফেসারের ইচ্ছা ছিল এঁকে দিয়ে স্যার দিগেন্দ্রকে খুন করিয়ে এঁকে হাতে রেখে যখন-তখন blackmail করে প্রচুর অর্থলাভ করবেন, অথচ নিজে এর মধ্যে জড়াবেন না।

প্রথম থেকেই আমি জানতাম খুনী স্বয়ং কালো ভ্রমর। এবং তিনি ছদ্মবেশী কুমারসাহেব। কিন্তু সেই চিঠি থেকে প্রমাণ হল কী করে ইনি স্বয়ং কালো ভ্রমর। এঁর হাতের লেখা এঁদের স্টেটের ফাইলে পেয়েছি, তা ছাড়া গতকাল উনি যে কমিশনার সাহেবকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে ফর্ম সই করে এসেছেন, সেই লেখার সঙ্গে কালো ভ্রমরের চিঠির হুবহু মিল হয়ে গেছে। উনি বর্মায় থাকতেই hashish সিগারেট খেতেন তা আমি জানতাম।

দু নম্বর কারণ সেই ছুরিটা, যেটা আমরা অরুণ করের বাগানে দেখি। সেটা বর্মী অস্ত্র। সেখানকার লোকেরা ঐ ধরনের অস্ত্র খুনখারাপি করতে ব্যবহার করে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এঁকে অপরাধী বলে মনে হল কেন? মনে আছে তোমাদের, মৃত স্যার দিগেন্দ্রর আঙুলের নখে একটা জিনিস পাওয়া গিয়েছিল, সে হচ্ছে কালো রংয়ের সার্জের প্যান্টের সুতো। সেই সুতো এঁর প্যান্টের কাপড়ের সুতোর সঙ্গে অবিকল মিলে গেছে। গতকাল উনি যখন প্রফেসার শর্মাকে খুন করে রক্তাক্ত জামা-কাপড়ে এখানে ফিরে আসেন, সেই কোট-প্যান্ট উনি সরিয়ে ফেলবার অবকাশ পাননি। হরিচরণ ওঁর শয়নঘরের সোফার নীচে পেয়ে নিয়ে গেছে ওঁর অবর্তমানে ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে আজ দ্বিপ্রহরে এখানে এসে। সেই প্যান্টের সুতোর সঙ্গে মৃত স্যার দিগেন্দ্রর নখের মধ্যে আটকে ছিল যে সুতো দুটো অবিকল মিলে গেছে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ধরে জানা গেছে সে এই বাড়িতে একজনকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল কাল রাত্রে। তা ছাড়া সেই বাগানের ছুরিটার হাতলে যে আঙুলের ছাপ ছিল এবং এঁর আঙুলের ও কালো ভ্রমরের আঙুলের যে ছাপ আমার কাছে আছে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। তাছাড়া তোমার মনে পড়ে সুব্রত, প্রফেসার শর্মাকে যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে, সে সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, ডাক্তার বলেই ওভাবে হত্যা করা এঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। স্যার দিগেন্দ্র যে মুহূর্তে চিনতে

পেরেছিলেন তাঁর ভাইপো আসলে কে, তখনই তিনি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ইনিও তখন বুঝতে পেরেছেন, জীবনে যে জঘন্য কাজ কোন দিনও করেননি আজ তাই তাঁকে করতে হবে। স্যার দিগেন্দ্র যদি একবার হাতের বাইরে চলে যান তবে তাঁর পক্ষে এই ছদ্ম পরিচয়ে বাঁচা আর সম্ভব হবে না। তাই চির-জীবনের মত স্যার দিগেন্দ্রকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার মনস্থ করেছিলেন। এইবার ডাক্তার সান্যাল দয়া করে বলুন, মিঃ মিত্রকে কিভাবে খুন করেছিলেন সে রাত্রে? কেননা ও ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

ডাঃ সান্যাল মৃদু হাসলেন, চমৎকার বুদ্ধি আপনার মিঃ রায়। সম্পূর্ণ হার মানলাম আপনার বুদ্ধির কাছে। সত্যিই আমি কালো ভ্রমর, ডাঃ এস. সান্যাল। কুমারসাহেব আমি নই, কোনদিন ছিলামও না। আপনি অনেক কিছু জানেন বা জানতে পেরেছেন, কিন্তু একটা কথা এখনও জানেন না। সেটা হচ্ছে এই, দিগেন্দ্রর অতীত ইতিহাস। এই দিগেন্দ্র এতকাল এই কলকাতায় থেকে আমারই দলে কাজ করত। সে ছিল আমার কলকাতার দলের প্রতিভূ। সেবারে আপনাদের যখন আমি বর্মায় নিয়ে যাই, দিগেন্দ্র তখন সেখানে। সে-ই বনমালী বসু* নাম নিয়ে সনৎবাবুকে তাঁদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসা থেকে চুরি করে আনে। 'মৃত্যুগুহায়' সে রাত্রে আমি একজাতীয় বুনো গাছের রসে তৈরী ঔষধ শরীরে ফুটিয়ে পাঁচ ঘণ্টার জন্য অজ্ঞান থেকে আপনার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা পাই এবং আপনারা আমাকে ইরাবতীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন। আমার অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর রামু ইরাবতীর মধ্যেই খানিকটা দূরে নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছিল, আমায় তুলে বাঁচায় সে। আমার পরিধানে তখন ছিল রবারের পোশাক। তাই জলে ভেসে ছিলাম, ডুবিনি। আর ঐ ঔষধটার এমন গুণ ছিল যে, জল মুখে ঢুকলে তার কাজ নষ্ট হয়ে যায়। আমি সব রকম কিছু ভেবে আগে থেকেই সে রাত্রে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, সবই pre-arranged

কয়েক দিন পরে একটু সুস্থ হয়ে ধনাগারে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি ধনাগার শূন্য, একটা কপর্দকও নেই। বর্মায় ফিরে এসে দেখি দিগেন্দ্র উধাও। ব্যাপার সব বুঝলাম। প্রতিশোধের হিংসায় জলেপুড়ে মরতে লাগলুম। তারপর সেখান থেকেই দিগেন্দ্রকে একটা চিঠি দিই, ওই চিঠিটা এইজন্য দিয়েছিলাম, যাতে দিগেন্দ্র

---

* 'কালো ভ্রমর' দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।—লেখক

জানতে পারে আমি বেঁচে উঠেছি এবং ভয়ে ধনবস্তুগুলো ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু he was clever, তাই চুপচাপ বসে গেল, আমার চিঠির কোন জবাবই দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলে না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, আমরা পরের দিন ধনাগারে ধনবস্তু আনতে গিয়ে দেখি ধনাগার শূন্য, কিছুই নেই। কিরীটী বললে।

তখন ডাক্তার আবার বলতে লাগলেন, কিন্তু মূর্খ সে, তাই আমার কথায় কান দিল না। ওর সব ইতিহাস আমি জানতাম, সুতরাং ওর মৃত ভাইপোর পরিচয়ে এখানে এসে ঢুকলাম। বুঝলাম ও আমায় সন্দেহ করেছে, এবং পরে টের পেলাম ও আমাকে মারবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু মারতে এসে একদিন সে ধরা পড়ে গেল, ও নিজেকে সাফাই করবার জন্য পাগলের ভান করলে। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

ধরা পড়ল এবং ওকে গারদে পাঠালাম। কিন্তু আবার গারদ ভেঙে ও পালাল। খুন করা আমি চিরদিন ঘৃণা করি। কিন্তু নরাধম আমাকে বাধ্য করলে ওকে খুন করতে। কিন্তু প্রফেসার শর্মা একদিন আমাকে এসে বললে মিঃ মিত্রের আসল পরিচয় কী। কিন্তু নির্বোধ জানত না এ সংবাদ তার ঢের আগেই আমার জানা হয়ে গেছে। আমিও দেখলাম, ও যখন জেনেছে তখন ওকে বাদ দিয়ে কাজ করা তো চলবে না। এইখানেই আমার সব চাইতে বড় ভুল হল। মূর্খ আমাকে পেয়ে বসল। আমিও নিরুপায় হয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করতে লাগলাম। প্রায়ই ও আমার কাছ থেকে টাকা নিত। কেননা আমি যে আসল কুমার নই সে ও টের পেয়েছিল। আসল কাজ হবে না ভয়ে ওকে টাকা দিয়ে আমি নিরস্ত রেখেছিলাম। ভবিষ্যতে একদিন ওর পাওনা মেটাব বলে। প্রফেসর যখনই জানতে পারে আসল মিঃ মিত্র আমার সেক্রেটারী নয় এবং আসলে সে স্যার দিগেন্দ্র, তখন থেকেই সে উল্লাসে নাচতে লাগল। আমার জন্মোৎসবের রাত্রে সকলেই এখানে আমরা উপস্থিত, ছদ্মবেশী স্যার দিগেন্দ্র, আমি, প্রফেসার শর্মা।

এবার হয়েছে, আমাকে বলতে দিন ডাক্তার। কিরীটী সহসা বলে উঠল।

বলুন। ডাক্তার মৃদু হেসে জবাব দিলেন, কিন্তু হাতের বাঁধনটা খুলে দিতে বলুন। ভয় নেই, পালিয়ে বাঁচবার ইচ্ছা আর আমার নেই। পর পর দু-দুটো খুন করে এ জীবনে আমার ঘৃণা হয়ে গেছে। কুমারসাহেব ও আমার নিজের উপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি আমি গতকালই উইল করে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দান করে দিয়েছি, আর তার অছি নিযুক্ত করেছি কাকে জানেন?

কিরীটী অধীর স্বরে বললে, কাকে ?

আমার জীবনের সব চাইতে বড শত্রু ও সবার বড় বন্ধু আপনাকে ও সুব্রতবাবুকে।

ধন্যবাদ ডাক্তার। কিরীটী বললে।

এর পর ডাক্তারের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। মুহূর্তকাল কিরীটী চুপ করে রইল। তারপর আবার ধীরস্বরে বলতে লাগল, তাহলে এঁদের কৌতূহলটা মিটিয়ে দিই। হ্যাঁ শুনুন, আপনার সেক্রেটারী অর্থাৎ স্যার দিগেন্দ্র ৮ ৫৫ মিনিট পর্যন্ত আপনার খাবার ঘরেই ছিলেন। তারপর সেখান থেকে তিনি বের হয়ে আসেন বোধ করি ঠিক ৮ ৫৫ মিনিটে এবং সাড়ে নটার সময় আমাদের ধারণা ও দেখা অনুসারে তিনি প্রাইভেট রুমে ঢোকেন। এই যে ৩৫ মিনিট সময়—এই সময়টা কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। এই সময় তিনি খাবার ঘর, ড্রইংরুম, হলঘর, শোবার ঘর, লাইব্রেরী ঘর বা নীচে বা সিঁড়িতে কোথাও ছিলেন না। তবে নিশ্চয়ই তিনি ঐ সময় আপনার প্রাইভেট রুমে ছিলেন এবং খাবার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা তিনি ঐখানেই গিয়ে ঢুকেছিলেন।

এটাও ঠিক ডাক্তার যে, ৮ ৫০-৮ ৫২ মিনিটের সময় আপনার ম্যানেজারের সঙ্গে দোতলার সিঁড়িতে আপনার দেখা হয়। তাহলে নিশ্চয়ই ধরা যায় ঠিক ঐ সময়ই মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র যখন আপনার খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসেন, দোতলার হলঘরে আপনাদের দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কেমন কিনা, am I right ?

হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক মিঃ রায়। আমি সন্ধ্যার সময়েই ঠিক করেছিলাম মনে মনে, স্যার দিগেন্দ্রকে আজ শেষ করব। কেননা ও যা ভয়ানক লোক, সুযোগ পেলেই আমাকে অনায়াসে খুন করবে। তাই সন্ধ্যার অল্প পরেই আমার নিজ স্বাক্ষরে ওকে চিঠি দিলাম : তোমার সময় উপস্থিত, আজই—প্রস্তুত থাক।—ইতি 'কালো ভ্রমর'। সারা বাড়িতে তখন উৎসবের হুল্লোড়, নটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে ম্যানেজারের কাছ থেকে এসে hashish দিয়ে তৈরী কয়েকটা সিগারেট চেয়ে নিই। কেননা আপনি জানেন আমি বাড়িতে মরফিয়া ইনজেকশন নিতাম। এখানেও ওটা অভ্যাস করেছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে মরফিয়া বন্ধ করবার জন্য অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হত। রাতে ভাল ঘুম হত না। প্রফেসার শর্মাকে এ কাজে নিয়েছিলাম, কেননা দুজনে না হলে এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। শর্মা আমায় বলে গেল, ওকে নিয়ে আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি। তুমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর। যখন সে খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসবে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু সাবধান,

তোমাকে যেন কেউ লক্ষ্য না করে।

৮'৫৫ মিঃ কি ৯টার সময় দিগেন্দ্র খাবার ঘর থেকে বের হয়ে এল। ওপরের হলঘরে তখন বড একটা কেউ ছিল না। যে দু-চারজন ছিল তারা তখন তাস খেলায় মত্ত। বাকি অভ্যাগতরা নীচের হলঘরে গান-বাজনায় জমে উঠেছে। প্রফেসার যখন খাবার ঘরে দিগেন্দ্রকে নিয়ে যায়, আমি সেই ফাঁকে এক সময় প্রাইভেট রুমে ঢুকে দেওয়াল থেকে তলোয়ারটাকে নামিয়ে সোফার ওপর গদির তলায় রেখে আসি। হলঘরে দাঁড়িয়ে আছি সিঁড়ির কোণায়। দিগেন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ওকে ইশারায় ডেকে প্রাইভেট রুমে গিয়ে ঢুকি, কেউ দেখেনি। আমার মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ছিল। একসময় দুজনে কথা বলতে বলতে টুপ করে সেটা মেঝেয় ফেলে দিই ইচ্ছা করে। দিগেন্দ্র সেটা যেমন কুড়িয়ে নিতে নীচু হয়েছে, চক্ষের নিমেষে গদির তলা থেকে ভারী তলোয়ারটা টেনে নিয়ে তার গলা দু ভাগ করে দিই। তারপর মাথাটা নিয়ে মাঝখানে রেখে দিই। এখন বুঝতে পারছেন আপনারা, মৃতদেহের position ওরকম ছিল কেন।

তারপর ৯১০ মিনিটের সময় আমি একটা চাদর জড়িয়ে ওঘর থেকে বের হয়ে সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকি। সেখানে দেড থেকে দু মিনিটের মধ্যে পোশাক বদলে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। আমি আগেই আপনাকে দিগেন্দ্র লেখা চিঠি পাঠিয়ে এখানে এনেছিলাম। অত্যধিক অহঙ্কারেই ঐ কাজ করতে গিয়ে এইভাবে ধরা পড়লাম। নাহলে এ জগতে কারও সাধ্য ছিল না আমাকে ধরে। কিন্তু শর্মাকে যখন বললাম সে ভয়ে শিউরে উঠল। মনে মনে আমি হাসলাম এবং আমাদের পরামর্শমত ঠিক রাত্রি সাড়ে নটায় আমাদের চোখের সামনে দিয়েই শর্মা প্রাইভেট রুমে গিয়ে ঢুকল। এবং ঠিক যখন প্রায় সে অদৃশ্য হয়েছে, তখন আপনার দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করলাম। এদিকে শর্মা ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার সময়ে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চাকরদের ডাকার ঘণ্টার দড়িটা টেনে, চকিতে খাবার ঘরের দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে একেবারে আপনার হরিচরণের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। বেয়ারাকে আগে থেকেই শর্মা ওঘরে যাবার জন্য বলে রেখেছিল।

কিন্তু মিঃ মিত্রের পকেট থেকে চাবিটা চুরি করেছিল কে?

আমি। আমিই খুন করে আসবার সময় নিয়ে আসি। শর্মা আমাকে ওগুলো নিয়ে আসতে বলেছিল।

তারপর কী হয়েছিল সে চাবি নিয়ে জানেন?

হ্যাঁ, জানি। শর্মা ঐ রাত্রেই মিঃ মিত্রের ওখানে গিয়ে তার সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলে, আর তার ধারণা ছিল অন্ত্রঘরে আসল মিঃ মিত্রের মৃতদেহ লুকানো আছে, তাই সে অন্ত্রঘরের চাবি চুরি করে রেখেছিল।

প্রফেসারকে কেন সন্দেহ করেছিলাম সর্বপ্রথম জানেন ডাক্তার? উনি আমার লোক হরিচরণের কাছে সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলে। হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করবার মানেই তার কাজের মিথ্যে সাফাই একটা রেখে দেওয়া। তাছাড়া আপনিই নিজে গিয়ে তিনতলায় অরুণের সঙ্গে ঐ ভাবে দেখা করেছিলেন।

হ্যাঁ, আমিই। আমার ইচ্ছা ছিল এতে যদি ভয় পেয়ে ও শর্মার মত লোকদের পাপচক্রে আর না ভোলে। বড ভাল ছেলেটি, দেখলে মায়া হয়।

হলঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল। এক ঝলক হাওয়া খোলা জানলা-পথে ঘরে এসে যেন সবার চোখে-মুখে শান্তির প্রলেপ দিয়ে গেল।

আমরা সকলে নিঃশব্দে বসে রইলাম।

হতভাগ্য শর্মাকে হয়তো আমি খুন করতাম না, কিন্তু ও আস্ফালন দেখালে, আমায় নাকি টিপে মারতে পারে। সে বিনিময়ে চার লক্ষ টাকা চায়। তার টাকার সাধ চিরতরে কাল অরুণ করের বাড়িতে মিটিয়ে এসেছি। ওদের মত জঘন্য প্রবৃত্তির লোক এ দুনিয়ায় যত কম থাকে ততই ভাল, তার জন্য আমি এতটুকুও অনুতপ্ত নই।

ডাক্তার সান্যাল চুপ করলেন।

হলঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি পাঁচটা ঘোষণা করল।

বত্রিশ সিংহাসন

কথিত আছে, গল্পের সেই রাজা বিক্রমাদিত্যের নাকি মণিমাণিক্যখচিত একটি বহু মূল্যবান রত্ন-সিংহাসন ছিল, এবং সেই সিংহাসনটির নির্মাণ-কৌশলও ছিল অদ্ভুত। বত্রিশটি পুতুল চারদিক থেকে সিংহাসনটিকে বেষ্টন করে থাকত।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর বহুকাল পরে, ভোজরাজ মৃত্তিকাতল থেকে সেই সিংহাসনটি উদ্ধার করেন। কিন্তু ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের সমগুণসম্পন্ন ছিলেন না বলে তাঁর আর সে সিংহাসনে বসা হল না কোন দিনই।

সিংহাসনটি উদ্ধার করবার পর প্রথম যেদিন ভোজরাজ সিংহাসনের ওপরে উপবেশন করতে গেলেন সিংহাসনের প্রথম পুতুলটি তাঁকে নিষেধ করল, বললে, মহারাজ! এই সিংহাসনে উপবেশনের পূর্বে আমার কিছু বলবার আছে, শ্রবণ করুন।

পুতুলটি বিক্রমাদিত্যের অশেষ গুণরাশির একটি কাহিনী বললে, এবং গল্পটি শেষ হলে বললে, মহারাজ, আপনাকে বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে যে গল্পটি বললাম, আপনার যদি সে-রকম কোন গুণ থাকে তবে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

সেদিন আর ভোজরাজের সে সিংহাসনে উপবেশন করা হল না।

পরের দিনও অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পুতুলটি ভোজরাজকে সিংহাসনে উপবেশনে বাধা দিয়ে আর একটি গল্প শোনাল বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে।

এইভাবে বত্রিশটি পুতুল একের পর এক—দিনের পর দিন সিংহাসনে বসতে ভোজরাজকে বাধা দিতে লাগল এবং ফলে ভোজরাজের আর কোনদিনও সেই সিংহাসনে বসাই হল না।

গল্পের ভোজরাজের মত শ্রীনগর রাজবাড়ির গৃহদেবতাদেরও তাঁরই জন্যই প্রস্তুত স্বর্ণ-নির্মিত কারুকার্য-মণ্ডিত পান্নাচুনিহীরাখচিত বত্রিশ সিংহাসনটিতে বসাই হল না কোনদিন।

শ্রীনগর কোথায়, ভারতবর্ষের কোন্ জায়গায়—পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে না উত্তরে সেটা আমাদের বর্তমান কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

ধরে নেওয়া যাক বাংলাদেশেরই আশেপাশে কোথাও সেই শ্রীনগর—কলকাতা থেকে মাত্র একদিনের পথ।

পূর্ব কাহিনী যার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কাহিনীর যোগসূত্র আছে, তা এই : শ্রীনগরের বর্তমান তরুণ রাজা ত্রিদীপনাথ রায়ের পুরুষানুক্রমে পাওয়া সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 'যে সম্পত্তিটি ছিল সেটি হচ্ছে ছোট একটি স্বর্ণ-নির্মিত

রত্নখচিত সিংহাসন। সিংহাসনটিকে বত্রিশটি স্বর্ণ-নির্মিত পুতুল তাদের চৌষট্টি হাতে ধারণ করে আছে।

প্রায় সাত-আট পুরুষ আগে রাজবংশের সর্বেশ্বর রায় ঐ সিংহাসনটি নির্মাণ করে সোনার গোপাল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই হতেই সিংহাসনটিকে বত্রিশ সিংহাসন নামে অভিহিত করা হত। সোনার গোপাল প্রতিষ্ঠা করবার কিছুকাল পরে হঠাৎ অদ্ভুত উপায়ে কোন অদৃশ্য লুণ্ঠনকারী রাজবাড়ির অন্দরমহলে অবস্থিত ঠাকুরঘর থেকে গৃহদেবতা সোনার গোপালটি লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।

সমগ্র রাজবাড়িতে বিষাদের কালো ছায়া ঘনিয়ে এল অবশ্যম্ভাবী এক অমঙ্গলের দুশ্চিন্তায়। চারিদিকে অনুসন্ধান শুরু হল, কিন্তু বৃথা।

এমন সময় রাজমাতা কাত্যায়নী দেবী স্বপ্নে অপহৃত গৃহদেবতা সোনার গোপালের প্রত্যাদেশ পেলেন: ভয়ের কিছু নেই। অপহৃত হয়েছি আমি, আবার তোদের গৃহে সময় হলেই আসব। যতদিন না তোদের ঘরে আবার আমি প্রত্যাবর্তন করি, ততদিন শূন্য সিংহাসন সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রাখিস্। ঐ বত্রিশ সিংহাসন যতদিন তোদের ঘরে থাকবে, কোন অমঙ্গলই তোদের স্পর্শ করতে পারবে না।

সেই থেকে এতদিন রত্নমণ্ডিত স্বর্ণনির্মিত বত্রিশ সিংহাসনটি রাজবাড়ির লোহার সিন্দুকেই তালাবদ্ধ ছিল। গৃহদেবতাও আর প্রত্যাবর্তন করেননি, বত্রিশ সিংহাসনও আর কোন কাজে লাগেনি। রাজবাড়ির কোথাও কোন অমঙ্গলের চিহ্নও দেখা দেয়নি।

সেই সিংহাসনটিই অকস্মাৎ কেমন করে অভাবনীয়রূপে রাজবাড়ির অন্দরমহলে অবস্থিত লৌহ-সিন্দুক থেকে লুণ্ঠিত হয়েছে।

বহুকালের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্তমান রাজা ত্রিদীপনাথ রায় ঠিক করেছিলেন, লৌহ-সিন্দুক থেকে সোনার বত্রিশ সিংহাসনটি বের করে আবার নতুন সোনার গোপাল নির্মাণ করে দেবতার প্রতিষ্ঠা করবেন।

স্বর্ণকারকে ডেকে মূর্তি গড়াবার আদেশও দেওয়া হয়েছিল এবং সোনার গোপালের নির্মাণকার্যও প্রায় সুসম্পন্ন হয়ে এসেছে।

আসন্ন উৎসবের আয়োজন চলেছে। আত্মীয়স্বজনে রাজবাড়ি গমগম করছে, এমন সময় এই আকস্মিক বিভ্রাট। রাজা ত্রিদীপনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। লোহার সিন্দুক থেকে বত্রিশ সিংহাসনটি চুরি গেছে। নির্মেঘ নীলাকাশ থেকে যেন সহসা বজ্রপাত হয়েছে

মাত্র কয়েকদিন হল কিরীটী এম. এস্‌-সি.র শেষ পরীক্ষা দিয়েছে। এখন অখণ্ড অবসর। কিরীটী শিয়ালদহের এক খ্যাতনামা অন্ধকার গলির মধ্যে অবস্থিত

'বাণীভবন' মেসে থাকে।

শরৎ ঋতুর অবসানে শীতের প্রথম আবির্ভাবের রং লেগেছে প্রকৃতির অঞ্চলে। ঝরা পাতার উৎসব দিকে দিকে শেষ হল, শুষ্ক ডালে সবুজের প্রথম ইশারা।

মেসের তেতলার ঘরে একটা লোহার চেয়ারে বসে কিরীটী সেইদিনকার দৈনিকখানা আনমনে ওল্টাচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় দৃষ্টি পড়তেই কিরীটী সচকিত হয়ে ওঠে। একটা বিজ্ঞাপন—

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে শ্রীনগরের রাজবাটীর অন্দরমহলে অবস্থিত লৌহসিন্দুক হইতে রাজাদের পুরুষানুক্রমে রক্ষিত ইতিহাস-বিখ্যাত বহুমূল্য রত্নখচিত স্বর্ণনির্মিত বত্রিশ সিংহাসনটি কে বা কাহারা অত্যাশ্চর্য উপায়ে লুণ্ঠন করিয়াছে। যদি কোথাও এমন কেহ থাকেন, যিনি সেই সিংহাসনটি উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, অনুসন্ধানেচ্ছু অবিলম্বে নিজ ব্যয়ে শ্রীনগরের রাজবাটীতে আসিয়া শ্রীনগরের রাজা ত্রিদীপনাথ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। রাজবাটী : শ্রীনগর।

অদ্ভুত বিজ্ঞাপন।

পাঁচ হাজার টাকাটা কিরীটীর কাছে এমন কিছু একটা মূল্যবান সংবাদ নয়। কিন্তু তার মধ্যে যে রহস্যটি ঘনীভূত হয়ে আছে, কিরীটী তাতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। পর্যাপ্ত সময়ের এমন চমৎকার সদ্ব্যবহার আর কিছুতেই হতে পারে না।

প্রিয় রাজা বাহাদুর,

তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। আমার পরিচয় আপনি জানেন না। কারণ আমি সরকারী বা বেসরকারী গোয়েন্দা নই, সাধারণ একজন ছাত্র মাত্র, বর্তমানে বেকার। হাতে কোন কাজকর্ম নেই। আপনি আপনার বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে যে রহস্যের অনুসন্ধান দিয়েছেন সেটা আমার রহস্যপ্রিয় মনকে একান্তভাবে আকর্ষণ করেছে। পারিশ্রমিকের কথা ছেড়ে দিন, অর্থের আমার অভাব নেই, তাই হয়তো লালসাও নেই। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনার অপহৃত বত্রিশ সিংহাসনটির অনুসন্ধান একটিবার আমি করে দেখি। তবে আমার একটা শর্ত আছে: আমি অনুসন্ধানভার গ্রহণ করলে' কাউকেই আপনি সে কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবেন না, বিশেষভাবে আমার ও আপনার মধ্যে গোপন থাকবে। আপনি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী থাকেন, আমি

নিজ ব্যয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। আর একটা কথা মানুষের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে আপনার অপহৃত বত্রিশ সিংহাসনটি নিশ্চয়ই আমি উদ্ধার করে দিতে পারব। মনে করবেন না এটা আমার আত্মম্ভরিতা, এটা আমার সংস্কার বলতে পারেন, কারণ অনুসন্ধানের ব্যাপারটা আমি মনে করি সম্পূর্ণ অঙ্কশাস্ত্রের মতই একটা জটিল সমস্যা মাত্র। বুদ্ধি থাকলেই যে কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করা যায়, অবিশ্যি সে সমস্যা যদি উদ্ভাবিত হয়ে থাকে আমাদের মত কোন এক মানুষের দ্বারা। অধিক বলবার কিছু নেই, সাক্ষাতেই বিশদ আলোচনা হতে পারবে। নমস্কার জানবেন।

ভবদীয়—কিরীটী রায়

নাম ঠিকানা খামে লিখে তখুনি কিরীটী চিঠিখানি ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার জন্য মেসের ভৃত্যকে ডেকে পাঠিয়ে দিল।

দিন তিনেক বাদেই অপ্রত্যাশিত ভাবে জবাব এল :

প্রিয় কিরীটীবাবু,

আপনার চিঠিখানা পেলাম। আপনি এলে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পাব আশা করছি, সাক্ষাতে সব কথাবার্তা হবে।

শিয়ালদহ থেকে রাত্রি আটটায় একটা ট্রেন ছাড়ে, সেটা এখানে পরের দিন সকালবেলা সাতটায় এসে পৌছয়। স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ি ঘণ্টাখানেকের পথ। আগে সংবাদ পেলে টমটম পাঠাব। নমস্কার রইল।

নিবেদক—ত্রিদীপনাথ রায়

চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার মধ্যেই অপরিচিত ত্রিদীপনাথ রায়ের সুস্পষ্ট একটা ছবি যেন ফুটে উঠেছে। বার দুই আদ্যোপান্ত পড়ে কিরীটীর মনে হয়—লোকটি স্বল্পভাষী। কোন কাজই বেশ চিন্তা না করে করেন না। পূর্বপুরুষের বত্রিশ সিংহাসনটি চুরি যাওয়ায় ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিশেষ রকম বিচলিত হয়ে উঠেছেন। এবং বিচলিত হয়েই ক্ষান্ত হননি, সেটি পুনরুদ্ধার করবার জন্যও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ও সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে দিয়ে সেটা যেন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হচ্ছে কিরীটীর কাছে। আর দেরি করা নয়, শুভস্য শীঘ্রম্।

কিরীটী জামাটা গায়ে দিয়ে শিয়ালদহের দিকে বেরিয়ে পড়ল। সেখানে খোঁজ করে পরের দিনের গাড়িতে একটা সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করে, কিরীটী ডাকঘরে গিয়ে ত্রিদীপনাথকে তার করে দিল।

শীত এখনও ভাল করে মোটেই পড়েনি, সামান্য একটু শীতের আমেজ দেখা

দিয়েছে মাত্র। স্টেশনে এসে কিরীটী দেখল, ছোট একটা সেকেণ্ড ক্লাস কুপেতে লোয়ার বার্থ সে পেয়েছে। উপরের বার্থে যিনি যাচ্ছেন তাঁর নাম বিনায়ক সান্যাল, বার-অ্যাট্-ল। কিরীটী গাড়িতে উঠে হোল্ড-অলটা খুলে বার্থের ওপরে বিছানাটা বিছিয়ে নিল। সঙ্গে করে কয়েকটা রহস্যোপন্যাস এনেছে, রাত্রের খোরাক। রাত্রে ট্রেনে সে কোনদিনই ঘুমোতে পারে না। ট্রেনের ঝাঁকুনি ও চাকার শব্দে ঘুম আসে না।

কিরীটী স্লিপিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে বালিশের ওপরে আড় হয়ে শুয়ে একটা বই খুলে বসল। ট্রেন ছাড়তে বোধ করি আর মিনিট দু-তিন দেরি আছে।

সাহেবী পোশাক পরা একজন নধরদেহ পুরুষ, হাতে একটা অ্যাটাচি কেস, বগলে প্রকাণ্ড একটা খাপে ভর্তি বীণ জাতীয় তারের বাদ্যযন্ত্র ও কুলীর মাথায় বেডিং ও একটা মাঝারি গোছের সুটকেস চাপিয়ে কামরার মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী একবার বই থেকে চোখ তুলে আগন্তুকের দিকে তাকাল।

আগন্তুকের বয়স তিরিশের উর্ধ্বে। মাথার ঘন চুল ব্যাক-ব্রাশ করা। নাকটা ভোঁতা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, বাটারফ্লাই গোঁফ। চোখে রিমলেস চশমা। চশমার লেন্সের অন্তরালে গোল গোল চোখের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি। পরিধানে নেভি ব্লু কালারের দামী সার্জের সুট। জিনিসপত্র গোছগাছ করে বিছানাটা বার্থে পেতে আগন্তুক কুলীকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে, কিরীটীর বার্থের পাশে বসবার যে বেতের চেয়ারটা আছে, তাতে বসে পড়ে পকেট থেকে দামী টোবাকো পাইপ ও পাউচ বের করে ধূমপানের যোগাড় করতে লাগলেন। পাইপে টোবাকো ভরে লাইটার দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে তীব্র এক টান দিয়ে একগাল পীতাভ ধোঁয়া ছেড়ে কিরীটীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গেছে, ট্রেন প্ল্যাটফরম ছেড়ে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

কতদূর যাবেন? ব্যারিস্টার সাহেব কিরীটীকে প্রশ্ন করলেন।

বেশী দূর নয়, শ্রীনগর। আপনি?

আমি শ্রীনগর না হলেও কাছাকাছি—শ্রীনগরের আগের স্টেশনে।

টাইম-টেবলে কিরীটী দেখেছিল, শ্রীনগরের আগের স্টেশনটি একটি বড় জংশন স্টেশন। একটি নামকরা ডিস্ট্রিক্ট টাউন।

কোন মকদ্দমার ব্যাপারে বোধ হয়?

হ্যাঁ। তা না হলে আর কেন বলুন? ভদ্রলোক পাইপটা দাঁতে চেপে মৃদু

একটু হাসলেন।

ট্রেন দমদম জংশনে এসে থামল।

যাত্রীদেব গোলমাল, ওঠানামা। ঘণ্টা বাজল, ট্রেন আবাব চলতে শুরু করল।

সান্যাল আবাব প্রশ্ন কবেন, হঠাৎ শ্রীনগবে চলেছেন যে?

এমনিই বেড়াতে যাচ্ছি। দেশভ্রমণ কবাটা আমার একটা নেশা। শুনেছি জায়গাটা নাকি বেশ। পুবনো দিনেব অনেক কিছু স্মৃতিচিহ্ন নাকি এখনও সেখানে অবশিষ্ট আছে।

হ্যাঁ, আমিও দু-একবাব সেখানে গেছি। শ্রীনগবেব বাজবাড়িই তো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জিনিস একটা। পাল বাজত্বেব সময়কাব তৈবী সে প্রাসাদ। শুনেছি, সে নাকি এক বহস্যেব খাসমহল।

আপনি দেখেছেন সে প্রাসাদ?

বাইবে থেকে যতটা সম্ভব, মানে বহির্মহলটা সব ঘুবে ঘুবে দেখেছিলাম একবাব। প্রাসাদেব অভ্যন্তবে তো বাজাবা কাউকে প্রবেশ কবতে দেন না। বাজাদেব একটা গেস্ট হাউস আছে, বাজবাড়ি থেকে কিছু দূবে। সেখানে অনেকেই গিয়ে অনেক সময় থাকেন। তা ছাডা পাল বাজাদেব সময়ে কৈবর্ত সর্দার ভীমেব উপদ্রবে বাজাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামপাল কিছুদিন নাকি ওখানে গিযে এক বাড়িতে ছিলেন, সেটাকে রামপালেব দুর্গ বলে। হৃতসর্বস্ব বামপাল নাকি সেই বাড়িতে প্রায় দেড় বৎসব লুকিয়ে ছিলেন। ছোটখাটো একটা দুর্গেব মত সে বাড়িটা। দুর্গেব চাবপাশে পরিখা, পবিখাব চাবপাশে প্রায় দেড মানুষ সমান উঁচু পাথবেব প্রাচীব।

বামপাল নিজেই নাকি সে দুর্গ নির্মাণ কবেছিলেন নিজেব লোকজনদেব দিয়ে এবং শোনা যায়, সেই দুর্গে বসেই তিনি সৈন্য সংগ্রহ কবেছিলেন পবাক্রান্ত কৈবর্ত সর্দার ভীমেব বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য।

কৈবর্ত সর্দাব সে কথা জানতে পেবে একদল দুর্ধর্ষ সৈন্য প্রেবণ কবে বামপালকে বিধ্বস্ত কববাব জন্য। দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা সেই দুর্গেব মধ্যে আত্মগোপন করে বামপাল ভীমেব প্রেবিত সৈন্যদেব সঙ্গে যুদ্ধ চালান। শেষটায় কিছুতেই যখন আব দুর্গ বক্ষা কবা সম্ভব হল না, তখন গোপনে পালিয়ে যান বর্তমান শ্রীনগবে যে রাজপ্রাসাদ তাবই মধ্যে। আকাবে ও চাকচিক্যে তখনকার সে প্রাসাদ বর্তমানের থেকে অনেক ছোটই ছিল, এবং মালিক ছিলেন সর্বেশ্বর রায়, সামান্য বিত্তশালী একজন ঐ সময়কাব জমিদাব মাত্র।

রামপাল সর্বেশ্বরের গৃহে প্রায় পনেবো দিন আত্মগোপন করে থাকেন। পরে

সর্বেশ্বরের ঢালীরা রাতের অন্ধকারে পালকিতে করে রামপালকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসে।

কিরীটী তন্ময় হয়ে মিঃ সান্যালের বর্ণিত কাহিনী শুনছিল। রূপকথার মতই চমকপ্রদ, রহস্যঘন রোমাঞ্চকর।

মিঃ সান্যাল একজন শক্তিশালী কথক বটে। ভাষা ও বলবার টেকনিকও তাঁর অপূর্ব।

অন্ধকারে নির্জন প্রকৃতির বুকখানাকে শব্দমুখর করে মেল ট্রেনখানা একটানা ছুটে চলেছে। থামবে গিয়ে একেবারে সেই রাণাঘাট জংশনে।

মাঝে মাঝে ট্রেনের তীব্র গতিবেগের দু পাশে ছোট ছোট স্টেশনের আলোগুলো চমক দিয়ে যায়, মসীকৃষ্ণ রাতের বুকে হঠাৎ জেগেই মিলিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎচমকের মত। রেল লাইনের দু পাশে অন্ধকারে আবছা আগাছার ঝোপঝাড়গুলো জোনাকির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে যেন অভিসারে বের হয়েছে।

তারপর? কিরীটী প্রশ্ন করে।

তারপর ঐ ঘটনার অনেক দিন পরে রামপাল যখন হৃতরাজ্য পুনর্বায় ফিরে পেলেন, সর্বেশ্বরের কাজের জন্য তাঁকে ইনাম দিলেন রাজা উপাধি ও অনেক নিষ্কর জমিজমা। সর্বেশ্বর তখন রামপালের সনদের জোরে রাজা উপাধি নিয়ে ঐ জায়গার নাম বদল করে 'শ্রীনগর' বলে নতুন নামকরণ করলেন। সর্বেশ্বরের ভাগ্যলক্ষ্মী তখন সুপ্রসন্ন, দিনে দিনে দেবতার আশীর্বাদে তাঁর যশ, মান, প্রতিপত্তি ও অর্থ বাড়তে লাগল। বর্তমানের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তৈরী হল অতীতের ক্ষুদ্র জমিদার ভবনের ভিতের উপরে। বর্তমান শ্রীনগর ও সেই সঙ্গে শ্রীনগরের রাজাদের উৎপত্তির এই হল মোটামুটি ইতিহাস।

গল্প বলতে বলতে পাইপটা নিভে গিয়েছিল। মিঃ সান্যাল পাইপটায় আবার অগ্নিসংযোগ করে একটা টান দিয়ে পীতাভ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, প্রায় বছর পাঁচেক আগে একবার শ্রীনগরে বেড়াতে গিয়ে ওখানকার এক বৃদ্ধের মুখে শ্রীনগরের এই ইতিহাস আমি শুনি।

উপন্যাসের মতই চমকপ্রদ এ কাহিনী। অতীত বাংলার যে কত শত কাহিনী আজও এমনি করে সুপ্ত রয়ে গেছে, কেই বা তার খোঁজ রাখে। পরদেশী ভাষায় পরের দেশের ইতিহাস মুখস্থ করে আমরা ডিগ্রীর নম্বর বজায় রাখি এবং সেই ডিগ্রীই হয় আমাদের শিক্ষার শীল-মোহর। অথচ ঘরের খবর আমরা রাখি না।—কিরীটী মৃদুস্বরে খেদোক্তি করলে।

সত্যি যা বলেছেন। বাংলার ইতিহাসকারেরা যেন চোখ বুজেই ইতিহাস রচনা করেছেন।

নানা ধরনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দুজনের ভিতর ক্রমশঃ বেশ গভীর আলাপ জমে ওঠে। কিরীটীর বেশ লাগে ক্ষণপরিচিত মিঃ সান্যালকে।

মিঃ সান্যালের ব্যারিস্টারি ব্যবসা হলেও তাঁর বেশী ঝোঁক ইতিহাস পড়ায়। কাজকর্মের বাইরে যতটুকু সময় তিনি পান, নানা ধরনের ইতিহাস পড়েই তিনি কাটান বেশির ভাগ সময়। এ ছাড়াও তাঁর আর একটি নেশা আছে, সেটা হচ্ছে যন্ত্র-সঙ্গীতের সাধনা। কাজেই যেখানেই তিনি যান, একটি সুটকেস-ভর্তি বই ও বীণা যন্ত্রখানি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

শেষরাত্রের দিকে কিরীটীর চোখে কেমন একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। ঘুম যখন ভাঙল, চলমান গাড়ির কাঁচের শার্সির ফাঁকে প্রথম ভোরের ধূসর আলো ওর চোখে পড়ে। চেয়ে দেখল সহযাত্রী মিঃ সান্যাল গাড়িতে নেই, বোধ হয় নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে গেছেন।

কিরীটী কাঁচের শার্সিটা নামিয়ে দিল, ঝিরঝির প্রভাতী হাওয়া এসে রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত চোখেমুখে স্নিগ্ধ শীতল পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি পরে গাড়ি শ্রীনগরের রেলওয়ে স্টেশনে এসে থামল।

স্টেশনটি ছোট্ট অখ্যাতনামা, ততোধিক অখ্যাতনামা স্টেশনের নামটি। আগে এখানে মেল ট্রেন থামত না। স্টেশন থেকে শ্রীনগর প্রায় মাইল আষ্টেক দূরের পথ।

স্টেশন থেকে রাজবংশেরই তৈরী প্রশস্ত কাঁচা সড়ক বরাবর শ্রীনগর পর্যন্ত চলে গেছে। মাত্র মাস আষ্টেক হল বর্তমান রাজা ত্রিদীপনাথের অনেক চেষ্টার ফলে আজকাল মেল ট্রেনটা এই স্টেশনে থামছে—তাও মাত্র আধ মিনিটের জন্য। আগে আগে রাজবাড়ির লোকেরা বড় জংশন স্টেশনটিতে নেমে সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের একটা ছোট শাখানদী বেয়ে ভাউলিয়া করে শ্রীনগর যেত, তাতে বর্ষাকাল ও তার পরবর্তী কয়েক মাস নদীপথে যাতায়াত করা চলত। শীতকালে নদীর জল এত বেশি শুকিয়ে যেত যে, নদীপথে কোন বড় বা মাঝারি নৌকোই যাতায়াত করত না। তাই শীতকালটা পরের ছোট স্টেশনে নেমে, হাঁটাপথে গরুর গাড়িতে চেপে শ্রীনগরে যাওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় থাকত না।

উঁচু বাঁধানো প্ল্যাটফরমের ওপরে একতলা ছোট একটি বাড়ি—স্টেশন-ঘর ও

দায় অফিস

স্টেশন-ইনচার্জ বামসদয়বাবু। প্রায় চল্লিশেব উর্ধ্বে বয়স। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ইতিমধ্যে অর্ধেকেব বেশী চুলে বয়সেব নোটিশ জাবী হয়েছে। চোখে পুরু লেন্সের নিকেল ফ্রেমেব চশমা। কিবীটী গাড়ি থেকে নেমে ইতস্তত দৃষ্টিপাত কবতে থাকে।

কে একজন এই দিকেই এগিয়ে আসছে। বয়স ত্রিশ-পঁযত্রিশেব বেশী নয। রোগা লম্বাটে গড়ন। অত্যন্ত সুশ্রী চেহাবা। দীর্ঘ উন্নত নাসা। একজোড়া চোখে বুদ্ধিব প্রখর দীপ্তি। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। পরিধানে সাদা ধুতি ও সাদা ভায়লার গরম পাঞ্জাবি, তাব ওপবে সাদা শাল জড়ানো। পায়ে সাদা নাগবাই। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনমাস্টাব বামসদযবাবুও এগিযে আসেন, টিকেট ?

কিরীটী টিকেটটা পকেট থেকে বেব কবে দেয়।

কোথায় যাবেন ? বামসদয় আবাব প্রশ্ন কবেন।

বাজবাড়ি।

আপনিই কি মিঃ বায ? সুশ্রী যুবকটি প্রশ্ন কবেন।

হ্যাঁ। আপনি ?

আজ্ঞে, ইনি আমাদেব বাজাবাহাদুব, বামসদয়বাবু বলে ওঠেন, মহাশয় ব্যক্তি, প্রাতঃস্মরণীয়।

ওঃ। কিবীটী হাত তুলে নমস্কাব জানায়।

প্রতিনমস্কাব জানিযে ত্রিদীপনাথ সাদর আহ্বান জানান, বাইবে টমটম দাঁড়িয়ে আছে।

দুজনে স্টেশনেব বাইবে এসে দাঁড়ান। অপ্রশস্ত কাঁচামাটিব সড়ক। ছোট একটি টমটম গাড়ি। একটা তেজী সাদা ঘোড়া। কোন সহিস বা কোচম্যান নেই।

উঠুন।

কিরীটী গাড়ির পাদানিতে পা দিযে উঠে বসে। দুলকি চালে ঘোড়াটা ছুটে চলে। দু পাশের ক্ষেতে সবিষার অজস্র হলুদ ফুল, ভোরেব স্নিগ্ধ আলোয় যেন খুশির ঢেউ জাগিয়েছে। চারিদিকে একটা শুচিস্নিগ্ধ আবহাওয়া।

কিরীটী বেশ একটু আশ্চর্যই হয়েছিল, রাজাবাহাদুর নিজেই তাকে নিতে এসেছেন! এতটা সে আশা করেনি। বিশেষ করে তার মত একজন সামান্য অপরিচিত ব্যক্তি!

রাজাবাহাদুরই প্রথমে কথা বললেন, মিঃ রায়, আপনার চিঠি পড়ে আমি যতটা না আশান্বিত হয়েছিলাম, তার চাইতে বেশী আনন্দিত হয়েছি আপনাকে দেখে এবং আশা করছি পরিচয় হলে আরো সুখী হব।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, হতাশও তো হতে পারেন।

বোধ হয় না, কারণ মানুষ চেনবার একটা অসাধারণ 'ন্যাক' আমার আছে। রাজাবাহাদুরের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা দেখা দেয়।

আপনি বোধ হয় একটু আশ্চর্যই হচ্ছেন, রাজাবাহাদুর বলতে লাগলেন, এভাবে একা আমার আপনাকে এগিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, কিন্তু শ্রীনগরের রাজবাড়ির এইটাই চিরন্তন নীতি। অতিথি নারায়ণ, তাঁকে স্বয়ং গিয়ে অভ্যর্থনা না জানালে অতিথির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়, তা ছাড়া

রাজাবাহাদুর থামলেন। কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রাজাবাহাদুরের মুখের দিকে তাকায়।

তা ছাড়া আপনার চিঠি পড়ে আমি এতখানি বিস্মিত হয়েছিলাম যে আপনাকে চোখে দেখবার একটা দুর্দমনীয় লিপ্সা মনে আমার জেগেছিল। এই দেখুন আমি সঙ্গে করে টাকাও এনেছিলাম। রাজাবাহাদুর ডান হাতে ঘোড়ার লাগামটা ধরে বাঁ হাত দিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে গোটা পাঁচেক নোট বের করে দেখালেন। তার পর বললেন, আপনার কথাবার্তা ও চেহারায় আমাকে না যদি ইমপ্রেস করতে পারতেন, তবে স্টেশন থেকেই ধুলোপায়ে আপনাকে বিদায় করে ফিরে আসতাম।

কিরীটী আবার একটু হাসলে, কোন জবাবই দিলে না বা একটি প্রশ্নও করলে না।

আপনাকে তো বলেছিই, আপনাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার আশা হচ্ছে এখন, আপনি হয়তো আমার হারানো সম্পত্তির একটা কিনারা করলেও করতে পারবেন। সরকারী বে-সরকারী অনেক গোয়েন্দার কাছ থেকেই আমি চিঠি পেয়েছি। সকলের চিঠির মধ্যেই যেন ফুটে উঠেছে একটা জঘন্য লালসার ছবি পাঁচ হাজার টাকার প্রতি।

এতক্ষণ পরে প্রথম কিরীটী সহসা একটা প্রশ্ন করল, রাজাসাহেব, আপনার বহুমূল্য রত্নসিংহাসনটি যে অপহৃত হয়েছে, এ সংবাদ কে কে জানে?

এখনও বাড়ির কেউই জানে না বলতে গেলে, কারণ এ সংবাদটা আমি সকলের কাছেই গোপন রেখেছি, এমন কি আমার স্ত্রী পর্যন্ত জানেন না এবং একটি মাত্র ইংরাজী দৈনিক ছাড়া অন্য কোথাও আমি বিজ্ঞাপন দিইনি। ইংরাজী দৈনিকে ইংরাজীতে বিজ্ঞাপন দেওয়ারও দুটো কারণ আমার আছে। এক কারণ, চোরকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে ব্যাপারটা আমি টের পেয়েও বিচলিত হইনি এবং ফিরে

পাবার আশা রাখি। দ্বিতীয় কারণ, ব্যাপারটা বাড়িতে ঢাকঢোল না পিটিয়ে যথাসাধ্য গোপন করে অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছি।

আশ্চর্য। আচ্ছা আপনার কাউকে কি সন্দেহ হয় এই চুরির ব্যাপারে ?

কাউকে বলতে আপনি ঠিক কি mean করছেন ?

মানে বাড়ির মধ্যে কোন বিশেষ লোককে বা বাইরে জানাশোনার মধ্যে কাউকে।

বাড়ির মধ্যে কাউকেই আমি সন্দেহ করতে পারছি না, কারণ 'আয়রন সেফ'টা আমার নিজের শয়নকক্ষে ছিল। তা ছাড়া তার চাবি সর্বদাই আমার নিজের শয়নকক্ষে ড্রয়ারে থাকে।

আপনার শয়নকক্ষ তো পুরাকালের নবাবী আমলের বেগমদের মহল নয় যে কারও পক্ষেই সেখানে প্রবেশ দুঃসাধ্য।

তা নয় বটে, তবে সে কক্ষে দু-চারজন ছাড়া অপরের যাওয়া নিষেধ আছে।

যেমন ?

আমার স্ত্রী, আমার বৃদ্ধা মা ও বাড়ির বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য ভজু। এরা ছাড়া সে ঘরে কেউই আর বড় একটা ঢোকে না বলেই আমি জানি। তবে যদি বলেন এ কাজ আমার স্ত্রী বা বিশ্বাসী বৃদ্ধ ভৃত্য ভজুর তা হলে আমি নাচার।

কিরীটী হো হো করে হেসে ওঠে।

হাসছেন যে ?

কতদিন আপনি বিয়ে করেছেন ?

বছর সাতেক।

আপনার সন্তান ?

এখনও পর্যন্ত হয়নি।

আপনার স্ত্রী ? মাপ করবেন, অবশ্য যদি কিছু না মনে করেন।

না না, অসঙ্কোচে আপনি যা জানতে চান বলুন। রাজবাড়ির অন্দরমহলে আপনাকে আমি নিয়ে চলেছি। রাজবাড়ির রীতিবিরুদ্ধ কাজ। আজ পর্যন্ত খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া রাজঅন্তঃপুরে বড় একটা কেউই প্রবেশ করতে পারেনি। অথচ পাল রাজত্বের সময় থেকে ইতিহাসবিখ্যাত বলে অনেকবার অনেক পর্যটক রাজবাড়ির অন্দরমহল দেখবার জন্য অনেক ইচ্ছা ও অনুরোধ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু নিয়ম নেই বলে কাউকেই আজ পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বলতে গেলে আপনিই সর্বপ্রথম সেখানে প্রবেশ করতে চলেছেন, এক্ষেত্রেই ··

বলছিলাম আপনি কি রকম ঘরে বিয়ে করেছেন ?

এককালে তাঁরা যথেষ্টই ধনী ছিলেন, কিছুদিন হল অবস্থার একটু হেরফের হয়েছে। তবে পুরাতন বনেদী বংশ।

সহসা কিরীটীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে রাজবাড়ি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রাজবাড়িই বটে।

আরও বিস্মিত হল সে, যখন গাড়ি এসে রাজবাড়ির ফটকের মধ্যে ঢুকল। বন্দুকধারী নেপালী দারোয়ান কুর্নিশ করে লোহার বিরাট গেট খুলে দিল। পাথরের নুড়িঢালা চওড়া পথ।

বহির্মহলে এসে টমটম দাঁড়াতেই বৃদ্ধ নায়েব থাকহরিবাবু নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এলেন। সহিস এসে ঘোড়ার বাগ ধরল। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীও টমটম থেকে নেমে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল।

কিরীটী বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজবাড়ির ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কারুকার্য দেখে। বড় বড় পাথরের খিলান, মোটা মোটা থাম। একদা যে এখানে ঐশ্বর্য ও গরিমার প্রাচুর্য ছিল, এখনও যে তার অনেকখানিই অবশিষ্ট আছে তা প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়।

ত্রিদীপনাথ শৌখিন ও আধুনিক কেতা দুরস্ত লোক। পুরাতনের সঙ্গে বহু জায়গায় আধুনিকের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

আসুন মিঃ রায়। রাজাবাহাদুর বলেন কিরীটীকে। সেই আহ্বানে কিরীটী এগিয়ে চলে।

বহির্মহলের অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে, দুজনে এসে একটা নাতিপ্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করেন। আসবাবের বিশেষ কোন বাহুল্য নেই। তবু যা সামান্য আসবাবপত্র আছে, সে সব মূল্যবান। সুন্দর একটি মেহগনি পালঙ্কের ওপরে শুভ্র শয্যা বিছানো, মাথার ধারে শ্বেতপাথরের একটি গোল টেবিল, সাদা পাথরের গ্লাসে বোধ হয় পানীয় জল ঢাকা দেওয়া আছে। পুরনো আমলের দুটি আরামকেদারা। একটি আলমারি বই ভর্তি। জামা কাপড় রাখবার জন্য একটি আলনা। এ ঘরটাই আপনার জন্য ঠিক করে রেখেছি, কোন কষ্ট হবে না তো?

বরং বলুন এত বেশী প্রাচুর্য যে অসুবিধাই ভোগ করতে হবে প্রাচুর্যে।

রাজাবাহাদুর হাসলেন প্রত্যুত্তরে।

আপনি বিশ্রাম করুন, আহারাদির পর আবার সাক্ষাৎ হবে।

রাজাবাহাদুর নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

* * *

দ্বিপ্রহরের দিকে বোধ হয় কিরীটীর কেমন একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। একটা

অস্পষ্ট খসখস শব্দে তার তন্দ্রা টুটে গেল।

খোলা জানালাপথে বৈকালী রৌদ্রের নিস্তেজ আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে।

দরজাটা সে শয়নের পূর্বেই ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল।

ঘুমের ঘোর তখনও চোখের পাতা থেকে ভাল করে মুছে যায়নি।

একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও শুনেছিল, ঘরের ভিতর চারদিকে ও একবার ভাল করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

কিন্তু ও কি, বইয়ের আলমারিটার পাশে? ভাল করে কিরীটী চোখের পাতা দুটো একবার রগড়ে নিল। দেওয়ালের একটা অংশ ভিতরের দিকে সরে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তাই তো

বিস্ময়ে যেন ও স্তব্ধ হয়ে গেছে। একদৃষ্টে দেওয়ালের দিকে ও তাকিয়ে থাকে।

আরো ভিতরে—হ্যাঁ, ক্রমে দেওয়ালের একটা চৌকো অংশঃভিতরের দিকে ঢুকে গিয়ে বেশ প্রশস্ত দ্বারপথ প্রকাশ পেল।

আশ্চর্য। এসব কি ভোজবাজি? না, ও জেগে জেগেই দিনের বেলা স্বপ্ন দেখছে? না, স্বপ্ন যে নয়, পরমুহূর্তেই তা প্রকাশ পেল। ঘরে প্রবেশ করলেন রাজাবাহাদুর। কিরীটীর বিস্ফারিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রাজাবাহাদুর হেসে বললেন, ও কি, আপনি জেগে নাকি? আমার ঘরের অদৃশ্য দ্বারপথ দিয়ে যে একটু আগে আমি দেখলাম আপনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

রাজাবাহাদুর ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ালের গায়ে চোরা দ্বারটি অদৃশ্য হয়ে গেল। নিরেট পাথরের দেওয়াল, কোথাও দ্বারের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

রাজাবাহাদুর এগিয়ে এসে একটি আরাম-কেদারা অধিকার করে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, এ গোপন দ্বারপথের রহস্য রাত্রে আপনার কাছে ভেদ করব। তা যাকগে, সকলের সামনে দিয়ে এ বাড়ির চিরন্তন নীতি ভঙ্গ করে আপনাকে অন্দরমহলে নিয়ে যেতে পারব না। তাই ঠিক করে রেখেছিলাম, এই দ্বারপথ দিয়ে অন্দরমহলে আপনাকে নিয়ে যাব রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে। বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত হয়নি তো?

না। কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দিল।

দু-চারটে কথাবার্তার পর রাজাবাহাদুর গোপন দ্বারপথেই আবার বিদায় নিলেন।

রহস্যের খাসমহলই বটে এ রাজবাটী। গতরাত্রে ট্রেনে সহযাত্রী ব্যারিস্টার মিঃ

সান্যালের কথা কিরীটীর মনে উদিত হল।

* * *

গভীর রাত্রি। একটু আগে রাজবাড়ির পেটা ঘড়িতে রাত্রি একটা ঘোষণা করেছে। কিরীটী একাকী শয্যায় জেগে বসে আছে রাজাবাহাদুরের অপেক্ষায়। তিনি বলেছিলেন রাত্রি এগারটার পর আসবেন। কিন্তু এখনও তাঁর দেখা নেই। কিরীটী চিন্তিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ এমন সময় সেই অস্পষ্ট খসখস শব্দ। ঘরের মধ্যে সুদৃশ্য বাতিদানে তেলের বাতি জ্বলছে। সমগ্র ঘরখানি তারই আলোয় আলোকিত।

সেই গুপ্ত দ্বার আবার ফুটে ওঠে চোখের সামনে এবং একটু পরেই সেই দ্বারপথে রাজাবাহাদুরকে দেখা গেল, হাতে তাঁর শক্তিশালী পাঁচ সেলের টর্চ।

দেরি হয়ে গেল। এইবারে সব ঘুমিয়েছে, আপনাকে এবারে অন্দরমহলে নিয়ে যাব। বাড়িতে উৎসব আসন্ন। আর মাত্র সাতদিন বাদেই সোনার গোপাল প্রতিষ্ঠিত হবে, আত্মীয়স্বজন ও বাড়ির প্রত্যেকেই জানে। মাত্র সাতটা দিন আপনার হাতে সময় মিঃ রায়, যা কিছু করবার এই সময়ের মধ্যেই আপনাকে করতে হবে। মূর্তি প্রতিষ্ঠার যে এতবড় বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে এখনও পর্যন্ত কেউ তা জানে না, কাউকে জানতে দিইনি। রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর যেন কি এক অদ্ভুত উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। সহসা এগিয়ে এসে কিরীটীর ডান হাতখানি আগ্রহের সঙ্গে চেপে ধরে ব্যাকুল উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলেন, বলুন মিঃ রায়, পারবেন তো আমার সিংহাসনটি উদ্ধার করে দিতে?

কিরীটী অবাক হয়ে রাজাবাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, এ যেন স্টেশনে সকলের পরিচিত সে রাজা ত্রিদীপনাথ নয়, সেই দুর্জয় সঙ্কল্প ও মনোবল, কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই, ছোট একটি ভীরু শিশু।

চলুন রাজাবাহাদুর, আপনাদের শয়নকক্ষটা একবার দেখব।

আসুন।

সাঙ্কেতিক গোপন দরজা-পথে দুজনে—আগে রাজা ত্রিদীপনাথ, পশ্চাতে কিরীটী একটা অপ্রশস্ত অলিন্দে এসে প্রবেশ করল। অনেক দিনের বদ্ধ বায়ুতে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অলিন্দপথে অনেকটা চলবার পর সামনেই সিঁড়ি অতিক্রম করে আবার দুজনে এসে একটা বন্ধ দেওয়ালের সামনে দাঁড়াল। সেই দেওয়াল সরে গিয়ে দ্বারপথ প্রকাশিত হল এবং সেই দ্বারপথ দিয়ে দুজনে এসে যে প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করল, সেটাই রাজা ত্রিদীপনাথের শয়নকক্ষ।

রৌপ্যনির্মিত সুদৃশ্য বাতিদানে মোমবাতি জ্বলছে। প্রকাণ্ড পালঙ্কে নিভাঁজ শয্যা বিছানো।

আমার স্ত্রী এখানে নেই। তিনি দিন দশেক হল তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি গেছেন, দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসবার কথা। উৎসবের বাড়ি, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মা'র শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে যেতে হয়েছে।

কিরীটী ঘরের চতুষ্পার্শে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছিল।

পালঙ্ক থেকে হাত পাঁচেক দূরে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো মস্ত একটি আয়রন সেফ।

ঐ আয়রন সেফেই বুঝি আপনার সিংহাসনটি ছিল?

হ্যাঁ।

সিন্দুকটা একবার দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়, রাজাবাহাদুর এগিয়ে গিয়ে কটিদেশ থেকে একটা চাবির গোছা বের করে সিন্দুকের গা-ডালায় একটা চাবি লাগালেন।

কোন শব্দমাত্র হল না, নিঃশব্দে সিন্দুকটি খুলে গেল।

কিরীটী মৃদুস্বরে বললে, আশ্চর্য তো!

কি আশ্চর্য মিঃ রায়?

কিছু না, এ সিন্দুকটা।

হ্যাঁ, মূল্যবান জার্মান সিন্দুক ওটি, আমার প্রপিতামহের আগেকার।

সিন্দুকে পর পর তিনটি সেলফ। ছোট বড় অনেক প্রকার কৌটো ও কাগজ-পত্রের বাণ্ডিল সেই তিনটি সেলফে সাজানো।

কোথায় ছিল সিংহাসনটি?

ঐ যে দেখছেন সুন্দর ঝাঁপিটি, ওর মধ্যেই ছিল।

সিংহাসনটি কত বড় ছিল?

তা ছ'ইঞ্চি খাড়ায় হবে বৈকি। এক-একটা পুতুলই তো প্রায় আড়াই ইঞ্চি করে হবে।

কিরীটী রাজাবাহাদুরের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে, তার আলোয় আয়রন সেফটি ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

সিংহাসনটি চুরি যাওয়ার পর আপনি সিন্দুকের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করেন নি তো?

না, কেবলমাত্র ঝাঁপিটা একবার সিন্দুক থেকে বাইরে বের করেছিলাম।

কিরীটী সিন্দুকটার ভিতর থেকে ঝাঁপিটা বাইরে এনে, সেটাকে ভাল করে দেখতে লাগল। ঝাঁপিটার গঠনকৌশল সত্যই অপূর্ব। সাধারণ বেতের তৈরী নয়, সূক্ষ্ম রূপোর তারে তৈরী। যথেষ্ট মজবুত। ঝাঁপির ভিতরে অনেক কিছু এক সঙ্গে রাখা যেতে পারে।

ঝাঁপিটি আমি দিনের আলোয় একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। এটা আমি নীচে আমার ঘরে নিয়ে যাব, আপনার কোন আপত্তি নেই তো রাজাবাহাদুর?

না, আপত্তি কি। নিয়ে যান।

এবারে কিরীটী ঘরটা ভাল করে দেখতে লাগল।

বেশ প্রকাণ্ড ঘর। মেঝে সুদৃশ্য চৌকো মার্বেল পাথরে গাঁথা, গুপ্তদ্বারটি ভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশের একটি মাত্রই দ্বার। তা ছাড়া ঘরে চারটি জানলা। দুটি অন্দরের দিকে, অন্য দুটি পূর্বে ও দক্ষিণে।

দক্ষিণের জানালাপথে দেখা যায় রাজবাড়ির বাগান। প্রকাণ্ড বাগান, বাগানের সুউচ্চ প্রাচীরের ওপারে দেখা যায় শীতের ম্রিয়মাণ চন্দ্রালোকে মূর্ছিতা বিশুষ্কা ক্ষীণকায়া নদী।

পূবের দিকে রাজবাড়ির সুউচ্চ গেট। দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে আসে।

জানালাপথে মোটা মোটা সব লোহার শিক বসানো। দুটি শিকের ব্যবধান এক বিঘতের বেশী নয়। সেই সামান্য পরিসরের মধ্য দিয়ে কারো এই কক্ষে প্রবেশ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কক্ষের বাইরে একটা ঘোরানো বারান্দা। বারান্দার মাঝামাঝি স্নানঘর।

উপরের তলায় সর্বসমেত আটখানা ঘর।

রাজবাড়িতে কর্মচারী ও ভৃত্যদের বাদ দিলে রাজা ত্রিদীপনাথ, তাঁর স্ত্রী, বৃদ্ধা মা জগত্তারিণী, প্রৌঢ় অবিবাহিত খুল্লতাত জ্ঞানদাশঙ্কর, এক বিধবা বোন শ্যামা।

শ্যামা নিঃসন্তান। দিন কুড়ি হবে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য দূরসম্পর্কীয় অনেক আত্মীয়ই এসেছেন, মেয়ে পুরুষ ছেলে যুবা বুড়ো বুড়ী।

অন্তঃপুরের তিনটি মহল। সর্বশেষের মহলের উপরে তিনখানি ঘর, একখানা রাজাবাহাদুরের শয়নকক্ষ, একখানা লাইব্রেরী, অন্যখানা বসবার জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় মহলে শ্যামা থাকেন, তৃতীয়টিতে খুড়ো জ্ঞানদাশঙ্কর। উপরের টানা বারান্দা দিয়ে এক মহল থেকে অন্য মহলে যাতায়াত করবার দরজা আছে, তবে রাত্রে সে সব দরজা বন্ধ থাকে।

নীচে অমনি তিনটি মহল। প্রথম দুটি মহল অন্তঃপুরের সঙ্গে সংযুক্ত, বাকি মহলটি অন্তঃপুরেরই শামিল—তবে সেখানে গণ্যমান্য অতিথিরা এলে বাস করেন।

তারই একটি ঘরে কিরীটীকে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

* * *

কিরীটীর অনুরোধে রাজাবাহাদুর সিংহাসনটি চুরি যাবার আনুপূর্বিক ঘটনা বললেন।

সেদিন শনিবার, অমাবস্যা। তার উপরে সকাল থেকেই আকাশটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সারাটা দিন লাইব্রেরী ঘরে কাটিয়ে ত্রিদীপনাথ সন্ধ্যার দিকে অন্দরমহলে যাবেন বলে উঠেছেন, এমন সময় হঠাৎ যেন তাঁর মাথাটা ঘুরে উঠল। তাড়াতাড়ি সোফার ওপরে বসে পড়লেন। শরীরটার মধ্যে কেমন যেন অস্থির-অস্থির করছিল। ঐ দিনই সকালের ট্রেনে তাঁর শ্যালক মেডিক্যাল কলেজের পাস-করা ডাক্তার শশাঙ্ক তার দিদিকে নিতে এসেছিল। সে সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে এবং সকলে মিলে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তাঁর শয্যার ওপরে শুইয়ে দেয়। শশাঙ্ক তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে। রাত্রে আর অন্য কিছু না খেয়ে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়েই শুয়ে পড়েন, মাঝরাত্রে একবার ঘুম ভেঙেছিল, তাঁর মনে আছে যে রাজবাড়ির পেটা ঘড়িতে তখন রাত দুটো ঘোষণা করছে। বাকি রাতটা আর তাঁর ঘুম হয়নি। পরের দিন তাঁকে একটু সুস্থ দেখে তাঁর স্ত্রী ও শ্যালক দুপুরের গাড়িতে কলকাতায় চলে গেলেন। বেলা চারটের সময় যে স্বর্ণকার সোনার গোপাল নির্মাণ করছিল, সে এসে সিংহাসনের মাপটা জানতে চায়। কেননা যে মাপ সে পূর্বে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা সে হারিয়ে ফেলেছে। তার ধারণা হচ্ছে, সোনার মূর্তির নীচেকার অংশ যেন একটু বড় হয়ে গেছে। সেই সময় রাজাবাহাদুর আয়রন সেফ খুলে ঝাঁপি তুলে দেখেন ঝাঁপি শূন্য, সিংহাসন তার মধ্যে নেই। অথচ তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, মাত্র দুদিন আগেও একবার যখন তিনি সেফ খোলেন, ঝাঁপি খুলে দেখেছিলেন সিংহাসন ঝাঁপির মধ্যে আছে।

সেফের মধ্যে যে ঝাঁপিতে সিংহাসন আছে সকলেই তা জানত, না?

হ্যাঁ, কিংবদন্তীর মতই সিংহাসনের অস্তিত্বটা কারো কাছেই গোপন ছিল না।

তবে ঝাঁপির মধ্যে যে ঐ সেফে সেটা থাকত, সেটা আমি, আমার স্ত্রী ও মা ছাড়া আর চতুর্থ ব্যক্তি কেউই জানত না।

আর কেউ জানত না আপনি ঠিক জানেন?

নিশ্চয়ই।

আপনার মা বাইরের কারো কাছে কোনদিন গল্পচ্ছলেও কি বলে থাকতে পারেন না ?

পারেন, কিন্তু আমি আমার স্ত্রী ও মাকে ভালভাবেই চিনি, তাঁদের কেউ অন্যের কাছে সে কথা বলতে পারেন না।

কথায় বলে স্ত্রীলোকের মন, গোপনকে গোপন না রাখাটাই তাদের ধর্ম। জানেন না, মহাভারতে যুধিষ্ঠির তাঁর মা কুন্তীদেবীকে কি অভিসম্পাত দিয়েছিলেন। কিন্তু যাক সে কথা। ওটা সামান্য একটা কিংবদন্তী মাত্র। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার ভৃত্য ভজু তো শুনেছি এ বাড়িতে বহুকাল আছে, সেও জানত না ?

না। তবে সে এ ঘরে প্রায়ই আসে।

কখনও কি এমন হয়েছে, আপনি সিন্দুক খুলেছেন সে এসে পড়েছে ?

না সিন্দুক খোলবার আগে বরাবরই আমি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিই।

আচ্ছা, আপনার ঘরের এই গুপ্তদ্বারের কথা আপনি ছাড়া আর কেউ জানে ?

আমার মা আর আমার স্ত্রী।

হুঁ, আমার মনে পড়েছে সেই কিংবদন্তী। মনে মনেই কিরীটী কথাগুলো উচ্চারণ করলে।

আপনি যখন ঘুমোন, তখন আপনার সেফের চাবি কোথায় থাকে ?

আমার লেখবার ড্রয়ারে।

ঘুমোবার সময় আপনার শয়নকক্ষের দরজা তো বন্ধই থাকে, না ?

হ্যাঁ।

সে রাত্রেও ছিল ? মানে যেদিন আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ?

হ্যাঁ। ঘুম ভেঙে উঠে তাই দেখেছিলাম, দরজা ভিতর থেকে বন্ধই ছিল।

আচ্ছা, এই গুপ্ত দ্বারের কথা আপনার কাকামশাই জ্ঞানদাশঙ্করবাবুও জানতেন না ?

না, আমার বাবাই জানতেন এবং মৃত্যুশয্যায় আমাকে বলে যান।

আপনার খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে তো কই পরিচয় হল না ? তিনি কি এখানে নেই ?

আছেন। কাল পরিচয় করিয়ে দেব। চমৎকার লোক। আলাপ করে সুখী হবেন। আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন।

* * *

পরের দিন সকালে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে কিরীটী গত রাত্রের সেই

ঝাঁপিটি কোলের ওপর নিয়ে দেখছিল।

ঝাঁপির ভিতরটা দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সূক্ষ্ম রুপোর তারের সঙ্গে সেটা আটকে আছে। আনন্দে উত্তেজনায় তার চোখের দৃষ্টি জলজল করে উঠল। জিনিসটা সে ঝাঁপির মধ্যে থেকে বের করে পকেটে রেখে দিল।

এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। কিরীটী উঠে দরজা খুলে দিল। ঘরে প্রবেশ করলেন রাজাবাহাদুর এবং তাঁরই মত সুশ্রীগড়ন আর একজন প্রৌঢ়। প্রৌঢ়ের পরিধানে দামী মিহি ঢাকাই ধুতি, গায়ে দামী শাল।

ইনি আমার কাকা, জ্ঞানদাশঙ্কর রায়। রাজাবাহাদুর বললেন।

নমস্কার। কিরীটী হাত তুলে নমস্কার জানাল।

এ-কথা সে-কথার পর কিরীটী সহসা প্রশ্ন করল, শেষরাত্রের দিকে সেতারের বাজনা শুনছিলাম, রাজাবাহাদুর।

হ্যাঁ, রাজাবাহাদুরই ভোররাত্রের দিকে সেতার বাজাচ্ছিলেন। উনি একজন নামকরা সেতার-বাজিয়ে। কথাটা বললেন জ্ঞানদাশঙ্কর।

সত্যি, চমৎকার হাত আপনার রাজাবাহাদুর।

হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌতে শিক্ষা করেছিলাম আমীর খাঁর কাছে। শুনেছেন বোধ হয় তাঁর নাম?

হ্যাঁ, ওদিকটায় আমারও একটু ঝোঁক আছে কিনা। আমিও কিছু কিছু চর্চা করি।

বটে! কি বাজান আপনি?

এস্রাজ ও ব্যাঞ্জো। সামান্যই শিখেছি।

রাজাবাহাদুর অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলেন। ঠিক হল সন্ধ্যার দিকে একটু গান-বাজনা করা যাবে। এরপর রাজাবাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিরীটী খুড়োমশায়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। খুড়োমশায়ের কাছে রাজাবাহাদুর বলেছিলেন, কিরীটী তার পরিচিত বন্ধু। শ্রীনগরে বেড়াতে এসেছেন দু-চার দিনের জন্য।

রাজাবাহাদুরের মুখেই কিরীটী শুনেছিল, সিংহাসনটার ওজন প্রায় তিন পোয়া হবে। খুব একটা ভারী জিনিস নয়। তার ইচ্ছা ছিল, বাড়ির অন্যান্য সকলকে ডেকে সে দু-চারটা কথাবার্তা বলে, কিন্তু রাজাবাহাদুর বলেছেন, আর দু-একদিন বাদে কৌশলে তাকে সে কাজ করতে হবে। ঘুণাক্ষরে যেন কেউ তার এখানে উপস্থিতির

উদ্দেশ্য না টের পায়। তা হলেই সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে রাণীসাহেবা শ্রীনগরে ফিরে এলেন। রাজাবাহাদুরের মুখে সেকথা শুনে কিরীটী তাঁর নিকট এক অদ্ভুত প্রস্তাব উত্থাপন করল। সে বললে, সিংহাসন চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা রাণীসাহেবাকে বলতে হবে এবং সেটা আমারই সামনে।

অনুরোধটা যেন কেমন। কিন্তু এই কদিনের আলাপেই রাজাবাহাদুরের কেমন একটা শ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল কিরীটীর ওপরে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

রাজাবাহাদুরের চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে কিরীটী বললে, আমি বুঝতে পারছি, আপনার কোথায় সঙ্কোচ হচ্ছে রাজাবাহাদুর। কিন্তু অনুসন্ধানের ব্যাপারে ওটা অপরিহার্য। তাছাড়া ভেবে দেখুন, আপনার উৎসবের দিন সমাগত, যেমন ভাবেই হোক আমাদের মিলিত চেষ্টা করতেই হবে হৃত সিংহাসনটি পুনরুদ্ধারের জন্য।

রহস্যের কোন সূত্র কি আপনি পেয়েছেন মিঃ রায়?

সামান্য কয়েকটা সূত্র ধরে একটা অসম্পূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছেছি মাত্র।

শেষ পর্যন্ত রাজাবাহাদুর কিরীটীর যুক্তিতর্কের কাছে নতিস্বীকার করলেন। ঠিক হল ঐদিনই সন্ধ্যায় রাজাবাহাদুর কিরীটীর প্রস্তাবমত রাণীসাহেবার কাছে কিরীটীর সামনেই ঘটনাটি প্রকাশ করবেন।

* * *

সন্ধ্যার অল্প পরেই কিরীটীর কক্ষে সকলে মিলিত হলেন।

রাণীসাহেবাকে দেখে কিরীটী মুগ্ধ হয়েছিল, শুধু দৈহিক সৌন্দর্যের দিক দিয়েই নয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সংযতস্বভাবা রাণীসাহেবা সত্যিই একটি রত্নবিশেষ। রাজকীয় সম্মানের উপযুক্তা।

দু-চার মিনিট সাধারণ আলাপ-আলোচনার পর সহসা কিরীটী তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে রাণীসাহেবার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, রাণীসাহেবা, আপনি এখনও শোনেননি, কেন আমি আপনাদের প্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি?

রাণীসাহেবা তাঁর পরিপূর্ণ দৃষ্টি কিরীটীর প্রতি তুলে ধরেন।

আপনি জানেন, আপনাদের গৃহে দেবতার প্রতিষ্ঠার উৎসব সমাগত, কিন্তু একথা এখনও জানেন না যে, সেই উৎসবে কত বড় বিঘ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের পূর্বপুরুষের তৈরী আসন্ন উৎসবের প্রধান অঙ্গ মূল্যবান বত্রিশ সিংহাসনটি আপনাদের শয়নকক্ষের আয়রন সেফ থেকে অপহৃত হয়েছে।

কিরীটী দেখলে, সংবাদটি শুনে রাণীসাহেবার সমগ্র শরীর যেন মুহূর্তে বংশপত্রের মত সহসা বারেকের জন্য কেঁপে উঠে পরক্ষণেই আবার স্থির হয়ে গেল। সহসা তিনি যেন ঘটনার আকস্মিকতায় পাথরের মত শুদ্ধ অনড় হয়ে গেছেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তিনি কিরীটীর সপ্রশ্ন কঠিন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার পর পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামীর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ অথচ দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করলেন, একথা তো তুমি আমায় বলোনি? কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে যেন একটি কঠিন ভং সনার সুর মূর্ত হয়ে উঠল। বললেন, একথা কি সত্যি?

হ্যাঁ মালতী, এ ঘটনায় আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

কবে এ দুর্ঘটনা ঘটল?

সম্ভবতঃ যেদিন তুমি তোমার বাপের বাড়ি যাও, তার আগের দিন রাত্রে।

মানে যে রাত্রে তুমি অসুস্থ হয়েছিলে?

হ্যাঁ।

সে রাত্রের কথা আপনার সব মনে আছে রাণীসাহেবা? প্রশ্ন করল এবারে কিরীটী।

কি আপনি জানতে চান বলুন?

সে রাত্রের আনুপূর্বিক ঘটনা সব আমায় বলুন, যতটা আপনার মনে আছে।

সন্ধ্যার দিকে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার ভাই শশাঙ্ক সেদিন এখানে ছিল, তারই সাহায্যে ওঁকে আমরা ওঁর শয়নকক্ষে নিয়ে যাই। শয্যায় শুইয়ে দেওয়ার পর উনি যেন কেমন অজ্ঞানের মত রইলেন, ডাকলে সাড়া দেন না, চোখ দুটো বোজা, ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস।

কতক্ষণ অমন অবস্থায় ছিলেন?

রাত্রি একটার পর আমি ঘুমোই, তখন পর্যন্ত ওই অবস্থায়ই ছিলেন। শেষের দিকে ঘুমের ওষুধ দেওয়ায় বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

কে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল?

আমার ভাই শশাঙ্ক ডাক্তার। সে-ই দিয়েছিল।

রাত্রি কটা পর্যন্ত আপনার ভাই আপনাদের শয়নকক্ষে ছিলেন?

তীব্র দৃষ্টিতে রাণীসাহেবা কিরীটীর দিকে তাকালেন, পরে শান্ত স্বরে বললেন, তা রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত হবে। তার পর তাকে আমি একপ্রকার ঠেলেঠুলে শুতে যাই।

সে রাত্রে আপনার ভাই শুতে যাওয়ার পর, যতক্ষণ আপনি জেগে ছিলেন,

আপনাদের শয়নকক্ষে কোনরকম অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলেন বলে আপনার মনে হয় ?

না।

সে রাত্রে কখন আপনার ঘুম ভাঙে ?

শেষরাত্রে।

তখন রাজাবাহাদুর জেগে ছিলেন ?

হ্যাঁ, জেগে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন।

হঠাৎ কিরীটী রাজাবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে একটি অদ্ভুত অনুরোধ জানাল, রাজাবাহাদুর, আর একটি অনুরোধ আপনার কাছে আমার আছে।

বলুন।

আমি রাণীসাহেবাকে একাকী কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই অর্থাৎ এ ঘরে আমি ও রাণীসাহেবা ছাড়া আর তৃতীয় কেউ থাকবে না।

বেশ তো, করুন। রাজাবাহাদুর উঠে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কিরীটী বসে রইল। ঘরের মধ্যে অখণ্ড স্তব্ধতা। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ঘরখানি অবলুপ্ত হয়েছিল। কিরীটী উঠে পকেট থেকে দেশলাই বের করে ফস্ করে সামনের শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপরে রক্ষিত মোমবাতিটা জ্বালাল। নিমেষে ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হল।

রাণীসাহেবা মাথা নীচু করে বসে ছিলেন। কিরীটী রাণীসাহেবার দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করল, রাণীসাহেবা, আপনার স্বামী কি সেদিনকার মত আর কখনও পূর্বে অসুস্থ হয়েছিলেন ?

রাণীসাহেবা কিরীটীর দিকে চোখ তুলে চেয়েই, আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

না।

এর আগে কখনও কোনদিনও অমনি অসুস্থ হন নি ?

না।

আপনার ভাইয়ের পুরো নাম কি ?

শশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল।

ডাঃ শশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল—আমি এক সান্ন্যালকে জানি নামকরা ম্যাজিসিয়ান।

সেই ম্যাজিসিয়ানই আমার ভাই। আপনি তাকে চেনেন ?

চিনি না, তবে দু-চারবার তাঁর 'মেস্‌মেরিজম্‌' দেখেছি ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে। তিনি একজন নামকরা বীণাবাদকও বটে, তাই না ?

হ্যাঁ।

আপনার স্বামীও শুনেছি চমৎকাব সেতাব বাজান।

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আপনি এবাব যেতে পাবেন বাণীসাহেবা।

*　　　　*　　　　*

পবেব দিন সন্ধ্যাব দিকে কিবীটী কলকাতায চলে গেল। বলে গেল, দিন দুয়েকেব মধ্যেই ফিববে, এবং সত্যি-সত্যিই দিন দুই বাদে আবাব ফিবে এল। মূর্তি প্রতিষ্ঠাব আব মাত্র দুদিন বাকি আছে।

এসে শুনল বাণীসাহেবাব ভাই ডাঃ সান্যালও এসেছেন।

দ্বিপ্রহবেব দিকে বাজাবাহাদুবই স্বযং বাণীসাহেবাব ভাইকে কিবীটীব ঘবে এনে আলাপ কবিযে দিলেন। সুশ্রী চেহাবা, দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। গাযেব বং উজ্জ্বল গৌববর্ণ। বেজায হাসি-খুশী ও আমুদে। কিবীটী ডাঃ সান্যালেব সঙ্গে আলাপ কবে মুগ্ধ হল।

কথায কথায কিবীটী ডাঃ সান্যালকে বললে, আপনাব মেস্‌মেবিজম কবা দু-একবাব আমি দেখেছি ডাঃ সান্যাল, আজ একবাব দেখান না।

ডাঃ সান্যাল হাসতে হাসতে বললেন, বেশ তো, খাওযাদাওযাব পব হবে'খন আজ বাত্রেই। জামাইবাবু চমৎকাব মিডিয়াম। চট্ কবে ওঁকে মেস্‌মেবাইজ কবা যায়।

তাই নাকি, বাজাসাহেব। আমিও এককালে যখন ফোর্থ ইযাবে পড়ি যাদুকব গণপতিব কাছে মেস্‌মেবিজম্ বিদ্যা শিক্ষা কবেছিলাম।

সত্যি? আপনিও জানেন নাকি?

সামান্যই, তবে ভাল মিডিযাম হলে কখনও কখনও কৃতকার্য হযেছি।

*　　　　*　　　　*

বাত্রি তখন বোধ কবি নটা সাড়ে নটা হবে।

ঠিক হল আগে কিছুক্ষণ গান-বাজনা হবাব পব ম্যাজিক শুরু কবা যাবে।

কিবীটীব ঘবেই সকলে সমবেত হযেছেন, কিবীটী, বাজাবাহাদুব, জ্ঞানদাশঙ্কব, ডাঃ সান্যাল ও বাণীসাহেবা মালতী দেবী।

প্রথমে সকলেব অনুবোধে কিবীটী ব্যাঞ্জো বাজালে। সকলেই মুগ্ধ হল। তাব পর রাজাবাহাদুর। তাঁবও বাজনাব হাত চমৎকাব।

সর্বশেষে পড়ল ডাঃ সান্যালেব পালা। কিন্তু তিনি তাঁর পার্শ্বস্থিত খাপে মোড়া

প্রকাণ্ড বীণাখানির দিকে সস্নেহে একবার দৃষ্টিপাত করে সখেদে বললেন, আমার বীণার একটা অংশ গাড়িতে আসবার সময় ফেটে গেছে। আজ বীণা থাক্। আপনাদের আজ আমি বাঁশের বাঁশী শোনাব। ডাঃ বাঁশীতে সুর দিলেন। বাঁশীতেও তাঁর শক্তি অদ্ভুত। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ঘরের মধ্যে অপূর্ব সুরের জাল সৃষ্টি করলেন সামান্য সেই বাঁশের বাঁশীতেই, বীণাখানি পাশেই পড়ে রইল। বাজনা থামবার পর আবার সকলের অনুরোধে ডা. সান্যাল বাঁশী তুলে নিলেন। এবার তিনি বাজালেন 'জয়-জয়ন্তী' সুর। নিশীথের নিস্তব্ধতায় সামান্য বাঁশের বাঁশী থেকে যে সুরের ঝর্ণা প্রবাহিত হল তা সত্যই অপূর্ব।

বাজনা শেষ হতেই কিরীটী আচমকা উঠে দাঁড়াল, রাজাবাহাদুর, এবারে আমি আমার ম্যাজিক দেখাব। কিন্তু তার আগে আমি ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখি। ঘরের মধ্যে এখন যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে দুজন, কাকাবাবু ও ডাঃ সান্যাল, আপনাদের কাছেই বিশেষ করে আমার ক্ষমা চাওয়া, কেন যে ক্ষমা চেয়ে রাখছি, এর পর যা ঘটবে, সেটা থেকেই আপনারা দুজনে সহজেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু যাক্ সে কথা। রাজাবাহাদুর, আপনি আমার সামনে এসে বসে, আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন তো। আমার চোখে একটা অদ্ভুত নীল আলো লুকানো আছে। ম্যাজিকের প্রভাবে সেটা সকলের দৃষ্টিগোচর করতে পারি। একে একে আমি সকলকেই দেখাব। শুরু হোক রাজাবাহাদুর থেকে।

মৃদু হেসে রাজাবাহাদুর কিরীটীর সামনে এসে বসলেন, তাকালেন কিরীটীর চোখের দিকে।

ভালো করে অনন্যমনা হয়ে একদৃষ্টে তাকান। দেখতে পাবেন। শুধু ভাবুন আমার চোখ দুটি।—ভুলে যান জগৎ সংসার সব কিছু। ভুলে যান আপনি কে, কোথায়, কেন? শুধু আমার চোখ—হ্যাঁ, আমার চোখ

এক মিনিট, দু মিনিট করে মিনিট দশেক কেটে গেল। রাজাবাহাদুর ও কিরীটী পরস্পর চোখের দিকে তাকিয়ে। ঘরের সব কটি প্রাণী বাক্যহারা।

সহসা কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এ যেন সে কিরীটীর একটু আগে শোনা কণ্ঠস্বর নয়। বজ্রগম্ভীর নির্দেশ বের হয়ে আসে কিরীটীর কণ্ঠস্বরে, রাজাবাহাদুর।

মন্ত্রমুগ্ধ রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, বলুন। যেন বহু বহু দূর হতে ভেসে আসছে।

আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ?

হ্যাঁ। ক্ষীণ উত্তর।

আপনাদের পূর্বপুরুষের বত্রিশ সিংহাসনটি চুরি গেছে, না ?

হ্যাঁ।

ঘরের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানদাশঙ্কর চমকে উঠলেন, কিরীটীর ইঙ্গিতে চুপ করে রইলেন।

আপনি জানেন সেটা কোথায় আছে ?

না তো।

নিশ্চয়ই জানেন। আজ থেকে ঠিক তেরো দিন আগে এমনি একটি রাত্রির কথা মনে করুন। মনে করে দেখুন। নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন। সে রাতের কথা মনে পড়ছে এখন ?

হ্যাঁ, পড়ছে।

সহসা এমন সময় অতর্কিতে দপ্‌ করে ঘরের মধ্যের একটিমাত্র মোমবাতি নিভে গিয়ে নিশ্ছিদ্র আঁধারে সমগ্র ঘরখানি যেন দৃষ্টি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মালতী দেবী অর্ধস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। আলো জ্বালতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল।

রাজাবাহাদুর তেমনি ভাবেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছেন, মাথাটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত, যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমুচ্ছেন।

অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটিই আবার সর্বপ্রথম বললে রাজাবাহাদুরকে সম্বোধন করে, আপনিই রুপোর ঝাঁপিটা আপনার শয়নঘরের আয়রন সেফ থেকে সে রাত্রে বের করে নিয়ে আসেন, কেমন তাই না ? বলুন, কোথায় রেখেছেন সেটা ?

হ্যাঁ।—কিন্তু আমার মনে পড়ছে না কোথায় রেখেছি সেটা। না মনে পড়ছে না।

এর পর ধীরে ধীরে কিরীটী রাজাবাহাদুরের মোহনিদ্রা ভাঙিয়ে দিল। ঘরের সব কয়টি প্রাণীই নির্বাক। কারো মুখে কোন কথা নেই। যাদুমন্ত্রে যেন সকলেই বাক্যহীন হয়েছে।

* * *

ঘুম আসছে না। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। দু পাশের শিরাগুলো দপ্‌ দপ্‌ করছে। মোমবাতিটা পিট্‌পিট্‌ করে জ্বলছে। খস্‌খস্‌ একটা শব্দ।

কিরীটী সতর্ক হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, দেওয়ালের সেই গুপ্তদ্বার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই গুপ্তদ্বারপথে যার মূর্তি ভেসে উঠল, তাকে দেখে কিরীটী যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে।

মাথার ওপরে স্বল্প ঘোমটা, রাণীসাহেবা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী শয্যার ওপরে উঠে বসে বললে, আসুন রাণীসাহেবা।

কিরীটীবাবু।

বসুন রাণীসাহেবা। আপনি কেন এত রাত্রে এসেছেন তা আমি জানি।

আমাকে এ কলঙ্ক থেকে বাঁচান কিরীটীবাবু। অসহ্য কান্নার দুর্দমনীয় বেগে রাণী যেন ভেঙে পড়লেন।

কিরীটী ঘরের মধ্যে ধীরভাবে পায়চারি করছিল, সহসা রাণীসাহেবার সামনে এসে দাঁড়াল, তার পর তীক্ষ্ণ অথচ চাপা কণ্ঠে বললে, আপনি যা বলছেন, তা কি সত্যি আপনার মনের কথা রাণীসাহেবা? সত্যিই কি এই কলঙ্ক থেকে আপনি মুক্ত হতে চান?

হ্যাঁ।

কিন্তু দুদিন আগেও তো আপনার এ সদিচ্ছা ছিল না রাণীসাহেবা?

বিস্মিত দৃষ্টি তুলে রাণীসাহেবা কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

তার মানে?

তা হলে সে রাত্রে এমন করে আপনি আমার কাছে সত্যকে গোপন করতেন না।

আপনি কি বলছেন কিরীটীবাবু?

রাণীসাহেবা। এখনও আপনার মনে 'কিন্তু' আছে। আমার কাছে আগাগোড়াই আপনি নিজেকে গোপনতার আড়ালে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু বৃথা, বৃথা আপনার সে প্রয়াস। আপনি—আপনি বুঝতে পারছেন না রাণীসাহেবা, কত বড় কলঙ্ক আপনার মাথার ওপরে ঝুলছে। দেবতুল্য আপনার স্বামী। আপনার প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। একবার যখন সমস্ত কথা প্রকাশ পাবে, বুঝতে পারছেন কি, আপনার প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধা ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে, আপনার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হবে। সারাটা জীবন আপনাকে চোখের জলে ভাসতে হবে। এখনও ভেবে দেখুন রাণীসাহেবা, আমার কথা এখনও ভেবে দেখুন—এ কলঙ্ক হতে মুক্তি চান, না সারা জীবন ধরে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান? সোনার সিংহাসনে আপনি আজ সমারূঢ়। মুহূর্তে আপনি ধুলোর ওপরে লুটিয়ে পড়বেন। শেষের দিকে কিরীটীর কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

রাণীসাহেবা দু হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন।

কিরীটী রোরুদ্যমানা রাণীসাহেবার দিকে তাকিয়ে রইল নিশ্চল হয়ে।

অনেকক্ষণ কেঁদে রাণীসাহেবা কিছুটা শান্ত হলেন, অশ্রুধৌত মুখখানি তুলে বললেন, বলুন, আমাকে কি করতে হবে কিরীটীবাবু? আমি প্রস্তুত।

আমার ওপরে যদি বিশ্বাস রাখেন, তবে সব কথা আমায় খুলে বলতে হবে।

জিজ্ঞাসা করুন।

সে রাত্রে, মানে যেদিন আপনার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেদিন দ্বিপ্রহরে আপনার স্বামীকে মেস্‌মেরাইজড করা হয়েছিল, কেমন, সত্যি কিনা?

হ্যাঁ।

কিন্তু মেস্‌মেরাইজ তাঁর সেদিন ভাঙানো হয়নি।

না না, তাঁকে আবার ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল।

না, আপনি জানেন না, তা হয়নি। মেস্‌মেরাইজের ঝোঁকেই আপনার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর সেই অবস্থাতেই আপনারা তাকে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শুইয়ে দেন। বুঝতে পারছেন কি, কত বড় নিষ্ঠুরতা আপনার স্বামীর প্রতি সেদিন করা হয়েছিল। আপনার জেগে থাকা অবস্থাতেই আপনার স্বামী আপনার চোখের সামনে আয়রন সেফ খুলে ঝাঁপিসমেত সিংহাসনটি বের করে নিয়ে গুপ্তদ্বারপথে নীচে চলে যান, তাই না?

রাণীসাহেবা চুপ করে রইলেন।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, কেমন করে সে কথা প্রথম আমার মনে উদয় হয় জানেন? এই মেরজাবটা (তারের যন্ত্র বাজাতে হলে আঙুলের মাথায় যে জিনিসটি পরে নিতে হয়) আমি ঝাঁপির মধ্যে পাই। কিরীটী সেটা পকেট থেকে বের করে দেখালে এবং বললে, এটা আপনার স্বামীরই, এটা প্ল্যাটিনামের তারে তৈরী। এ ধরনের মেরজাব আপনার স্বামীই সেতার বাজাবার সময়ে আঙুলের মাথায় পরে থাকেন। সে কথা জ্ঞানদাশঙ্করবাবুর কাছ থেকে আমি জানতে পারি। অথচ আপনার স্বামী মেস্‌মেরাইজ্‌ড্‌ অবস্থায় এত কাণ্ড করেছিলেন বলেই পরে কিছুই তাঁর মনে ছিল না। কেন আমি আপনার স্বামীকে সন্দেহ করেছিলাম তার একটি প্রধান কারণ ঐ।

দ্বিতীয়ত, আপনাদের অন্দরমহল এমনভাবে তৈরী যে বাইরের কোন লোকের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তার পর আমি জেনেছি আপনাদের শয়নকক্ষে

কেবল আপনি, আপনার স্বামী, পুরাতন ভৃত্য ভজু ও রাজমাতা ছাড়া আর কারুরই প্রবেশাধিকার নেই। আয়রন সেফের চাবিও আপনাদের শয়নকক্ষেই থাকে। সেক্ষেত্রে সে ঘর থেকে আপনাদের অজান্তে আয়রন সেফ খুলে সিংহাসনটি চুরি করে আনা, একমাত্র যাদের সে ঘরে গতিবিধি আছে তারা ছাড়া তৃতীয় কোন লোকের পক্ষে শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসম্ভব।

তাই যদি মেনে নিই যে, বাইরের কেউ এসে চুরি করতে পারে না, তবে চুরি করেছে এমন কেউ যাদের ঐ ঘরে গতিবিধি আছে।

প্রথমত ধরুন আপনার স্বামী রাজাবাহাদুর। তিনি যদি জানতেন যে তিনিই চুরি করেছেন, তা হলে এভাবে তিনি সেটা অনুসন্ধান করবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করে আনতেন না কখনও। অতএব তাঁকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। বৃদ্ধা রাজমাতার দ্বারাও সম্ভব নয়। তৃতীয় রইলেন আপনি।

বলতে বাধা নেই, তাই আপনার ওপরেই আমার সন্দেহ পড়ে এবং সে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় যখন রাজাবাহাদুরের মুখে শুনলাম, চুরির পরদিনই আপনি বাপের বাড়িতে গেছেন। পূর্বদিন স্বামী অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোন স্ত্রী তার অসুস্থ স্বামীকে ফেলে এভাবে যেতে পারে না। আপনার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তখন আপনাদের খুড়োমশাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করি।

তাঁর কাছে শুনলাম, আপনার স্নেহ ও মমতার নাকি তুলনা নেই। শতকণ্ঠে তিনি আপনার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তখন আমার সন্দেহ হল, আপনি পাকেপ্রকারে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন এবং সেইজন্যই আপনি ঐভাবে পরদিন পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছেন।

তার পর? ক্ষীণ স্বরে রাণীসাহেবা প্রশ্ন করলেন।

তার পর আরও একটা দিক ভাববার ছিল। আপনিই যদি সিংহাসনটি চুরি করে থাকেন, তবে কেন করলেন? আপনার কিসের অভাব? অতুল ঐশ্বর্য, মান-সম্মান, কিছুরই তো আপনার অভাব নেই। তবে? তা ছাড়া যদি আপনি চুরি করেই থাকেন, কিভাবে আপনি সেটা লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করবেন? ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে প্রচুর। অথচ ঝাঁপির মধ্যে পেলাম আপনার স্বামীর সেতার বাজাবার মেরজাবটি।

তখন মনে হল এর মধ্যে প্রকাণ্ড এক ষড়যন্ত্র আছে, যার মধ্যে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আপনি জড়িয়ে পড়েছেন। সেই কারণেই আপনার স্বামীর সামনে আপনাকে আমি প্রশ্ন করা শুরু করি। ঐ সময়কার আপনার হাবভাব দেখে

আপনার ওপরে আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। আপনার মুখেই আপনার ভাইয়ের কথা আমি শুনি এবং সব কথা শুনে বুঝতে আর আমার কষ্ট হয় না যে, আপনার ভাই আপনাকে যন্ত্র-হিসাবে এ কাজে ব্যবহার করেছে, অথচ আপনি তা জানেন না বা জানবার চেষ্টাও করেননি। শুধু তাই নয়, আপনি এও জানেন না, আপনার বিবাহের পর গত চার-পাঁচ বছরে আপনার ভাইয়ের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। বহু ধারকর্জ হয়েছে। আকণ্ঠ দেনার দায়ে তিনি এখন মুহ্যমান। আমি কলকাতায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসব জানতে পারি।

আশ্চর্য, আমার ভাই! এর মধ্যে আছে?

হ্যাঁ। তিনিই আপনার স্বামীকে মেসমেরাইজ করে সিংহাসনটি চুরি করেন, আপনার স্বামীরই হাত দিয়ে। অদ্ভুত চাতুর্য। অভিনব চৌর্য-কৌশল। আপনি জানেন না, আপনাদের এখানে আসবার দিন গাড়িতে সহযাত্রী হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার ভাল করে পরিচয় হয়। নিজের প্রতি অসাধারণ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি শ্রীনগরের যে অত্যাশ্চর্য নির্ভুল কাহিনী আমার কাছে ব্যক্ত করেন, তাতেই তাঁর প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহ জাগে। ছদ্মবেশে এবং ছদ্মনামে তখন তিনি ছিলেন এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই আবার তিনি আজ এ বাড়িতে আমার সামনে আসতে দুঃসাহসী হয়েছেন। তিনি জানেন না, একবার যে কণ্ঠস্বর আমি শুনি, এ জীবনে তা আর আমি ভুলি না। চিরদিন আমার তা মনে থাকে। তাছাড়া একজন সাধারণ তৃতীয় পক্ষের যে অমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজবাড়ির সব কথা জানা অসম্ভব, সেকথাও তার মনে হয়নি সেদিন।

আমি ওঁকে সন্দেহ করেছিলাম বটে, কিন্তু

সেই জন্যই আপনি স্বামীর অসুস্থতা সত্ত্বেও ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলেন, কেমন না?

হ্যাঁ, কিন্তু

কিন্তু আপনি সিংহাসনটির খোঁজ পেলেন না!

না। আমার ভাই যদি সিংহাসনটি নিয়ে থাকবে, কোথায় গেল সেটা? আমি অনেক খুঁজেছি, তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও এ ক'দিন রেখেছি।

সেও আর এক মস্ত কেরামতি তাঁর। শুনে দুঃখ পাবেন না, আপনার ভাইটি শুধু চোরই নন, একজন পাকা চোর। হ্যাঁ ভাল কথা, আজ আপনার ভাই কোথায় শুয়েছেন?

আমাদেরই পাশের ঘরে।

তাঁর বীণাটি নিয়ে আসতে পারেন ?

বীণাটি কেন ?

নিয়ে আসুন না। যাঁরা সত্যিকারের বাজিয়ে তাঁরা কখনও তাঁদের নিজেদের ব্যবহৃত ভাঙা বাদ্যযন্ত্র আপনার ভাইয়ের মত অত যত্নসহকারে সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়ান না। আর একটা কথা, আপনি কোনদিন গল্পচ্ছলে নিশ্চয়ই আপনার ভাইয়ের কাছে আপনাদের বহু মূল্যবান সিংহাসনটির কথা বলেছিলেন।

হ্যাঁ।

এরপর রাণীসাহেবা গুপ্তদ্বারপথ দিয়ে তাঁর ভাইয়ের বীণাযন্ত্রটি নিয়ে এলেন।

কিরীটী ইতিমধ্যে জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

ও কি, আপনি জামাকাপড় পরেছেন যে ?

আমি এবার বিদায় নেব রাণীসাহেবা। আপনাদের পারিবারিক এ কলঙ্কের মধ্যে আর না থাকাই মঙ্গল। আপনি নিজে থেকে আজ রাত্রে আমার কাছে এভাবে না এলে ভেবেছিলাম চিঠিতেই আপনার কাছে সব লিখে রেখে ভোররাত্রের ট্রেনে চলে যাব।

কিন্তু স্টেশন তো এখান থেকে অনেক দূরের পথ।

শেষরাত্রের দিকে চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলোয় হেঁটে চলে যাব, খুড়োমশাইকে বলে গেট খুলে রাখবার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছি। ঐ বীণার খোলের মধ্যেই খুব সম্ভব আপনার সিংহাসনটি আছে।

হঠাৎ রাণীসাহেবার হাত থেকে বীণাটি মাটিতে পড়ে গেল এবং বীণার খোলটি ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। রাণীসাহেবা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, সেই দ্বিখণ্ডিত বীণার খোলের মধ্যে বত্রিশ সিংহাসনটি মোমবাতির আলোয় ঝিলমিল করছে।

কিরীটী মৃদু হাসল।

হাতের ঘড়ি দেখে বললে, এবারে না বের হলে রাত্রি পাঁচটার ট্রেন আমি ধরতে পারব না, রাণীসাহেবা। আপনার স্বামীকে আমার নমস্কার দেবেন। আপনাদের হৃত জিনিস আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি বিদায় নিলাম। নমস্কার।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কিরীটী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিরালা প্রহর

। এক

ঘটনাটা যেমন নৃশংস তেমনি বীভৎস।

পুলিস ইন্সপেক্টর সুদর্শন মল্লিক ঘরের মধ্যে ঢুকেই যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সমস্ত ঘরের মেঝেতে চাপচাপ রক্ত।

তার মধ্যে পড়ে আছে দুটি মৃতদেহ।

একটি বছর ত্রিশ-একত্রিশের তরুণীর মৃতদেহ আর অন্যটি একটি বছর চারেকের শিশুর। দুজনকেই কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়।

তরুণীর দেহে অনেকগুলো ক্ষতচিহ্ন—চোখে মুখে গলায় পেটে বুকে—মনে হয় বুঝি কোন উন্মাদ তাকে কোন তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে বার বার আঘাত করেছে—যার ফলে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়েছে।

শিশুটিকেও ঠিক অনুরূপভাবে হত্যা করা হয়েছে।

পাশাপাশি ঘরের মেঝেতে দুটি মৃতদেহ পড়ে আছে।

দেহটা নৃশংসভাবে ক্ষতবিক্ষত হলেও দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না তরুণী সত্যিই সুন্দরী ছিল। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ— টানা টানা দুটি চোখ—মাথাভর্তি মেঘের মত একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে আছে।

পরনে একটা দামী ঢাকাই শাড়ি—গায়ে লাল সিল্কের ফুলহাতা ব্লাউজ। মাথায় সিঁদুর—দু হাতে ছয় গাছা করে বারো গাছা সোনার চুড়ি—গলায় হার, কানে হীরার টাব।

তাতেই মনে হয় ব্যাপারটা কোন চোর-ডাকাতের কাজ নয়, কোন বার্গলারি নয়। তাহলে নিশ্চয়ই গহনাগুলো গায়ে তারা রেখে যেত না হত্যা করার পর।

শিশুটির খালি গা—পরনে ইজের—মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—হাতে সোনার বালা। গলায় সোনার বিছেহার।

শিশুটি মেয়ে।

দুর্ঘটনাটা ঘটেছে একেবারে প্রখর দিবালোকে।

কলকাতা শহরে সি আই টি-র কল্যাণে যেসব এলাকা নতুন করে গড়ে উঠেছে—বড় বড় চওড়া পীচঢালা রাস্তা আর তারই দু'পাশে নানা ধরনের সব নতুন নতুন বাড়ি—সেই এলাকাতেই অর্ধসমাপ্ত একটা চারতলার বাড়ির ফ্ল্যাটে ঘটনাটা ঘটেছে।

একতলায় একটা ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কে ঐ সময় পুরোদস্তুর কাজকর্ম চলছিল।

বাড়িটা এখনো কমপ্লিট হয়নি। দোতলা ও তিনতলার গোটাচারেক ফ্ল্যাটে মাত্র ভাড়াটে এসেছে।

তিনতলা ও চারতলার কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, চলছে। সামনে ও পিছনে বাঁশের ভারা বাঁধা। চার-পাঁচ জন রাজমিস্ত্রী ও জনাচারেক মজুর কাজ করছিল ঐ সময়।

অথচ আশ্চর্য।

ব্যাপারটা কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি।

জানাও যেত কিনা সন্দেহ সন্ধ্যার আগে যদি না স্ত্রীলোকটির স্বামী ডালহৌসীর অফিসে বসে কাজ করতে করতে জরুরী একটা ফোন-কল পেয়ে তখুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাসায় এসে না হাজির হত।

মণিশঙ্কর ঘোষাল, মেয়েটির স্বামী, বেলা দুটো নাগাদ একটা ফোন-কল পায় অফিসের পি বি. এক্স থেকে ফোনের কানেকৃশানটা টেলিফোন অপারেটা তার টেবিলে দিয়েছিল।

মিঃ ঘোষাল, আপনার ফোন।

অফিসেরই ব্যাপারে হয়তো কেউ ফোন করছে ভেবে মণিশঙ্কর ঘোষাল ফোনটা তুলে নিয়েছিল।

হ্যালো—আপনি কি মণিশঙ্কর ঘোষাল? মণিশঙ্করের মনে হয়েছিল গলার স্বরটা কোন পুরুষের—মোটা, কর্কশ ও কেমন যেন সর্দিধরা গলার মত ভাঙা-ভাঙা।

হ্যাঁ, কথা বলছি। মণিশঙ্কর জবাব দেয়।

আপনি একবার এখুনি আপনার বাসায় যান।

বাসায় যাব।

কেমন যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্নটা করে মণিশঙ্কর।

হ্যাঁ, দেরি করবেন না—এখুনি চলে যান। সেখানে বিশ্রী একটা ব্যাপা ঘটেছে—

কিন্তু কেন—কী হয়েছে বাসায়?

আপনার স্ত্রী ও মেয়ে—

কি? কি হয়েছে তাদের?

উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙে পড়ে মণিশঙ্করের গলার স্বর।

গেলেই দেখতে পাবেন—চলে যান।

কিন্তু আপনি কে? কে কথা বলছেন?

অপর প্রান্তে গলার স্বর তখন থেমে গিয়েছে—আর কিছু শোনা যায়নি।

মণিশঙ্কর কিছুক্ষণ তারপর কেমন যেন হতভম্ব হয়ে চেয়ারটার উপর বসে ছিল—ব্যাপারটা তখনো যেন ঠিক তার মাথার মধ্যে থিতোয়নি।

কে ফোন করল তাকে—কি হয়েছে তার স্ত্রী ও কন্যার।

শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়ে মণিশঙ্কর।

ম্যানেজারকে বলে ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে পড়ে।

বেলা তখন দুটো বেজে মিনিট-দশেক হয়েছে।

রাস্তায় নেমে একটা খালি 'ট্যাক্সিও পেয়ে গেল মণিশঙ্কর—সোজা চলে যায় বেলেঘাটায়। ট্যাক্সি থেকে যখন নামল সেখানে কোনরকম কিছু অস্বাভাবিক তার নজরে পড়েনি।

ব্যাঙ্কের মধ্যে নিয়মমত কাজকর্ম চলেছে সে-সময়।

ভিতরে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা যে যার আপন আপন কাজে ব্যস্ত।

রাস্তায়ও দু-চারজন লোক নজরে পড়ে। একটা বাস চলে গেল। গোটা দুই ট্যাক্সি চলে গেল। একটা রিকশা চলে গেল—

দুজন মিস্ত্রী ভারায় বসে কাজ করছে।

অবিশ্যি এই তল্লাটে সাধারণতঃই লোকজনের ভিড় বা চলাচল একটু কম সব সময়ই। এখনো তেমন কলকাতা শহরের অন্যান্য অংশের মত জনবহুল ও ঘিঞ্জি হয়ে উঠতে পারেনি বলেই হয়তো।

বাড়িতে ফোন নেই।

অবিশ্যি নীচের তলায় ব্যাঙ্কে ফোন আছে। ইচ্ছে করলে বা প্রয়োজন হলে সেখান থেকে ফোন করা যেতে পারে।

বিজিতা দু-একবার সেখান থেকে অফিসে প্রয়োজনে ফোনও করেছে মণিশঙ্করকে।

কিন্তু আজ যে তাকে অফিসে কে ফোন করল—এখনো ভেবে পাচ্ছে না মণিশঙ্কর।

নানা কথা ভাবতে ভাবতেই মণিশঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে তার দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল। দরজাটা বন্ধ।

ধাক্কা দিয়ে দরজার গায়ে ভৃত্য শম্ভুকে ডাকতে যাবে কিন্তু হাতের সামান্য

ঠেলাতেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল আপনা থেকেই।

তিনখানা ঘর—পর পর। পিছনের দিকে দুটো পর পর ল্যাভেটরি। একটা বাথরুম—রান্নাঘর বা কিচেন, ছোট্ট মত একটা স্টোররুম।

তারই ভাড়া তিনশ টাকা।

অফিস থেকে ভাড়ার অর্ধেক টাকা দেয়, বাকিটা দিতে হয় নিজের পকেট থেকে, তাই মণিশঙ্কর ফ্ল্যাটটা নিতে সাহস করেছিল মাসচারেক আগে।

নূতন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে মাত্র চার মাস। আগে ছিল শ্যামবাজার অঞ্চলে দেড়খানা ঘর নিয়ে একতলায়। দমবন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। মাত্র দেড়খানা ঘর, স্বামী স্ত্রী ওরা দুজন ছাড়াও একজন চাকর।

চাকর না হলে চলে না। বাজার আনাটা—টুকটাক ফাইফরমাশ কে করবে। তার উপরে মেয়েটাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

মণির তো সময়ই নেই। সেই সকাল নটায় অফিস যায়, ফিরতে সেই কোন্ সাড়ে ছ'টা-সাতটা। বিজিতাকেও একলা থাকতে হয়।

অনেক খুঁজে পেতে বছর বারোর একটা বাচ্চা চাকর পাওয়া গিয়েছিল—শম্ভুচরণ।

তা ছেলেটা ভাল। সব সময়ই হাসিমুখ। এক পায়ে খাড়া। শম্ভুকে পেয়ে যেন ওরা বেঁচে গিয়েছিল।

বাইরের বসবার ঘরটা বেশ সাজানো। ছিমছাম।

কিন্তু ঘর খালি।

শম্ভু—এই শম্ভু—দরজাটা খুলে রেখেছিস কেন? বলতে বলতে দ্বিতীয় ঘরে পা দিল মণিশঙ্কর। সে ঘরেও কেউ নেই—

শেষে শোবার ঘরে পা দিয়েই অকস্মাৎ একটা আতঙ্কে যেন থমকে দাঁড়িয়ে যায় মণিশঙ্কর।

নতুন মোজেকের ঘষা চকচকে ঘরের মেঝেতে চাপচাপ রক্ত।

উঃ।

মাথাটা যেন সহসা কেমন ঘুরে উঠল মণিশঙ্করের।

শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টির সামনে যেন দৃশ্যটা স্পষ্ট—বিজিতা আর রুণার রক্তাক্ত দুটো দেহ—কিছুটা ব্যবধানে চাপ-চাপ রক্তের মধ্যে পড়ে আছে।

বিজিতার পরিধেয় শাড়িটার আঁচল স্খলিত গা থেকে।

বুকের কাছে বীভৎস চার-পাঁচটা ক্ষত—ঝলকে ঝলকে রক্ত বোধ হয় বের হয়ে এসেছিল সেই ক্ষতমুখ দিয়ে—জামা—শাড়ি—মেঝেতে খালি রক্ত আর রক্ত।

শুধু বুকেই নয়—মুখে, গালে, গলায় হাতে সর্বত্র ক্ষত। প্রত্যেকটি ক্ষতস্থান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।

হঠাৎ ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মণিশঙ্কর—চিৎকার করবার চেষ্টা করে, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বের হয় না।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিল মণিশঙ্কর একপ্রকার পাগলের মতই যেন ছুটতে ছুটতে, ঐসময় দোতলার পাশের ফ্ল্যাটের অন্য ভাড়াটে ইঞ্জিনীয়ার গোপেন বসুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক গোপেনবাবু।

কি—কি হয়েছে মণিবাবু—

খুন—

খুন—কে? কে খুন হলো?

আমার স্ত্রী—আমার মেয়ে—তাদের মেরে ফেলেছে গোপেনবাবু—তাদের মেরে ফেলেছে—বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে মণিশঙ্কর।

কোথায়, কোন্ ঘরে।

উপরে শোবার ঘরে।

চলুন—চলুন দেখি—

না, না—আমি যাবো না—রক্তের বন্যা বইছে - না, না—

গোপেন বসুই নীচে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে থানায় ফোন করে দিয়েছিল, শীঘ্র আসুন স্যার—বেলেঘাটা নতুন সি আই টি র ফ্ল্যাটে দুটো খুন হয়েছে।

আপনি কে? থানা-অফিসার রবীন দত্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আমার নাম গোপন বসু, ঐ বাড়ির উপরের ফ্ল্যাট আমি থাকি।

রবীন দত্ত ছুটে আসে জীপ নিয়ে। দেরি করে না।

অকুস্থানে দাঁড়িয়ে যখন সবেজমিন তদন্ত করছে, ইন্সপেক্টর সুদর্শন মল্লিক লালবাজার হোমিসাইডাল স্কোয়াডের একটা পুলিস ভ্যানে চেপে হাজির হলো।

বাড়ির সামনে ও ভিতরে, সিঁড়ির নীচে পুলিস ছিল, তারা সুদর্শনকে সেলাম করল।

কোথায় খুন হয়েছে? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

দোতলার ফ্ল্যাটে স্যার—

সুদর্শন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে। প্রথম ঘরটাতে একজন লালপাগড়ি ছিল —সে-ই সুদর্শনকে ইঙ্গিতে ঘরটা দেখিয়ে বলে, ভিতরের ঘরে স্যার ডেড বডি।

সুদর্শন পরের ঘরটা পার হয়ে শেষের ঘরে পা ফেলেই দরজা-পথে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত ঘরের মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত। জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

আর সেই চাপ-চাপ জমাট বাঁধা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে দুটো মৃতদেহ।

॥ দুই ॥

একটি বছর ত্রিশ-একত্রিশের তরুণীর মৃতদেহ, অন্যটি একটি বাচ্চা মেয়ের—বছর চার বয়স হবে বড় জোর, গায়ে কোন জামা নেই, কেবল একটা ইজের পরা। তারও পেটে-বুকে নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন।

নৃশংস—বীভৎস ভাবে হত্যা করা হয়েছে দুজনকেই।

কোন উন্মাদ যেন এক হত্যা-লালসায় কোন তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রের দ্বারা ওদের বার বার আঘাত করে হত্যা করেছে।

সত্যি কথা বলতে কি সুদর্শন মল্লিকেরও ঘরের মধ্যে পা ফেলে প্রথমটায় মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠেছিল।

মাত্র মাস দুই হবে সুদর্শন প্রমোশন পেয়ে লালবাজারে পোস্টিং পেয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে গত দুই মাসে আরো দুটি হত্যার ব্যাপারে তাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে, কিন্তু এবারের হত্যার ব্যাপারটা যেন তার তুলনায় যেমনই নিষ্ঠুর তেমনি নৃশংস ও বীভৎস।

মুহূর্তের বিহ্বলতাটা কাটিয়ে ওঠবার পর সুদর্শন ভাল করে একবার ঘরটার মধ্যে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করল।

সুন্দর ছিমছাম ভাবে শয়নকক্ষটি যেন সাজানো।

জানলায় দরজায় দামী রঙ্গে প্রিন্টের রঙীন পর্দা। রাস্তার দিকের সব কয়টি জানলাই খোলা।

হাওয়ায় পর্দাগুলো উড়ছিল।

ঘরের একদিকে জানলা ঘেঁষে দুটি পর পর সিঙ্গল বেডে শয্যা—তার উপর দামী বেডকভার।

একধারে ছোট একটি স্টীলের প্রমাণ-আরশি-বসানো আলমারি। তারই পাশে একটি ড্রেসিং টেবিল। দেওয়াল ঘেঁষে একটি র‍্যাকের উপরে একটি খাপে-ভরা তানপুরা ও একটি বেহালার বাক্স নজরে পড়ে। টেবিলের ওপরে সুন্দরভাবে সাজানো

প্রসাধনদ্রব্যগুলি। সামনে ছোট একটি বসবার টুল।

তার পাশে একটি মোড়া।

অন্যদিকে ঘরের নীচু একটি টেবিলের ওপরে একটি দামী রেডিও সেট—তার উপরে কাঁচের ফ্রেমে পাশাপাশি দুটি ফটো।

একটি ফটো বিজিতা ও মণিশঙ্করের—হাসিখুশী দুটি তরুণ-তরুণী—অন্য ফটোটি তাদের একমাত্র সন্তান রুণুর।

ঘরের মেঝেতে চারিদিকে রক্তের ছিটে কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে।

ইতিমধ্যে থানা-অফিসার রবীন দত্ত যতটা সংবাদ মোটামুটি সংগ্রহ করতে পেরেছিল সুদর্শনকে বললে।

সুদর্শন নিঃশব্দে সব শুনে গেল।

ফ্ল্যাটে তাহলে ঐ তরুণী, ঐ বাচ্চাটা আর চাকরটা ছাড়া কেউ ছিল না? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

না। রবীন দত্ত বলে।

চাকরটার কোন পাত্তা এখনো পাওয়া যায়নি?

না।

কতদিন কাজ করছিল এখানে চাকরটা?

মণিবাবু—মানে ভদ্রমহিলাটির স্বামী তো বলছিলেন, বছর কয়েক হবে চাকরটা ওঁদের কাছে আছে।

কত বয়স?

বছর বারো-তেরো হবে।

দরজাটা তাহলে খোলাই ছিল?

হ্যাঁ—ভেজানো ছিল—মণিবাবু হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে গেলেই খুলে যায়।

মণিশঙ্করবাবু আর কাউকেই দেখেননি?

না।

সুদর্শন আবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলো। দুপুরেই কোন এক সময় ঐ নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে অথচ কেউ জানতে পারল না।

কেউ কোনরকম আশেপাশে শব্দ, আওয়াজ বা চিৎকার শোনেনি? সুদর্শন আবার প্রশ্ন করে।

আমার মনে হয় স্যার—

ববীন দত্তব প্রশ্নে সুদর্শন ওব মুখেব দিকে তাকাল, কি ?

ঐ চাকব ব্যাটাবই কীর্তি। খুন করে চুবিটুবি কবে পালিয়েছে দলবল নিয়ে।

কিছু চুবি গেছে কিনা জানতে পেবেছেন ?

না। এখনো সব অনিশ্চিত, ভাল কবে সন্ধান কবা হয়নি, তবে সঙ্গে যে বার্গলাবি আছে নিশ্চিত।

তাই যদি হবে তো ভদ্রমহিলাব হাতে সোনাব চুড়ি—গলায় সোনাব হাব—কানে টাব—বাচ্চাটাবও গলায় হাব, হাতে বালা হয়তো থাকত না। ওগুলো না নিযেই কি তাবা যেত। সুদর্শন বললে।

হয়তো কেউ এসে পডেছিল বা তাডাহুডাতে সময় কবে উঠতে পাবেনি, সঙ্গে সঙ্গে পালিয়েছে—

আমাব তা যেন ঠিক মনে হচ্ছে না মি৹ দত্ত।

কিন্তু স্যাব—

যে ভাবে হত্যা কবা হযেছে দুটো মানুষকে, যদি একটু চিন্তা কবেন তো একটা কথা স্বভাবতই মনে হবে—

কি স্যাব ?

ইট ইজ এ ডেলিবাবেট, প্রিমেডিটেটেড মার্ডাব। সুপবিকল্পিত হত্যা। এবং হত্যাব জন্যই হত্যা—হত্যাকাবী চুবি কবতে এখানে আসেনি। এসেছিল হত্যা কবতে এব৲ হত্যা কবে চলে গিযেছে—হযতো কোন প্রতিহি৲সাবৃত্তি চবিতার্থ কববাব জন্যই হত্যা কবে গিযেছে।

প্রতিহিংসা।

সব কিছু দেখে তাই মনে হচ্ছে। হত্যাব পিছনে হযতো একটা আক্রোশ ও প্রতিহিংসাব ব্যাপাব জডিযে আছে। তাহলেও বলবো হত্যাকাবীব দুর্জয় সাহস আছে। দিনেব বেলা আশেপাশে লোকজনেব মধ্যে এসে হত্যা কবে গিযেছে।

আপনি বলছেন চাকবটাব সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

তা ঠিক বলা যায় না। হযতো থাকতেও পাবে—

নিশ্চযই স্যাব। নচেৎ পালাবে কেন ?

এমনও তো হতে পাবে মিঃ দত্ত, চাকবটা বাডিতে ছিল না সে-সময়—হয়তো সে কোন কাজে ঐ সময় বাইবে গিয়েছিল অথবা ঐ মহিলাই তাকে কোন কাজে কোথাও পাঠিয়েছিলেন আব ঐ সময়ই হত্যাকাবী আসে। দবজায় ধাক্কাব শব্দ পেয়ে ভদ্রমহিলা গিয়ে দরজা খুলে দেন—তাবপব হত্যাকারী তাব কাজ শেষ করে চলে যাবার পব

হয়তো চাকরটা ফিরে আসে এবং ঘরে ঢুকে ঐ দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়েছে।

সে তো থানায় একটা খবরও দিতে পারত।

একটা বারো-তেরো বছরের ছেলের ঐ দৃশ্য দেখে মাথা ঠিক রাখা সাধারণতঃ সম্ভব নয়—সে যাক—সে-সব তো তদন্তসাপেক্ষ।

সুদর্শন কথাগুলো বলে আবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল, পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

মাথা আঁচড়াবার চিরুনিটা হাতে দিয়ে তুলল সুদর্শন--কয়েক গাছি চুল চিরুনিতে তখনো আটকে আছে—

আরো একটা ব্যাপার নজরে পড়ল—ড্রেসিং টেবিলের উপরে কাচের ওপরে সিঁদুর ও পাউডারের কিছু গুঁড়ো এদিক ওদিক পড়ে আছে।

সুদর্শন বললে, মনে হয় দুপুরে হয়তো প্রসাধন করেছিলেন ভদ্রমহিলা। প্রসাধনের পর টেবিলের কাচটা পরিষ্কার করেননি—করতে ভুলে গিয়েছেন বা করবার সময় পাননি।

তাই কি মনে হচ্ছে স্যার? রবীন দত্ত বলে।

তাছাড়া ভদ্রমহিলার পরনের দামী ঢাকাই শাড়িটা দেখে মনে হয় তো কোথাও বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন বা হয়েছিলেন, এমন সময় হত্যাকারীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

রবীন দত্ত কোন কথা বলে না। সুদর্শন আবার বলে, দেওয়ালটা দেখুন মিঃ দত্ত—

ঘরের দেওয়ালেও কয়েকটা রক্তের ছিটে নজরে পড়ল রবীন দত্তর। রক্ত শুকিয়ে আছে।

অতঃপর সুদর্শন পাশের ঘরে এলো দুটি ঘরের মধ্যবর্তী দরজা-পথে।

এ ঘরটি মাঝারি সাইজের। এ ঘরেও একপাশে একটি শয্যা, একটি সিঙ্গল খাটে শয্যাটি নীল রংয়ের একটা বেডকভারে ঢাকা।

এক পাশে ডাইনিং টেবিল ছোট সাইজের একটি এবং খান তিনেক চেয়ার। অন্য পাশে ছোট একটি মীট-সেফ ও একটি কাঠের আলমারি।

ঐ ঘরেরই সংলগ্ন বাথরুম ও কিচেন।

ঐ ঘরেই একটা চেয়ারের ওপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল মণিশঙ্কর।

রোগা পাতলা চেহারা।

পরনে দামী টেরিলিনের স্যুট—গলার টাইটার নট লুজ; মাথার চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা।

সুদর্শন ও রবীন দত্তর পদশব্দে মণিশঙ্কর মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল।

চোখ দুটো তার লাল।

বোধ হয় কাঁদছিল।

মণিশঙ্কর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

সুদর্শন বাধা দেয়, বসুন বসুন মিঃ ঘোষাল।

মণিশঙ্কর আবার চেয়ারটার ওপরে বসে পড়ল।

সুদর্শনও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি অফিস থেকে ফোন পেয়েই তো আসেন, তাই না?

হ্যাঁ।

ফোনে পুরুষের গলা শুনেছিলেন?

হ্যাঁ—মোটা, কর্কশ—সর্দিধরা গলার মতো, যেন কেমন ভাঙা-ভাঙা গলার স্বরটা ছিল।

চিনতে পারেননি কার গলা?

না।

আন্দাজও করতে পারছেন না কিছু?

না।

কখন ফোনটা পান?

ঠিক লাঞ্চের কিছু পরে—দুটো বাজতে দশ-পনের মিনিট তখনো বাকি।

তারপরই চলে এলেন আপনি?

হ্যাঁ—সোজা একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসি।

কি বলেছিল ফোনে লোকটা?

তখুনি আমাকে বাসায় আসতে বলেছিল। বাসায় নাকি একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে। তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি আমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—

কথাগুলো বলতে বলতে মণিশঙ্করের গলার স্বরটা যেন কান্নায় বুজে আসতে চায়।

উঃ, এখনো আমি যেন ভাবতে পারছি না অফিসার—, একটু থেমে আবার বলে মণিশঙ্কর।

কাউকে কি আপনার এ ব্যাপারে সন্দেহ হয় ?

সন্দেহ !

হ্যাঁ—আচ্ছা চাকরটা—

যদিও বয়স অল্প—তবু কি করে বলি বলুন—

তা ঠিক—যা দিনকাল পড়েছে—তা চাকরটার বাড়ির ঠিকানা-টিকানা কিছু জানেন না ?

না। শুনেছি মেদিনীপুর জেলায় কোন এক গ্রামে থাকে—

গ্রামের নাম কি ? শোনেননি কখনও কিছু ?

পানিপারুল।

আচ্ছা আর কাউকে সন্দেহ হয় ?

ভাবতে পারছি না।

আচ্ছা আলমারির চাবি, মানে স্টীলের আলমারিটার চাবি কোথায় ?

আমার স্ত্রীর কাছেই থাকত তার আঁচলে বাঁধা সর্বদা।

দেখলাম না তো আঁচলে তাঁর—

তবে হয়তো ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে বা মাথার বালিশের নীচে রেখে দিয়েছে, মণিশঙ্কর বললে।

হুঁ—আচ্ছা আপনার স্ত্রী কি সাধারণতঃ বাড়িতেও দামী শাড়ি পড়তেন ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ও একটু শৌখিন প্রকৃতির ছিল বরাবর। সর্বদা ছিমছাম সাজগোজ করে থাকতেই ভালবাসত।

কতদিন আপনাদের বিবাহ হয়েছে ?

পাঁচ বছর—

নেগোসিয়েট করে বিয়ে হয়েছিল, না আপনাদের লাভ-ম্যারেজ ?

আমরা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম।

এক জাত ?

না—ওর বাড়ি কেরালায়—তবে দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করায় চমৎকার বাংলা বলতে পারত।

মাদ্রাজ দেশের মেয়ে ছিলেন তাহলে উনি ?

হ্যাঁ।

আত্মীয়স্বজন বলতে আপনার কে কে আছেন ? তাঁরা কোথায় থাকেন—মানে মা বাবা—ভাই—বোন—

আমি বাবার একই ছেলে—চার বোন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে—মা বছর কয়েক হল মারা গেছেন। বাবা এখনো বেঁচে আছেন। রিটায়ার্ড রেলওয়ে অফিসার।

কোথায় থাকেন তিনি?

আমার ছোট বোন বেনারসে থাকে—ছোট ভগ্নীপতি সেখানকার হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসার তার কাছেই বাবা রিটায়ার করার পর থেকে থাকেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান প্রকৃতির লোক।

আপনাদের বিবাহে আপনার বাবার মত ছিল?

অমত ছিল কিনা জানি না, তবে কোন বাধা দেননি।

আপনার স্ত্রী আপনার বাবার কাছে যেতেন না?

প্রত্যেক পূজোর ছুটিতেই আমরা যেতাম—বাবা ওকে খুব স্নেহ করতেন।

মিঃ ঘোষাল, একটু ইতস্তত করে সুদর্শন বলে যদিও কথাটা অত্যন্ত ডেলিকেট তবু জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে আমাকে

কি কথা?

বিবাহের আগে আপনাদের পরস্পরের কতদিনের আলাপ ছিল?

বছর-খানেক—

উনি তখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন?

না—

তবে?

ও কলকাতার একটা মিউজিক কলেজে কাজ করত।

আপনাদের শোবার ঘরে তানপুরা আর বেহালা দেখলাম—

হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর তানপুরা—ও খুব ভাল গান গাইতে পারত—রেডিও-আর্টিস্ট ছিল একসময়—গানের রেকর্ডও আছে—

আই সি। তা ঐ বেহালাটা—

ওটা আমার।

আপনিও তাহলে সংগীতানুরাগী?

তা ঠিক নয়—

তবে?

শিখছিলাম বেহালা।

কতদিন ধরে শিখছেন?

বছর-খানেক—

আপনাদের আলাপ কি করে হলো ?

এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ওর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আলাপ করি—আমাদের পরস্পরের এক বন্ধুই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। পরে সেই আলাপ—

বুঝেছি। আপনার সেই বন্ধুটি কোথায় থাকেন ?

কলকাতাতেই—বালিগঞ্জে—

কি নাম ?

সমীরণ দত্ত—নামকরা গাইয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের—

যাঁর বহু রেকর্ড আছে ?

হ্যাঁ।

আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর খুব আলাপ ছিল ?

হ্যাঁ—শান্তিনিকেতনে ওরা দুজনেই ছিল অনেকদিন, তখন থেকেই ওদের আলাপ।

সমীরণবাবু আপনাদের এখানে আসতেন না ?

আগে মধ্যে মধ্যে আসত।

এখন আর আসেন না ?

না।

কেন ?

বোধ হয় সময় পায় না।

আপনার স্ত্রী তাঁর ওখানে যেতেন না ?

প্রায়ই যেত। বিশেষ করে রেকর্ডিংয়ের সময় রিহার্সেল যখন চলত।

তিনি বিয়ে-থা করেছেন ?

না। ব্যাচিলর।

আপনি কোথায় কাজ করেন ?

জন গ্রিফিথ অ্যাণ্ড কোম্পানিতে।

কতদিন কাজ করছেন ?

বি এ পাস করবার বছরখানেক পরেই ওখানে আমি চাকরি পাই।

মাইনে কত পান ?

সব মিলিয়ে আটশর মত।

॥ তিন ॥

নীচের ব্যাঙ্কের কর্মচারীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু তারা সবাই বললে, কেউ কিছু জানে না—জানতেও পারেনি।

জনা ছয়েক মিস্ত্রী যারা ভারায় বসে প্ল্যাস্টারিংয়ের কাজ করছিল তাদের মধ্যে একজন মিস্ত্রী—মকবুল বললে, বেলা তখন সওয়া বারোটা কি সাড়ে বারোটা হবে, একা সে বাড়িটার অদূরে একটা ছোট মিষ্টি দোকানের সামনে গাছতলায় বসে ছিল টিফিন সেরে—একটা কালো রংয়ের অ্যামব্যাসাডার গাড়িকে এসে ঐ বাড়িটার সামনে দাঁড়াতে দেখে—

তারপর? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

গাড়ি থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন ভদ্রলোক নামেন—তাঁর হাতে একটা চামড়ার সুটকেস ছিল হুজুর।

তারপর? ভদ্রলোক কি করলেন?

ভদ্রলোককে দেখলাম ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে—

ভদ্রলোক দেখতে কেমন?

দূর থেকে দেখেছি হুজুর, ঠিক ঠাহর করতে পারিনি।

সুদর্শন প্রশ্ন করে, তারপর কি হল?

আধঘণ্টাটাক বাদে দেখলাম একজন সুট-পরা ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন বাড়ি থেকে—গাড়িতে উঠে তিনি গাড়িটা চালিয়ে চলে গেলেন।

গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলে?

দেখিনি ভাল করে—

তাঁর হাতে কিছু ছিল?

হ্যাঁ, একটা সুটকেস।

গাড়িটা নতুন না পুরনো?

নতুন গাড়ি বলেই মনে হল হুজুর।

আর কাউকে দেখনি?

আজ্ঞে আরো দুটো ট্যাক্সিতে লোক এসেছে—তারা ব্যাঙ্কে ঢুকেছে—তারপর ব্যাঙ্ক থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

পথে লোকজন ঐসময় ছিল না?

ছিল—তবে খুব বেশী নয়।

মকবুল!

হুজুর?

তোমরা তো অনেকদিন ধরে ঐ ফ্ল্যাটে কাজ করছ?

আজ্ঞে—তা মাস তিনেক হবে—

ওই বাড়ির একটা চাকরকে দেখেছ?

হ্যাঁ বাবু—শম্ভুকেও জানি।

তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?

হ্যাঁ—বোগা পাতলা ছেলেটা।

আজ তাকে দেখেছ?

দেখেছি।

কখন?

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ, আমাদের টিফিনের কিছু আগে।

কোথায় দেখলে?

বাজারের দিকে যেতে দেখেছি—

হাতে কিছু ছিল?

একটা সাদা খাম ছিল বলে মনে হচ্ছে।

তাকে ফিরতে দেখনি?

না। নজরে পড়েনি।

মকবুলকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, মণিশঙ্করেরই ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরে বসে একজন সেপাই বারো-তেরো বছরের একটা ক্রন্দনরত বোগা ছেলেকে ধরে টানতে টানতে সুদর্শনের সামনে নিয়ে এল।

হুজুর, ছেলেটাকে পাকড়াও করেছি।

শম্ভু কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওরা সব কি বলছে সেপাইরা—দোহাই হুজুর আমি কিছু জানি না।

তোর নাম শম্ভু?

আজ্ঞা শম্ভুচরণ বেরা।

বাড়ি কোথায়?

আজ্ঞা পানিপারুল—বড় পোস্টাপিস এগরা—মেদিনীপুর জিলা।

কোথায় গিয়েছিলি তুই?

আমার পিসেব কাছে টালিগঞ্জে—জিজ্ঞাসা করেন না কেনে আমার বাবুকে—ঐ যে—আমি তো—পরশুই ছুটি চেয়ে রেখেছিলাম।

মণিশঙ্কব বললে, হাঁ্যা, ও আমাকে পরশু বলেছিল বটে—পিসেব সঙ্গে দেখা কবতে যাবে টালিগঞ্জে—

তা কখন তুই গিয়েছিলি ?

কেন, এগাবটায়—

তোর মাকে বলে গিয়েছিলি ?

হাঁ্যা—মা তো বললেন যেতে—

সুদর্শনই আবাব প্রশ্ন কবে, যখন যাস দবজাটা খোলা বেখে গিয়েছিলি ?

না—মা তো দবজা বন্ধ কবে দিলেন, ভিতব থেকে আমাব সামনেই।

তোব মা তখন কি কবছিলেন ?

মাব তো তখনো স্নানই হযনি।

আব খুকু ?

সে তো খেলছিল ঘবে। কি হয়েছে হুজুব—সত্যিই মা আব খুকুকে ে. ফেলেছে।

সুদর্শন শম্ভুব কথাব কোন জবাব দেয় না।

সে তখন মনে মনে ভাবছিল—শম্ভু এগাবটায চলে যায়। অর্থাৎ এগাবটাব পব থেকে—ফ্ল্যাটে মণিশঙ্কবেব স্ত্রী ও মেয়ে ছাড়া আব কেউ ছিল না—ভিতব থেকে দবজ বন্ধ কবে দিয়েছিলেন মণিশঙ্কবেব স্ত্রী। অথচ মণিশঙ্কব ফোন পেয়ে অফিস থেকে এসে দেখে তার ফ্ল্যাটেব দবজা ভেজানো এবং ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

সুদর্শন আবাব প্রশ্ন কবে, তুই যখন যাস তোব হাতে একটা চিঠি ছিল ?

হাঁ্যা হুজুর—

ডাকে ফেলতে যাচ্ছিলি ?

না।

তবে ?

শম্ভু কেমন যেন ইতস্তত করে।

কিবে, কথা বলছিস না কেন ?

আজ্ঞে—

চিঠিটা কার, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলি সেটা ?

আজ্ঞে—

তোর মা দিয়েছিল চিঠিটা ?

আজ্ঞে।

পোস্ট করতে ?

হ্যাঁ।

সত্যি কথা বলছিস ?

হ্যাঁ হুজুর।

চিঠিটা ডাকে দিয়েছিলি ?

হ্যাঁ।

সুদর্শন আর কোন প্রশ্ন করে না।

রবীন দত্ত পাশের সোফায় বসে নীচু টেবিলের উপর কাগজপত্র রেখে রিপোর্ট লিখছিল। সে মুখ তুলে তাকাল, তাহলে ওর কি ব্যবস্থা করব স্যার ?

কার, শম্ভুর ?

হ্যাঁ।

আপাততঃ ওকে থানায় নিয়ে রাখুন। এদিককার কাজ শেষ হয়েছে মিঃ দত্ত ?

একরকম মোটামুটি—ডেড বডি দুটো মর্গে পাঠিয়ে দিতে পারলেই—, কিন্তু এ ফ্ল্যাটের কি ব্যবস্থা করব ?

এটা আপাততঃ আনডার লক অ্যাণ্ড কী থাকবে, আর পাহারা রাখুন।

বেশ। তাহলে মিঃ ঘোষাল—দত্ত মণিশঙ্করের দিকে তাকাল।

সে অন্য একটা সোফায় বসে ওদের কথা শুনছিল। রবীন দত্তর প্রশ্নে ওর মুখের দিকে তাকাল।

আপনি তাহলে এক কাজ করুন—

কি বলুন ?

এই ফ্ল্যাটটা আপনার আপাতত. আণ্ডার লক অ্যাণ্ড কী ও পুলিস-প্রহরায় থাকবে —আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে—

সে আপনার বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না—এরপর এখানে আমি রাত্রিবাস করতে পারব আপনি ভাবতেই বা পারলেন কি করে ? আমি এখুনি শম্ভুকে নিয়ে চলে যাব।

সুদর্শন বললে, ওর জন্য আপনার ভাবতে হবে না মিঃ ঘোষাল—ও থানায় থাকবে।

ওকে কি তাহলে আপনারা অ্যারেস্ট করছেন ?

না।

তবে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

ওকে আমাদের প্রয়োজন আছে।

ওঃ, তাহলে তো আপনাদের আশ্রয়েই থাকল।

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

আজ রাত্রের গাড়িতেই মালদায় চলে যাব।

মালদায় ?

হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু সেখানে থাকে—ভাবছি ছুটি নিয়ে তার ওখানেই কিছুদিন থাকব।

কিন্তু আপনাকে যে আমাদের প্রয়োজন হবে—

মালদার ঠিকানা রেখে যাচ্ছি, যখনই তার করে দেবেন আমি চলে আসব।

না।

তবে ?

আপনি বরং আপাততঃ কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবার ব্যবস্থা করুন।

কলকাতায় ?

হ্যাঁ।

বেশ—তাহলে আমি ভবানীপুরেই, আমার একটা পরিচিত মেস আছে—কালিকা বোর্ডিং—সেখানেই থাকব।

কোথায় বোর্ডিংটা ? সুদর্শন শুধায়।

৩৩।১২ কালীঘাট রোড। আমি তাহলে উঠি—কিছু জিনিসপত্র নিতে হবে—

যান।

মণিশঙ্কর উঠে পাশের ঘরে গেল। ইতিমধ্যে সুদর্শনেরই নির্দেশে দুটো বেডকভার দিয়ে ডেড বডি দুটো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।

সুদর্শনের চোখের ইঙ্গিত পেয়ে রবীন দত্ত মণিশঙ্করের পিছনে পিছনে যায়, নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করে।

মণিশঙ্কর পকেট থেকে একটা চাবির রিং বের করে স্টীলের আলমারিটা খুলে কিছু জামা-কাপড় বের করে আলমারির মাথায় যে অ্যাটাচি কেসটা ছিল তার মধ্যে ভরে নিল। ও যখন ব্যস্ত তখন হঠাৎ পেছন থেকে সুদর্শনের গলা শোনা গেল।

ও যে ইতিমধ্যে রবীন দত্তর পাশে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল—মণিশঙ্কর জানতেও পারেনি।

মণিশঙ্করবাবু ?

হ্যাঁ—

ফিরে তাকাল মণিশঙ্কর ওদের দিকে। ওরা দুজনে এসে ততক্ষণ ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।

চাবিটা বুঝি আপনার প্যান্টের পকেটেই ছিল ?

হ্যাঁ—মানে ওটা—আলমারির একটা ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে থাকত।

ডুপ্লিকেট কেন ?

বিজির বড্ড ভুলো মন ছিল—কোথায় কি রাখত সব সময় মনে করতে পারত না, তাই তারই ব্যবস্থামত একটা চাবি আমার কাছে বরাবর থাকত।

ওতে বাইরের দরজার চাবিও আছে বোধ হয় ?

হ্যাঁ—দরজায় গডরেজের লকের চাবি, একটা আমার কাছে থাকত—একটা বিজির কাছে থাকত।

দেখলেন ?

কি।

আলমারির ভিতর থেকে কিছু চুরি গেছে কিনা ?

না—এখনো দেখিনি, দেখছি—

মণিশঙ্কর কথাটা বলে আলমারির ভিতরে সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। সুদর্শন আর ররীন দত্ত দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো।

মিনিট দশ-পনর পরে মণিশঙ্কর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না মিঃ দত্ত—কিছু চুরি গিয়েছে কিনা। মানে আমি তো ঠিক জানতাম না কোথায় কি আছে—সব কিছুই তো আমার স্ত্রীই রাখত—

সুদর্শন বললে, গহনাপত্র—টাকাকড়ি—সব ঠিক আছে ?

গহনাপত্র যা ওর গায়ে দেখছেন, এছাড়া তো আর বিশেষ কিছু ছিল না। আর টাকা-পয়সা তো ব্যাঙ্কেই রাখা হয়।

ও। তাহলে—

তাই তো বলছিলাম, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে কিছুই হয়তো চুরি যায়নি।

দেখুন তো—বালিশের তলায় বা ড্রয়ারে অন্য চাবিটা আছে কিনা। সুদর্শন আবার বললে।

মণিশঙ্কর অতঃপর সুদর্শনের কথামত ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো ও শয্যার কাছে

গিয়ে বালিশের তলা হাতড়ে দেখলো কিন্তু কোথাও কোন দ্বিতীয় চাবিব রিং পাওয়া গেল না।

কি হল—পাওয়া গেল না ? দত্ত জিজ্ঞাসা কবল।

না। দেখছি না তো—

গেল কোথায় তবে চাবিব রিংটা যেটা আপনাব স্ত্রীব কাছে থাকত ?

বুঝতে পাবছি না। হযতো—

কি ?

যাবা এসেছিল চুবি কবতে তাবাই নিয়ে গিয়েছে—তাডাতাডিতে কিছু নিতে পাবেনি—

তাই হয়তো হবে—সুদর্শন মৃদু গলায় বললে।

একসময সুদর্শন বিদায় নেবাব জন্য প্রস্তুত হল।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে দবজাব দিকে এগুতে যাবে, তখন সুদর্শন বললে, চলুন মিঃ ঘোষাল, আমিই আমাব জীপে আপনাকে পৌঁছে দেব।

আপনি দেবেন ?

হ্যাঁ চলুন—তাহলে ববীন আমবা চলি—তুমি এদিককাব ব্যবস্থা কবে তাবপব যেও—

তাই যাব স্যাব—

সুদর্শন নিজেব জীপে মণিশঙ্কবকে কালীঘাট বোড়ে কালিকা বোর্ডিং হাউসে পৌঁছে দিযে লালবাজাবে ফিবে এল।

লালবাজাবে পৌঁছে দুজন প্লেন-ড্রেস সি আই ডি ব কর্মচাবী সলিল ও সন্তোষকে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়ে ববীনকে থানায় ফোন কবল।

ববীন তখনো ফেবেনি জানতে পাবল।

সেকেণ্ড অফিসাব ফোন ধবেছিল, সে শুধাল, মিঃ দত্ত এলে আপনাকে কি ফোন কবতে বলব স্যাব ?

হ্যাঁ, বলবেন।

ঠিক আছে স্যাব—

সুদর্শন ফোনটা বেখে দিল।

ইতিমধ্যে বাইবে সন্ধ্যাব অন্ধকাব ঘন হয়ে এসেছে। পথে পথে আলো জ্বলে উঠছে।

একটা সিগারেট প্যাকেট থেকে বেব করে সেটায় অগ্নিসংযোগ কবে সুদর্শন।

সমীরণ দত্ত।

নামকরা রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পী। মণিশঙ্কর ও বিজিতার সঙ্গে বহুদিনকার আলাপ সমীরণ দত্তর।

থাকে বালিগঞ্জে, মণিশঙ্কর বলছিল।

একটিবার সমীরণ দত্তর সঙ্গে দেখা করে কথা বলা দরকার। কিন্তু তার ঠিকানা জানে না সুদর্শন।

কোথায় পাওয়া যেতে পারে সমীরণ দত্তর ঠিকানাটা?

হঠাৎ মনে পড়লো সমীরণ দত্ত একজন রেকর্ড ও রেডিওর নামকরা আর্টিস্ট—রেডিও অফিস থেকেই তো তাঁর ঠিকানাটা পাওয়া যেতে পারে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুদর্শন লালবাজার থেকে রেডিও অফিসে নিজের পরিচয় দিয়ে ফোন করল।

স্টেশন-ডাইরেক্টর আছেন?

না—অ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশন-ডাইরেক্টর বোধ হয় আছেন।

তাঁকেই দিন ফোনটা।

সমীরণ দত্তর ঠিকানাটা পাওয়া গেল।

মনোহরপুকুর রোডে থাকে সমীরণ—তিনতলা একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে। ফোনও সেখানে আছে, কিন্তু অনেকক্ষণ ফোনে রিং হল, কেউ ধরলে না।

হতাশ হয়েই একসময় সুদর্শন ফোনটা রেখে দিল।

॥ চার ॥

আপাতত একবার বাসায় যেতে হবে—সেই সকাল সাড়ে সাতটায় বের হয়েছে, এখন রাত প্রায় পৌনে আটটা—একবার না ঘুরে আসলে সাবিত্রীর সঙ্গে অলিখিত চুক্তিটা ভঙ্গ হবে।

বিয়ের কিছুদিন পরেই সাবিত্রীর সঙ্গে সুদর্শনের অলিখিত চুক্তি হয়েছিল সকালে কাজে বেরুলে যেমন করেই হোক সময় করে সুদর্শনকে একবার মাঝখানে দেখা দিয়ে আসতেই হবে সন্ধ্যার আগে যদি ফেরা না সম্ভব হয়।*

একবার সমীরণ দত্তর ওখানে যেতে হবে, কিন্তু তার আগে একবার যেতে হবে বাসায়। বাসা অবিশ্যি বেশী দূর নয়—শিয়ালদার কাছে—হ্যারিসন রোডের

* সুদর্শনের প্রথম কাহিনী পাওয়া যাবে 'প্রজাপতি রঙ' বইতে—লেখক।

কাছাকাছি।

সুদর্শন বের হয়ে পড়ল।

জীপচালক সেপাই শুধায়, কোন্ দিকে যাব স্যার ?

মোহন, একবার বাসায় চল তো—সেখান থেকে বালিগঞ্জ যাব।

বাসাটা একেবারে ঠিক বড় রাস্তার উপরে নয়, গলির ভিতর ঢুকতে হয়। তবে দক্ষিণ আর পুব দিকটা খোলা।

বাড়িটা নতুন।

দোতলার উপরে তিনখানা ঘর। হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিল বাসাটা সুদর্শন। বিয়ের পরে একটা ফ্ল্যাট খুঁজছে কলকাতা শহরে সর্বত্র যখন, তখনই এক অফিসার বন্ধু বাসাটার কথা সুদর্শনকে বলে। সেই অফিসারেরই মামাশ্বশুরের বাড়ি।

সুদর্শন একটু অন্যমনস্কই ছিল নচেৎ জীপ থেকে শেষ গলিতে ঢুকবার মুখে কিরীটীর নতুন কালো রংয়ের ফিয়াটটা নজরে পড়ত।

বড় গাড়ি বিক্রী করে দিয়ে কিরীটী কিছুদিন হল ফিয়াট কিনেছে। অসুবিধা হয়েছে ড্রাইভার হীরা সিংয়ের।

লম্বা মানুষ—চালাতে কষ্ট হয়।

তবে হীরা সিং মুখে কিছু বলেনি।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই নজরে পড়ল ঘরের দরজা খোলা। ঝুলন্ত পর্দার ওদিক থেকে আলোর আভাস আসছে—তারপরই একটা পরিচিত গলার স্বর কানে ভেসে আসতেই সুদর্শন হঠাৎ যেন খুশি হয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা তুলে ঘরে পা দেয়।

দাদা। কতক্ষণ ?

সুদর্শনের দিকে ফিরে কিরীটী বলে, তা ভায়া ঘণ্টাদেড়েক তো হবেই। ভাবছিলাম এবারে উঠব—তোমার সঙ্গে বুঝি দেখাই হল না।

সাবিত্রী উঠে পড়েছে ততক্ষণে। স্বামী সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে সাবিত্রী বললে, চা খেয়েছ ? নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয়নি—

সুদর্শন হেসে বলে, না—সময়ই পাইনি—

জানতাম আমি। দাদা, আপনিও খাবেন তো ?

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, তোমার দাদার চায়ে যে অরুচি নেই তা তো তুমি জান সাবিত্রী।

সাবিত্রী ভিতরের ঘরে চলে গেল।

সত্যি মেয়েটি বড় ভাল—তাই না সুদর্শন? কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

সুদর্শন বললে, সত্যিই জহুরী আপনি দাদা—

স্বীকার করছ? কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।

একবার কেন, হাজারবার স্বীকার করব।

আমার সঙ্গে গল্প করছিল বটে, সাবিত্রীর কিন্তু মনটা পড়ে ছিল সর্বক্ষণ দরজার দিকে—মাঝখানে একবার এসে ঘুরে গেলেই তো পার।

আসি দাদা—নেহাত কাজে আটকে না পড়লে। আজ এক জোড়া খুনের ব্যাপারে এমন জড়িয়ে পড়লাম যে—

আরে ভায়া তোমার চাকরিই তো খুনজখম রাহাজানি নিয়ে—

তা জানি দাদা। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা এমন নৃশংস, এমনি বীভৎস যে—মনটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

তাই নাকি। তা জোড়া খুন হল কোথায়?

খুন হয়েছে বেলেঘাটা অঞ্চলে দিনের বেলা—একেবারে ভরদুপুরে। ত্রিশ-একত্রিশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে আর তার ফুলের মত বছর চারেকের বাচ্চাটি—মানুষ যে এত নিষ্ঠুর কি করে হয়—

ভালবাসার উল্টোদিকেই তো নিষ্ঠুরতা—মানবচরিত্রের আলো অন্ধকার দুটি দিক।

জানি দাদা—তবু এক-এক সময় মনে হয় এটা কেমন করে সম্ভব হয় মানুষের পক্ষে।

আসল ব্যাপারটা কি জান ভায়া, প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই পশুবৃত্তি থাকে। ভালবাসা, স্নেহ, মমতা—সেই পশুবৃত্তিটাকে একটা পোশাক পরিয়ে চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না—আর যখন সম্ভব হয় না তখনই তার শিক্ষা কৃষ্টি রুচি সরে গিয়ে তার মুখোশটা হঠাৎ খুলে যায়—ভিতরের পশুটা বের হয়ে আসে নখদন্ত বিস্তার করে কুটিল হিংস্র হয়ে। আমরা চমকে উঠি তখন। কিন্তু সেটা যে মনুষ্য-চরিত্রের আলোর, অন্য দিক যে স্বাভাবিক অন্ধকার—সেটা ভুলে যাই।

সাবিত্রী ঐ সময় দু'কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে সুদর্শন বলে, আপনাকে বলতে ইচ্ছা করছে ঘটনাটা দাদা। কিন্তু সাবিত্রী ঐ সব সহ্য করতে পারে না।

কিরীটী হেসে বলে, তা না সহ্য করতে পারলে হবে কেন? পুলিস অফিসারের বৌ হয়েছ যখন—সত্যি সাবিত্রী—এ কিন্তু অন্যায় তোমার—

বাঃ, আমি কখনও কিছু বলেছি নাকি? সাবিত্রী বললে।

না। মুখে বলোনি বটে কিন্তু তোমার মুখের চেহারা যা হয়—আমার মায়া লাগে। —সুদর্শন বললে।

না, না—সুদর্শন। তুমি বলবে সাবিত্রীকে সব কথা। হয়ত দেখবে ওর অনেক পরামর্শ তোমার অনেক কাজে লাগবে—জান না তো মেয়েদের একটা বিচিত্র তৃতীয় নয়ন আছে। তুমি বল, আমরা শুনি আজকের ঘটনা।

শুনবেন ?

নিশ্চয়ই, বল।

সুদর্শন সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকাল। সাবিত্রী বললে, কি হয়েছে ?

কিরীটী বলে, কোথায় নাকি জোড়া খুন হয়েছে—

জোড়া খুন !

হ্যাঁ।

সুদর্শন তখন সংক্ষেপে ঐদিনকার ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করে যায়। কিরীটী একটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে বসে শোনে ধূমপান করতে করতে।

সাবিত্রী বলে, কি নিষ্ঠুর।

কিন্তু সাবিত্রী, কিরীটী বলে, তোমার কি মনে হয় বল তো ? মা ও মেয়েকে কে খুন করল—আর কেনই বা খুন হল ? মানে খুনের সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে ?

জানি না দাদা—

ব্যাপারটা বোধ হয় খুব একটা জটিল নয়—কিন্তু এবারে উঠব ভায়া। কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

এখুনি যাবেন দাদা ?

হ্যাঁ—রাত প্রায় পৌনে ন'টা হল।

চলুন আমাকেও একবার ওদিকে যেতে হবে। সুদর্শনও উঠে দাঁড়ায়।

কোথায় যাবে ?

ভাবছি একবার মনোহরপুকুর রোডে যাব।

সমীরণ দত্তর ওখানে ?

হ্যাঁ—সাবিত্রী, দরজাটা বন্ধ করে দাও। দুখনকে দেখছি না—কোথায় গেল ?

দুখন তো বিকেলে বের হয়েছে তার এক দেশওয়ালী ভাইয়ের সঙ্গে—এখনো ফেরেনি। তুমি যাও না—সবলা তো আছে—

সাবিত্রীর কথা শেষ হল না, দুখন এসে ঠিক ঐ সময় ঘরে ঢুকল।

কিরে, এত দেরী হল তোর? সাবিত্রী শুধায়।

বছর কুড়ি বয়স হবে ভুখনের। বেশ তাগড়াই চেহারা। পুলিসের চাকরির লোভে কলকাতায় তার কনস্টেবল কাকার কাছে এসেছিল, কিন্তু এখনো কোন সুবিধা না হওয়ায় তার কাকা রামনারায়ণের সুপারিশে সুদর্শন তাকে তার গৃহে স্থান দিয়েছে।

বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ছোট কাজ ইত্যাদি কিছু করে না—তবে বাজার-হাট করা, অন্য ফাইফরমাশ সব করে। খুব বিশ্বাসী।

ভুখন বললে, কি করি, দেরি হয়ে গেল ঝগড়া করতে করতে।

সে কি রে? ঝগড়া আবার কবে সঙ্গে করছিলি? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে?

আমার ভাইয়ের সঙ্গে, দেশ থেকে সে এসেছে।

কেন?

দেখুন না—নোকরি-উকরি নেই, বলে কিনা সাদী কর—আমি তো রাজী নই, ওরা রাজী করাবেই আমাকে।

তা শেষ পর্যন্ত কি ঠিক হল?

কি আবার—আগে নোকরী তারপর সাদী।

সকলেই হাসতে থাকে।

রাস্তায় বের হয়ে সুদর্শন কিরীটীর গাড়িতেই উঠে বসল—এবং নিজের জীপটা তার পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

একটা কথা বলব দাদা? একসময় সুদর্শন বলে।

কি?

আপনি তখন ওই কথাটা বললেন কেন?

কোন্ কথাটা ভায়া?

ব্যাপারটা বোধ হয় খুব জটিল নয়।

তোমার কাহিনী শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। কিরীটী বললে।

আপনি কি সমীরণ দত্তকেই তাহলে সন্দেহ করেন?

প্রেমের গতি বড় বিচিত্র, ভায়া।

কিন্তু—

বিশেষ করে যে প্রেম সর্বগ্রাসী। সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলেই হিংসা তার কুটিল নখর বিস্তার করে।

কিন্তু দাদা—

তাছাড়া ঠিক—অন্ততঃ মণিশঙ্কর ঘোষালের কথা যদি মিথ্যা না হয়—সমীরণ দত্তর ভালবাসা না হলেও বিজিতার ওপরে একটা দুর্বলতা ছিল।

তা তো বোঝাই যায়। সুদর্শন বললে।

অবিশ্যি তোমাকে জানতে হবে কথাটা কতখানি সত্য এবং যদি সত্যিই হয়ে থাকে তবে সেই দুর্বলতাটা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল। তবে এও ঠিক জেনো ভায়া—

কি?

সমীরণ হয়ত অত সহজে মুখ খুলবে না।

কেন?

প্রথমতঃ আর্টিস্টরা একটু টাচি হয়—দ্বিতীয়তঃ, দুর্বলতা বা ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও যে তার প্রেমাস্পদকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারে তাদের পেট থেকে কথা বের করা খুব সহজ হবে না।

আর মণিশঙ্কর?

সন্দেহের তালিকা থেকে সেও বাদ পড়ে না।

কিন্তু ঐভাবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যা করাটা—

যদি সে হত্যা করেই থাকে তাহলে যখন সে হত্যা করেছিল জানবে সে তখন স্বামী বা বাপ ছিল না। একটু আগে যে বলছিলাম মানুষের উদ্দাম মনের তলে চিরন্তন পশুবৃত্তির কথাটা—তখন জেনো সেই পশুটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে তো আরো পরের কথা। তারও আগে তোমায় জানতে হবে—

কি?

কালো অ্যামবাসাডারে করে বেলা বারোটা সোয়া বারোটায় কে এসেছিল ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটায়। তাছাড়া মকবুল মিস্ত্রীর কথাগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই ঠিক তেমন একটা সামঞ্জস্য নেই।

সামঞ্জস্য নেই?

হ্যাঁ। সে কি বলেনি কালো অ্যামব্যাসাডার থেকে নামতে দেখেছে—হাতে সুটকেস—একজন ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোককে যিনি গাড়িটা ঐখানে রেখে ঐ ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢোকেন—তার কিছুক্ষণ বাদে স্যুট-পরিহিত এক ভদ্রলোক ফ্ল্যাট বাড়িটা থেকে বের হয়ে এসে গাড়িটা চালিয়ে চলে গেলেন।

সত্যিই তো। তখন তো আমার কথাটা ঠিক মনে হয়নি!

পোশাকের বিভিন্নতা বাদ দিলে কালো রংয়ের অ্যামব্যাসাডার গাড়ি—একজন ভদ্রলোক ও একটা স্যুটকেস ঠিকই আছে। এর থেকে একটা কথাও কি তোমার মনে হয়নি ?

কি ?

যে ব্যক্তি অ্যামব্যাসাডারে করে এসে ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটায় ঢুকেছিল এবং যে ব্যক্তি ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে একটু পরে বের হয়ে এসে অ্যামব্যাসাডারটা চালিয়ে চলে গিয়েছে তারা একই ব্যক্তি, না দুজন। তাছাড়া মিস্ত্রীর কথাটাও কতখানি সত্য তারও যাচাই হওয়া দরকার, ঐ ব্যক্তির আইডেনটিটি ও গাড়িটার—

হ্যাঁ—খোঁজ নিচ্ছি আমি।

আরো আছে।

কি ?

ঐ ইঞ্জিনীয়ার গোপেন বসু ভদ্রলোকটি—যিনি থানায় ফোন করেছিলেন—যিনি ঐ বাড়িরই আর একটা ফ্ল্যাটে থাকেন—তাঁকে তো তোমরা কোন জিজ্ঞাসাবাদই করনি।

ভুল হয়ে গিয়েছে দাদা।

খুনের ব্যাপারে এত বড় ভুল মারাত্মক ভায়া। তোমার জানা উচিত ছিল। বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা উনি কোথায় ছিলেন—কি করছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামছিলেন না উঠছিলেন, যখন মণিশঙ্কর ঘোষালের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সিঁড়িতে—

আমি কালই সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

হ্যাঁ, ভুলো না। আর একটা কথা—

বলুন ?

মকবুল বলেছে সে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শম্ভুকে দেখেছে বাজারের দিকে যেতে এবং তার হাতে ঐ সময় একটা সাদা খাম ছিল।

হ্যাঁ, বলেছিল।

তাকে সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলে ঠিকই, কিন্তু—

কি ?

শম্ভু যে সব সত্যি কথাই বলেছে তারই বা ঠিক কি !

তা অবিশ্যি ঠিক, তবে—শম্ভু তো এখন লক-আপেই আছে।...

বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। তাকে লকআপেই রেখো। আরও আছে—

বলুন ?

যে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হয়েছে সেটাও তোমরা ভাল করে খুঁজে দেখনি। হয়ত ওই ফ্ল্যাটের মধ্যেই কোথাও সেটা এখনও থাকতে পারে—

কাল সকালেই আর একবার ওখানে যাব।

ভাল কথা, বিজিতার আত্মীয়স্বজন কেউ আছে কিনা বাংলাদেশে, সংবাদটা জানবার চেষ্টা করনি ?

না—

সেটাও অবিশ্যি প্রয়োজন।

করব।

কিরীটী মনোহরপুকুর রোডেই সুদর্শনকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সুদর্শন বাড়ির নম্বরটা খুঁজে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলার একটা ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু দরজা বন্ধ।

দরজায় তালা দেওয়া।

সুদর্শন কি করবে ভাবছে এমন সময় একজন তরুণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল। সুদর্শনকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, কাকে চান ?

সমীরণবাবুর কাছে এসেছিলাম—কিন্তু দেখছি দরজায় তালা দেওয়া—

উনি তো আজ বিকেলের প্লেনে ম্যাড্রাস গেলেন—

ম্যাড্রাস ?

হ্যাঁ—কি গানের রেকর্ডিংয়ের ব্যাপারে—

কখন গিয়েছেন ?

তা ঠিক জানি না। আমি যখন বের হই, সোয়া তিনটে, তখনো তাঁকে দেখেছি। কখন গিয়েছেন তা ঠিক বলতে পারব না।

আপনার সঙ্গে সমীরণবাবুর পরিচয় আছে ?

হ্যাঁ—আমি তো এই পাশের ফ্ল্যাটেই থাকি। তাছাড়া ওঁর কাছে আমি রবীন্দ্র-সংগীতের লেশন নিই—

ও, তাহলে তো আপনি তাঁর বিশেষ পরিচিতই—

আপনাকে তো চিনতে পারছি না, কখনো ওঁর কাছে আসতে তো দেখিনি।

না। আমি, মানে, কলকাতার বাইরে থাকি কিনা—

তাই—তা কি ব্যাপার বলুন তো ? কোন কনফারেন্স নাকি ?

সুদর্শন হাসে। বলে, না, অন্য একটু কাজ ছিল। তা উনি কখে আসবেন তা জানেন কিছু?

দিন পাঁচ-সাত দেরি হতে পারে।

আপনার নামটা কি জিজ্ঞেস করতে পারি?

দেবজ্যোতি আচার্য—তা সমীরণদা আসলে কি বলব? আপনার নাম, কোথা থেকে—, কিন্তু দেবজ্যোতির কথা শেষ হল না, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে দুজনেই নীচের দিকে ঘুরে তাকায়।

কে যেন উঠে আসছে—ক্লান্ত শিথিল পদবিক্ষেপে।

আরে ওই তো সমীরণদা—এ কি সমীরণদা, আপনি ম্যাড্রাস যাননি?

সুদর্শন তাকিয়েছিল আগন্তুকের মুখের দিকে। সিঁড়ির আলোটা শক্তিশালী না হলেও স্পষ্টই, সব কিছু দেখা যায়।

বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে সমীরণ দত্তর বয়স।

রোগা, লম্বা এবং যাকে বলে রীতিমত সুশ্রী চেহারা সমীরণ দত্তর। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি—মাথার চুল তৈলহীন রুক্ষ এবং কিছুটা এলোমেলো।

তীক্ষ্ণ নাসা—সুন্দর দুটি চক্ষু।

চোখে চশমা।

তার হাতে কালো রংয়ের একটা সুটকেস, মাঝারি সাইজের। দেবজ্যোতির পাশে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুদর্শনকে দেখে সমীরণ দত্ত হঠাৎ যেন থমকে সিঁড়ির মাঝপথেই একটা ধাপের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

দেবজ্যোতি বললে, আমি তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে আপনি ম্যাড্রাস পৌঁছে গিয়েছেন প্লেনে। এই যে এই ভদ্রলোক, আপনাকে খুঁজছিলেন।

পাশেই দণ্ডায়মান সুদর্শনকে দেখিয়ে দিল দেবজ্যোতি।

সমীরণের দিক থেকে কিন্তু কোন সাড়া এল না, সে যেন কেমন বোবার মতই দাঁড়িয়ে আছে তখনো।

॥ পাঁচ ॥

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

সমীরণ তাকিয়ে আছে সুদর্শনের মুখের দিকে। আর সুদর্শন তাকিয়ে আছে

সমীরণের মুখের দিকে। দুজনে যেন দুজনের সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরকে যাচাই করছে।

দেবজ্যোতি কিন্তু দাঁড়িয়ে ছিল না। তার কথাটা শেষ করেই সে তাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে গিয়েছিল।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সুদর্শন আর ধাপ-পাঁচেক নীচে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে তখনো সমীরণ দত্ত।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করল সুদর্শনই। মৃদু হেসে বললে, আসুন সমীরণবাবু—আপনার কাছেই আমি এসেছিলাম—আমার নাম সুদর্শন মল্লিক। এসে শুনি আপনি ম্যাড্রাস চলে গিয়েছেন—

ম্যাড্রাস ?

হ্যাঁ—দেবজ্যোতিবাবু বললেন—

সমীরণ দত্ত উঠতে শুরু করেছে তখন সিঁড়ি দিয়ে আবার। সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে উপরে এসে মুখোমুখি হয়ে বলে, দেবজ্যোতি ভুল করেছে—

ভুল ?

হ্যাঁ—আমার বোম্বাই যাওয়ার কথা ছিল, ম্যাড্রাস নয়—

তা গেলেন না ?

সুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রেখে পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালাটা খুলতে খুলতে সমীরণ বললে, না—প্লেনটা মিস করলাম—আসুন—

সমীরণের আহ্বানে সুদর্শন ঘরের মধ্যে পা দিল।

ঘরটা অন্ধকার ছিল, সমীরণ সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জেলে দেয়।

ঘরটা আকারে বেশ বড়ই। মেঝেতে যদিও কার্পেট পাতা কিন্তু কার্পেটটায় যে অনেকদিন ঝাঁটা পড়েনি সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। একদিকে একটা হারমোনিয়াম, তার পাশে বাঁয়া তবলা—একরাশ স্বরলিপির বই—গানের বই—খাতা-পেন্সিল, পানের ডিবে, পিকদানি—অ্যাশট্রে—রেকর্ড—সব ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে।

ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটি সোফা। তার পাশে একটা ভাসে কিছু শুকনো গোলাপ।

দেওয়ালে বড় বড় সব গাইয়েদের ফটো।

মধ্যিখানে রবীন্দ্রনাথের ছবি।

সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা অযত্ন—এলোমেলো বিশৃঙ্খলতা।

সমীরণ দত্ত সুদর্শনকে বললে—বসুন।

কথাটা বলে মধ্যবর্তী একটা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং একটু পরে সুটকেসটা সেই ঘরে রেখে বের হয়ে এল আবার।

আপনি বললেন আপনার নাম সুদর্শন মল্লিক—আপনাকে তো আমি চিনতে পারলাম না। আমার কাছে কি কিছু প্রয়োজন ছিল?

হ্যাঁ—বসুন না।

সমীরণ কিন্তু বসল না। সুদর্শনের মনে হচ্ছিল সমীরণ দত্ত যেন তাকে দেখা অবধি একটু বিব্রতই বোধ করছে। কেমন যেন একটু অস্থির—চঞ্চল।

বসুন সমীরণবাবু—

সমীরণ বসল পাশের সোফায়।

সমীরণবাবু—আপনাকে আমার আসল পরিচয়টা ও আসার উদ্দেশ্যটা খুলে বলছি—

সমীরণ চেয়ে আছে সুদর্শনের দিকে।

আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসছি—

কেন?

আপনাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার আছে।

প্রশ্ন!

হ্যাঁ—আপনি বিজিতা ঘোষালকে চিনতেন?

হঠাৎ যেন নামটা শুনে সুদর্শনের মনে হল সমীরণ কেমন একটু চমকে উঠল।

আপনি তাঁকে চিনতেন, মানে অনেকদিন, তাঁর বিবাহের আগে থেকেই, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি বোধ হয় একটা সংবাদ এখনো পাননি।

কি সংবাদ? সমীরণ যেন অতি কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করল।

আজ দুপুরে তাঁকে এবং তাঁর কন্যা রুণুকে সি আই. টি'র ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

সে কি! কে বললে?

মৃত বললেই সবটুকু বলা হবে না। *দে হ্যাভ বীন্ ব্রুটালি মার্ডারড্*—নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের—

নৃশংসভাবে হত্যা!

হ্যা—আর সেই ব্যাপারেই কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি আপনার কাছে।

আমি—

আপনি তো ওদের দুজনেরই বন্ধু ছিলেন। ওদের দুজনকেই ভাল করে জানবার ও চিনবার সুযোগ হয়েছিল আপনার। তাই—

অতঃপর সুদর্শন সমস্ত দুর্ঘটনাটা আনুপূর্বিক বলে গেল।

সমীরণ স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ যেন বসে থাকে।

মণিশঙ্কর কোথায় এখন? কেমন যেন মিনমিনে গলায় প্রশ্ন করলে সমীরণ একটু পরে।

কাছেই আছেন তিনি—কালিকা বোর্ডিংয়ে।

আপনি বলছেন যখন ব্যাপারটা ঘটে তখন সে অফিসে ছিল?

হ্যা—ফোনে সংবাদ পেয়ে এসে দেখতে পায়—

সে কিছুই জানে না?

না। অন্তত তাই তো তিনি বললেন।

কিছু অনুমানও করতে পারেনি?

না।

ও।

ওকথা বলছেন কেন সমীরণবাবু? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?

আমি!

হ্যা।

আমি কাকে সন্দেহ করব? তাছাড়া ইদানীং মাসকয়েক ওদের সঙ্গে আমার একদম দেখাসাক্ষাৎও হয়নি।

কাজে ব্যস্ত থাকার দরুনই বোধ হয়?

সমীরণ হাসল মৃদু। বললে, না—

তবে?

মণি পছন্দ করত না।

কি পছন্দ করত না—আপনাদের মেলামেশা?

হ্যা—বিজিতার উপর সেজন্য সে টরচারও করত।

কি ধরনের টরচার?

ঠিক আমি জানি না—তবে বিজিতার মুখ দেখে তাই মনে হয়েছিল।

তিনি কিছু বলেননি?

না। বিজিতার মত মেয়ে হয় না। এত ভদ্র—এত নম্র—এত শান্ত—অথচ কেন যে মণি একটা কথা বুঝতে পারত না—

কোন্ কথা ?

বিজিতার সমস্ত মন ভরে ছিল মণিশঙ্করই—

মণিশঙ্করের অত্যন্ত সন্দেহবাতিক মন ছিল তাহলে বলুন।

সমীরণ কোন জবাব দেয় না।

আর একটা কথা সমীরণবাবু—

সমীরণ সুদর্শনের মুখের দিকে তাকাল।

আপনি যে সুটকেসটা এইমাত্র সঙ্গে নিয়ে এলেন সেটা একবার আনবেন ?

সুটকেসটা।

হ্যাঁ।

কেন ?

আনুন না—দরকার আছে—

কিন্তু—

নিয়ে আসুন সুটকেসটা।

সমীরণ উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে সুটকেসটা নিয়ে এল। সুটকেসটা খুলতে গিয়ে দেখল সুদর্শন—গা-তালা বন্ধ সুটকেসের।

সুটকেসের চাবিটা কোথায় ? সমীরণের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সুদর্শন।

চাবি !

হ্যাঁ। চাবিটা দিন।

চাবি—মানে চাবিটা তো আমার কাছে নেই।

এই সুটকেসের চাবিটা আপনার কাছে নেই ?

সমীরণের মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে গিয়েছে—কেমন রক্তহীন ফ্যাকাশে।

এই সুটকেসটা আপনারই তো ?

হ্যাঁ, মানে,—সমীরণ কেমন যেন তোতলাতে থাকে। তার কথা ভাল করে মুখ দিয়ে বের হয় না।

আপনার নয় সুটকেসটা ?

আপনি—আপনি বিশ্বাস করুন অফিসার—ওই সুটকেসটা সত্যিই আমার নয়।

আপনার নয় !

না। আগে কোন দিন স্যুটকেসটা আমি দেখিওনি।

তবে আপনার কাছে কি করে এল এটা ?

জানি না।

জানেন না।

না। জানি কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি বলছি—স্যুটকেসটা জীবনে কখনো আমি আগে দেখিনি। আজ বেলা দশটা নাগাদ আমি বের হয়েছিলাম—আমার রিহার্শেল ছিল—বেলা দুটো নাগাদ ফিরে আসি কারণ বিকেলের প্লেনে আমার বোম্বাই যাবার কথা—

বলুন, থামলেন কেন ? তারপর ?

কপালে সমীরণের বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। ঠোঁট দুটো কেমন যেন কাঁপছে। সমীরণ একটা ঢোক গিলে বলতে থাকে আবার, ঘরে ঢুকে দেখি মানে আমার শোবার ঘরে, বিছানার উপরে ঐ স্যুটকেসটা পড়ে আছে। একটু অবাক হই। কোথা থেকে এল স্যুটকেসটা ? কে রেখে গেল—স্যুটকেসটা তো আমার নয় ? স্যুটকেসটা খোলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখি তালা লাগানো।

তারপর ?

আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল।

কেন ?

স্যুটকেসের ভিতরে কি আছে তখনো জানি না, তবু কেন যেন আমার বুকের মধ্যে সিরসির করতে লাগল—সেই সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল—তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোনটা ধরলাম, হ্যালো—

কে, সমীরণবাবু ?

হ্যাঁ—আপনি কে ?

আমি যেই হই না কেন আপনার তাতে প্রয়োজন নেই—একটা কথা বলবার জন্য ফোন করছি। আপনার শোবার ঘরে একটা স্যুটকেস আছে—যদি বাঁচতে চান তো যত তাড়াতাড়ি পারেন স্যুটকেসটার একটা ব্যবস্থা করবেন—

ওই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই কানেকশানটা কেটে গেল। আমি যে তখন কি করব বুঝতে পারছি না। অবশেষে ঠিক করলাম স্যুটকেসটা বাইরে কোথাও গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব—

সন্ধ্যার অন্ধকারে বের হলাম স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে, কিন্তু কোন ট্যাক্সিতে চাপতে সাহস হল না—হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম।

তারপর ?

ঘণ্টা তিনেক ধরে এ-রাস্তা সে-রাস্তা—লেক অঞ্চল রেল স্টেশন ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম স্যুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে। চারিদিকে কেবল মানুষ আর মানুষ। কোথায় স্যুটকেসটা ফেলব—কারো নজরে পড়ে যাব—এই ভয়ে রাত্রিতে আবার বেরুব ঠিক করে ফিরে এলাম। আমি জানি, আপনি নিশ্চয় আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু যা বললাম এক বর্ণও তার মিথ্যে নয়। সুসকেসটা আমার নয়, জানিও না কার। জানি না কি ওর ভেতরে আছে, কোথা থেকে এল, কেমন করেই বা এল—, বলতে বলতে সমীরণের গলার স্বরটা যেন বুজে এল।

আপনি যখন বাড়ি থেকে দশটা নাগাদ বের হয়েছিলেন, তখন দরজায় তালা দিয়ে যাননি ? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে।

গিয়েছিলাম।

ফিরে এসে দরজায় তালা দেওয়াই আছে দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ।

গডরেজের লক ?

না। সাধারণ একটা দেশী গা-তালা। তাহলেও তালাটা ভাল জাতের।

তবে ? যদি কেউ এসেই থাকে তবে সে খুলল কি করে ?

জানি না।

আপনার কোন চাকর-বাকর দেখছি না—নেই নাকি ?

চাকরটা মাসখানেক হল ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে। একটা ঠিকা-ঝি সব করে দিয়ে যায়।

রান্নাবান্না ?

যাহোক কিছু ফুটিয়ে নিই—একা মানুষ—

বিয়ে-থা করেননি ?

না।

মা-বাপ, ভাই-বোন কেউ নেই ?

সবাই আছে।

কোথায় থাকেন তাঁরা ?

এই কলকাতাতেই।

তবে ?

কেউ আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি।

কেন ?

ভালভাবে ইকনমিক্স-এ এম. এ. পাস করেও কোন চাকরি-বাকরি করলাম না—গান-বাজনা নিয়েই আছি—বাবার সঙ্গে তাই মতবিরোধ হতে লাগল সর্বক্ষণ, বাড়ি ছেড়ে তাই চলে এলাম।

কবে ?

তা বছর পাঁচেক হবে।

বছর পাঁচেক এই বাসাতেই আছেন ?

হ্যাঁ।

কিছু মনে করবেন না, আপনার ইনকাম কি রকম ?

যা পাই—আমার তাতে ভাল ভাবেই চলে যায়। উদ্বৃত্তও থাকে না—অভাবও নেই।

॥ ছয় ॥

ছুরি আছে ?

ছুরি।

হ্যাঁ।

আছে— তবে কি হবে ছুরি দিয়ে ?

নিয়ে আসুন একটা ছুরি।

সমীরণ একটা ছুরি নিয়ে এল—তারই সাহায্যে তালা ভেঙে সুটকেসটা খুলে ফেলল সুদর্শন।

আর খুলতেই যেন ও চমকে ওঠে।

রক্তমাখা কাপড়।

টেনে বের করল সুদর্শন। রক্তমাখা ধুতি-পাঞ্জাবি-গেঞ্জি—আর কাপড়ের মধ্যে জড়ানো ছিল একটা ধারালো বড় ছোরা।

ছোরাটার গায়েও রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে।

সমীরণ যেন বোবা হয়ে গিয়েছে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে রক্তমাখা জামাকাপড়ের দিকে

সুদর্শনের মুখ দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত কোন কথা বের হয় না।

এই ধুতি আর পাঞ্জাবি—চিনতে পারছেন ?

কেমন যেন অসহায় বোবাদৃষ্টিতে তাকায় সমীরণ সুদর্শনের মুখের দিকে। কোন কথাই বের হয় না তার মুখ দিয়ে।

চিনতে পারছেন না ?

না তো—

আপনার ধুতি-পাঞ্জাবি কোথায় থাকে ?

ওই যে আলমারির মধ্যে—হাত তুলে ঘরের মধ্যে একটা আলমারি দেখিয়ে দিল সমীরণ।

আলমারিতে চাবি দেওয়া থাকে না ?

না।

সুদর্শন উঠে গিয়ে আলমারির বন্ধ দরজা দুটো টানতেই খুলে গেল। একটা তাকে কিছু ধুতি-পাঞ্জাবি দলামোচা করে রাখা—অন্য তাকে কিছু ভাঁজ করা জামাকাপড়। হ্যাঙারে একটা কোট—একটা শাল। আলমারি থেকে একটা ভাঁজকরা ধুতি নিয়ে ফিরে এল সুদর্শন—সেটা এবং রক্তমাখা ধুতি-পাঞ্জাবি-গেঞ্জি সুটকেসের মধ্যে ভরল। সন্তর্পণে ছোরাটাও একটা রুমালে ভাঁজ করে সুটকেসের মধ্যে ভরে ডালাটা বন্ধ করল।

সমীরণবাবু ?

অ্যাঁ ?

আমার সঙ্গে যে একবার আপনাকে যেতে হবে।

কেন ?

চলুন, প্রয়োজন আছে—

আমাকে কি আপনি অ্যারেস্ট করছেন ?

আই অ্যাম সরি সমীরণবাবু—ঠিক অ্যারেস্ট নয়, তবে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কিন্তু কেন, আমাকে আপনি অ্যারেস্ট করছেন কেন ?

না, না—সমীরণবাবু, অ্যারেস্ট আপনাকে আমি ঠিক করছি না—বললাম তো। আপাততঃ লালবাজারে আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—চলুন আর দেরি করবেন না।

আপনিও কি সন্দেহ করছেন আমিই বিজিতা আর তার মেয়েকে হত্যা করেছি ?

চলুন আপনি আমার সঙ্গে।

কিন্তু কেন ? কেন আমি আপনার সঙ্গে যাব ? ঐ সুটকেসের ব্যাপারটার

কিছুই আমি জানি না বিন্দুবিসর্গ। কোথা থেকে এল, কেমন করে এল—

তবু স্যুটকেসটা আপনার কাছেই পাওয়া গিয়েছে। আপনি তাকে চিনতেন, দীর্ঘদিন ধরে পরিচয় ছিল আপনাদের পরস্পরের, আপনি তাকে ভালবাসতেন—

ভাল যদি বিজিতাকে আমি বেসেই থাকি কোন দিন সেটা নিশ্চয়ই একটা অপরাধ নয়!

দেখুন সমীরণবাবু, তর্ক করতে আমি চাই না। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কিনা সেটাই কেবল আমি জানতে চাই—

যদি না যাই?

তবে বাধ্য হয়েই আপনাকে আমায় অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে হবে।

বেশ চলুন।

সুদর্শন সমীরণকে সঙ্গে করে লালবাজারে নিয়ে এল। এবং তাকে লক-আপে রেখে দেবার ব্যবস্থা করল।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এগারোটা।

বাসায় ফিরবার আগে সুদর্শন কিরীটীকে ফোন করল।

কে? কিরীটীর গলা ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল।

দাদা আমি সুদর্শন।

কি ব্যাপার, এত রাত্রে?

সেই স্যুটকেসটা পাওয়া গিয়েছে দাদা।

পেয়েছ?

হ্যাঁ। তার মধ্যে রক্তমাখা ধুতি, পাঞ্জাবি, গেঞ্জি আর একটা ছোরাও পাওয়া গিয়েছে।

কোথায় পেলে?

সমীরণ দত্তর কাছে।

সমীরণকে অ্যারেস্ট করেছ?

নিশ্চয়ই।

কি বললে সে?

সংক্ষেপে সুদর্শন ঘটনাটা বলে গেল কিরীটীকে ফোনে। সব শুনে কিরীটী বলল, একটা কথা সুদর্শন—

বলুন দাদা?

মণিশঙ্করের ফ্ল্যাটে পুলিস-প্রহরা রেখেছ তো?

রেখেছি।

কাল একবার ভোরেই গোপেনবাবুর ওখানে যেও—

যাব। কিন্তু গোপেনবাবুর এভিডেন্সটা কি খুব প্রয়োজনীয় দাদা?

নিঃসন্দেহে। হয়তো তিনি তোমার বর্তমান হত্যা-রহস্যের ব্যাপারে আলোক-সম্পাত করতে পারেন।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দাদা -সমীরণ দত্তকে যখন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, হত্যা-রহস্যের কিনারা আমরা সহজেই করতে পারব।

তা হয়তো পারবে, কিন্তু তবু গোপেনবাবু কিছু জানেন কিনা জানা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আর রাত করো না, এবারে বাড়ি যাও—সাবিত্রী হয়ত তোমার জন্য বসে আছে। গুডনাইট।

কিরীটী অন্য প্রান্তে ফোনটা রেখে দিল।

সত্যিই সাবিত্রী জেগে বসেছিল সুদর্শনের জন্য।

রাত তখন প্রায় পৌনে বারোটা।

কলিংবেল টিপতে সাবিত্রীই এসে দরজা খুলে দিল, এত রাত হল যে।

খেয়েছো?

না।

কেন খেয়ে নিলে না। কতদিন বলেছি রাত হলে আমার জন্যে বসে থেকো না।

সাবিত্রী মৃদু হাসে।

হাসলে যে? সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে।

হাত-মুখ ধুয়ে নাও—এত রাত্রে নিশ্চয়ই স্নান করবে না।

স্নান না করলে আমার ঘুমই হবে না—চট্‌পট সেরে নিচ্ছি আমি। জান সাবি—

কি?

কেসটার আরো ডেভালাপমেণ্ট হয়েছে। খেতে খেতে তোমাকে সব বলব—তুমি খাবার রেডি কর—আমি আসছি।

খাবারের টেবিলে বসে খেতে খেতে সুদর্শন সব বলে গেল।

কি তোমার মনে হয় সাবি?

কিসের কি?

ঐ সমীরণ দত্তই নিশ্চয় খুন করেছে?

আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

কেন ?

কি জানি। আমার মন যেন বলছে সমীরণ দত্ত বিজিতাকে খুন করেনি।

কিন্তু কেন—কেন তোমার ওকথা মনে হচ্ছে ?

জানি না, তবে মনে হচ্ছে—

তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।

সাবিত্রী সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, জান, ছোড়দা এসেছিল আজ।

অমলেন্দুবাবু ?

হ্যাঁ।

তোমার মা-বাবা কেমন আছেন ?

বাবার শরীরটা খুব খারাপ।

যাও না ওখানে গিয়ে কিছুদিন থেকে এস।

না।

না কেন ?

আমার লজ্জা করে।

লজ্জা কিসের তোমার—যা ঘটেছিল তার জন্য তো তুমি দায়ী নও—হলই বা মাধবী তোমার বোন।

সে আমার বোন বলেই তো যেতে পারি না।

তবে না হয় তোমার মা বাবাকে এখানে এনে কিছুদিন রাখ।

বাবা আসবেন না।

কেন ?

সে তুমি বুঝবে না।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, সুদর্শন টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।

সাবিত্রী যখন শুতে এল সুদর্শন নাক ডাকাচ্ছে। গভীরভাবে নিদ্রিত।

কয়েকটা মুহূর্ত সাবিত্রী গভীর মমতায় ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফ্যানের হাওয়ায় সুদর্শনের চুলগুলো উড়ে উড়ে তার চোখে-মুখে এসে পড়ছে।

মনে মনে স্বামীকে প্রণতি জানায় সাবিত্রী। তুমি আমাকে যে কি লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছ তুমি জান না। আশীর্বাদ কর আমাকে, যেন তোমার ভালবাসার যোগ্য হতে পারি আমি।

খুব ভোরেই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে, শেভ করে, চা পান করেই সুদর্শন লালবাজার চলে

গিয়েছিল।

অফিস-ঘরে ঢুকতেই একজন সার্জেন্ট এসে স্যালুট করে দাঁড়াল।

কি খবর বিশ্বনাথ ?

একটু আগে এখানে একটা ফোন এসেছিল।

ফোন ? কার ?

আপনার কাছেই এসেছিল ফোন-কলটা। তবে কে যে ফোন করেছিল জানি না। তবে কালকের সেই সি আই টি-র ফ্ল্যাট বাড়িতে আর একটা খুন হয়েছে।

খুন। সে কি ?

হ্যাঁ স্যার—বিকাশবাবু ফোন পেয়েই স্পটে চলে গিয়েছেন।

কিন্তু কে—কে খুন হয়েছে ?

তা জানি না, স্যার।

সুদর্শন আর দেরি করে না। তখুনি বের হয়ে পড়ে।

অকুস্থলে পৌঁছে দেখল নীচে ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে পুলিসের একটা কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে—চার-পাঁচজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে।

সুদর্শন তাদেরই একজনকে প্রশ্ন করে, বিকাশবাবু কোথায় ?

উপরে স্যার। দোতলা উঠতেই সিঁড়ির মাথায় একজন সার্জেন্টের সঙ্গে দেখা হল। সুদর্শন তাকেই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় খুন হয়েছে ?

তিনতলার ফ্ল্যাটে, স্যার।

তরতর করে সুদর্শন তিনতলায় উঠে যায়।

ছটো ফ্ল্যাট সিঁড়ির ল্যানডিংয়ের ছই দিকে।

একটার দরজায় তালা দেওয়া।

অন্য দরজাটা খোলা—তার সামনে একজন সেপাই দাঁড়িয়ে। দরজার গায়ে ইংরেজীতে নেমপ্লেটে লেখা—শ্রীগোপেন বসু, বি ই.।

ঘরে পা দিতেই চোখে পড়ল সুদর্শনের বীভৎস দৃশ্যটা।

বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে একটি ভদ্রলোক—মাথার চুল অনেকটা সাদা হয়ে গিয়েছে—সামনের দিকে টাক—পরনে স্লিপিং সুট, খালি পা—উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে দেহটা—কিছু দূরে একটা চশমা পড়ে আছে ও ছ-পাটি চপ্পল।

মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত।

বিকাশ মধ্যবয়সী ভৃত্যশ্রেণীর লোকটিকে নানা প্রশ্ন করছিল, আর লোকটা

কাঁদছিল।

সুদর্শনকে ঢুকতে দেখেই বিকাশ তাকে একটা স্যালুট করে, এই যে স্যার, এসে গেছেন। কাল রাত্রে কোন এক সময় ব্যাপার ঘটেছে মনে হচ্ছে।

গোপেন বসু?

হ্যাঁ স্যার—

ঐ লোকটা কে?

গোপেনবাবুর চাকর দাশু।

আর কেউ নেই বাড়িতে?

না, গোপেনবাবুর স্ত্রী দিনসাতেক হল মুর্শিদাবাদে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

বাড়িতে তাহলে আর কেউ ছিল না?

না স্যার, ঐ দাশু আর গোপেনবাবু।

॥ সাত ॥

সুদর্শন মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল।

নীচু হয়ে বসে মৃতদেহের সামনেটা উল্টে দিল সুদর্শন। বুকে ও পেটের ক্ষতস্থান দুটো চোখে পড়ল। পেটের খানিকটা ইনটেসটিন বের হয়ে এসেছে—দু'হাতের পাতায় রক্ত শুকিয়ে আছে। বুকের ক্ষতটাও প্রায় ইঞ্চি-দুই চওড়া।

চোখে-মুখে অসহ্য একটা বিস্ময় ও যন্ত্রণার চিহ্ন তখনো যেন স্পষ্ট।

সুদর্শনের বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রথমে হয়তো পেটে কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা হয়েছিল, তারপর বক্ষস্থলে দ্বিতীয় আঘাত করা হয়েছে।

মোক্ষম দুটি আঘাত।

হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে।

ভদ্রলোক চেঁচাবার বা লোক ডাকবারও সময় পাননি।

ঘরের ঠিক দরজার সামনেই অনেকটা রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। হয়তো ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছিলেন বা ঘুমোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ঐ সময় আততায়ী এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। ভদ্রলোক দরজার গায়ে ধাক্কা শুনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই আততায়ী সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অতর্কিতে প্রথমে তাঁর পেটে আঘাত করে, তারপর বুকে।

দেহে বাইগার মরটিস সেট-ইন করেছে।

ঘণ্টা ছয়-সাত আগেই হয়তো মৃত্যু হয়েছে।

নিষ্ঠুর নৃশংস বীভৎস হত্যা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা ব্যবধানে পর পর তিনটি বীভৎস হত্যা একই বাড়ির দুই ফ্ল্যাটে—উপরের ও নীচের ফ্ল্যাটে। হত্যা-পদ্ধতিও এক। কোন ধারালো তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে।

হঠাৎ মনে পড়ে সুদর্শনের, পূর্বে যে অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে সেটা পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এবারে যে অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে সেটি কোথায়?

সুদর্শন আবার উঠে দাঁড়াল।

ঠিক দোতলার ফ্ল্যাটের মতই উপরের তলার ঐ ফ্ল্যাটটিতেও ব্যবস্থা—তবে চারটি ঘর এবং দুটি বেডরুম।

প্রত্যেক ঘরেই দামী দামী আসবাব।

একটি শোবার ঘরে পাশাপাশি দুটি শয্যা—একটি রাত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। সেই ঘরে একটি গডরেজের আলমারি—তার পাশে একটি দামী ড্রেসিং টেবিল। সেই ঘরটি একেবারে কোণের ঘর—তার আগের ঘরে একটি সিঙ্গল বেড শয্যা।

সে শয্যাটি দেখলেই বোঝা যায় রাত্রে শয্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ ঘরটি বসবার ঘরের ঠিক পরের ঘর।

শেষোক্ত ঘরের মধ্যে একটি বুক-সেল্‌ফ—পাশে ইংরাজী ও বাংলা বই সাজানো।

সেল্‌ফের উপরে একটি ফটো। ফ্রেমে একটি ফ্যামিলি-ফটো। দেখলেই বোঝা যায় গোপেন বসুর ফ্যামিলির ফটো।

গোপেনবাবু, তাঁর পাশে মোটাসোটা মধ্যবয়সী একটি ভদ্রমহিলা, পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ে, আঠার-উনিশ বছরের একটি যুবক ও দশ থেকে বারো বছরের মধ্যে দুটি ফ্রক-পরা মেয়ে।

ব্যবহৃত শয্যার পাশে ছোট একটি ত্রিপায়ের উপর একটি টেবিল-ক্লক। এক প্যাকেট সিগারেট—একটা ম্যাচ ও ছাইভর্তি একটি কাচের অ্যাশট্রে ও একটা টেবিল ল্যাম্প।

ল্যাম্পটা তখনো জ্বলছিল।

বোতাম টিপে টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল সুদর্শন।

ঘরে দক্ষিণ কোণে একটি মাঝারি সাইজের রাইটিং-টেবিল।

কিছু ফাইলপত্র—একটা ঝর্ণা কলম। আর একটা চাবির রিং। রিংয়ের মধ্যে একগোছা চাবি। টেবিলটার পাশেই একটা স্টীলের আলমারি।

রাইটিং-টেবিলের ড্রয়ারগুলো ও আলমারিটা সেই রিংয়ের চাবির সাহায্যে একে একে খুলে দেখল সুদর্শন।

একটা ড্রয়ারের মধ্যে একটা কালো মোটামত ডাইরি পাওয়া গেল। ডাইরির পাতায় সব হিসাবপত্র।

সংসার ও অন্যান্য জমাখরচের হিসাব।

কিছু ঠিকানাও লেখা আছে।

সেই ঠিকানার মধ্যেই গোপেন বসুর শ্বশুরমশাইয়ের মুর্শিদাবাদের ঠিকানা পাওয়া গেল।

একটা চামড়ার পার্সও পাওয়া গেল—

একগোছা নোট পার্সটার মধ্যে। গুনে দেখল সুদর্শন প্রায় ন'শ টাকা। একশ ও দশ টাকার নোট।

ড্রয়ার বন্ধ করে আলমারিটা দেখতে লাগল চাবি দিয়ে খুলে সুদর্শন।

হ্যাঙারে কিছু সুট—গোটাকতক টাই, রুমাল ও ভাঁজকরা ধুতি ও স্লিপিং-সুট।

আলমারির ড্রয়ারে কিছু প্ল্যানের ব্লু-প্রিন্টও পাওয়া গেল।

আলমারিটা দেখা হয়ে গেলে সেটায় চাবি দিয়ে দিল সুদর্শন।

পাশের ঘরে গিয়ে গডরেজের আলমারিটা খুলবার চেষ্টা করল—কিন্তু খুলতে পারল না। চাবির রিংয়ের মধ্যে ঐ আলমারির চাবি নেই।

আবার বসবার ঘরে ফিরে এল সুদর্শন।

বিকাশ তখন একজন ভদ্রলোককে নানা প্রশ্ন করছিলেন।

ভদ্রলোকটির বেশ পেশীবহুল চেহারা। গায়ের রঙ কালো হলেও সুশ্রী, চোখ-মুখের গড়ন ও দু'চোখের দৃষ্টিতে বেশ একটা বুদ্ধিদীপ্তি আছে।

পরনে দামী সুট। হাতে জলন্ত একটা সিগারেট ধরা।

অল্প দূরে ম্লান বিষণ্ণমুখে দাশু দাঁড়িয়ে।

ইনি কে বিকাশ?

মিঃ স্বামীনাথন।

ইনি—

ঐ যে পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন।

তাই নাকি। তা একটু আগে দেখেছিলাম দরজায় তালা দেওয়া? সুদর্শন বললে।

স্বামীনাথনই জবাব দিল, হ্যাঁ, আমি এইমাত্র ফিরছি। কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম, এসে ট্যাক্সি থেকে নামতেই পুলিস দেখি। তাদের ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করতেই তো জানতে পারলাম।

কথায় কেমন যেন একটা অবাঙালী টান—এবং কথা বললে ইংরাজীতেই।

কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

কলকাতার বাইরে—বলে স্বামীনাথন।

কোথায়?

দেশে গিয়েছিলাম।

দেশে।

হ্যাঁ, ত্রিচিনাপল্লীতে।

আপনি—

আমি একজন সাউথ-ইণ্ডিয়ান।

এখানে কি করেন?

এখানে একটা ইলেকট্রিকাল গুডস্ ফ্যাক্টরীতে চাকরি নিয়ে এসেছি—সুপারভাইজিং অফিসারের পোস্টে।

কি নাম কোম্পানির?

রবিসন অ্যাণ্ড আটারা।

কতদিন এখানে আছেন?

কলকাতায়?

হ্যাঁ।

মাস-দুই হবে।

এই ফ্ল্যাটে কতদিন আছেন?

জাস্ট এ ফিউ ডেজ বলতে পারেন—দিন-দশেকও হবে না।

আপনার ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই?

না, এখনো আমার ফ্যামিলি এসে পৌঁছয়নি—সামনের মাসে আসার কথা তাদের।

তাহলে এখানে আপনি নিউ কামার?

কতকটা তাই বলতে পারেন।

গোপেন বসুকে আপনি চিনতেন ?

হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল সামান্য—কয়েকদিনের পরিচয়—হি ওয়াজ এ নাইস ম্যান, আই অ্যাম বাদার শকড টু হিয়ার দ্য নিউজ। হাউ স্যাড।

মণিশঙ্করবাবুকে চিনতেন ?

হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে—

ওঁর স্ত্রী তো আপনাদেরই দেশের মেয়ে।

হ্যাঁ।

তাঁকে চিনতেন ?

আগে চিনতাম না—পরে চেনা হয়েছিল।

ওঁদের সংবাদ কিছু জানেন ?

না তো। কিন্তু কেন ? তারা তো নীচের ফ্ল্যাটেই থাকেন।

গতকাল দুপুরে মণিশঙ্করবাবুর স্ত্রী ও মেয়েটি নিহত হয়েছে।

হোয়াট ? কি বললেন ?

হ্যাঁ, ব্রুটালি মার্ডারড।

বাট হাউ ?

সুদর্শন হেসে বলে, সেটা অবিশ্যি জানতে পারিনি এখনো।

এনিবডি অ্যারেস্টেড ?

না।

কেউ অ্যারেস্ট হননি ?

না।

খুনীকে তাহলে ধরতে পারলেন না ?

পারিনি এখনো, তবে ধরা সে পড়বেই।

উঃ, হাউ ফ্যানটাসটিক। একই বাড়িতে একই দিনে তিন-তিনটে মার্ডার। হাউ হরিবল। তা মিঃ বোসের ফ্যামিলিকে সংবাদটা দিয়েছেন ?

দেওয়া হবে বৈকি।

কুড আই ইনফর্ম দেম ?

না, পুলিসই দেবে ইনফরমেশান।

এত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার—এরপর এখানে থাকতে আমি আর এক ঘণ্টাও সাহস পাচ্ছি না—আই মাস্ট ইনফর্ম দি ল্যাণ্ডলর্ড, আজই আমি বাড়ি ছেড়ে দেব—এক্সকিউজ মি—মাথাটার মধ্যে আমার যেন কেমন ফীল করছি—কথাগুলো

বলে স্বামীনাথন আর দাঁড়াল না, স্খলিত পদবিক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুদর্শন ফিরে তাকাল দাশুর দিকে।

দাশু না তোর নাম?

আজ্ঞে দাশরথী ত।

বাড়ি কোথায়?

তমলুক।

বাবুর কাছে কতদিন কাজ করছিস?

আজ্ঞে হুজুর পনের বছর তো হবেই।

তুই কোন্ ঘরে রাত্রে ছিলি?

রান্নাঘরের পাশে ছোট ভাঁড়ার ঘরটা, তারই সামনে বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলাম। দোহাই হুজুরের, মা-বাপ—আমি কিছু জানি না, আমার দেবতার মত মুনিব—হায় হায়, এ কি হল ঈশ্বর—

বাড়িতে তোর কে কে আছে?

ছেলে মেয়ে পরিবার—সবাই আছে হুজুর।

কাল কত রাত্রে ঘুমিয়েছিলি?

বাবু দশটা নাগাদ খেয়ে নিতেই, আমিও খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

বাবু কাল অফিস থেকে কখন ফিরেছিলেন?

বাবু কাল অফিসেই যাননি—কেবল বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ একবার বের হয়েছিলেন, কিন্তু একটু পরেই ফিরে আসেন—আর বের হননি।

কাল নীচের তলায় যে খুন হয়েছে জানিস?

জা—জানি হুজুর।

জানিস?

হ্যাঁ, আমরা তো তখন উপরে যখন পুলিস আসে—আমি, বাবু—

তুই আর তোর বাবু তখন উপরেই ছিলি?

আজ্ঞে হুজুর। বাবু ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

কেন? ভয় পেয়েছিলেন কেন?

কে জানে হুজুর—দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে ছিলেন।

হুঁ। তা নীচে কাল দুপুরে কোন চিৎকার বা চেঁচামেচির শব্দ শুনেছিলি?

না বাবু।

সত্যি কথা বল্‌ ?

মা কালীর দিব্বি বাবু—কিছু শুনিনি।

তবে জানতে পারলি কি করে যে খুন হয়েছে নীচের ফ্ল্যাটে—পুলিস এসেছে ?

আজ্ঞে বাবু বললেন—

বাবু বললেন।

হঁ্যা, বাবু ঐ সময় আবার জামাকাপড় পরে কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন—সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পুলিস দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন।

তা খুন হয়েছেন নীচে জানলেন কি করে ?

তা জানি না বাবু—

তারপর কি হল ?

বাবু উপরে উঠে এসে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে জামাকাপড় খুলে ফেললেন।

দাশু।

আজ্ঞে হুজুর—

তুই নেশা-টেশা করিস কিছু ?

আজ্ঞে।

নেশা-টেশা করিস ?

আজ্ঞে এই যৎসামান্য—

তা কিসের নেশা করিস ?

দামী নেশা কোথায় পাব হুজুর—সামান্য একটু-আধটু বড় কলকে—

হুঁ। কাল বড় কলকে হয়েছিল ?

আজ্ঞে।

যা বলছি তার জবাব দে।

আজ্ঞে—

কাল একটু বেশী নেশা তোর হয়েছিল, তাই না ?

আজ্ঞে।

কখন বড় কলকে টেনেছিলি ? সন্ধ্যায় ?

আজ্ঞে না—বাবু তাহলে জেনে ফেলবেন—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর—

তারপর ?

তারপর তো কিছু জানি না হুজুর—

নীচের বাবুর সঙ্গে তোর আলাপ ছিল ?

তা ছিল বৈকি হুজুর।

তোর বাবুর ?

বাবুর। হ্যাঁ ছিল বৈকি।

নীচের চাকরটা—মানে ঐ শম্ভুকে চিনিস না ?

হ্যাঁ—একটি ঘুঘু, বয়েস ওর অনেক হুজুর। ও মিথ্যা বলে ওর বয়েস।

তাই নাকি ?

আজ্ঞে।

॥ আট ॥

তা বুঝলি কি করে শম্ভু একটি ঘুঘু ? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

ও আমরা দেখলেই চিনতে পারি—দাশু বললে।

হুঁ। তা তুই আজ কখন জানতে পারিস যে তোর বাবু খুন হয়েছেন ?

বাবুর ঘুম ভাঙার পরই এক কাপ চায়ের দরকার হয়, সেই চা নিয়ে তার ঘরে ঢুকে দেখি—শোবার ঘরে বাবু নেই, তখন ভাবলাম বাবু বোধ হয় বাথরুমে, কিন্তু কেউ নেই—ঐ সময় দুধওয়ালা দুধ নিয়ে আসে—কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলে দিতে গিয়েই দেখি—

সদর দরজা খোলা ছিল, না বন্ধ ?

আজ্ঞে, বন্ধ।

ভিতর থেকে খিল দেওয়া ছিল ?

না।

বিকাশ ঐ সময় বলে, দরজার গডরেজের অটোমেটিক ডোরলক্ লাগানো স্যার।

তাই নাকি।

হ্যাঁ স্যার, আমার মনে হয় হত্যাকারী হত্যা করার পর বাইরে থেকে দরজাটা টেনে হয়তো আবার লক করে দিয়ে গিয়েছিল। বিকাশ বললে।

তারপর তুই কি করলি দাশু ?

আজ্ঞে প্রথমটায় কি করব বুঝতে পারিনি, তারপর দোতলায় ছুটে গিয়ে যে সেপাইজী পাহারায় ছিল তাকে ডেকে আনি।

লালবাজারে কে খবর দিয়েছিল বিকাশ ?

করণ সিং—

সে-ই তো কাল নীচের ফ্ল্যাটের সামনে পাহারায় ছিল ?

হ্যাঁ স্যার—

সে কোন শব্দ-টব্দ উপরে শোনেনি ?

না স্যার।

আরো আধঘণ্টা পরে সুদর্শন ফিরে এল লালবাজারে, বিকাশের উপরেই বাকি কাজের ভার দিয়ে। নিজের ঘরে ঢুকেই একজন সার্জেণ্টকে বললে সমীরণকে তার অফিস-কামরায় নিয়ে আসবার জন্য। একটু পরে সমীরণ সার্জেণ্টের সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল।

এক রাত্রেই তার চেহারা যেন অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।

চোখ-মুখ শুকনো—সমস্ত মুখে যেন একটা ক্লান্তি ও অবসন্নতা।

বসুন সমীরণবাবু।

সমীরণ বসল সুদর্শনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

চা বোধ হয় খাননি—বলে সুদর্শন একজন সেপাইকে ডেকে সমীরণকে চা দেবার জন্য বললে।

কাল ঘুমোতে পারেন নি মনে হচ্ছে।

সুদর্শনের প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না সমীরণ।

সমীরণবাবু।

সমীরণ মুখ তুলে তাকাল।

বিজিতা দেবীকে আপনি তো অনেক দিন থেকেই চিনতেন ?

চিনতাম।

আপনি তাঁকে ভালোবাসতেন, তাই না ?

সমীরণ মাথাটা নীচু করল, তারপর মৃদু গলায় বললে, সে সব কথায় আজ আর কাজ কি মিঃ মল্লিক।

বুঝতে পারছি ভালবাসতেন। আর এও বুঝেছি সত্যিই কত গভীর ভালবাসা ছিল তাঁর প্রতি আপনার। আশ্চর্য, তা ভালই যদি বাসতেন তো তাঁকে বিয়ে করলেন না কেন ?

বিজিতা—

বলুন ?

কিন্তু সে-সব কথা শুনে আপনার কি লাভ মিঃ মল্লিক।

বিজিতা দেবীর হত্যাকারীকে ধরতে হলে তাঁর সম্পর্কে সব কথাই জানা প্রয়োজন আমাদের সমীরণবাবু। আপনিও নিশ্চয়ই চান তাঁর হত্যাকারী ধরা পড়ুক—

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ মল্লিক, সমীরণ সুদর্শনের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল, তার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে, বিজিতাকে আমি হত্যা করিনি।

ও কথা থাক। আপনি মধ্যে মধ্যে ওঁদের ওখানে যেতেন?

আগে আগে যেতাম—তবে ইদানী কয়েক মাস যাইনি।

কেন?

মণি পছন্দ করত না জানতে পেরেই যাওয়া বন্ধ করেছিলাম।

মণিবাবু কিছু আপনাদের কোনদিন বলে ছিলেন?

না।

তবে আপনি বুঝতে পারলেন কি করে?

বুঝতে পেরেছিলাম—

কি করে?

ঐ সময় একজন বেয়ারা এক কাপ চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল।

চা-টা খেয়ে নিন।

চায়ের পিপাসা আমার নেই।

তবু খান না। সকালবেলাতে চা খাননি। নিন, কাপটা তুলে নিন।

সমীরণ কাপটা হাতে নিয়ে একটা ছোট চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা আবার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে দিল।

খেলেন না?

ভাল লাগছে না।

তবে থাক। যা বলছিলাম—মণিবাবু আপনার যাওয়াটা পছন্দ করতেন না তা জানতে পারলেন কি করে?

বিজিতা আমাকে একটা চিঠিতে জানিয়েছিল।

বিজিতা দেবী মধ্যে মধ্যে আপনাকে বুঝি চিঠি লিখতেন?

না।

কি লিখেছিলেন চিঠিতে বিজিতা দেবী আপনাকে?

মণি পছন্দ করে না আমার যাওয়া-আসাটা তাই—অথচ কেন যে ও সন্দেহ করত

বিজিতাকে আজও আমি ভেবে পাইনি মিঃ মল্লিক।

ওকথা বলছেন কেন?

কারণ বিজিতার সমস্ত মন জুড়ে ছিল মণিই। সেখানে কারো স্থান ছিল না। শী ওয়াজ সো সুইট—সো টেনডার—বলতে বলতে আবার সমীরণের গলাটা বুজে এল। দু চোখে জল ভরে উঠল।

শেষ আপনি কবে তাঁদের ওখানে গিয়েছিলেন?

গতকাল।

কাল গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কখন? কখন গিয়েছিলেন?

বেলা তখন পৌনে একটা হবে।

ওঃ, তা দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?

না।

দেখা হয়নি?

না—গিয়ে দেখি সদর দরজা বন্ধ।

বন্ধ।

হ্যাঁ—বার বার কলিংবেল টিপলাম। বিজিতার নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু—

কি?

সে দরজা খুলল না।

তারপর?

ফিরে এলাম। অথচ—

কি?

শম্ভুর হাত দিয়ে চিঠি লিখে বিজিতা আমাকে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে ডেকে পাঠিয়েছিল।

চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি আপনাকে?

হ্যাঁ।

কি লিখেছিলেন সে চিঠিতে?

বিশেষ কারণে সে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

তারপর?

আমি অবিশ্যি একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। চিঠি লিখে ডেকে পাঠাল অথচ

দেখা করল না। ফিরে এলাম আমি বাসায়।

কখন ফিরেছিলেন বাসায় ?

বেলা তিনটে নাগাদ হবে।

তবে যে কাল বলেছিলেন—

মিথ্যা বলেছি—কাল আমার কোন রিহার্শেল ছিল না।

হুঁ। বলুন, তারপর ?

বাসায় ফিরে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি বিছানার উপর সেই স্যুটকেসটা পড়ে আছে—কয়েকটা চাবি দিয়ে স্যুটকেসটা খোলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন চাবির সাহায্যেই স্যুটকেসটা খুলতে পারলাম না।

আপনি স্যুটকেসটা খুলতে চেষ্টা করেছিলেন তাহলে ?

হ্যাঁ।

তারপর ?

কেমন যেন একটা ভয় ভূতের মত আমাকে পেয়ে বসেছিল ঐ সময়।

ভয়।

হ্যাঁ—আর সেই ভয়টা আরো চেপে বসল যে মুহূর্তে আমি টেলিফোনটা পেলাম। এর টেলিফোনটা পাওয়ার পর—

হঠাৎ যেন সমীরণ আবার থেমে গেল।

তারপর ? বলুন, থামলেন কেন ?

ভয়টা ক্রমশ:ই যেন কেমন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্যুটকেসটা দূরে কোথাও ফেলে আসবার জন্য আমি সেটা নিয়ে বের হয়ে পড়ি। আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না মিঃ মল্লিক ?

সুদর্শন কি যেন ভাবছিল। সমীরণের কথার কোন জবাব দিল না।

আচ্ছা সমীরণবাবু।

সুদর্শনের ডাকে সমীরণ মুখ তুলে তাকাল।

যাকে আপনি অত ভালবাসতেন সে সুখী হতে পারেনি জেনে নিশ্চয়ই মনটা আপনার খারাপ হয়ে গিয়েছিল ?

হয়েছিল। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি।

আপনি মণিশঙ্করবাবুকে আলাদা করে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন না কেন ?

না। করিনি।

কেন ?

মণি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করত না। তাছাড়া কে জানে ব্যাপারটা আরো বিশ্রী হয়ে দাঁড়াত না।—তাই ওদের কাছ থেকে দূরেই সরে গিয়েছিলাম।

ঠিক আছে সমীরণবাবু, আপাততঃ আপনি যেমন আছেন তেমনি এখানেই থাকুন। সুদর্শন বলতে বলতে বেল বাজাল বোতাম টিপে।

একজন সেপাই এসে সেলাম দিল।

সার্জেণ্ট চক্রবর্তীকে ডাক।

একটু পরেই সার্জেণ্ট চক্রবর্তী এল, স্যার আমাকে ডেকেছেন ?

হ্যাঁ, এঁকে নিয়ে যান। যে ঘরে উনি ছিলেন সেখানেই রাখুন।

সমীরণ উঠে দাঁড়াল।

সুদর্শন একটা সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান করতে করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

সমীরণ দত্ত একটু আগে যা বলে গেল তা কি সত্যি ? না বানিয়ে বানিয়ে সব-কিছু বলে গেল ?

ঐদিনকার সংবাদপত্রটা টেবিলের উপর পড়ে ছিল—তাই কালকের সি আই. টি র ফ্ল্যাট-বাড়িতে হত্যার ব্যাপারটা প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছে নজরে পড়ল সুদর্শনের।

সি আই টি র ফ্ল্যাটে নৃশংস জোড়া খুন দিনের বেলা।

মা ও মেয়ে খুন হয়েছে।

আততায়ীকে পুলিস এখনো সন্ধান করতে পারে নি।

পরের দিন সকালে।

সুদর্শন ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কিরীটীকে ডায়াল করল।

কে ?

দাদা আমি সুদর্শন।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে কিরীটীর গলা শোনা গেল--কি খবর ?

দাদা, সেই ফ্ল্যাটে আর একটা খুন হয়েছে, শুনেছেন তো ?

গোপেন বসু নিহত ?

হ্যাঁ।

জেনেছি। ভাবছিলাম তুমি আমায় সংবাদটা দেবে। মনে হচ্ছে একই ভাবে খুন হয়েছে, তাই না ?

হ্যাঁ, ঠিক একই ভাবে খুন হয়েছে—সুদর্শন সমস্ত ঘটনাটা ফোনেই বিবৃত করে গেল।

সব শুনে কিরীটী বললে, আমি জানতাম এমনিই একটা কিছু ঘটবে—

আপনি জানতেন?

হ্যাঁ, মনই আমার বলেছিল—তাই তোমাকে গতকাল সকালেই ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে বলেছিলাম। কিন্তু ভাবতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটে যাবে—

আমিও ভাবতে পারি নি দাদা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওখানে আরো একটা খুন হবে। সব যেন কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে—

শোন, এক কাজ কর সুদর্শন।

বলুন?

কালিকা বোর্ডিংয়ে পুলিস-পাহারা আছে তো?

হ্যাঁ আছে।

মণিশঙ্করবাবুকে লোক পাঠিয়ে লালবাজারে নিয়ে এস।

এখুনি আনাচ্ছি।

আরো একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

কি?

স্বামীনাথনকে লালবাজারে নিয়ে এস।

স্বামীনাথনকে! আপনি কি তাকেও সন্দেহ করছেন?

ঐ ধরনের হত্যার ব্যাপারে আশেপাশে যারাই থাকে কেউ সন্দেহের তালিকার বাইরে যেতে পারে না সুদর্শন। তাছাড়া কয়েকটা কথাও তার কাছ থেকে আমাদের জানা দরকার।

বেশ—যা বললেন তাই করছি—কিন্তু তারপর?

একটু খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যদি কালকের দিনটা আমি নষ্ট না করতাম তবে হয়তো মি. বোসকে অমন করে প্রাণ দিতে হত না। যাক—যা বললাম তাই কর, ওদের দুজনকেই আমাদের প্রয়োজন—তাছাড়া ওরা—

ওরা কি?

ওরা দুজনের একজনও সব সত্য কথা বলেনি।

মণিশঙ্কর যে বলেনি তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু স্বামীনাথন—

একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ভায়া—বিজিতা মণিশঙ্করের স্ত্রী ছিল, দক্ষিণ দেশের মেয়ে—আর স্বামীনাথন সেই দেশেরই লোক। এবং ঐ ফ্ল্যাটেই এসে

স্বামীনাথন উঠেছিল। দুজনের পরস্পরের মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র থাকা এমন কিছুই বিচিত্র নয়।

আপনি কি তাহলে—

এর মধ্যে আর সন্দেহের কি ভায়া—হয়তো খোঁজ করতে গেলে এমনও দেখতে পাব ওদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় তো বটেই আত্মীয়তাও ছিল হয়তো।

হঠাৎ ওই সময় সুদর্শন বলে, আপনি একবার আসবেন দাদা?

কেন বল তো।

জিজ্ঞাসাবাদ যা করতে হয় আপনিই করবেন ওদের।

কেন? সবই তো তোমাকে বলে দিলাম, এবারে তুমিই জিজ্ঞাসাবাদ কর না।

তা পারি, কিন্তু আপনার মনের মধ্যে ওদের ঘিরে কোন্ প্রশ্নের উদয় হয়েছে সেটা তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়—শুধু আমার পক্ষেই বা বলি কেন, স্বয়ং ঈশ্বরও হয়তো জানেন না।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে হো-হো করে গলা খুলে হেসে ওঠে কিরীটী।

না না—হাসি নয় দাদা। আসুন –

আসতেই হবে?

হ্যাঁ।

বেশ, আসছি—

দেরি করবেন না যেন—

না, না—দেরি হবে না।

।। নয় ।।

সুদর্শন বুঝতে পেরেছিল বর্তমান রহস্যের ব্যাপারে সে অন্ধকারে হাতড়ে ফিরলেও কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে কোন একটা কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই।

রহস্যের ব্যাপারে তার বিশেষ অনুভূতিটা কোন একটা পথ খুঁজে পেয়েছে।

সুদর্শন তাই আর দেরি করে না।

দুটো ভ্যানে দুজন পুলিস অফিসার তখুনি পাঠিয়ে দেয় মণিশঙ্কর ও স্বামীনাথনকে আনবার জন্য।

এক ঘণ্টার মধ্যেই দুজনকে নিয়ে পুলিস অফিসার দুজন লালবাজারে পৌঁছে গেল। কিন্তু তার আগেই কিরীটি পৌঁছে গিয়েছিল।

কি হল, এলেন তোমার সম্মানিত অতিথিরা ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আনতে গেছে, বসুন—

দুজনকে কিন্তু আলাদা ঘরে রাখবে।

আলাদা !

হ্যাঁ, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করব—কেউ যেন কাউকে না দেখতে পায়।

বেশ তাই হবে।

সমীরণবাবুকেও প্রয়োজন হবে।

তাকে এ ঘরে আনাব ?

না—এখন না, সময় হলে বলব।

সুদর্শন সেই মতই ব্যবস্থা করে।

প্রথমেই সুদর্শন কিরীটীর নির্দেশানুযায়ী মণিশঙ্করকে ডেকে পাঠাল।

মণিশঙ্কর ঘরে ঢুকেই বললে, কি ব্যাপার—এভাবে এখানে হঠাৎ পাকড়াও করে নিয়ে এলেন ?

সুদর্শন নয়—জবাব দিল কিরীটী, বসুন মি. ঘোষাল। আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

মণিশঙ্কর চেয়ারটা টেনে নিয়ে বলল, বলুন শুনি।

আমরা জানতে পেরেছি—ইদানীং বেশ কিছুদিন ধরেই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মনকষাকষি চলছিল, কথাটা কি সত্যি ?

মূল্যবান এ খবরটি কার কাছ থেকে পেলেন ?

যেখান থেকেই পাই না কেন, কথাটা মিথ্যে নিশ্চয়ই আপনি বলতে পারবেন না।

কেন বলতে পারব না—একশোবার বলব মিথ্যে।

মিথ্যে ?

হ্যাঁ, যে বলেছে সে সম্পূর্ণ মিথ্যাই বলেছে। We never had any mis-understanding or quarrel।

কিরীটী এবারে প্রশ্ন করে, বেশ, বেশ। আপনার স্ত্রীকে আপনি খুব ভালবাসতেন নিশ্চয়ই ?

আপনি বোধ হয় জানেন না, আমাদের লাভ-ম্যারেজ।

জানি—আর এ-ও জানি অনেক ভালবাসার বিয়েতেই অনেক সময় চিড় ধরে, ধরছে হামেশাই—

আমাদের সেরকম কিছু হয়নি।

ইদানীং আপনার, মানে আপনার বন্ধু সমীরণবাবুকে ঘিরে আপনার স্ত্রীর প্রতি একটা সন্দেহের ধোঁয়া সৃষ্টি হয়নি আপনি বলতে চান ?

সমীরণ আমার বন্ধু—অত ছোট মন আমার নয়।

তবে সমীরণবাবু ইদানীং আপনার ফ্ল্যাটে আর যেতেন না কেন ? আগে আগে তো খুব যাওয়া-আসা ছিল।

তা আমি কেমন করে বলব ?

আপনি কিছুই জানেন না ?

না।

ওঃ, ভাল কথা কাল ও পরশু রাত্রে আপনার বেশ ভাল ঘুম হয়েছিল নিশ্চয়ই ?

ঘুম ! হঠাৎ যেন কেমন থতিয়ে যায় মণিশঙ্কর।

হ্যাঁ। ঘুম। শুনলাম আপনি দুই রাত্রিই বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছেন। কি, জবাব দিচ্ছেন না কেন ? ঘুমোননি ?

আমার কি ঘুমোবার মত মনের অবস্থা ?

তবু বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছেন বলেই খবর পেয়েছি।

দেখুন আপনার প্রশ্নের মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

ভালবেসে যাকে বিয়ে করলেন—আর যে নিজের সন্তান কয়েক ঘণ্টা আগে মাত্র নৃশংসভাবে খুন হয়েছে সে দৃশ্য দেখার পরও ঘুমের ব্যাঘাত আপনার ঘটল না রাত্রে—আপনার ভালবাসারই অকাট্য প্রমাণ বটে।

ব্যঙ্গের মত যেন শোনাল কিরীটীর কণ্ঠস্বর।

মণিশঙ্কর কোন জবাব দেয় না। কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

বেশ, এবারে বলুন পরশু আপনার জবানবন্দিতে দু-দুটো মারাত্মক মিথ্যা কথা কেন বলেছেন ?

মিথ্যা কথা বলেছি !

হ্যাঁ—প্রথমত যে চাবিটা আপনার স্ত্রীর আঁচলে থাকার কথা সেটা আপনার পকেটে এল কি করে ?

ওটা তো ডুপ্লিকেট চাবি।

মিথ্যা কথা।

না, মিথ্যা নয়—তার কারণ—

আপনার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, হত্যার দিন অর্থাৎ পরশু দুপুরে আপনি যখন ফ্ল্যাটে

আসেন তখুনি কোন এক সময় আপনার স্ত্রীর আঁচল থেকে আপনি চাবির রিংটা খুলে নিয়েছিলেন।

কি করে বুঝলেন?

যা সত্য তাই বলছি—

বেশ, কেন—কেন আমি তার আঁচল থেকে চাবির রিংটা খুলে নেব?

কারণ হত্যা-ব্যাপারটার সঙ্গে একটা বার্গলারিও জড়িয়ে আছে, সেটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা ও ইচ্ছা ছিল আপনার।

আ—আমি—

তারপর আপনি বলেছেন, বেলা দুটো বেজে দশ মিনিটের সময় আপনি ফোন পেয়ে অফিস থেকে ছুটে যান ট্যাক্সি নিয়ে বাড়িতে—

বলেছি তো।

তাও মিথ্যা।

মিথ্যা?

হ্যাঁ, তার আগেই একবার আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন—বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে।

আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঐ সময় আমি অফিসে কাজ করছিলাম—

বের হননি আপনি অফিস থেকে একবার গত পরশু বেলা এগারোটা নাগাদ বলতে চান?

কিরীটীর প্রশ্নটা এত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ যে মণিশঙ্করকে যেন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য কেমন থমকে দেয়।

হ্যাঁ—বের হয়েছিলাম— মৃদু গলায় জবাব দেয় মণিশঙ্কর, গোটা এগারোর সময়।

কখন ফিরেছিলেন আবার?

বেলা বারোটা নাগাদ।

না, তার অনেক পরে আপনি ফিরেছেন—বেলা দেড়টায়।

মোটেই নয়—আমি অফিসেই ছিলাম।

না, ঐ সময়টা আপনি অফিসে ছিলেন না।

ছিলাম না। বুঝলেন কি করে?

বুঝেছি কারণ তার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। এবারে বলুন কোথায় গিয়েছিলেন ঐ সময় আর কেনই বা ফিরতে আপনার অত দেরি হল?

অফিসের কাজে—মানে অফিসের একটা কাজে আমায় একটু বেরুতে হয়েছিল,

মাদ্রাজে একটা অফিসে চাকরি করতাম।

বিজিতা দেবী শান্তিনিকেতনে চলে আসার পর আপনাদের পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের দেওয়া-নেওয়া ছিল?

ছিল।

মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন?

গিয়েছি, দুবার।

সমীরণ দত্ত—বিখ্যাত গাইয়েকে আপনি চেনেন?

চিনি।

আপনি বিজিতা দেবীকে ভালবাসতেন—তাই না?

স্বামীনাথন মাথাটা নীচু করে।

বলুন, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। ভালবাসার মধ্যে কোন অপরাধ নেই।

স্বামীনাথন তবু কোন জবাব দেয় না।

কিরীটীর হঠাৎ নজরে পড়ল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মণিশঙ্কর ঘোষাল স্বামীনাথনের মুখের দিকে।

বলুন। কিরীটী আবার বলে।

বাসতাম—কিন্তু—, থেমে গেল স্বামীনাথন।

কি, থামলেন কেন, বলুন?

যেদিন জানতে পেরেছিলাম মণিশঙ্করকে সে ভালবাসে, সেইদিন থেকেই নিজেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

তাই যদি হবে তো ঐ একই ফ্ল্যাটে অত কাছাকাছি আবার এসে উঠেছিলেন কেন মিঃ স্বামীনাথন? কিরীটী প্রশ্নটা করে ওর মুখের দিকে তাকাল।

আজ বুঝতে পারছি ভুল করেছি।

ভুল?

তাই। হয়তো আমি ওইভাবে এখানে এসে না উঠলে তাকে আজ অমন পৈশাচিক নৃশংস মৃত্যু বরণ করতে হত না।

মিঃ স্বামীনাথন, গত পরশু বেলা দশটা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন? কিরীটী এবারে প্রশ্ন করল।

আগেই তো বলেছি, আমি পরশু কলকাতার বাইরে ছিলাম। স্বামীনাথন বললে।

কিন্তু আমি যদি বলি আপনি মিথ্যে বলছেন!

মিথ্যে ?

হ্যাঁ ওই সময়টা আপনি আপনার ফ্ল্যাটেই ছিলেন।

না না—আই ওয়াজ আউট অফ ক্যালকাটা।

ন —ষ্টান ইউ আর ডিনাই· দি ফ্যাক্টস। এখনো সত্য বলুন।

আ—আমি আগের দিনই সকালে বের হয়ে যাই—

হয়তো গিয়েছিলেন, তবে আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় পরশু আবার ফিরে এসেছিলেন। দেখুন মি স্বামীনাথন, হাজারটা মিথ্যা দিয়েও একটা নিষ্ঠুর সত্যকে আপনি চাপা দিতে পারবেন না। পুলিসের পক্ষে জানা অসম্ভব হবে না। সত্যিই ওই সময়টায় আপনি কোথায় ছিলেন, আজ বা কাল তারা সেটা জানতে পারবেই। হত্যাকারী যে-সময় বিজিতা দেবী ... হত্যা করে বের হয়ে যায়, আপনি তাকে সিঁড়িতে দেখেছিলেন, তাই ... থাকবেন না, বলুন—speak out।

হ্যাঁ, একজনকে আমি দেখেছি।

তাহলে পরশু ওই সময়টাতে আপনি ফ্ল্যাটেই ছিলেন ?

না।

ছিলেন না ?

না, আমি পৌনে একটা নাগাদ ফিরে এসে যখন সিঁড়ি ... উঠছি তখন একজনকে দ্রুত আমার পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি ... দেখেছিলাম।

কে সে ?

ঠিক চিনতে পারিনি।

তার পরনে কি ছিল ?

স্যুট পরা ছিল।

লম্বা না বেঁটে ?

লম্বাই হবে সে।

সত্যিই তাকে আপনি চিনতে পারেন নি ?

না।

॥ দশ ॥

কিরীটী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বললে এবার সমীরণ দত্তকে নিয়ে এস, সুদর্শন।

সুদর্শন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এবং একটু পরেই সমীরণকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

মি· স্বামীনাথন!

স্বামীনাথন কিরীটীর ডাকে ওর দিকে মুখ তুলে তাকান।

এঁকে চেনেন আপনি? সমীরণকে দেখিয়ে বললে।

না।

সমীরণবাবু?

সমীরণ তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

স্বামীনাথনকে দেখিয়ে কিরীটী প্রশ্ন করল, এঁকে আপনি চেনেন সমীরণবাবু?

না, চিনি না।

কখনো দেখেননি আগে?

না।

কোন দিন উনি শান্তিনিকেতনে যাননি, যখন আপনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন?

দেখিনি যেতে।

বিজিতা দেবীর মুখে কখনো ওঁর কথা শোনেননি?

না।

ভাল করে ভেবে বলুন! সত্যিই কখনো ওঁকে আপনি দেখেননি?

সমীরণ চুপ করে থাকে।

কিন্তু আমার ধারণা ওঁকে আপনি দেখেছেন আগে—

ঠিক মনে পড়ছে না—তবে—

বলুন?

একবার যেন মনে হচ্ছে দেখেছিলাম।

কবে?

মাসখানেক আগে।

কোথায়?

বিজিতাকে আমার ফ্ল্যাট উনি ওঁর গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

গাড়ি।

হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কিরীটীর চোখের মণি দুটো যেন ঝকঝক করে ওঠে, বলে, কিরকম গাড়ি? কি রং ছিল গাড়িটার?

বোধ হয় একটা কালো রংয়ের অ্যামবাসাডার।

কালো রংয়ের অ্যামবাসাডার! মিঃ স্বামীনাথন, আপনার গাড়ি আছে?

অফিস থেকে ব্যবহারের জন্য আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছে।

গত পরশু তাহলে দুপুরে সেই গাড়িতে করেই আপনি সি আই টি রোডে গিয়েছিলেন?

না। গাড়ি গত পরশু আমি ব্যবহার করিনি।

তবে কিসে গিয়েছিলেন?

ট্যাক্সিতে।

আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।

মিথ্যা আমি বলছি না—কিছুদিন ধরেই রিপেয়ারের জন্য গাড়িটা গ্যারেজে আছে।

কোন গ্যারেজে?

নিউ অটোমোবাইলস গ্যারেজে।

কিরীটী এবারে ফিরে তাকাল সুদর্শনের দিকে, ঐ গ্যারেজে ফোন করে একটা খোঁজ নাও তো গাড়িটা সম্পর্কে।

সুদর্শন ফোন করল।

কি বললেন? গাড়িটা পরশুই ডেলিভারি হয়ে গিয়েছে। আই সি, আচ্ছা ধন্যবাদ।

দাদা, ওরা বলল গাড়িটা নাকি পরশুই সকালে ডেলিভারি দিয়ে দিয়েছে।

মিঃ স্বামীনাথন? কিরীটী তাকাল স্বামীনাথনের দিকে।

হতে পারে—অফিস হয়তো ডেলিভারি নিয়েছে—আমি জানি না।

কিরীটীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—ও চেয়ে আছে স্বামীনাথনের মুখের দিকে।

মিস্টার স্বামীনাথন, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে।

কেন বলুন তো?

বিজিতা দেবী ও তাঁর শিশুসন্তান এবং মি. বোসকে হত্যা করার অপরাধে।

কি পাগলের মত যা-তা বলছেন!

আমরা যে পাগলের মত যা-তা কিছু বলছি না—আদালতে সেটা প্রমাণ করতে পারব আমরা। সুদর্শন, ওঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও।

সুদর্শন স্বামীনাথনকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

কথাটা বলেই কিরীটী সমীরণের দিকে তাকাল, সমীরণবাবু, এবারে বলুন—বিজিতা দেবীর চিঠি পাওয়ার পর সেখানে গিয়ে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে আপনি যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন—কাউকেই আপনি দেখেননি?

সমীরণ চুপ।

চুপ করে থাকবেন না, বলুন। আই অ্যাম সিওর, ইউ মেট্ সাম ওয়ান—

সমীরণ তথাপি চুপ।

ইউ মেট্ সাম ওয়ান্ অ্যাণ্ড ইট ওয়াজ—আমি বলছি আপনি দেখেছিলেন মিঃ ঘোষালকে। ডিড'নট ইউ। বলুন—স্পীক আউট দি ট্রুথ।

হ্যাঁ—দেখেছি, কিন্তু একটা সুটকেস হাতে উনি এত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন যে আমাকে হয়তো ভাল করে নজরই করেননি।

তাহলে সুটকেসটা তখন মিঃ ঘোষালের হাতে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ।

হোয়াই ডিডন'ট ইউ টেল দি ট্রুথ দেন?

আমি—

বলুন?

আমি ভেবেছিলাম মণিশঙ্করই হয়তো হত্যা করেছে—

কাকে?

বিজিতাকে।

আপনি তো তখনো জানেন না যে বিজিতা দেবী নিহত? আপনি তাহলে মিথ্যা বলেছেন? ঘরের দরজা বন্ধ দেখে এবং দরজা থেকে ডাকা সত্ত্বেও খুলল না দেখে যে ফিরে এসেছেন—সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা?

হ্যাঁ।

বলুন তাহলে কি দেখেছিলেন?

মণিশঙ্করের ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলাই ছিল—খোলা দরজার পাশেই সামনে দাঁড়াতেই মৃতদেহ দুটো রক্তে ভাসছে আমি দেখতে পেয়েছিলাম—

তারপর?

আমার ধারণা হয়েছিল মণিশঙ্করই—

তার স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করেছে?

হ্যাঁ।

তারপর?

দরজাটা টেনে দিয়ে লক করে আমি চলে আসি।

কিরীটী এবারে মণিশঙ্করের দিকে তাকাল, মণিশঙ্করবাবু, এবারে আপনি বলুন, যা সত্যি গতকাল ঘটেছিল—সব কথা।

আমি তো ঘরের মধ্যে ঢুকে—

দেখতে পান আপনার স্ত্রী ও কন্যা মৃত—রক্তে ভাসছে মেঝেতে, তাই না?

হ্যাঁ। মাথা ঘুরে গেল আমার—

মণিশঙ্করবাবু, আপনি খুব উঁচুদরের অভিনেতা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমরাও কিছু কিছু নাটক সৃষ্টি করতে যেমন জানি তেমনি অভিনয়ও করতে জানি।

কি বললেন?

নাটক আর অভিনয়ের কথা—

আমি ঠিক—

বুঝতে পারছেন না আমার কথাগুলো, তাই না?

হ্যাঁ, মানে—

বুঝতে পারবেন যখন ফাঁসির দড়িটা গলায় এঁটে বসবে।

ফাঁসি!

হ্যাঁ, ডায়াবলিক্যাল মার্ডার কেসে আসামীদের জন্য ইনডিয়ান পেনাল কোডের পাতায় যে শাস্তির বিধান লেখা আছে সেটা হচ্ছে টু বি হ্যাংড বাই নেক টিল ডেথ—ফাঁসি—ভাবছেন নিশ্চয়ই তবে এতক্ষণ কি শুনলাম—কি দেখলাম—

আমি—

হ্যাঁ, আপনি যেমন দেখেছেন শুনেছেন—তেমনি আমারও আপনার মনের ঐ মুহূর্তের কথাটা না শুনতে পেলেও আপনার দু চোখে যে উল্লাসের দৃষ্টি দেখেছি—স্বামীনাথনকে অ্যারেস্ট করবার সময় মার্ডার চার্জে, সেটা আমার কাছে নিষ্ঠুর সত্যকেই উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে—আর আমার অভিনয়টুকুও সেইজন্যেই করা—কিন্তু এখন আপনি বুঝতে পারছেন—হোয়াট এ ব্লাণ্ডার ইউ হ্যাভ ডান—কত বড় ভুল আপনি করেছেন।

মণিশঙ্কর ঘোষাল যেন একেবারে পাথর।

কিরীটী বলতে থাকে—যে ভিন্ন প্রদেশের মেয়েটি ভালবেসে আপনার হাতে

সর্বস্ব তুলে দিয়েছিল, যার ভালবাসার মধ্যে এতটুকু খাদ ছিল না, তাকে এবং সেইসঙ্গে আপনার নিজের ঔরসজাত সন্তানকে হত্যা করলেন কি করে? একটি বারের জন্যে হাত আপনার কাঁপল না?

না, কাঁপেনি—হঠাৎ মণিশঙ্কর বলে ওঠে, সী ওয়াজ এ হারলট—বিশ্বাসঘাতিনী, আর ঐ সন্তানও আমার নয়, সমীরণের—আমি জানি, আমি জানি—ঠিক সমীরণের গায়ের রঙ—ঠিক ওরই মত চোখ-মুখ—

মণিশঙ্কর।

অস্ফুট কণ্ঠে যেন আর্তনাদ করে ওঠে সমীরণ হঠাৎ।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি—তুমিই, আমার ঘরে আগুন জেলে দিয়েছ সমীরণ—তোমার জন্য বিজিতা কোন দিনই আমাকে ভালবাসতে পারেনি—আমার বুকে মাথা রেখে সে তোমারই কথা ভেবেছে—

না, না—মণি, না—আমি—

দিনের পর দিন তুমি তাকে চিঠি লিখেছ—আমার মানা সত্ত্বেও সে লুকিয়ে তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছে তোমার ফ্ল্যাটে—বল, বল সমীরণ সেও মিথ্যে—সেও ভুল।

ভুল—হ্যাঁ, ভুল তোমার—সব মিথ্যা—

না, ভুল নয়—বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে চিনতে কোন স্বামীরই ভুল হয় না কোন দিন। তুমি আমার মনের শান্তি—ঘুম সব কেড়ে নিয়েছিলে, কিন্তু পরশু আর কাল রাত্রে অনেকদিন পরে আমি ঘুমিয়েছি—আর জান, তোমারই একদা প্রেজেন্টেশান করা মহীশূর থেকে আমার জন্য আনা ছোরা দুটোর একটা দিয়ে তোমার বিজিতাকে আমি হত্যা করেছি।

কিন্তু মিঃ বোসকে আপনি হত্যা করলেন কেন? কিরীটী হঠাৎ প্রশ্ন করে।

সে আমায় বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিল—

তাই তাকেও হত্যা করলেন?

হ্যাঁ, ইচ্ছা ছিল ওকেও—ঐ সমীরণকে হত্যা করব, সেই কারণেই অন্য ছোরাটা আমি রেখে দিয়েছিলাম—কিন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি যা করেছি স্বেচ্ছায় করেছি—অ্যাণ্ড আই কিল্ড দেম ডেলিবারেটলি। ফাঁসির কথা বলছিলেন না? নাউ আই অ্যাম রেডি ফর দ্যাট।

সুদর্শন বলে ওঠে, হাউ ফ্যানটাস্টিক—হাউ হরিবল্!

হাঃ হাঃ করে হঠাৎ ঐ সময় পাগলের মতই যেন হেসে ওঠে মণিশঙ্কর, তারপর বলে, খুব অবাক হয়ে গিয়েছেন ইন্সপেক্টার, তাই না ?

কথাটা বলে মণিশঙ্কর সুদর্শনের দিকে তাকাল।

মণিশঙ্করের চোখেমুখে তখনো হাসি।

সুদর্শন ভাবে, লোকটা বিকৃতমস্তিষ্ক নয় তো।

মে আই হাভ এ সিগারেট ? একটা সিগারেট খেতে পারি স্যার ? মণিশঙ্কর বলল।

খান—সুদর্শন বলে।

মণিশঙ্কর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো, কিন্তু গোটা দুই টান দিতেই টলে পড়ে গেল। সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মণিশঙ্কর বলে, চললাম স্যার, গুড বাই—মণিশঙ্করের চোখ বুজল।

॥ এগার ॥

সুদর্শনের বাসাতে বসে পরের দিন সন্ধ্যায় সি আই টি র ফ্ল্যাটের হত্যা-ব্যাপারটা নিয়েই কিরীটী আলোচনা করছিল। সামনে পাশাপাশি একটা সোফায় বসে সাবিত্রী ও সুদর্শন।

একসময় সুদর্শন বললে, প্রথম থেকেই কি আপনার মণিশঙ্করের ওপর সন্দেহ পড়েছিল দাদা ?

কিরীটী বললে, বলতে পার তোমার মুখে সব কথা শোনবার পরই মণিশঙ্করের ওপর আমার সন্দেহ জাগে মনে—

কেন ?

প্রথমতঃ মণিশঙ্করের অতগুলো চাবিসমেত চাবির রিংটাই রীতিমত একটা খট্‌কা জাগায় আমার মনে, যেটা তার পকেট থেকে বের হয় ও সে বলে সেটা একটা ডুপলিকেট চাবির রিং। ঐ চাবির রিংয়ের মধ্যেই ছিল দুটো চাবি অর্থাৎ একটা আলমারির ও অন্যটা সদর দরজার। মনে করে দেখ—

হ্যাঁ, মনে পড়ছে—

মণিশঙ্কর বলেছিল, চাবি তার স্ত্রীর কাছেই থাকত। কথাটা হয়তো মিথ্যা নয় —সেটাই স্বাভাবিক। এবং ডুপলিকেট চাবি থাকলেও একমাত্র সদর দরজার চাবিই থাকত, তাই বলে রিংয়ের মধ্যে অন্যান্য চাবিও থাকবে কেন, বিশেষ

করে ঘরের আলমারির চাবি—কাজেই ঐ চাবির রিং মণিশঙ্করের সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে যাবার কোন যুক্তিও নেই। সেদিন অর্থাৎ দুর্ঘটনার দিন দ্বিপ্রহরে মণিশঙ্কর আসে তার ফ্ল্যাটে তার পূর্ব-পরিকল্পনা মত—বিজিতা দেবীর মনে তার ঐভাবে হঠাৎ আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নিশ্চয় জাগেনি এবং সে কল্পনাও করতে পারেনি যে তার স্বামী তাকে হত্যা করবার জন্যেই এসেছে, বিশেষ করে ঐ সময়, নিষ্ঠুর একটা সংকল্প নিয়ে। মণিশঙ্কর অতর্কিতে বিজিতাকে আঘাত করে হত্যা করে হয়তো পিছন থেকে—তারপর শিশুটি পাছে সব কথা প্রকাশ করে দেয় সেই ভয়ে তাকেও হত্যা করে। হত্যার পর সে বেশ বদলিয়ে রক্তাক্ত জামা-কাপড় স্যুটকেসটায় নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে যায়। সে স্বামীনাথনের গাড়িটা আগেই গ্যারেজ থেকে delivery নিয়েছিল—সব দোষটা তার ঘাড়ে চাপানোর জন্য—এবং তা না হলে সমীরণের ঘাড়ে চাপানোর জন্য সে স্যুটকেসটা তার ফ্ল্যাটে রেখে এসেছিল, কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল সে করল যেটা আমার তাকে দ্বিতীয় সন্দেহের কারণ—

ভুল।

হ্যাঁ, চাবির রিংটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে। চাবির রিংটা যদি সে সঙ্গে না নিয়ে যেত, হয়তো ব্যাপারটা অত শীঘ্র আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠত না। এবং ব্যাপারটা যে কোনরকম বার্গলারি নয় যখনই বুঝতে পারলাম তোমার কথায়, তখুনি বুঝেছিলাম এটা স্পষ্ট একটা নিষ্ঠুর হত্যার ব্যাপার। তোমারও সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, অবিশ্যি—

সন্দেহ যে একেবারে হয়নি তা নয়, হয়েছিল—কিন্তু—

তুমি ভাবতে পারনি যে স্বামী হয়ে নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করতে পারে কেউ, তাই না।

তাই, দাদা।

কিন্তু সন্দেহের মত বিষ আর নেই ভাই, বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে এ দুনিয়ায়। মনের মধ্যে একবার সন্দেহ জাগলে কোন একজনের, তার বিষ সমস্ত মনকে বিষাক্ত করে তোলে—তাই যখন মণিশঙ্কর হত্যা করেছিল তার নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে তখন তার সমস্ত শুভবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা লোপ পেয়েছিল। যার ফলে তার মধ্যে momentary insanity develop করেছিল—তারপরই সে ঐ নিষ্ঠুর কাজে লিপ্ত হয়।

কি জান ভাই, মানুষের শুভবুদ্ধি যখন তাকে ত্যাগ করে তখন সে কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায় সে-বিবেচনাটুকুও হারিয়ে ফেলে। আর তার ফলে যে মানুষ তখন

কোন্ স্তবে গিযে দাঁডায আজকেব দিনে তাবও প্রমাণেব অভাব নেই তোমাব চাবপাশে। কিন্তু আব ঐ প্রসঙ্গ নয়, মণিশঙ্কব তাব পাপেব মাশুল নিজেই হাত পেতে নিয়েছে সেই একজনেব অলঙ্ঘ্য বিচাবেব নির্দেশে—

সাবিত্রী এতক্ষণ চুপ কবে শুনছিল। দু চোখে তাব জল, ম্লান কণ্ঠে বললে, আশ্চর্য!

কিবীটী মৃদু হেসে বলল, মানুষেব চবিত্র সত্যিই আশ্চর্য সাবিত্রী। আবো যত বয়স হবে দেখবে—আবো জানবে—বুঝবে।

দাদা! সাবিত্রী ডাকে।

বল। কিবীটী জবাব দেয়।

চা আনি?

নিশ্চয়ই। অনিরুদ্ধ—গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

সাবিত্রী উঠে গেল।

রত্নমঞ্জিল

॥ এক ॥

আহারাদির পর দুই বন্ধু এসে বসবার ঘরে বসে।

শীতের রাত। শীতটাও কয়েকদিন ধরে যেন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ঘরের কোণে একটি ইলেকট্রিক হিটার জ্বলছিল, তারই উত্তাপে ঘরটা বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠেছিল। দুজনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে টানছে—রামদেব অধিকারী আর কিরীটী রায়। রামদেব অধিকারীর পূর্বপুরুষেরা এককালে বহরমপুরের নামকরা জমিদার ছিলেন। এখনো জমিজমা কিছু আছে বটে কিন্তু তার প্রাচুর্যের আসল উৎসটা ব্যবসা—কাঁচা মালের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা দেশ-বিদেশে। এবং বিরাট ফলোয়া ব্যবসা।

আর কিরীটী রায় তখনো হ্যারিসন রোডের মেস বাণীভবনে থাকে। একদা রামদেবের কলেজ-জীবনের সহধ্যায়ী বন্ধু।

কিরীটী হাতের সিগারেটটায় দীর্ঘ একটা টান দিয়ে বললে, তারপর বল কিসের পরামর্শ করবার জন্য আমায় ডেকেছিস? কোনরকম ভণিতা না করেই কিরীটী শুরু করল বলতে।

ব্যাপারটা হচ্ছে একটা স্বর্ণ হীরকখচিত কঙ্কন—রামদেব বললে।

কি রকম? কিরীটী কৌতূহলী হয়ে বলল।

আগে কঙ্কনটা দেখ, তারপর বলছি সব কথা। রামদেব বললে।

উঠে গিয়ে আয়রণ সেফ থেকে পাশের ঘরের একটি সাবেককেলে লেদারের চৌকো বাক্স নিয়ে এল রামদেব। বাক্সের ডালা খুলতেই দেখা গেল একখানি কঙ্কন—হীরকখচিত স্বর্ণ কঙ্কন। সত্যিই অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত কঙ্কনটি—চোখ যেন ফেরানো যায় না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কঙ্কনের দিকে কিরীটী।

আরো আধঘণ্টা পরে।

কিরীটী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেবিলের ওপরে রক্ষিত ডোমে-ঢাকা বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মুগ্ধ বিস্ময়ে হস্তধৃত হীরকখচিত স্বর্ণ কঙ্কনখানি দেখছিল। ওজনে তিন ভরি তো হবেই—সেকেলে জড়োয়া গহনা যাকে বলে, একেবারে খাঁটি পাকা সোনার তৈরী। ভিতরটাও গালা ভরা নয়, একেবারে নিরেট।

হীরকখচিত কঙ্কন। দু'পাশ হতে দুটো হাঙরের হিংস্র মুখ যেন পরস্পরের সঙ্গে এসে ঠেকেছে। আজকালকার হালফ্যাসানের যুগে এ ধরনের ভারী অথচ

সূক্ষ্ম কাজ বড় একটা চোখেই পড়ে না। ছোট ছোট হীরা কঙ্কনটির সারা গায়ে বসানো, ল্যাম্পের আলোয় সব ঝলমল করছে।

অনেকক্ষণ ধরে কঙ্কনখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সম্মুখে চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট রামদেব অধিকারীর হাতে সেটা এগিয়ে দিল কিরীটী এবং প্রশ্ন করল, কিন্তু একটি কঙ্কন কেন—আর একটি কোথায়?

রামদেব মৃদু কণ্ঠে বলল, জানি না।

জানিস না মানে?

সত্যিই জানি না এর অন্য কঙ্কনটি কোথায়, কিরীটী।

ঠিক বুঝলাম না।

সেই কথা বলবার জন্যই এবং কি ভাবে অন্য কঙ্কনটি উদ্ধার করা যেতে পারে সেই পরামর্শ নেবার জন্যই তোকে ডেকে এনেছি—

সব কথা আমায় খুলে বল রাম। অন্য কঙ্কনটির কথা কিছুই তুই জানিস না—কিছুই জানিস না?

শুনেছি হারিয়ে গিয়েছে—

হারিয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ। সেই রকমই আমার পিসেমশাইয়ের মুখে শুনেছি। কঙ্কন জোড়া আমার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। আমার প্রপিতামহী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ শরৎশশী দেবী আমার পিতামহীর হাতে আসে ঐ কঙ্কন জোড়া। আমার ঠাকুর্দার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে আমার পিসিমা মৃন্ময়ী দেবী ছিলেন আমার বাবার চাইতে বয়সে প্রায় চোদ্দ বছরের বড়।

রামদেব বলে চলে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার ঠাকুর্দার কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় মাত্র এগার বৎসর বয়সে কন্যা মৃন্ময়ীর বিবাহ দিয়ে পিসেমশাইকে ঘরজামাই করে রাখলেন—পুত্রের মতই। তের বৎসর বয়সে অর্থাৎ বিবাহের পরবৎসরই পিসিমার একটি পুত্র জন্মাল—আমার পিসতুত ভাই অনিলদা এবং অনিলদার জন্মের দেড় বৎসর পরে জন্মাল বাবা—

তাহলে তোর বাবা তোর পিসতুত ভাই অনিলদার থেকে বয়সে ছোট?

হ্যাঁ। প্রায় দেড় বৎসরের ছোট।

তারপর?

রামদেব অধিকারী পুনরায় শুরু করে তার কাহিনী, আমার পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংসারের প্রতি কোনদিনই তেমন আকর্ষণ ছিল না। দিবা-

রাত্র জপতপ নিয়েই থাকতেন—শোনা যায় তিনি নাকি একজন রীতিমত সাধক ছিলেন।

তাই বুঝি?

হুঁ, দিবারাত্রি বেশীর ভাগ সময়েই জপতপ পূজাআর্চা নিয়েই থাকতেন। প্রথম যৌবনে শুনেছি আগুনের মত প্রখর রূপ ছিল আমার পিসেমশাইয়ের। বাবরী চুল, কটা চোখ, বিরাট দশাসই চেহারার পুরুষ আমার পিসেমশাইকে একবার দেখলে তাঁর দিক থেকে নাকি চোখ ফেরানো যেত না। প্রথম যৌবনে নাকি তিনি নিয়মিত কুস্তি ও ডনবৈঠক করায় দেহেও ছিল তাঁর অসুরের মতই বল। গরীব যজমান পুরোহিতের একমাত্র সন্তান ছিলেন পিসেমশাই। সেই জন্যই এবং তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর্দা তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে ঘরজামাই করে এনেছিলেন। কিন্তু পিসেমশাই সরল সাধক এবং সংসারের প্রতি ও সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ না থাকায় বোধ হয় বিবাহটা শেষ পর্যন্ত সুখের হলো না।

কেন? শুধু কি ঐ কারণেই বিবাহটা সুখের হয়নি?

না, আমার মনে হয় আরো কারণ ছিল। ধনশালী জমিদারের একমাত্র দুহিতা আমার পিসিমা ছিলেন যেমন গর্বিতা তেমনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক, আর আমার পিসেমশাই ছিলেন ঠিক ভিন্ন প্রকৃতির—শান্ত সহিষ্ণু ও সদাহাস্যময় পুরুষ। তা সত্ত্বেও শুনেছি পিসেমশাই যথাসাধ্য মানিয়ে চলবারই চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু পিসিমার দিক থেকে বোধ করি কোন কমপ্রোমাইজের ইচ্ছা ছিল না—তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই ছিল। এবং সেই বিসম্বাদ চরমে উঠল অনিলদার জন্মের পর হতেই এবং যার ফল হল অতিবড় সহিষ্ণু ও শান্তপ্রকৃতির লোক পিসেমশাইকেও বাধ্য হয়ে একমাত্র স্বামী-স্ত্রীর লৌকিক সম্পর্কটা ছাড়া অন্য সমস্ত সম্পর্কই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছিন্ন করে জমিদারবাড়ির বাইরের মহলে নিজেকে একেবারে নির্বাসিত করতে হল। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরেই আমার বাবার জন্ম। বাবার জন্মের কিছুদিন পর হতেই কিন্তু পিসিমা যেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ নিলেন—চেষ্টা করতে লাগলেন পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আবার নতুন করে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য। কতদূর তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল জানি না, তবে পিসেমশাই কিন্তু অন্দরে আর ফিরে এলেন না। নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত বাইরের মহলেই রাত কাটাতে লাগলেন ও দিনের বেলাটা নির্জন একটা অন্ধকার ঘরে পূজাআর্চা নিয়েই কাটাতে লাগলেন। যখন আমার বাবার বছর দেড়েক বয়স সেই সময় একদিন মা ও মেয়ে অর্থাৎ পিসিমা ও আমার পিতামহীর সঙ্গে প্রচণ্ড একটা বিবাদ হয়ে গেল।

বিবাদ হলো কেন?

এই কঙ্কনের ব্যাপার নিয়েই। আমার পিতামহী শরৎশশীর পুত্র না থাকায় পিসিমার বিবাহের সময় কঙ্কন জোড়া কন্যাকেই যৌতুক দিয়েছিলেন। পরে পুত্র জন্ম নেওয়ায় একদিন পিতামহী কথাপ্রসঙ্গে মেয়েকে বলেছিলেন—মীনু, এ বংশের নিয়ম কঙ্কন জোড়া এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূই পাবে। তোর যখন বিবাহ হয় তখন খোকা জন্মায়নি বলে এবং আর পুত্র হবার কোন সম্ভাবনা নেই ভেবেই কঙ্কন জোড়া তোকে যৌতুক দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন সে কঙ্কনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হচ্ছে খোকারই স্ত্রী এই বাড়ির ভবিষ্যৎ বধূ। উত্তরে পিসিমা বললেন, সে কি মা! যে বস্তু একবার আমার বিবাহের সময় যৌতুক দিয়েছ, এতদিন বাদে সেটা আর কেড়ে নেবে কোন যুক্তিতে? আমিই বা লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে আর তোমাদেরই কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না? মাতামহী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে পিসিমাকে বললেন, ভেবে দেখ তুই মিনু, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দৈবনির্দেশ ছাড়া কিছুই নয়। নিয়মানুযায়ী ও কঙ্কনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এই বংশের বধূ। মৃত্যুর সময় আমার শাশুড়ী এই প্রতিজ্ঞাই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন। অন্যথায় তিনি বলেছিলেন, নাকি ভয়ানক অমঙ্গল দেখা দেবে। আমি বরং তোকে ওর চাইতেও দামী ও সুন্দর এক জোড়া কঙ্কন গড়িয়ে দেবো মা, ও কঙ্কন জোড়া তুই ফেরত দে।

কিন্তু পিতামহীর কোন যুক্তিই পিসিমা মানতে চাইলেন না এবং রীতিমত চেঁচামেচি ও ঝগড়া করে কড়া কড়া কতকগুলো কথা শুনিয়ে দিয়ে মাকে পিসিমা ঘর ছেড়ে হনহন করে চলে গেলেন। এসব কথা আমার মা'র মুখেই পরবর্তী কালে শোনা। মা শুনেছিলেন তাঁর শাশুড়ী আমার পিতামহীর কাছ থেকে।

তারপর?

পিসিমার ঐ ধরনের ব্যবহারে পিতামহী অত্যন্ত মনে ব্যথা পান এবং পিতামহও দুঃখিত হন।

হুঁ, থামলি কেন বল।

যা হোক, শোনা যায় অতঃপর নাকি পিসিমা তাঁর মা'র ঘর থেকে বের হয়ে সোজা একেবারে বাইরের মহলে তাঁর স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

পিসেমশায় ঐ সময় তাঁর নির্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে প্রদীপের আলোয় বসে কি একখানা পুঁথি অধ্যয়ন করছিলেন, আচমকা স্ত্রীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে মুখ তুলে তাকালেন।

এই মুহূর্তে আমি এ বাড়ি থেকে চলে যেতে চাই। যেখানে হোক অন্য কোথাও আমায় নিয়ে চল। পিসিমা বললেন তাঁর স্বামীকে।

কি হল হঠাৎ আবার? এত উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন?

বিচলিত—উত্তেজিত হই কি সাধে? তুমি যদি মানুষ হতে এতটুকু লজ্জা সরমও যদি তোমার থাকত তো দুঃখ ছিল কি আমার।

কি হয়েছে শুনিই না। হাসতে হাসতে পিসেমশাই শুধান।

আমি এখানে এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকব না।

কেন, হল কি?

হবে আরাব কি—বিবাহের পর স্ত্রীলোকের একমাত্র স্থান তার স্বামীর গৃহে তা সে পর্ণকুটিরই হোক বা গাছতলাই হোক। আমায় নিয়ে চল—

তুমি তো জান মৃন্ময়ী, আমি সহায়-সম্বলহীন, নিজের বলতে আমার একটি কুঁড়ে-ঘরও নেই। করুণ কণ্ঠে পিসেমশাই বলেন।

তা জানি না, বিবাহ করেছ, স্ত্রীকে ভাতকাপড় মাথা গোঁজবার ঠাঁই দিতে পার না—পুরুষমানুষ হয়ে কথাটা বলতে লজ্জা করল না।

পুরুষমানুষ হলে হয়ত লজ্জা করত, কিন্তু আমি যে ঘরজামাই। পুরুষ হলে কি ঘরজামাই হতাম। করুণ হেসে জবাব দেন তিনি।

কোন কথা শুনতে চাই না, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে অন্য কোথায়ও নিয়ে যাবে কিনা বল—নচেৎ তোমার সামনেই আমি গলায় দড়ি দেব।

তা না হয় হল, কিন্তু ব্যাপার কি তাও বলবে না?

নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই স্বামীর পীড়াপীড়িতে মৃন্ময়ী দেবী তখন সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে পিসেমশাইয়ের গোচরীভূত করলেন। সমস্ত শুনে পিসেমশাই বললেন—মিথ্যে তুমি রাগ করছো মৃন্ময়ী। নিয়ে তোমাকে অন্যত্র কোথায়ও আজই যাব, কিন্তু কঙ্কন জোড়া এখান হতে চলে যাবার পূর্বে তোমায় ফেরত দিয়ে যেতে হবে। অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পেল।

না, আমি ফেরত দেব না। একবার যা দান করেছে, তার ওপরে আর ওদের কোন অধিকার নেই। প্রতিবাদ জানালেন পিসিমা।

উঁহু, ফেরত তোমাকে দিতে হবেই। পিসেমশাইয়ের চিরদিন শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে যেন একটা বজ্রের আভাস পাওয়া গেল।

না—দেবো না। কারণ আমি জানি এ কঙ্কন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক অমঙ্গল আমাকেই ঘিরে ধরবে। আমি ঠাকুরমার মুখে ছোটবেলায় শুনেছি, সন্ন্যাসীপ্রদত্ত আশীর্বাদী এই কঙ্কন জোড়া। কোন এক সন্ন্যাসীর পরামর্শেই নাকি এই হীরকখচিত কঙ্কন জোড়া গড়িয়ে সন্ন্যাসীর মন্ত্রপূত আশীর্বাদসহ এই বংশেরই কোন পূর্বপুরুষ তাঁর স্ত্রীর

হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই হতেই কঙ্কন জোড়া এ বাড়ির জ্যেষ্ঠ বধূর হাতে থাকে এবং সন্ন্যাসী নাকি বলে গিয়েছিলেন—যতদিন এই কঙ্কন কোন নারীর হাতে থাকবে ততদিন তাকে কোনদিন বৈধব্য স্পর্শও করতে পারবে না, এমন কি কোন অমঙ্গলই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এবং একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন এ কঙ্কন একবার হাতে পরে খুলে ফেললেও মহা সর্বনাশ হবে।

পিসেমশাই নাকি অতঃপর শান্তকণ্ঠে পিসিমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, শোন মৃন্ময়ী, তোমার কথা হয়ত মিথ্যা নয়, কিন্তু সবটাই তো তোমার শোনা কথা—

না না—শোনা কথা নয়। পিসিমা বলেন।

তা ছাড়া কি? বংশপরম্পরায় ঐ কাহিনী মুখে মুখে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া একটা কথা কি জান, ভাগ্যে যা লেখা আছে তা কেউ জানতে কি আজ পর্যন্ত পেরেছে না পারে? শোন আমি যা বলি, তুমি এখানে থাকতে চাও না আর একটা মুহূর্তও বেশ—নিয়ে এখান থেকে তোমাকে আমি যাব কিন্তু তার আগে যা বললাম তা তোমায় করতে হবে—

কি?

ঐ কঙ্কন জোড়া তোমার মা যখন বলেছেন, ফিরিয়ে দেবে তুমি তাঁকে। তারপর এ বাড়ি থেকে আমরা বেরুব।

না না, তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। পারবো না—আমি তা পারবো না।

হঠাৎ এবার শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বরটা যেন বদলে গেল। তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত কঠিন কণ্ঠে বললেন, শোন মৃন্ময়ী, এ বাড়ি ছেড়ে যদি সত্যিই যেতে চাও তুমি তো আমার কথা তোমাকে সর্বাগ্রে মানতে হবে—

আমি—

শোন আরো একটা কথা—যদি আমার কথা তুমি না রাখ, তাহলে জানবে কালই এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব—এই আমার শেষ কথা।

মৃন্ময়ী অতঃপর বলে ওঠে, না না—ওকথা বলো না। আমার অমঙ্গলের কথা আদৌ আমি চিন্তা করিনি। আমি আমাদের একমাত্র সন্তান অনিলের কথা ভেবেই বলেছি। যদি ওর কোন অমঙ্গল হয়—

কি জানি কেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁর একমাত্র পুত্রটিকে প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসতেন। মৃন্ময়ীর কথায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর আবার একসময় বললেন, বেশ তবে এক কাজ কর—একটা কঙ্কন তোমার হাতে থাক, অন্যটা খুলে মাকে দিয়ে এস।

আশ্চর্য! মৃন্ময়ী তার স্বামীর প্রস্তাবটি মুহূর্তকালের জন্য ভাবলেন, তারপরই রাজী

হয়ে গেলেন।

ঠিক হল ঐদিনই সন্ধ্যার পর রাত্রে তাঁরা তাঁদের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন একটি কঙ্কন ফিরিয়ে দিয়ে।

যাবার পূর্বে শ্যামসুন্দরের ইচ্ছামত মৃন্ময়ী একখানি কঙ্কন তাঁর মা'র হাতে ফিরিয়ে দিলেন আর বললেন, অন্যটা তিনি যতদিন বেঁচে আছেন ধারণ করবেন তাঁর স্বামীর মঙ্গলের জন্য। শরৎশশী দেবী মেয়ের কথায় হাঁ বা না কোন কথাই বললেন না আর, কেবল হাত পেতে একখানা কঙ্কনই মেয়ের কাছে থেকে নিলেন।

মৃন্ময়ী একটি কঙ্কন ফিরিয়ে দিলেন বটে কিন্তু তাঁর মাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না যে, সেই রাত্রে ওঁরা ঐ গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

ঠিক ছিল রাত বারোটার পর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, চারিদিক নিষুতি হয়ে গেলে শ্যামসুন্দর অন্দরে এসে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে যাবেন।

নির্দিষ্ট সময়ে স্ত্রীকে ডাকতে এসে তাঁর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে শ্যামসুন্দর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে তার বালক পুত্রটি একাকী শয্যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আর মৃন্ময়ীর প্রাণহীন দেহটা ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। হাতে তাঁর কঙ্কনটি নেই। আর মৃন্ময়ীর প্রাণহীন দেহের পাশে পড়ে আছে একটা খালি শিশি—তাতে লেখা বিষ। ঐ রাত্রেই শ্যামসুন্দর জমিদারবাড়ি ছেড়ে চলে যান একবস্ত্রে।

তার পর? শ্যামসুন্দরের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি? কিরীটি শুধাল।

না।

মৃন্ময়ী তাহলে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছিলেন?

হুঁ।

কিন্তু এসব কথা তুমি জানলে কি করে? কিরীটীর প্রশ্ন।

পিসিমার এক বুড়ী ঝি ছিল, তারই মুখে সব কথা শোনা। সে পিসিমাকে বিষপান করতে দেখেনি বটে—তবে পিসেমশাইকে ঘরে ঢুকতে দেখেছিল।

তারপর কঙ্কনটির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি?

না।

॥ দুই ॥

একটু থেমে বামদেব আবার বলতে লাগলেন।

অনিলদা আমার পিতামহের কাছেই মানুষ হতে লাগল। দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে পিসেমশাই আবার একদিন আমাদের ওখানে ফিরে এলেন, এখনো তিনি বেঁচে আছেন। পরে অবিশ্যি এ গল্প তাঁর মুখেও আমার শোনা।

এই পর্যন্ত বলে বামদেব অধিকারী চুপ করলেন।

কিরীটীও স্তব্ধ।

বাইরে নিষুতি রাত্রি।

তারপর? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আজ পর্যন্ত পিসিমার হাতের সেই কঙ্কনটির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেনই বা পিসিমা আত্মহত্যা করলেন আর কি করেই বা পিসিমার হাত হতে কঙ্কনটি চুরি হয়ে গেল—আজও সে রহস্য উদ্ঘাটিত হল না। যা হোক, অপহৃত সে কঙ্কনটির কথা সকলে ভুলেই গিয়েছিল পিসিমার মৃত্যুর ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে এবং এতদিন পর্যন্ত সে কঙ্কনটির কথা আর কারো মনেও পড়েনি। কিন্তু মাত্র মাসখানেক আগে আমাদের বহরমপুরের পৈতৃক বাড়িটা বিক্রির কথাবার্তা শুরু হবার পর হতেই আমাদের কলকাতায় এই বাড়িতে ঘন ঘন চোরের উপদ্রব শুরু হলো—

চোরের উপদ্রব? বিস্মিত কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। এই গত মাসখানেক ধরে পাঁচ-সাতবার চোর এসেছে এই বাড়িতে এবং প্রত্যেক বারই আমার স্ত্রীর ঘরে। আমাদের কোন সন্তানসন্ততি নেই। একমাত্র আছে আমাদের এক পালিতা পিতৃমাতৃহীন বন্ধুকন্যা সুজাতা। সুজাতা ও আমার স্ত্রী এক ঘরেই শোয়। কারবারের কাজে মধ্যে মধ্যে আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়। দেখেছি আমি বাইরে গেলেই বাড়িতে রাত্রে চোরের উপদ্রব হয় সাধারণত—

আচ্ছা একটা কথা। কিরীটী প্রশ্ন করে।

কি?

চোর এসেছে কিন্তু কিছু চুরি যায়নি?

সেটাই আশ্চর্য, চোর এসেছে বটে কিন্তু কিছুই চুরি যায়নি।

কি রকম?

তাই। প্রথমটায় তাই ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি, পরে হঠাৎ একটা কথা মনে হয় ভাবতে ভাবতে—

কি?

চোর এসেছে বার বার আমার স্ত্রীব হাতের ঐ কঙ্কনটির লোভে।

বল কি। কিন্তু—

সেই কথাই বলছি। বামদেব বলতে লাগল, শেষবার চোর এসে প্রথমে আমার স্ত্রীর ঘুমন্ত অবস্থায তার হাত থেকে কঙ্কনটি খুলে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়, তখন কঙ্কনটা আমার স্ত্রীর হাতসমেতই কেটে নিয়ে যাবার মতলবে ছিল বোধ হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধারাল অস্ত্রের কোপটা পাশের বালিশে পড়তেই স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। পরের দিনই সকালবেলা আমি ফিরে আসি। প্রথমটায আমরা ধারণাও করতে পারিনি যে চোরের লক্ষ্য ঐ কঙ্কনটির উপরেই। পরে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শেষবারের ঐ চেষ্টার পর অমঙ্গলের সম্ভবনা সত্ত্বেও আমার স্ত্রীর হাত হতে কঙ্কনটি খুলে বাধ্য হযে সিন্দুকে তুলে রাখি, কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, গতরাত্রেও আবার চোর এসেছিল এবং লোহার সিন্দুকটাই ভাঙবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জার্মান সিন্দুক খুলতে পারেনি। এতে আরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, চোরের লক্ষ্য ঐ হীরকখচিত স্বর্ণ কঙ্কনই। তোমার কি মনে হয় কিরীটী? বামদেব কিরীটীর মুখের দিকে তাকিযে প্রশ্নটা করল।

সেই রকম বলেই তো মনে হচ্ছে তোমার মুখে সব শুনে। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝে উঠতে পারছি না কিরীটী, আমার স্ত্রীর আরো বহু টাকার স্বর্ণালঙ্কার আছে কিন্তু চোরের এই কঙ্কনটির ওপরেই কেবল নজর কেন?

কিরীটী প্রত্যুত্তরে হেসে বলল, তাহলে তো কঙ্কন-রহস্যই আমাদের কাছে পরিষ্কার হযে গেল বামদেব। আমার সব শুনে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই এই স্বর্ণ কঙ্কনের পশ্চাতে এমন কোন গোপন ইতিহাস আছে যেটা চোরকে বিশেষভাবে এই কঙ্কনটির প্রতিই লালায়িত করে তুলেছে।

আমার স্ত্রীও অবিশ্যি সেই কথাই বলছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। পুরাতন দিনের আর অবিশ্যি পিসেমশাই ব্যতীত কেউ বেঁচে নেই, কিন্তু এমন কোন ইতিহাস ঐ কঙ্কনের সঙ্গে জড়িত থাকলে অন্ততঃ পিসেমশাইও কি সেকথা জানতেন না?

না জানতেও তো তিনি পারেন। সর্বদা তো তিনি বাহিবাটিতে জপতপ নিয়েই থাকতেন শুনলাম?

হ্যাঁ। সংসারে থাকলেও কোনদিন তিনি সংসারী ছিলেন না।

আচ্ছা একটু আগে তুমি যে বলছিলে, বহরমপুরের পৈতৃক বাড়িটা তোমার বিক্রির কথাবার্তা হচ্ছে।

হ্যাঁ, ওই বাড়িটা অর্থাৎ 'রত্নমঞ্জিলে'র বিক্রির কথাবার্তা চালাচ্ছি। একপ্রকার পাকাপ

হয়ে গিয়েছে বলা যায়, বায়না নেওয়া হয়েছে।

বাড়িটা অনেক দিনের না ?

হ্যাঁ। আমাদের কোন পূর্বপুরুষ নবাব সরকারের চাকরি করতেন। আসলে আমরা চাটুয্যে, অধিকারী আমাদের বংশের নবাব-প্রদত্ত খেতাব। নবাব সরকারে ঐ চাকরির সময়েই বহরমপুরে তিনি একখনা গৃহ নির্মাণ করেন, পরে পূর্ববঙ্গ হতে এসে পরবর্তী পুরুষ বসবাস করতে শুরু করেন এবং ক্রমে জমিদারীও ক্রয় করেন। তারপর একদিন আমার পিতৃদেব কলকাতায় এই বাড়ি করে চলে আসেন এখানে এবং সেই হতে বহরমপুরের বাড়িটা প্রায় খালিই পড়ে ছিল কিন্তু বাড়িটার মাল-মশলা খুব ভাল থাকায় ও গঠনকৌশল সেকেলে এবং মজবুত থাকায় বাড়িটা পুরাতন হয়ে গেলেও এখনও অটুট আছে। বাড়িটা দেখতে অনেকটা পুরাতন কেল্লার মত, গঙ্গার একেবারে ধারে এবং গঙ্গাও মজে গিয়েছে এবং বহুদিনের অব্যবহারে চারিপাশে এখন ঘন জঙ্গল হয়ে গিয়েছে।

বাড়িটা মানে তোমাদের ঐ রত্নমঞ্জিল কিনছে কে ?

এক গুজরাটি ভদ্রলোকে। নাম রতনলাল রাণা।

লোকটার অবস্থা কেমন—নিশ্চয়ই ধনী ?

তা তো নিশ্চয়ই।

তা হঠাৎ অমন জায়গায় একটা অতদিনকার পড়ো পুরনো বাড়ি কেনবার তাঁর সখ হল যে।

শুনেছি কাঁসার জিনিসপত্র তৈরির একটা ফ্যাক্টরী নাকি খুলবেন তিনি।

দাম কি রকম পেয়েছ ?

হুঁ—দাম ? তাও আশাতীত।

কি রকম ?

পঞ্চান্ন হাজার টাকা।

বল কি।

কিরীটির মনের মধ্যে তখন বহরমপুরে গঙ্গার ধারে নবাবী আমলের এক পুরাতন কেল্লাবাড়ি রত্নমঞ্জিল ছায়াছবির মত আকার নেবার চেষ্টা করছে।

নবাবী আমলের পুরাতন কেল্লাবাড়ি।

সামনে টেবিলের ওপরে রক্ষিত টাইমপিসটা একঘেয়ে টিকটিক শব্দ জাগিয়ে চলেছে নিষুতি রাতের স্তব্ধতার সমুদ্রে।

পুলিসেই সংবাদ দেওয়ার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিরীটী ব্যাপারটা এমন ধোঁয়াটে —পুলিস হয়ত বিশ্বাসই করবে না, কিন্তু চুপচাপ বসেও আর থাকতে পারলাম না—তাই

তোমার শরণাগত হয়েছি। বামদেব আবার বললে।

কিরীটীর মাথার মধ্যে তখনও রত্নমঞ্জিল ঘোরাফেরা করছে।

বহরমপুর। রত্নমঞ্জিল!

এখন তুমি কি পরামর্শ দাও কিরীটী?

একটু আমায় ভেবে দেখতে হবে। তবে প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, কাল সকালেই সবাগ্রে কোন ব্যাঙ্কে গিয়ে ঐ কঙ্কনটি তাদের সেফ কাস্টডিতে তোমাকে রেখে আসতে হবে।

বেশ, তাই করব।

আচ্ছা আজ তাহলে আমি উঠি।

এস।

ভাল কথা, কত বায়না নিয়েছ, বলছিলে না বাড়িটার জন্য?

নিয়েছি—দশ হাজার টাকা। কথা আছে সামনের মাসে দশ তারিখে বিক্রয়-কোবালা রেজিস্ট্রি হবে।

॥ তিন ॥

মিঃ অধিকারীর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে কিরীটী বাড়ি ফিরছিল। রাত খুব বেশী নয় কিন্তু শীতের রাত বলে এর মধ্যেই চারিদিক যেন নিযুতি হয়ে এসেছে। আর শীতও এবার যেন বেশ জাঁকিয়ে এসেছে শহরে। একেবারে হাড়কাঁপানো কনকনে।

যে ট্যাক্সিতে কিরীটী বামদেবের ওখানে গিযেছিল, সেটা ছাড়েনি অত রাত্রে কোন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না বলে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার ট্যাক্সি চালাচ্ছিল। চলমান গাড়ির খোলা জানালাপথে শীতের রাত্রির কনকনে হাওয়া নাকে চোখে মুখে কিরীটীর এসে ঝাপ্‌টা দিচ্ছে।

রাস্তার দু'পাশে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে শুধু চোখে পড়ে ক্বচিৎ কখনো এক-আধটা পানের দোকান এখনও খোলা। তারই সামনে দেখা যায় এখনো দু-চারজন শেষ খরিদ্দার। আর চোখে পড়ে এক-আধটা মিঠাইয়ের দোকান—তারাও একেবারে দরজা বন্ধ করার উদ্যোগ করছে।

দু-একটা ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ি পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

কিরীটীর মাথার মধ্যে তখনও পাক খেয়ে ফিরছিল গঙ্গার ধারে একখানা নবাবী আমলের পুরাতন বাড়ি। বিক্রয়-কোবালা—যার এখনো রেজিস্ট্রি হয়নি কিন্তু বায়না হয়েছে দশ হাজার টাকা।

কে এক রাণা বাড়িটা কিছুদিন আগে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় বামদেবের কাছ হতে ক্রয় করে নেবে বলে বায়না দিয়েছে। কাঁসার বাসনের ফ্যাক্টরী খুলবে। কাঁসার বাসনপত্রের জন্য বহরমপুরের খাগড়া অঞ্চল অবশ্য বিখ্যাত। গুজরাটি ব্যবসায়ীর সেদিকটায় নজর পড়েছে। ব্যাপারটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয় তবে অত অধিক মূল্যে একটা পুরাতন আমলের বাড়ি ক্রয় করছে যখন গুজরাটি ব্যবসায়ী, মিথ্যে সে নিশ্চয়ই অতগুলো টাকা ব্যয় করছে না।

এক-আধটা টাকা নয় তো—পঞ্চান্ন হাজার টাকা।

টাকাটাও অবশ্য এখনো সম্পূর্ণ পেমেণ্ট হয়নি—হাজার দশেক বায়না নিয়েছে বামদেব এবং সামনের পনের তারিখে বাকি পেমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়-কোবালা রেজিস্ট্রি হবে। আগাম দশ হাজার টাকা নিয়েছে এবং কথাবার্তাও যখন সব ঠিক ঠাক, কেবল বিক্রয়-কোবালা রেজিস্ট্রি করা বাকী, তখন একপ্রকার বিক্রয়ই হয়ে গিয়েছে ধরে নিতে হবে।

হঠাৎ কিরীটীর চিন্তাসূত্রে বাধা পড়লো।

গাড়ির মধ্যস্থিত দর্পণে বার দুই একটা গাড়ির সাইড হেডলাইটের আলো ওর সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী ড্রাইভারকে বলে গাড়ির গতি আর একটু কমিয়ে দিতে। ট্যাক্সির স্পীড কমতেই কিরীটী সন্তর্পণে পিছনের দিকে তাকাল। সামান্য ব্যবধানে সাইডলাইট জ্বালিয়ে একখানা গাড়ি ট্যাক্সির পিছনে পিছনেই আসছে সমগতিতে।

কিরীটী তার সহজ বিচারবুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পেরেছিল, সাধারণ কোন গাড়ি নিশ্চয়ই নয়, তাই ট্যাক্সির গতি কখনো একটু কমিয়ে কখনো একটু বাড়িয়ে বেশ কিছুটা পথ পরীক্ষা করে দেখল এবং বুঝতে দেরি হয় না ওর—পশ্চাতের গাড়িখানা ওকে অনুসরণ করছে।

সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে ওঠে কিরীটী। এবং আরো কিছুটা পথ চলে কিরীটী সুস্পষ্টই লক্ষ্য করে পশ্চাতের গাড়িটা ঠিক একই ভাবে তার ট্যাক্সিকে অনুসরণ করে আসছে। ব্যাপারটায় ও একটু বিস্মিতই হয়।

নিতান্ত বামদেব কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েই কিরীটী বামদেবের ওখানে রাত্রের ডিনারে গিয়েছিল এবং বামদেবও প্রথমটায় আসল উদ্দেশ্যটা তার কিরীটীকে খুলে বলেনি। খাওয়া-দাওয়ার পর সব বলল।

এ ক্ষেত্রে বাইরের কোন তৃতীয় পক্ষের তো ব্যাপারটা আঁচ করাও সম্ভব নয়। তবে?

এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বামদেবের ওখানে যাওয়াটা তার কারো-না-কারো শ্যেন সতর্ক দৃষ্টিকে এড়ায়নি। বামদেবের ওপরে কারো-না-কারো লক্ষ্যও আছে। অতঃপর কিরীটী সোজাপথে না গিয়ে ইচ্ছা করে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগল।

কিরীটী মনে মনে বুঝি মৃদু হাসে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয় মনে মনে তাঁর অনুমানটা মিথ্যে নয় বলে। সে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে আদেশ দেয়, সর্দারজী, সোজা পার্কসার্কাসের দিকে চল। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারজী গাড়ি ঘোরায়। পার্কসার্কাস অঞ্চলে কিরীটীর এক শিল্পী বন্ধু থাকে। সবিতাব্রত সেন। কিরীটীর নির্দেশে সর্দারজী সেই দিকে গাড়ি চালায়।

নির্জন রাস্তায় কেবল গ্যাসের আলোগুলো টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। এদিক হতে ওদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে রাস্তাটা শূন্য—একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

সবিতাব্রতব বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে এসে কিবীটী সর্দারজীকে থামতে বললে সর্দারজী গাড়ি থামাল –কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে সবিতাব্রতর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সর্দারজীকে গাড়ির স্পীডটা স্লো করতে বললে এবং একসময় চলন্ত ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল, ট্যাক্সি আবার স্পীড নিল।

অন্য গাড়িটাও ততক্ষণে থেমে গিয়েছে। পশ্চাতে গাড়ির সাইডলাইট দুটো দপ করে হঠাৎ ঐ সময় নিভে গেল।

কিরীটী গাড়ি থেকে নেমে একটা লাইটপোস্টের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল কিছুক্ষণ, তারপব এক সময় এগিয়ে গিয়ে সবিতাব্রতর বাড়ির দরজার গায়ে কলিং বেলটা টিপল।

কিরীটী বারকয়েক বাজাবার পব দরজার ওপাশে পদশব্দ শুনতে পেল।

দরজা খুলে দিতে লোক আসছে, কিরীটী বুঝতে পারে।

দরজা খুলতেই সামনে সবিতাব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল কিরীটীর। এত রাত্রে কিবীটীকে দেখে সবিতাব্রত কম বিস্মিত হয়নি। সবিতাব্রত ঘুমোয়নি, জেগে বসে একটা ছবিতে বিটাচ দিচ্ছিল স্টুডিওর মধ্যে।

ব্যাপার কি রে। এত রাত্রে তুই?—সবিতাব্রত প্রশ্ন করে।

কথা আছে—চল্ ভেতরে। কিরীটী বললে।

কিরীটীর অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে সবিতাব্রত পূর্বেই পরিচিত। তাই দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন না করে কেবল আহ্বান জানাল, আয়।

দরজা বন্ধ করে দুজনে ওপরে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে

উঠতে কিরীটী প্রশ্ন করে, জেগে ছিলি মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, একটা ছবির রিটাচ দিচ্ছিলাম।

সবিতাব্রতর দোতলায় বসবার ঘরের মধ্যে ঢুকে ইজিচেয়ারটার ওপরে গা-টা এলিয়ে দিতে দিতে আরাম করে চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে, এক কাপ কফি খাওয়াতে পারিস সবিতা?

করছি—

সবিতাব্রত বলতে গেলে একাই থাকে। দ্বিতীয় প্রাণী এক বৃদ্ধ ভৃত্য। ইলেকট্রিক স্টোভে দু'কাপের মত কফির জল চাপিয়ে দিল সবিতাব্রত।

গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললে, বাকি রাতটুকু এখানে কাটাব চেয়ারে শুয়েই—একটা বালিশ দে।

কিরীটী যে বিনা কারণে এই শীতের মধ্যরাত্রে তার বাড়িতে এসে ওঠেনি সবিতাব্রত তা জানে। মনের মধ্যে কৌতূহল উঁকিঝুঁকি দিলেও ও সম্পর্কে এতক্ষণ কোন প্রশ্নই করেনি। অকারণ কৌতূহল কিরীটী পছন্দ করে না। কোন দিন প্রশ্রয়ও দেয় না।

কিন্তু কিরীটী নিজেই সবিতাব্রতর কৌতূহলের অবসান ঘটায়।

আচ্ছা জব্দ করা গেছে বেটাকে—বলতে বলতে কিরীটী নিঃশেষিত কফির কাপটা একপাশে নামিয়ে রেখে ভাল করে হেলান দিয়ে শোয় চেয়ারের ওপরে।

কিরীটীর হাস্যোদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সবিতাব্রত প্রশ্ন করে, কাকে আবার জব্দ করলি?

সে আছে একজন। বামদেববাবুর ওখানে গিয়েছিলাম—সর্দারজীর ট্যাক্সিতে ফিরছি, দেখি বেটা আমায় ফলো করেছে। হঠাৎ মনে হল রাতটা তোর এখানে এসে কাটিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে। বেটা বোধ হয় এখনো ট্যাক্সিটা ফলো করছে।—বলতে বলতে কিরীটী হাসল।

আলোটা নিভিয়ে দেব? সবিতাব্রত প্রশ্ন করে।

তা দে।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সবিতাব্রত এগিয়ে গিয়ে আবার ছবিটা নিয়ে বসল পাশের ঘরে। দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই রইল।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা যেন হঠাৎ চাপ বেঁধে ওঠে।

লালবাজারে এল কিরীটী। তার বিশেষ পরিচিত ইন্সপেক্টার সুভাষ দত্তর ঘরে গিয়ে ঢুকল

সুভাষ দত্ত বললেন, কি ব্যাপার কিরীটীবাবু ?

কিরীটী বলল, অ্যাটর্নি রমেশ দত্ত তো আপনার পরিচিত, না ?

হ্যাঁ।

তাঁর পার্টনার রাঘব সাহা লোকটা কেমন জানেন ?

যেমন মোটা তেমনি কালো ও তেমনি কূটচক্রী। দত্ত অ্যাণ্ড সাহা অ্যাটর্নি ফার্মের ইদানীং যে দুর্নাম রটেছে বাজারে তা তো ঐ রাঘব সাহার জন্যই শুনছি। সুভাষ দত্ত বললেন।

আজ একবার দত্ত-সাহার ওখানে একজন কাউকে এখান থেকে পাঠাতে পারবেন ?

কেন পারব না। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

শুনুন, বহরমপুরে আমার এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক বামদেব অধিকারীর রত্নমঞ্জিল নামে একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে—কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলি, কে এক রাণা বাড়িটা কিনবার জন্য দশ হাজার টাকা ইতিমধ্যে অগ্রিমও দিয়েছে। দাম ঠিক হয়েছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা। সামনের মাসের পনেরই বিক্রয়-কোবালা-রেজিস্ট্রি হবার কথা।

বুঝলাম।

রাঘবকে সে বলবে তার হাতে একজন খদ্দের আছে। সে ষাট হাজার টাকা দাম দেবে। এবং কমিশন হিসাবে তাকে দেবে পাঁচ হাজার।

বাড়িটা যাতে রাণা কিনতে না পারে, এই তো ?

না, ঠিক তা নয়—আসলে বাডি বিক্রির ব্যাপারটা মাসখানেক পিছিয়ে দিতে চাই। এমনিতে দত্ত রাজী হলেও তার পার্টনার রাজী হবে না, তাই ঐ টোপ আর কি।

বেশ। কিন্তু ব্যাপারটা কি কিরীটীবাবু ?

আসলে ঐ রত্নমঞ্জিলের সঙ্গে একটি অপহৃত সুবর্ণ-কঙ্কন-রহস্য জড়িয়ে আছে।

সুবর্ণকঙ্কন !

হ্যাঁ। পরে আপনাকে সব বলব। কিরীটী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে একটা ফাইল টেনে নেয়।

ঐদিনই অ্যাটর্নি দত্ত-সাহার নিভৃত চেম্বারে সুভাষবাবু-প্রেরিত লোক যতীন ঘোষ ও রাঘব মুখোমুখি বসে দ্বিপ্রহরে কথা হচ্ছিল। পাশে দত্তও ছিল।

কিরীটীর অনুমান ভুল হয়নি।

রাঘব সাহা নির্বিবাদেই তার টোপ গিলেছে। কিন্তু আপত্তি তুলেছে তার

পার্টনার দত্ত।

দত্ত যতীন ঘোষকে বললে, এখন তা কি করে সম্ভব যতীনবাবু। দশ হাজার টাকা অগ্রিম নেওয়া হয়ে গিয়েছে—এতে ব্রিচ্ অফ্ কনট্রাক্টের মামলায পড়তে হবে যে।

চেষ্টা করলে আপনি ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারবেন না—এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ দত্ত। এতে করে যদি দু-চার হাজার খরচও হয় আমার পার্টি দিতে রাজী আছে।

রাঘব সায় দেয়, চেষ্টা করে দেখতে একবার ক্ষতিটা কি দত্ত? পাঁচ হাজার টাকাও তো কম নয়।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো মিঃ ঘোষ? ঐ পুরাতন বাড়িটার প্রতিই বা আপনার ক্লায়েন্টের লোভ হল কেন? দত্ত যতীন ঘোষকে প্রশ্ন করে।

যতীন ঘোষ বললেন,আমার ক্লায়েণ্ট কেন ঐ বাড়িটা কিন'ত চান তা তো বলতে পারব না। তবে ডিলটা করে দিতে পারলে আমিও কিছু পাব।

রাণার তো এখনই আসবার কথা—তাকে আসতে বলেছি। দশ হাজার টাকা সুদ-সমেত দিলে যদি রাজী হয়ে যায়। রাঘব বলে ওঠে।

তা হলে অবিশ্যি কোন ঝামেলাই থাকে না। তবে ব্যাপার যা বুঝেছি তাতে অত সহজে সে রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে না।

এমন সময় বেয়ারা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

কি রে?

আজ্ঞে, রাণা সাহেব এসেছেন।

ভেতরে পাঠিয়ে দে। দত্ত বলে।

একটু পরে রাণা এসে ঘরে প্রবেশ করল চেম্বারের সুইংডোর ঠেলে, রাম রাম! দোত্তবাবু, কি ব্যাপার? এত জরুরী তোলব কেন?

বসুন—বসুন রানা সাহেব।

যতীন ঘোষ চেয়ে দেখছিলেন আগন্তুককে। মোটাসোটা ভুঁড়িয়াল চেহারা। গায়ে দামী সার্জের সেরওয়ানী, পরনে মিহি নয়নসুখের ধুতি।

চোখ দুটো ছোট, কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি। অতি মাত্রায় সজাগ।

খানিকটা ভণিতা করে অবশেষে সোজাসুজি দত্তই ব্যাপারটা রাণাকে বললে, একটা কথা ভাবছিলাম রাণা সাহেব, মিথ্যে কেন অতগুলো টাকা ঐ পুরাতন বাড়িটার পেছনে ঢালবেন। তার চাইতে আশেপাশে অন্য কোন বাড়ি—

মৃদু হাসিতে রতনলাল রাণার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, বাত তো হাপনি ঠিকই

বলিয়েছেন দোস্তবাবু—লেকেন একবার যখন টাকা হামি আগাম দিয়েসে, কণ্ট্রাক্ট ভি হইয়েসে, তোখন ও তো বিক্রিই হয়ে গিয়েসে—কি বোলেন অ্যাঁ।

তা অবিশ্যি বলতে পারেন। তবে যদি আপনাকে সুদের উপরেও কিছু বেশী ধরে দেওয়া যায়। কথাটা বললে রাঘব।

রতনলাল রাণাকে টাকা দেখলাবেন না দোস্তসাহেব। টাকার বাৎ থোড়াই আছে, চান তো আরো কিছু আগাম ভি হামি দিতে পারি। লেকেন ও বাড়িটা হামার চাই-ই।

কিন্তু কেন বলুন তো রাণা সাহেব? রাঘব সাহা প্রশ্ন করে।

সে কি দোস্তবাবু, হাপনাকে তো হামি বলিয়েসে কেন বাড়িটার হামার প্রয়োজন।

ফ্যাক্টরী করবেন তো? তা ওর চাইতে যদি ভাল একটা বাড়ি পাওয়া যায়—মানে অত পুরনো নয়।

না, ওহি বাড়ি হামি লিবে।

শুনুন তবে, আর একজন খরিদ্দার আছে—বলেন তো মাঝখান থেকে কিছু মোটা মতন পেতে পারেন—

না।

তাহলে আপনি ঐ বাড়িটাই নেবেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি বলছিলাম কি—

দেখেন দোস্তবাবু, হামি রতনলাল—সিধা বাতের লোক আছে। সিধা বাতই হামি পসন্দ কোরে। হাপনাদের কাছে ভি সিধা বাতই হামি চাই দোস্তবাবু। রূপেয়া দেখলাচ্ছেন রতনলালকে—ও তো হাতের মোয়লা আছে, আনা-যানা তো রূপেয়াকে দস্তুর আছে।

মিঃ রাণা, আপনি ঠিক আমাদের কথা ধরতে পাবেননি—ও কথা আমি বলিনি। বলছিলাম একটা সেকেলে পুরাতন বাড়ির পিছনে মিথ্যে কেন অতগুলো টাকা ঢালবেন। তাছাড়া—বিনীত হাস্যের সঙ্গে রাঘব সাহা আরো বলবার চেষ্টা করে।

কিন্তু থামিয়ে দেয় রাণা। বলে, আইনের কারবারী আপনি দোস্তবাবু, এ কেমন বাত করছেন? হামি যদি বলি, যে বাবুটি এখোন বাড়িটা কিনতে চাইছেন তিনিই বা কিনতে চান কেন? বোলেন—জবাব দেন। বলতে বলতে হা-হা করে রতনলাল হেসে ওঠে।

হাসির উচ্ছ্বাসে তার মেদ ও চর্বিবহুল বিরাট শরীরটা দুলতে থাকে।

যতীন বুঝতে পারে রতনলালকে অত সহজে ঘায়েল করা যাবে না। সে গভীর জলের কাতলা। এবং তার অফিসার সুভাস দত্তর মুখ থেকে শোনা কাহিনীটা আবার আগাগোড়া তার মনে পড়ে।

সুবর্ণকঙ্কন আর রত্নমঞ্জিল এই দুটোর মধ্যে যে একটা রহস্য জড়িয়ে আছে এবং একে অন্যের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সে সম্পর্কেও আর সন্দেহের অবকাশ মাত্রও থাকে না।

আচ্ছা দোত্তবাবু, হামি এবারে উঠ্‌বে। আর হাঁ, রূপেয়ার আউর জরুরৎ হোয় তো গদিতে একটা ফোন কোরে দেবেন, হামি রূপেয়া ভেজ দেবো। রাম রাম বাবু।

রতনলাল গাত্রোত্থান করল এবং ধীরপদে একবার আড়চোখে অদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট যতীনের দিকে তাকিয়ে ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সুইং-ডোরটা ফাঁক হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে এল।

তাহলে এখন উপায়? প্রশ্নটা করে যতীন দত্তকে এবারে।

রেজিস্ট্রির দিনটা মাসখানেক পিছিয়ে দেওয়া ভিন্ন তো আর কোন উপায় দেখছি না। চিন্তিতভাবে দত্ত বলে।

বেশ, তবে অন্তত তাই করুন।

আরো মিনিট পনের পরে যতীন দত্ত-সাহার অফিস হতে বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে জীপগাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে স্টার্ট দিতে বললে।

॥ চার ॥

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট তখন অসংখ্য প্রাইভেট গাড়ি ও মানুষের ভিড়ে সরগরম।

একটা পান-সিগারেটের দোকানের সামনে লম্বা ঢ্যাঙা মত একজন লোক মুখে একটা সিগারেট, আড়চোখে পুলিসের জীপগাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। যতীন দত্তকে গাড়িতে উঠে চলে যেতে দেখে সেও চট্ করে একটা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললে অগ্রবর্তী জীপগাড়িটা দেখিয়ে সেটাকে অনুসরণ করতে।

এদিকে দত্ত অ্যাণ্ড সাহা অ্যাটর্নির ফার্ম থেকে বের হয়ে রতনলাল সোজা নেমে এসে রাস্তায় অপেক্ষমান তার নিউ মডেলের ঝকঝকে স্টুডিবেকার গাড়িটার সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার ক্ষিপ্র হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

গাড়ির মধ্যে অত্যন্ত ঢ্যাঙা ও রোগা একটি লোক, পরিধানে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, তার উপরে সার্জের সেরওয়ানী, মাথায় একটা সালের টুপি, হাতে ধরা মার্কোভিচের

একটা টিন, নিঃশব্দে বসে ধূমপান করছিল।

রতনলালকে গাড়ির মধ্যে উঠে বসতেই সেই ঢ্যাঙা লোকটি প্রশ্ন করলে, তোমার অ্যাটর্নি কেন ডেকেছিল হে?

প্রশ্নকারীর জবাবে কোন কিছু না বলে রতনলাল ড্রাইভার কিষেণের দিকে তাকিয়ে বলল, অফিস চল। জোরে চালাও।

গাড়ি চলতে শুরু করে।

কোর্ট ভেঙেছে, এই সময়—ঐ রাস্তায় বেজায় ভিড, তা সত্ত্বেও কিষেণ দক্ষ চালনায় অনায়াসেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে গাড়ি বেশ জোরেই চালিয়ে নিয়ে যায়।

রতনলাল গাড়ির নরম গদিতে বেশ আরাম করে হেলান দিয়ে বসে জামার পকেট থেকে সুদৃশ্য একটা রূপার কৌটা বের করে, কৌটা হতে দু আঙুলের সাহায্যে খানিকটা সুগন্ধি মিষ্টি সুপারি বের করে মুখগহ্বরে ফেলে কৌটোটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

আরাম করে সুপুরি চিবুতে চিবুতে এতক্ষণে রতনলাল কথা বললে, পিয়ারীলাল, আজ রাত্রেই তুমি একবার বামনদেব অধিকারীর সঙ্গে দেখা কোরবে। তোমার হাতে হামি কিছু নগদ টাকা দেবে—চেষ্টা কোরবে যাতে কোরে রত্নমঞ্জিলের বিক্রয়-কোবালাটা দু'তিনদিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করিয়ে নেওয়া যায়। দরকার যেমন বুঝবে—পঞ্চান্ন হাজার টাকা ছাড়াও দু-চার হাজার যদি বেশীও দিতে হয়, কবুল করে আসবে। মোট কথা মনে রাখবে, রেজিস্ট্রিটা দু-তিন দিনের মধ্যেই করিয়ে নিতে চাই।

পঞ্চান্ন হাজার টাকার উপরেও আরো দু-চার হাজার।

হ্যাঁ, দরকার হলে আরো দশ বিশ হাজার—

কিন্তু ব্যাপারটা কি শেঠ?

ও বাড়ির আরো খরিদ্দার জুটেছে।

বল কি শেঠ।

হ্যাঁ—

কিন্তু অধিকারীকে তো আগাম দশ হাজার টাকা বায়না দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন অন্য পার্টির কথা আসে কোথা থেকে?

সে যদি এখন খেসারত দিয়ে বায়না ফিরিয়ে দেয়, বলে বিক্রি করব না—আটকাবে কি কোরে? তাই ভেবেছি চাঁদির জুতি দিয়ে বেটার মুখ বন্ধ করব। আমিও রতনলাল রাণা। একবার যখন হাত বাড়িয়েছি, এত সহজে হাত গুটাবো না।

কিন্তু শেঠ, তুমি কি সত্যিই মনে কর সেই বেটা মালীর কথা সত্যি?

ঢোকায়।

সেলাম শেঠজী। চললাম, সব খবর এনে দেবো।

নিমেষে ছট্টুলাল ঘর হতে বের হয়ে গেল।

আরো ঘণ্টাখানক বাদে অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে। কর্মচারীরা যে যার ঘরে চলে গিয়েছে।

রতনলাল এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে এঁটে দিয়ে চেয়ারের ওপরে এসে আরাম করে বসল। চাবি দিয়ে বাঁ পাশের ড্রয়ার খুলে একটা বেঁটে কালো বোতল, একটা গ্লাস ও একটা জলের বোতল বের করল। খানিকটা তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে কিছুটা জল মিশিয়ে বার দুই সবে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু টোকা পড়ল।

কে ?

কোন জবাব নয়। আবার দুটো টোকা পড়ল।

॥ ছয় ॥

বামদেব অধিকারীর পার্ক সার্কাসের বাড়ির দ্বিতলের একটি ঘর। রাত আটটা বাজে।

সোফায় বসে একটি মেয়ে কি একখানা বই পড়ছে। বছর কুড়ি বয়সের মেয়েটি। ছিপছিপে দেহের গঠন। গায়ের রং গৌরবর্ণ না হলেও সমস্ত চেহারায় মধ্যে যেন একটা অপূর্ব শ্যাম স্নিগ্ধতা। মুখখানি বয়সের অনুপাতে যেন কচি বলেই মনে হয়। টানা আয়ত দুটি চক্ষুতে একটা সচকিত চঞ্চল ভাব। মাথার চুল ঘাড়ের দু'পাশে বেণীর আকারে লম্বমান।

মেয়েটির নাম সুজাতা। বামদেবের পালিতা বন্ধুকন্যা। একটা ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় সুজাতার মা-বাবা ঘটনাস্থলেই মারা যান। সেই থেকে বামদেব ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী সুজাতাকে নিজ সন্তানের মত লালন করে এসেছেন। সুজাতা তখন মাত্র তিন বৎসরের বালিকা। সুজাতার তো মা-বাপকে মনেই নেই, বাইরের লোকেরাও জানে সাবিত্রী ও বামদেবেরই একমাত্র কন্যা সুজাতা, একমাত্র সন্তান। সুজাতাও জানে সাবিত্রী দেবীই তার মা। বামদেবই তার বাপ। সুজাতা কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

সাবিত্রীর ইচ্ছা তার বোনপো বিনয়ের সঙ্গে সুজাতার বিবাহ দেন। বিনয়ের সঙ্গে সুজাতার পরিচয় আছে। বিনয় যখন শিবপুরে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত, সেই সময়

থেকেই বামদেবের বাড়িতে তার ঘন ঘন যাতায়াত ছিল।

শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বিনয় বিলেতে যায় এবং বছর দেড়েক হল সেখান থেকে ফিরে কলকাতার এক বিদেশী ফার্মে মোটা মাহিনায় চাকরি নিয়েছে এবং পূর্বের মতই এখনো ঐ গৃহে সে যাতায়াত করে। সাবিত্রীর ইচ্ছা ছিল বিনয় এবারে তারই বাড়িতে থাকুক কিন্তু বিনয় কিছুতেই রাজী হয়নি। সে এক হোটেলে ঘর নিয়ে আছে।

বিনয়ের প্রতি সুজাতার মনোগত ভাবটা ঠিক কিন্তু বোঝা যায় না। বিনয় ও সুজাতার সঙ্গে দেখা হলেও দু-চার মিনিটের মধ্যে খিটিমিটি লেগে যায়। বিনয়ের বাঁশীর মত টিকোল নাক—সুজাতা তাকে 'নাকু' 'নাকেশ্বর' 'নাকানন্দ' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করে। আর বিনয়ও সুজাতার গায়েব রং শ্যামবর্ণ বলে কখনো 'কালোজিরে', 'কালিন্দী', 'কালীশ্বরী' ইত্যাদি ভূষণে অলঙ্কৃত করে তাকে রাগাবার চেষ্টা করে।

আবার পরস্পরের যত শলাপরামর্শ পরস্পরকে বাদ দিয়েও হয় না।

সাবিত্রী কখনো কখনো বলেছেন, বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস, ওর সঙ্গেই তো তোর আমি বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

নাক সিঁটকে ঘাড় দুলিয়ে সুজাতা বলেছে, মাগো, ঐ নাকুয়া নাকেশ্বর বোনপোকে তোমার কোন্ দুঃখে বিয়ে করতে গেলাম মা। সারা দেশে কি আর পাত্তর নেই।

অমন পাত্র কোথায়, বিলেত-ফেরতা ইঞ্জিনিয়ার, বড চাকুরে—

রক্ষে কর মা-জননী। তার চাইতে গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে যোগিনী হওয়াও ঢের ভাল।

অমন পাত্র তোর মনে ধরে না পোড়ারমুখী। বরাতে তোর তাই লেখা আছে—কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলেছেন সাবিত্রী দেবী।

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে সুজাতাও বলেছে:

মা আমার গণৎকার
ইয়া লম্বা দাড়ি তার
আমার ভাগ্য দেছে গনে
বলতো দেখি আর কি আছে
ভাগ্যে আমার লেখা—
কপাল আমার গুণে?

অথচ এদিকে আবার দেখেন দু-তিনদিন পরপর বিনয় না এলে সুজাতা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কারণে অকারণে এঘর ওঘর করে বেড়ায়। কেমন একটা চাঞ্চল্য।

সাবিত্রী শুধান, অমন ছট্‌ফট করছিস কেন রে ?

আচ্ছা, নাকানন্দ স্বামীর কি হয়েছে বল তো মা ! হিমালয়েই তপস্যা করতে গেলে. নাকি ? টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কদিন !

জানি না বাপু । মনে মনে হাসেন সাবিত্রী ।

কিন্তু একটা খোঁজ নেওয়া তো দরকার ।

গরজ থাকে নিজে যা না গাড়ি নিয়ে ।

বয়ে গিয়েছে তোমার নাকেশ্বর কুচ্‌কুচের ওখানে যেতে । মরুক গে । যেমন গণ্ডারের মত নাক তেমনি হোঁৎকা বুদ্ধি তো । তাছাড়া খবর নেওয়া উচিত তে. তোমারই, তুমি তো আর পর নও—নিজের মায়ের পেটের বোন মাসী বলে কথা ।

সাবিত্রী মেয়ের কথায় আবার না হেসে থাকতে পারেন না ।

কি যে তুমি হাস মা, দেখলে পিত্তিশুদ্ধ জ্বলে যায় । সুজাতা হনহন করে ঘং ছেড়ে চলে যায় দ্রুতপায়ে ।

সাবিত্রী যেন কূল পান না । মেয়ের মনের থৈ পান না ।

বামদেবের কিন্তু এসবে খেয়াল নেই । নিজের কাজ-কারবার নিয়েই ব্যস্ত ।

দিন পাচেক বিনয় এ-বাড়িতে আসেনি ।

সুজাতা সোফায় বসে বই পড়ছিল । নিঃশব্দ পায়ে পশ্চাৎ দিকে এসে এমন সময় দাঁড়ায় বিনয । পাযে ক্রেপ সোলের চপ্পল, পরিধানে সাদা ট্রাউজার ও সাদা লিনেনের হাফ্‌ শার্ট

টক্‌টকে গোরাদের মত গায়ের রং—সমস্ত মুখখানার মধ্যে নাকটা যেন উদ্ধত ভঙ্গীতে, উঁচিয়ে আছে । জোড়া ভ্রূ । কোঁকড়ানো চুল ব্যাকব্রাস করা । মাঝারি দোহারা গঠন । বিনয়কে সত্যিই সুন্দর বলা চলে ।

হঠাৎ পিছন দিক হতে অধ্যয়নরত সুজাতার বইখানা ছো মেরে টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বিনয় বলে, কাকেশ্বরীর কোন্‌ দাঁড়কাক-কাহিনী পড়া হচ্ছিল দেখি ।

দেখ, ভাল হবে না 'কিন্তু—দাও, আমার বই ফিরিয়ে দাও বলছি । বলতে বলতে দু হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে সুজাতা ।

দেবো—আগে চা খাওয়াও এক কাপ ।

ইঃ, বয়ে গেছে নাকানন্দকে আমার চা খাওয়াতে । মুখ বেঁকিয়ে জবাব দেয় সুজাতা ।

চা না হয় এক কাপ কোকো কিংবা এক কাপ কফি ।

এক গ্লাস এঁদো পুকুরের পচা জলও নয় । কি আমার গুরুঠাকুর এলেন রে ।

বোঝা যাবে দাও কি না । একবার সাতপাক ঘোরাই—

আমিও চোদ্দপাক ঘুরিয়ে নাকচ করে না দিই তো আমার নাম সুজাতা নয়।

তাতে করে আরো শক্ত হবে বাঁধন। হা-হা করে হেসে ওঠে বিনয়।

ঘরে এসে প্রবেশ করলেন বামদেব ঐ সময়, এই যে বিনয়, কখন এলে ?

এই কিছুক্ষণ।

সুজাতা দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

বস, আমি জামাটা ছেড়ে আসি।

বিনয় সোফার ওপরে একা একা বসে সুজাতার বইয়ের পাতা ওল্টাতে থাকে।

একটু পরে বামদেব ফিরে এলেন, তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি একটা পরামর্শের জন্য বিনয়।

পরামর্শ।

হ্যাঁ।

কিসের পরামর্শ মেসোমশাই ?

তুমি জান বহ্নিপুরে রত্নমঞ্জিলটা এক গুজরাটি ভদ্রলোককে বিক্রী করব বলে বায়না নিয়েছিলাম, আশাতীত মূল্য আবার পাওয়া যাচ্ছিলও—

হ্যাঁ, মনে আছে।

গতকাল ডাকে একটা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা অদ্ভুত। চিঠির নীচে কারো নাম সই নেই, কেবল লেখা আছে জনৈক ব্যক্তি। এই সেই চিঠি, পড়ে দেখ।

এগিয়ে দিলেন বামদেব চিঠিটা বিনয়ের দিকে। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শ্রীযুক্ত বামদেব অধিকারী সমীপেষু

জানিলাম অপনি রত্নমঞ্জিল বিক্রয় করিতেছেন। পূর্বপুরুষের ভিটা এভাবে টাকার জন্য হস্তান্তর করিবেন না। করিলে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। মঙ্গল চান তো বায়না ফেরত দিন।

—ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী জনৈক ব্যক্তি

ব্যবসাক্ষেত্রে ঐ শেঠ জাতটার একাধিপত্য থাকলেও এবং লোকগুলো প্রচণ্ড ধনী হলেও চিরদিন বিনয়ের ওদের প্রতি কেমন যেন একটা বিদ্বেষই ছিল। তাছাড়া অর্থই যে সর্বতোভাবে জীবনের একমাত্র মানদণ্ড নয়, স্বপ্নবিলাসী বিনয় সেটা বিশ্বাস করতো।

বিক্রয়ের ব্যাপারে যখন রতনলালের সঙ্গে বামদেবের দরকষাকষি চলছিল তখনই সে বলেছিল, কিছু ভাববেন না মেসোমশাই, ও বোকা শেঠের যখন একবার মাথায়

রত্নমঞ্জিল প্রবেশ করেছে, শেষ পর্যন্ত দেখবেন ঐ পঞ্চান্ন হাজারেই বেটা টোপ গিলবে। স্রেফ চুপ করে বসে থাকুন না। এবং কার্যক্ষেত্রে হলও তাই।

কিন্তু আজ বামদেব-প্রদত্ত ছোট্ট চিঠিটা পড়ে ওর পূর্বের সমস্ত চিন্তাধারা যেন ওলটপালট হয়ে গেল। রত্নমঞ্জিল ক্রয়ের ব্যাপারে রাণার জিদ ও শেষ পর্যন্ত পঞ্চান্ন হাজার স্বীকৃতি সব কিছুর মূলে যেন এখন ওর মনে হচ্ছে কোথায় একটা রহস্য লুকিয়ে আছে।

বিনয়কে নিঃশব্দে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বামদেব প্রশ্ন করেন, কি মনে হচ্ছে এখন বিনয়? চিঠিটার মানে কিছু বুঝতে পারলে?

না। তবে চিঠির মানে যাই হোক না কেন, আপাতত সামনের মাসের পনের তারিখে বাড়ি রেজিস্ট্রি করা হবে না এটা ঠিক।

কিন্তু জান তো বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

তা হোক, তবু যে ভাবেই হোক আমাদের কিছুদিন সময় নিতেই হবে, যদি একান্তই বায়নার টাকা ফেরত না দেওয়া যায়—

কি তুমি বলতে চাও বিনয় খুলে বল।

এই চিঠির নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে—

অর্থ। বিস্মিত বামদেব বিনয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ। অবশ্য এখুনি চট্‌ করে আপনাকে সঠিক কিছু আমি বলতে পারছি না, দুটো দিন ভাবতে দিন।

আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয়?

বলুন।

তুমি হয়ত জান না, এ বাড়িতে গত দু মাস ধরে চোরের উপদ্রবের ব্যাপারে আমার বন্ধু কিরীটী রায়কে পরশু রাত্রে আমি ডেকে এনেছিলাম—

সত্যি।

হ্যাঁ।

তিনি কি বললেন? ব্যগ্র কৌতূহল উৎকণ্ঠা বিনয়ের চোখেমুখে।

সঠিক কিছুই বলেনি, তবে যা বললে—তার ধারণা হচ্ছে হীরকখচিত সোনার আমাদের পূর্বপুরুষের সেই কঙ্কন, রত্নমঞ্জিল ও এখানে চোরের উপদ্রব গত কিছুদিন ধরে—সব কিছুর মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগাযোগ আছে।

বিনয় এবারে বলে, মেসোমশাই, আপনার কথা শুনে আমারও কেমন যেন মনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে কিছুদিন ধরে যে চোরের উপদ্রব হচ্ছে সেটা সামান্য তুচ্ছ একটা

ব্যাপার নয়। এর পিছনে কোন একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। আমারও মনে হচ্ছে কিরীটীবাবুর ধারণা হয়ত মিথ্যে নয়।

রামদেব বিনয়ের কথাগুলো শুনে এবারে যেন সত্যিই একটু চিন্তিত হয়।

বিনয় আবার বলে, এবং মনে হচ্ছে সব কিছুর মূলে সত্যিই ঐ রত্নমঞ্জিলই আর তাই ঐ শেঠজীর ঐ ভাঙা রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারে এত আগ্রহ—এত উৎসাহ।

তোমার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না বাবা। যদিও কষ্টকল্প তা হলেও চোরের উপদ্রব ও কঙ্কনের সঙ্গে একটা যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে রত্নমঞ্জিলের যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেটাই বুঝতে পারছি না।

ঠিক যে কি সম্পর্ক তা হয়ত এখনো বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু এটা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, কেনই বা শেঠজীর বহরমপুরের ঐ পুরাতন বাড়িটা সম্পর্কে এত আগ্রহ? খাগড়ার বাসনের ফ্যাক্টরী করবে। একটু অস্বাভাবিক নয় কি? তাছাড়া শেঠজী ঐ বাড়িটার খোঁজ পেলেই বা কি করে? এবং ফ্যাক্টরীই যদি করবার ইচ্ছা ওর বহরমপুরে, একমাত্র ঐ রত্নমঞ্জিল ছাড়া কি আর কোন বাড়ি বা জায়গা নেই ঐ তল্লাটে? সবচাইতে বড় কথা, কেউ অত টাকা ঢালে ঐ পুরাতন একটা বাড়ির জন্য? শেষ পর্যন্ত আর একটা ব্যাপার ঐ সঙ্গে ভেবে দেখুন, বায়না নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়িতে চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছে—

এমনও তো হতে পারে, সব কিছুই একটা যোগসূত্রহীন আকস্মিক ব্যাপার।

হতে যে পারে না তা বলছি না মেসোমশাই, তবে ঐ সঙ্গে এও তো ভাবা উচিত, নাও হতে পারে। ব্যাপারগুলো যা পর পর ঘটেছে, কোনটাই তার আকস্মিক বা উদ্দেশ্যহীন নয়। না মেসোমশাই, কিরীটী রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিকই করেছেন। ভাল কথা, এ চিঠির কথা তাঁকে জানিয়েছেন?

না। কাল সন্ধ্যার ডাকে অফিসের ঠিকানায় এই চিঠিটা পেয়েছি মাত্র। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে কতকটা চিন্তান্বিত ভাবেই বললেন, না, সত্যিই তুমি যে আমায় ভাবিয়ে তুললে বিনয়।

দাসীর হাতে ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে সুজাতা ঐ সময় কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

সামনের ত্রিপয়ের ওপরে ট্রে-টা নামিয়ে রেখে কাপে কাপে চা ঢালতে ঢালতে ঘাড় ফিরিয়ে রামদেবের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে আব্দারের সুরে সুজাতা বলে, অফিস থেকে ফিরে এসেই কি ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর লাগিয়েছ বাবা।

তাই তো মা, বিনয় যে আমাকে বড় চিন্তায় ফেলে দিলে—

বাঁকা দৃষ্টিতে একবার বিনয়ের দিকে তাকিয়ে সুজাতা জবাব দেয়, কে কি আবোল-তাবোল বাজে বকল, তাই নিয়ে মিথ্যে কেন মাথা ঘামাচ্ছ বাবা। তার চাইতে ওপরে চল, রেডিওতে আজ খুব ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত আছে।

এমন সময় ভৃত্য এসে সংবাদ দিল বাইরে কে একজন বাবু এসেছেন দেখা করতে।

এ সময় আবার কে এল।

ভৃত্য বললে, নাম বললে পিয়ারীলাল—

রাণার দূত। বিনয়, আমার মনে হচ্ছে লোকটা—

আপনি যান নীচে। দেখুন আবার কি সে বলে। কিন্তু কোন কথা দেবেন না। তারপর চলুন, আজই একবার কিরীটীবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

কোনমতে গরম গরম চা-টা গলাধঃকরণ করেই উঠে পড়লেন বামদেব। গায়ের ওপরে শালটা চাপিয়ে বললেন, তাহলে তুমি একটু অপেক্ষা কর। দেখি আমি হঠাৎ এ অসময়ে আবার রাণার দূত কেন। তারপর একসঙ্গেই না হয় বের হওয়া যাবে।

॥ সাত ॥

একটু যেন চঞ্চল পদেই বামদেব ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

সুজাতা বিনয়ের ব্যবহারে একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল। ক্ষণপূর্বে ও বিনয়কে খোঁচা দিয়েই কথা বলেছে এবং ইতিপূর্বে কোনদিনই বিনয় খোঁচা খেয়ে খোঁচা নির্বিবাদে হজম করেনি, বিশেষ করে সুজাতার কাছ থেকে খোঁচা খেলে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ চোখা বক্রোক্তিই সে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বিনয় বুঝতে পারে কৌতূহলে সুজাতা ফেটে পড়বার উপক্রম, তথাপি সে নির্বিকার-ভাবে শিস্ দিয়ে যায়। বেশীক্ষণ কিন্তু বিনয় নির্বিকার থাকতে পারে না। সামনে উপবিষ্ট ঐ মেয়েটিকে এবারে শান্ত করা দরকার।

ইঃ, মেয়ের মুখখানা দেখ না—বেজায় চটেছে।

হঠাৎ এমন সময় অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত যেতেই বিনয়ের একটা কথা মনে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠপ্রান্তে বিচিত্র হাসি দেখা যায়।

বিনয়-সুজাতার মধ্যে লৌকিক চক্ষে যত গরমিলই থাক, পরস্পরের মধ্যে যে পরস্পরের একটা সত্যিকারের গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক আছে অন্য কেউ না জানলেও পরস্পরের নিকট সেটা অবিদিত নেই।

তৃতীয় কেউ না জানলেও পরস্পর পরস্পরকে মধ্যে মধ্যে দু-চার ছত্রের এক-আধখানা

চিঠি দেয়। অবশ্য সে চিঠিতে কোন সম্বোধন বা চিঠির নীচে ইতির শেষে কোন নাম বা পরিচয়-সংজ্ঞা না থাকলেও, চিঠি যে যখন পায় এবং যে যখন চিঠি লেখে তারা উভয়েই বুঝতে পারে এবং জানেও কার চিঠি এবং কে কাকে লিখেছে। এবং ঐভাবে গোপনে চিঠি লেখালেখির ব্যাপারটা দুজনের মধ্যে একটা বিচিত্র আকর্ষণের সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অমনি একখানা চিঠি মাত্র দিন দুই আগে বিনয় পেয়েছে এবং পকেটে হাত যেতে সেই চিঠিটাই হাতে ঠেকতে ওর ওষ্ঠপ্রান্তে বিচিত্র হাসি দেখা দিয়েছিল।

উৎসাহে এতক্ষণে বিনয় সোজা হয়ে উঠে বসে। এবং নিজের সঙ্গেই যেন নিজে কথা বলছে এইভাবে বলে ওঠে, তাই তো, সেই মেয়েটির একখানা চিঠি তো পরশু পেয়েছি। জবাব দেওয়া তো এখনো হয়নি।' নাঃ, কি ছাই যে ভোলা মন হয়েছে আমার। মেয়েটি এত করে চিঠি লিখলে, অথচ একটা উত্তরও দেওয়া হল না।

কথা বলতে বলতে চিঠিখানা বের করে বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই এবারে বিনয় পড়তে শুরু করে।

সবুজ রংয়ের একটা চিঠির কাগজ। চিঠিটা পকেট থেকে বের করতেই মৃদু মিষ্টি একটা বিলাতী ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ পাওয়া যায়। পড়তে গিয়ে কিন্তু বিনয়ের মাথার মধ্যে একটা দুষ্টুমি চাড়া দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজের মন থেকে কল্পনায় বানিয়ে বানিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে পড়তে শুরু করে :

ওগো, তোমার নীরবতা যে আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি কি নিষ্ঠুর—হৃদয় বলে কি তোমার কোন পদার্থই নেই। আমার এ রক্তাক্ত হৃদয় তোমার পদতলে লুণ্ঠিত করে—

এই পর্যন্ত বিনয় বলেছে, হঠাৎ মুখ ভেংচে সুজাতা বলে ওঠে বিকৃত কণ্ঠে, এঃ, রক্তাক্ত হৃদয় তোমার পদতলে—মিথ্যুক কোথাকার। বয়ে গিয়েছে লুণ্ঠিত হতে কারো হাতীর মতো গোদা পায়ে।

হো হো করে বিনয় গলা ছেড়ে এবার হেসে ওঠে।

আরো রেগে যায় সুজাতা বিনয়ের হাসিতে, কোন মেয়ের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ঐ হোৎকা নাকেশ্বরের গোদা পায়ে লুণ্ঠিত হতে যাবে।

কিন্তু যদি এমন কোন মেয়ে থাকে—

কক্‌খনো না। থাকতেই পারে না।

কিন্তু শ্রীমতী কালোজিরে বোধ হয় সম্যক জ্ঞাত নন যে, বিগত যুগে মুনিঋষিরাও বলে গিয়েছেন যে নারী-মন বিচিত্র। নচেৎ যে মেয়েটি আমার প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে এই পত্রবাণ নিক্ষেপ করেছেন—

বয়ে গিয়েছে নাকানন্দ নাকেশ্বরের প্রেমে গদ্‌গদ হতে।

আহা রে। সত্যি বলছি কালিন্দী, ক্যামেরাটা এসময় সঙ্গে নেই, নচেৎ ঐ মুগ্ধ চন্দ্রিমার এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের একখানি ছবি তুলে নিতে পারলে—হায় হায়, কি ভয়ঙ্কর অপূরণীয় ক্ষতি। হায় পৃথিবীর মনুষ্যগণ, তোমরা কি হারাইলে তোমরা জান না। বাইবেলের ভাষার বঙ্গানুবাদে বলতে ইচ্ছা করছে, ঈশ্বর তোমাদের প্রেম দিতে চাহিয়াছিলেন—

খিলখিল করে এবারে সমস্ত কষ্টকল্পিত গাম্ভীর্য ও বিরাগের মুখোশটা খুলে ফেলে দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসির উচ্ছ্বাসে গড়িয়ে পড়ে সুজাতা।

অভিমানের গুমোটটা কেটে যায়।

সুজাতার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয় বিনয়ও। বিনয় জানত, বাইবেলের ঐ ধরনের অদ্ভুত বঙ্গানুবাদ সুজাতাকে কি ভাবে হাসায়—তাই বরাবরই কপট মান-অভিমানের কলহের শেষে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগেই সুজাতার সঙ্গে সন্ধি করত। আজও শেষ পর্যন্ত তাকে সেই আশ্রয়ই গ্রহণ করতে হল।

হাসির মধ্য দিয়েই ভাব হয়ে গেল।

সুজাতা অতঃপর প্রশ্ন করে, বাবার সঙ্গে কি আলোচনা হচ্ছিল?

সেই চিরাচরিত সহজাত নারীমনের কৌতুহল। বিনয় হাসতে থাকে।

না না, নাকু সত্যি বল না, কিসের চিঠি বাবা তোমাকে পড়তে দিয়েছিলেন?

জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির—

তার মানে?

সত্যিই তাই। জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মেসোমশাইকে সাবধান করে দিয়েছেন, রত্নমঞ্জিল যেন বিক্রি করা না হয়। অন্যথায় তাঁকে নাকি সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

না, না—be serious।

এমন সময় সিঁড়িতে বামদেবের জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

বামদেব আসছেন।

দুজনেই ঠিক হয়ে গুছিয়ে সরে বসে। বামদেব ঘরে এসে ঢুকলেন। মুখে তাঁর চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট।

সোফার উপরে বসতে বসতে বামদেব বললেন, বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, বিনয়। পিয়ারীলাল কেন এসেছিল জান।

কেন?

পঞ্চাশ হাজারের উপরে রাণা আরো কিছু বেশী দিতে প্রস্তুত এবং আরো দশ হাজার

অগ্রিম দিতে চায়। এবং বললে, সামনের মাসের পনের তারিখের আগে বিক্রয়-কোবলাটা রেজেস্ট্রী হয় তাদের ইচ্ছা—

আপনি কি বললেন ?

আমার হাতে অনেক কাজ বর্তমানে—সেটা সম্ভব নয় তাই বলে দিলাম। কাল-পরশুর মধ্যে একবার রাণার অফিসে যেতে বলে গেল।

কি বললেন আপনি ? যাবেন নাকি ?

তাই ভাবছি।

কিন্তু আমার মনে হয় না যাওয়াই আপনার ভাল। সত্যি আমি যেন ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

এদিকে আবার কি হয়েছে জান ?

কি ?

রাঘব সাহা যে আবার এইমাত্র ফোন করেছিল।

রাঘব সাহা—মানে ঐ অ্যাটর্নি ?

হ্যাঁ।

সে আবার ফোন করেছিল কেন ?

A new offer—

কি রকম!

হ্যাঁ, কে এক নাকি আবার নতুন খরিদ্দার জুটেছে বাড়িটার—সে নাকি আরও কুড়ি হাজার বেশী দাম দিতে চায়।

বলেন কি!

তাই তো বললে সাহা।

হুঁ, আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন মেসোমশাই!

কি ?

এই রত্নমঞ্জিলের মধ্যেই কোন একটা রহস্য আছে—

তাই তোমার মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ, নচেৎ একটা ভাঙা বাড়ি নিয়ে এমন টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হত না। তা নতুন খরিদ্দারটি আবার কে এলেন, শুনলেন কিছু ?

তাঁর নামধাম তো কিছু বললে না, কেবল বললে টাকার কথা—

বলছিলাম কি, একবার চলুন না আপনার বন্ধু কিরীটী রায়ের ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক এখুনি।

বয়ে গিয়েছে নাকানন্দ নাকেশ্বরের প্রেমে গদ্‌গদ হতে।

আহা রে। সত্যি বলছি কালিন্দী, ক্যামেরাটা এসময় সঙ্গে নেই, নচেৎ ঐ মুখ-চন্দ্রিমার এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের একখানি ছবি তুলে নিতে পারলে—হায় হায়, কি ভয়ঙ্কর অপূরণীয় ক্ষতি। হায় পৃথিবীর মনুষ্যগণ, তোমরা কি হারাইলে তোমরা জান না। বাইবেলের ভাষার বঙ্গানুবাদে বলতে ইচ্ছা করছে, ঈশ্বর তোমাদের প্রেম দিতে চাহিয়াছিলেন—

খিলখিল করে এবারে সমস্ত কষ্টকল্পিত গাম্ভীর্য ও বিরাগের মুখোশটা খুলে ফেলে দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসির উচ্ছ্বাসে গড়িয়ে পড়ে সুজাতা।

অভিমানের গুমোটটা কেটে যায়।

সুজাতার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয় বিনয়ও। বিনয় জানত, বাইবেলের ঐ ধরনের অদ্ভুত বঙ্গানুবাদ সুজাতাকে কি ভাবে হাসায়—তাই বরাবরই কপট মান-অভিমানের কলহের শেষে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগেই সুজাতার সঙ্গে সন্ধি করত। আজও শেষ পর্যন্ততাকে সেই আশ্রয়ই গ্রহণ করতে হল।

হাসির মধ্য দিয়েই ভাব হয়ে গেল।

সুজাতা অতঃপর প্রশ্ন করে, বাবার সঙ্গে কি আলোচনা হচ্ছিল?

সেই চিরাচরিত সহজাত নারীমনের কৌতূহল। বিনয় হাসতে থাকে।

না না, নাকু সত্যি বল না, কিসের চিঠি বাবা তোমাকে পড়তে দিয়েছিলেন?

জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির—

তার মানে?

সত্যিই তাই। জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মেসোমশাইকে সাবধান করে দিয়েছেন, রত্নমঞ্জিল যেন বিক্রি করা না হয়। অন্যথায় তাঁকে নাকি সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

না, না—be serious!

এমন সময় সিঁড়িতে বামদেবের জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

বামদেব আসছেন।

দুজনেই ঠিক হয়ে গুছিয়ে সরে বসে। বামদেব ঘরে এসে ঢুকলেন। মুখে তাঁর চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট।

সোফার উপরে বসতে বসতে বামদেব বললেন, বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, বিনয়। পিয়ারীলাল কেন এসেছিল জান।

কেন?

পঞ্চাশ হাজারের উপরে রাণা আরো কিছু বেশী দিতে প্রস্তুত এবং আরো দশ হাজার

অগ্রিম দিতে চায়। এবং বললে, সামনের মাসের পনের তারিখের আগে বিক্রয়-কোবলাটা রেজেস্ট্রী হয় তাদের ইচ্ছা—

আপনি কি বললেন ?

আমার হাতে অনেক কাজ বর্তমানে—সেটা সম্ভব নয় তাই বলে দিলাম। কাল-পরশুর মধ্যে একবার রাণার অফিসে যেতে বলে গেল।

কি বললেন আপনি ? যাবেন নাকি ?

তাই ভাবছি।

কিন্তু আমার মনে হয় না যাওয়াই আপনার ভাল। সত্যি আমি যেন ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

এদিকে আবার কি হয়েছে জান ?

কি ?

রাঘব সাহা যে আবার এইমাত্র ফোন করেছিল।

রাঘব সাহা—মানে ঐ অ্যাটর্নি ?

হ্যাঁ।

সে আবার ফোন করেছিল কেন ?

A new offer—

কি রকম।

হ্যাঁ, কে এক নাকি আবার নতুন খরিদ্দার জুটেছে বাড়িটার—সে নাকি আরও কুড়ি হাজার বেশী দাম দিতে চায়।

বলেন কি।

তাই তো বললে সাহা।

হুঁ, আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন মেসোমশাই।

কি ?

এই রত্নমঞ্জিলের মধ্যেই কোন একটা রহস্য আছে—

তাই তোমার মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ, নচেৎ একটা ভাঙা বাড়ি নিয়ে এমন টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হত না। তা নতুন খরিদ্দারটি আবার কে এলেন, শুনলেন কিছু ?

তাঁর নামধাম তো কিছু বললে না, কেবল বললে টাকার কথা—

বলছিলাম কি, একবার চলুন না আপনার বন্ধু কিরীটী রায়ের ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক এখুনি।

আগে একবার ফোন করে দেখ তাহলে উনি আছেন কিনা ?

বামদেবের নির্দেশে বিনয় ফোন করবার জন্য ফোনের কাছে গিয়ে মাউথপিসটা তুলে নিল।

প্রায় মিনিট দশেক চেষ্টার পর কানেকশন পাওয়া গেল

মিঃ রায় আছেন ?

কথা বলছি, বলুন।

ধরুন, মিঃ অধিকারী আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

বামদেব এসে ফোনটা ধরলেন, কে কিরীটী নাকি ?

হ্যাঁ, বল।

আমি বামদেব কথা বলছি—

ওপাশ হতে মৃদু হাস্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এলো, কি ব্যাপার। রত্নমঞ্জিলের আবার কোন নতুন offer এসেছে বুঝি অন্য কারো কাছ থেকে ?

আশ্চর্য। ঠিক তাই, কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

অনুমান। কিন্তু তোমার কাছে রাণার লোক যায়নি ?

আশ্চর্য, তাও তো এসেছিল। তার চাইতেও একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে গতকাল একটা চিঠি পেয়েছি—

চিঠি। কার ?

কোন নাম-স্বাক্ষর নেই, লেখা আছে জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি—

চিঠিতে কি লেখা আছে ?

বাড়ি বিক্রি করতে নিষেধ করেছে। বিক্রি করলে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হব।

আমি জানতাম, জানতাম—I smelt it—অস্পষ্ট আত্মগতভাবেই যেন শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করে কিরীটী।

অ্যাঁ, কি বললে !

দেখ, আমাদের একবার বহরমপুরে অবিলম্বে যাওয়া প্রয়োজন—

বহরমপুরে ?

হ্যাঁ। কালই চল, রওনা হওয়া যাক।

কিন্তু—

না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। প্রস্তুত থেকো—কালই।

বেশ।

তাহলে স্টেশনেই আমাদের দেখা হবে।

* * *

কালই বহরমপুর যাচ্ছি বিনয়—

আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব মেসোমশাই।

তুমি! কিন্তু তোমার অফিস?

ছুটি পাওনা আছে, ছুটি নিয়ে নেব।

সুজাতা বলে, তাহলে আমিও কিন্তু যাব বাবা তোমাদের সঙ্গে—

তুই! তুই কোথায় যাবি?

ঐ তো বললাম, বহরমপুরে তোমাদের সঙ্গে—

দেখি তোর মাকে তাহলে গিয়ে বলি। বামদেব ভিতরে চলে গেলেন।

উঁহু, পথে নারী বিবর্জিতা—বিনয় বলে।

মুখ ভেংচে প্রত্যুত্তর দেয় সুজাতা, কি আমার নর রে! নাকেশ্বর, নাকানন্দ, নাকসর্বস্ব!

তবু কালোজিরে যাচ্ছেন না—

যাচ্ছি—যাব!

উঁহু।

যাবই।

নৈব নৈব চ।

হুঁ, if নাকু goes—I go!

তবে বল বিয়ে করবে আমায়?

নৈব নৈব চ। এ জীবনে নয়।

বহরমপুর যাওয়ার সময় সুজাতাও ওদের সঙ্গী হল।

কন্যার প্রতি দুর্বলতায় বামদেবের শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা না থাকলেও মুখে না করতে পারলেন না। এবং যাবার সময় বিনয় মুখখানা গম্ভীর করে থাকলেও মনে মনে খুশি হল, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তার জিদ বজায় রেখেছে দেখে ও মেসোমশাই বামদেবও কন্যার প্রতি দুর্বলতায় থাতিয়ে সুজাতাকে সঙ্গে নিলেন দেখে।

যাহোক নির্বিবাদেই সকলে বহরমপুরে এসে পৌঁছল।

সারাটা দিন সুজাতা পুরাতন রত্নমঞ্জিলের সর্বত্র হৈচৈ করেই বেড়াল।

কলকাতার বদ্ধ জীবনের পর বহরমপুরের খোলা মুক্তির মধ্যে সুজাতা যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে এবং না হোক দশ-বারো বার বামদেবকে বললে, এই বাড়ি তুমি কেন বিক্রি করবে বাবা! এ-বাড়ি তুমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারবে না।

কিন্তু বায়না যে নেওয়া হয়ে গিয়েছে মা—

তাতে কি, ফেরত দিয়ে দাও। বায়না নিয়েছ তো কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বলবে ভেবেছিলাম বিক্রি করব কিন্তু ভেবে দেখলাম বিক্রি করতে পারছি না, ব্যাস।

রামদেব হাসলেন, পাগলী।

বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারের উপর বসে রামদেব ও তাঁর মেয়ে সুজাতা রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে যখন কথাবার্তা বলছিল, বিনয় সেই সময় একা একা ঘুরে ঘুরে বাড়ির চারপাশ দেখছিল।

কিছুদিন ধরে বাড়িটার বিক্রয়-ব্যাপার নিয়ে যে সব ঘটনাগুলো ঘটেছে, বিনয়কে সেটা বেশ খানিকটা উত্তেজিত করে তুলেছিল নিঃসন্দেহে এবং বহরমপুরে পৌঁছে রত্নমঞ্জিলে পদার্পণ করবার পর থেকে কেমন যেন তার বার বার মনে হচ্ছিল, কোনক্রমেই এই রত্নমঞ্জিল বিক্রয় করা চলতে পারে না। টাকাই সব ক্ষেত্রে বড় কথা নয়, মানুষের সেন্টিমেন্টেরও একটা মূল্য আছে বৈকি।

পূর্ব ব্যবস্থামত ওদের সঙ্গে বহরমপুর আসতে পারেনি কিরীটী। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে বিশেষ একটা কাজে আটকা পড়ায় ওদের সঙ্গ নিতে পারেনি। তবে বলেছে দু-চারদিনের মধ্যেই আসছে।

এখানে আসবার পূর্বে বিনয় কিরীটীর সঙ্গে দেখা করেছিল সেই রাত্রেই। কিরীটী বলে দিয়েছে বিশেষ করে কয়েকটি কথা, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—দিনে বা রাত্রে সর্বদা যেন তারা বিশেষ সাবধানে থাকে।

বিনয় শুধিয়েছিল, কেন বলুন তো? আপনি কি মনে করেন আমাদের আচম্‌কা কোন বিপদ-আপদ ঘটতে পারে সেখানে?

ঘটলে আশ্চর্য হবেন না বিনয়বাবু।

কিরীটীর সাবধান-বাণী বিনয় তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু এখানে পৌঁছবার পর ও বাড়িটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে মনের মধ্যে তার ঠিক শঙ্কা না হলেও কেমন একটা অসোয়াস্তি অনুভব করে যেন সে।

॥ আট ॥

পুরাতন নবাবী আমলের বাড়ি।

বাড়িটার গঠন-কৌশলের মধ্যেও সেই নবাব আমলের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় যেন। বহুদিনের সংস্কারের অভাবে বাড়িটা অনেক জীর্ণ হয়ে গেলেও, এর যা

কাঠামো তাতে মনে হয় আরো ৬০-৭০ বৎসর অনায়াসেই এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রায় চোদ্দ কাঠা জায়গার উপরে বাড়িটা। সামনে ও পিছনে যে জায়গা আছে, তাও প্রায় বিঘাখানেক তো হবেই। বাড়িটা দোতলা এবং সর্বসমেত তিনটি মহলে ভাগ করা যায়।

নবাব আমলে অধিকারী বংশ ধন, প্রতাপ, শৌর্য ও পদমর্যাদায় যখন জমজমাটি ছিল, এই রত্নমঞ্জিল হয়ত মানুষজনের কোলাহলে তখন গমগম করত।

এখনো রত্নমঞ্জিলের বহিরাংশে জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ হাতীশালা ঘোড়াশালা, নাটমন্দির, পাইক-পেয়াদাদের মহল একদা সেই অতীত শৌর্যেরই সাক্ষ্য দেয়।

বাইরের মহলেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিনয়।

চারিদিকে জঙ্গল ও আগাছা। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরটার প্রশস্ত চত্বরের চারিদিকে সুউচ্চ বড় বড় থাম, শীর্ষে শীর্ষে সূক্ষ্ম পঙ্খের কারুকার্য। সুউচ্চ খিলানের মাথায় কবুতর বাসা বেঁধেছে, নির্বিবাদে বংশবৃদ্ধি করছে।

মধ্যাহ্নশেষের নিস্তব্ধ নির্জনতায় কবুতরের কূজন চলেছে। মেঝেতে ধরেছে দীর্ঘ সর্পিল ফাটল।

শীতের সূর্য প্রায় অস্তগমনোন্মুখ। শেষ আলোর ম্লান রশ্মি গম্বুজ-শীর্ষে-শীর্ষে অস্ত পরশটুকু বুলিয়ে যাচ্ছে।

নাটমন্দিরের পাশ দিয়ে একটু সরু পায়ে-চলা পথ, দু' পাশে আগাছা জন্মে পথটাকে প্রায় ঢেকে দেবার যোগাড় করেছে। সেই পথ ধরে বিনয় আরো পিছনে এগিয়ে যায়।

পথটা এসে শেষ হয়েছে একটা দিঘীর সামনে।

প্রশস্ত বাঁধানো রানা। কিন্তু তাতেও ফাটল ধরেছে, জন্মেছে আগাছা।

অতীতের ধ্বংস জীর্ণ অবশেষ। ক্লান্ত বিনয় দিঘির ভগ্ন রানার উপরেই বসে পড়ল।

দিঘির চারপাশে অজস্র গাছপালা হুমড়ি খেয়ে যেন দিঘির বুকের ওপরে পড়েছে, দিঘির কালো জলে তারই ছায়া স্তূপ বেঁধে আছে।

দিঘির নোংরা জল দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন এদিকে মানুষের হাতের স্পর্শ পড়েনি। অবহেলিত পরিত্যক্ত।

সর্বত্র যেন অযত্ন ও অবহেলা।

অন্যমনস্কভাবে বিনয় কতক্ষণ ভগ্ন রানার উপরে বসে ছিল মনে নেই, হঠাৎ একটা অস্পষ্ট খস খস শব্দে চমকে পাশে তাকাল।

রানার ওপরে বিনয় যেখানে বসে ছিল তার প্রায় হাত দশেক তফাতে দিঘির ঢালু পাড় ও ঘন জঙ্গলের সামনে প্রদোষের ম্লান আলোয় দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় এক পুরুষ।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখভর্তি দাড়ি—পরিধানে ধুতি, গায়ে একটা ধূসর রঙের চাদর।

বড় বড় দুটো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিনয়ের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ। চক্ষু তো নয়, যেন অন্তর্ভেদী দুটো জ্বলন্ত পাথর।

লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চক্ষের পলকে লোকটা পিছনের ঘন জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। একটা দুঃস্বপ্ন যেন মিলিয়ে গেল।

বিনয় প্রথমটায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সত্যি না তার দেখবারও ভুল বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু লোকটা পশ্চাতের ঘন জঙ্গলের মধ্যে চকিতে অন্তর্হিত হলেও তখনও সেখানকার গাছপালাগুলো দুলছিল।

গাছপালাগুলোর মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়ে যে লোকটা অন্তর্হিত হয়েছে ক্ষণপূর্বে, দোদুল্যমান গাছপালাগুলোই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বপ্ন নয়, দেখারও ভুল নয়।

বিনয় একবার ভাবলে এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা অনুসন্ধান করে দেখে কিন্তু ঠিক সাহস হলো না, কারণ চারিদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

একাকী এই অচেনা জায়গায় ঐ রকম একটা লোককে অনুসরণ করাটা মনে হল ঠিক বিবেচনার কাজ হবে না। বরং কাল সকালে কোন এক সময় দিনের আলোয় এসে ঐ জায়গাটা ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। এখন ফিরে যাওয়াই সমীচীন হবে।

বিনয় যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চলল।

কিন্তু চকিতে দেখা ক্ষণপূর্বের সেই দাড়িগোঁফ-ভরা মুখখানা কেবলই মনের মধ্যে এসে উঁকি দিতে লাগল বারংবার যেন।

কে লোকটা?

এই নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ দিঘির ধারে কে লোকটা।

বিনয়কে দেখে হঠাৎ অমন করে অদৃশ্য হলই বা কেন? বিনয়কে হয়ত সে লক্ষ্য করছিল আড়ালে থেকে, হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গিয়েছে।

বিনয় পথ চলে কিন্তু তার মনের মধ্যে অহেতুক একটা অসোয়াস্তি তাকে যেন পীড়ন করতে থাকে।

মাঝের মহলের দোতলায় খান-দুই ঘর ওদের থাকবার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া হয়েছিল। এবং মাঝের মহলে যেতে হলে 'কেয়ারটেকার' মনোহরের এলাকা পার হয়ে যেতে হয়।

সিঁড়ির কাছেই মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিনয়ের। মনোহর গোটা দুই

হ্যারিকেন জ্বেলে উপরে উঠছিল।

বিনয়কে দেখে মনোহর প্রশ্ন করে, এই যে দাদাবাবু। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? বড়বাবু আপনাকে খুঁজছিলেন।

বড়বাবু, দিদিমণি এঁরা সব কোথায় মনোহর?

উপরের দালানে বসে চা খাচ্ছেন।

বিনয় মনোহরের আগে-আগেই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

প্রকাণ্ড টানা বারান্দার একাংশে ছোট একটি বেতের টেবিলের দু'পাশে বসে সুজাতা ও বামদেব চা পান করছিলেন।

পাশেই আর একটা চেয়ার বোধ হয় বিনয়ের জন্যই খালি পড়ে ছিল। টেবিলের পাশেই একটা স্ট্যাণ্ডের উপরে একটি প্রজ্বলিত টেবিলল্যাম্প। জায়গাটায় একটা অস্পষ্ট আলোছায়া।

বিনয়ের পদশব্দে বামদেব ও সুজাতা দুজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকায়।

এই যে বিনয়, সারাদিন কোথায় ছিলে?

বিনয় খালি চেয়ারটার ওপরে গা ঢেলে দিয়ে বসতে বসতে বললে, আপনার রত্নমঞ্জিল সারভে করছিলাম মেসোমশাই।

সুজাতা কোন কথা না বলে ততক্ষণে বিনয়ের জন্য চায়ের কাপে চা ঢেলে চামচটা দিয়ে চিনি ও দুধ মেশাচ্ছিল। সে কেবল আড়চোখে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাল।

বামদেব চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, এখানকার বনজঙ্গলে শুনছি নানা বিষধর সাপ আছে বিনয়। একটু সাবধানে চলাফেরা করো। বরং একা একা না ঘোরাফেরা করে মনোহরকে সঙ্গে নিও। এখানকার সব কিছু ও জানে।

মনোহর দু'হাতে দুটো জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে ততক্ষণে উপরে উঠে এসেছে।

বামদেবের কথাগুলো তার কানেও প্রবেশ করেছিল। সে বললে, হ্যাঁ দাদাবাবু, এখানে সাপের ভারি উপদ্রব।

বিনয় তৈরী চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে গরম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আরামসূচক একটা শব্দ করে বললে, সাপের ভয় থাকুক আর যাই থাকুক মেসোমশাই—আপনার রত্নমঞ্জিলের উপরে কিন্তু ভারি একটা মায়া পড়ে গিয়েছে আমার।

বামদেব হাসতে হাসতে বললেন, কেন হে, এই পুরনো ভাঙা বাড়ির মধ্যে এমন কি পেলে?

আছে মেসোমশাই আছে, আমার মন বলছে আছে, নচেৎ—

বল কি বলছিলে।

নচেৎ ঐ ঝানু গুজরাটী ব্যবসাদার এই ভাঙা বাড়িটা কিনবার জন্য অমন করে হন্যে হয়ে আপনার পেছনে ছুটে বেড়াত না।

কি জানি বাবা, আমার তো মনে হচ্ছে মিথ্যে মিথ্যে এ-বাড়িটা নিয়ে একটা সোরগোল করা হচ্ছে। জবাব দেন বামদেব।

বেশ তাই যদি হবে, তাহলে ঐ চিঠিটারই বা কি অর্থ বলুন আর আপনার কলকাতার বাড়িতে অমন চোরের উপদ্রবই বা কেন ইদানীং হচ্ছিল?

বামদেব বললেন, চোরের উপদ্রবের চাইতেও ঐ চিঠিটাই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে বেশী।

কিন্তু গণ্ডগোল কি কেবল ঐ বেনামা চিঠিটাই সৃষ্টি করেছে মেসোমশাই, আপনার পূর্বপুরুষের সেই সোনার কঙ্কন।

তুমি কি সত্যিই মনে কর বিনয়, এই রত্নমঞ্জিলের সঙ্গে ঐ সোনার কঙ্কনের কোন যোগাযোগ আছে?

বিনয় এবারে হাসতে হাসতে জবাব দেয়, আমি কেন কিরীটীবাবুও তো সেই রকম সন্দেহ করছেন।

সুজাতা এবারে আলোচনার মাঝখানে বাধা দিল, কি হয়েছে তোমাদের বাবা বল তো? কেবল রত্নমঞ্জিল আর স্বর্ণ কঙ্কন। ঐ কথা ছাড়া কি তোমাদের আর কথা নেই?

বিনয় বুঝতে পারে সুজাতা চটেছে। তা চটবারই তো কথা। এখানে এসে পৌঁছনো অবধি সে রত্নমঞ্জিল নিয়েই ব্যস্ত সারাক্ষণ।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর যখন বের হচ্ছিল সুজাতা সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, কোথায় যাচ্ছ বিনয়, বলেছিল সুজাতা।

যেখানেই যাই না কেন, কালোজিরে যাচ্ছে না।

নাকুর সঙ্গে যাচ্ছে কে। যেতে হয় একা যাব।

তাই যেও।

যাবই তো। একশবার যাব। মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল সুজাতা।

একা একা মজাসে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াব, কোথাও কালোজিরেকে সঙ্গে নেবো না। বলেই বিনয় এগিয়ে যায়।—চললুম।

বিনয় বুঝতে পারে সেই দ্বিপ্রহরের জের এখন ফের শুরু হবে।

টেবিলের একপাশে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা ছিল, সেটা হাতে করে বামদেব ঘরে

চলে গেলেন।

বিনয় আর সুজাতা বসে রইল।

অন্য সময় হলে বিনয় এই সুযোগে সুজাতার অভিমান ভাঙাবার জন্য তৎপর হত, কিন্তু আজ তার মন ঐ মুহূর্তে অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল।

সে ভাবছিল দিঘির ধারে ঘনায়মান বিকেলে আবছায়ায় দেখা সেই অদ্ভুত দাড়িগোঁফওলা লোকটার কথাই। লোকটা কে? হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় অমন করে পালিয়েই বা গেল কেন?

ছট্টুলাল বহরমপুরে পরের দিনই এসে পৌঁছয়। যে কাজের ভার নিয়ে সে বহরমপুরে এসেছে সে-সব কাজে চিরদিনই সে পোক্ত। কারণ গত দশ বছর ধরে ঐ ধরনের কাজের দ্বারাই সে জীবিকানির্বাহ করে আসছে।

প্রথম একটা দিন ছট্টুলাল রত্নমঞ্জিলের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু বাইরে থেকে রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভবপর হল না তার পক্ষে।

চট্ করে রত্নমঞ্জিলের মধ্যে ঢুকতেও তার সাহস হয় না।

দূর থেকে রত্নমঞ্জিলের 'কেয়ারটেকার' মনোহরের ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা দেখেই বুঝতে পারে, লোকটা বিশেষ সুবিধের হবে না।

ছট্টুলাল তার আস্তানা নিয়েছিল স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে ঘুরতে ঘুরতে ছট্টুলাল রত্নমঞ্জিলের পশ্চাৎদিকে গিয়ে হাজির হল।

অন্ধকারে বাড়িটা একটা কালো ছায়ার স্তূপ যেন।

আচমকা কাঁধের ওপরে কার মৃদু স্পর্শ পেয়ে চমকে ফিরে তাকাল ছট্টু।

আবছা আলোছায়ায় দীর্ঘকায় একটা মূর্তি ঠিক তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে।

লোকটার মুখভর্তি দাড়িগোঁফ।

কে তুই, এখানে কি চাস? গম্ভীর চাপাকণ্ঠে লোকটা প্রশ্ন করে।

লোকটার আচমকা আবির্ভাবে প্রথমে ছট্টু একটু হকচকিয়েই গিয়েছিল, কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সে সামলে নেয়।

রুক্ষকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, তোর তাতে দরকার? তুই কে শুনি?

সহসা লোকটা তার ডান হাতের লৌহকঠিন বাঁকানো শীর্ণ আঙুলগুলো দিয়ে ছট্টুর কাঁধটা একটু টিপে দিতেই নিজের অজ্ঞাতেই ছট্টু একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে আর তার বাকি থাকে না লোকটা দেহে প্রচুর শক্তি রাখে।

সোজা কথায় জবাব না দিস তো গলা টিপে শেষ করে দেবো।

এবার আর ছট্টু প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে না।

শক্ত ঠাঁই। এখানে চালাকি চলবে না বুঝতে পেরেছিল সে।

বল্ কাল থেকে এখানে কি মতলবে ঘোরাফেরা করছিস ?

কি আবার মতলব। এমনিই দেখছিলাম বাড়িটা।

এমনি দেখছিলে চাঁদু। বেটা চালাকি করবার জায়গা পাওনি ?

সত্যি বলছি দোস্ত—

এই থাম্। দোস্ত। চোদ্দ পুরুষের দোস্ত আমার—খিঁচিয়ে ওঠে লোকটা।

শীর্ণ লোহার মত বাঁকানো ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে লোকটা ছট্টুর ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরে, চল্ আমার সঙ্গে। সত্যি কথা বলবি তো ছেড়ে দেব—নইলে ছাড়ছি না।

টানতে টানতে অন্ধকারে বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লোকটা ছট্টুকে নিয়ে চলে। এতটুকু প্রতিবাদ করবারও সাহস পায় না ছট্টু। আট দশ মিনিট প্রায় অন্ধকারে বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে একটা ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে থামল।

দাঁড়া, পালাবার চেষ্টা করেছিস কি মরবি।

ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। লোকটা কোমর থেকে চাবি বের করে দরজার তালাটা খুললে।

ছট্টু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে তখন।

ঘন অন্ধকার বনজঙ্গল, বিশেষ করে অপরিচিত জায়গা, ছুটে পালাবারও উপায় নেই।

ডান হাতের কব্জিটা ব্যথায় টনটন করছে। ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলছে। লোকটা এবারে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ভিতরে আয়।

অজগরের চোখের সামনে বন্য জন্তুর যে অবস্থা হয়, ছট্টুরও সেই অবস্থা। সুড়সুড় করে একান্ত বাধ্যের মত এক পা এক পা করে ছট্টু ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

বোস্।

॥ নয় ॥

সুজাতা ও বিনয় বসেছিল।

সামান্য ব্যবধান দুজনের মধ্যে। দুজনের মধ্যখানে মাত্র ছোট একটা বেতের টেবিল। টেবিলের ওপরে কাচের টিপটটার মধ্যে হয়ত খানিকটা ঠাণ্ডা চায়ের তলানি ও ভিজে

নিংড়ানো কতকগুলো চায়ের পাতা। গোটাতিনেক চায়ের তলানি সমেত চায়ের কাপ। স্ট্যাণ্ডের ওপরে জ্বলছে ছোট টেবিলল্যাম্পটা।

রাগ করেছে সুজাতা। নিশ্চয়ই রাগ করেছে, যদিচ সেই রাগের সঙ্গে মিশে আছে একটা উগ্র অভিমান। রাগ আর অভিমানের মেশামেশিতে মুখখানা একটু গম্ভীরই মনে হচ্ছে সুজাতার। ঠোঁটের কোণে বিনয়ের বঙ্কিম একটা চাপা হাসির নিঃশব্দ প্রকাশ।

রাগ আর অভিমান যাই হোক, বিনয় জানে সুজাতা এখন চট্ করে উঠে যাবে না।

মান ভাঙিয়ে কথা বলবার একটা অবকাশ দিচ্ছে সুজাতা বিনয়কে।

সত্যিই তো, সুজাতা যে ওদের সঙ্গে বহরমপুর এসেছে সে তো ওরই সঙ্গ-আকর্ষণে। বিনয়ের সান্নিধ্যকে একটু ঘনিষ্ঠ, আরো একটু নিবিড় করে পেতেই। নয় কি। সেই বিনয়ই যদি তাকে অবহেলা জানায়, রাগ-অভিমান হয় বৈকি। না, সুজাতার দোষ নেই।

বিনয় এবারে আপন মনেই সুস্পষ্টভাবে হাসল, তবে নিঃশব্দেই।

তারপর শ্রীমতী কোকিললাঞ্ছিতা।

কিন্তু নতুন নামকরণেও সুজাতা ফিরে তাকায় না। যেমন নিঃশব্দে বসে ছিল বসে রইল।

শ্রীমতী কৃষ্ণা—শোন শ্রীমতী কালোজিরে, রাগ করে যদি কথাই না বলো তো আজ দুপুরে যা সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে কিছুই শোনা হবে না কিন্তু।

কে শুনতে চায়। গোড়া কেটে আগায় জল না ঢাললেও চলবে।

তা চলবে না বটে, তবে ঐ যে বললাম অত্যাশ্চর্য ঘটনা শোনা হবে না।

এবারে ঘুরে মুখোমুখি বসল সুজাতা। বোঝা গেল মুখে না বললেও মনে মনে সুজাতা বিনয়ের কথা শোনার জন্য উদ্গ্রীব ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

কি, বলব না বলব না।

কে বারণ করেছে বলতে।

শুনব বলেও তো কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

ভণিতা না করে বলে ফেললেই তো হয়। কালা তো নই যে শুনতে পাব না।

তা নয় বটে, তবে কানের সঙ্গে মনের একটা যোগাযোগ আছে কিনা। কথাগুলো বলে একান্ত নিস্পৃহভাবে বিনয় সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বিনয় আবার হাসে।

এবারে সুজাতাই তাগাদা দেয়, কই বললে না কি বলবে বলছিলে।

বিনয় আর বিলম্ব না করে দ্বিপ্রহরের তার সমস্ত অভিযান-কাহিনী যতটা সম্ভব সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করে যায়। কোন কিছুই বাদ দেয় না।

লোকটা কে বলে তোমার মনে হয়। সুজাতা প্রশ্ন করে।

সেই থেকে তো শেই শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখখানার কথাই ভাবছি। কে হতে পারেন তিনি। বুঝতে পাবছি না এখনো।

বাবাকে বললে না তো কিছু ?

না, বলিনি। ব্যাপারটা আগে ভাল করে খোঁজ না নিয়ে জানাজানি বা হৈচৈ করতে চাই না।

তোমার কোন কিছু সন্দেহ হয় নাকি ?

নিঃসন্দেহই বা একেবারে হতে পারছি কই।

আচ্ছা কোন পাগল-টাগল নয় তো ?

পাগল-টাগল হতে বাধা তো নেই, তবে অমন জায়গায় ঐ সময় হঠাৎই বা কেন অমনধারা এক পাগলের আবির্ভাব হল। আব হলই যদি, অমন কবে হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শ্রীমান পাগল নিজেকে অপসৃত করলেন কেন ভীতচকিত ভাবে ?

তাই তো। তা হলে ?

দাডাও, ব্যস্ত হলে চলবে না। এটা রত্নমঞ্জিল—নবাবী আমলের ব্যাপার সব।

তার মানে ? তুমি কি বলতে চাও বিনয় ?

বলতে তো অনেক কিছুই চাই, তবে বলতে পারছি কই। সবই যে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ ও মিষ্ট্রি যে ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

মিষ্ট্রি। বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা করে সুজাতা বিনয়ের মুখের দিকে তাকান।

তুমি কি তাহলে বলতে চাও বিনয়, এ-বাড়ির সঙ্গে ঐ লোকটার কোন যোগাযোগ আছে ?

আছে কিনা সত্যি জানি না, তবে থাকলে আশ্চর্য হব না। গোডা থেকে এ বাডির সমস্ত ব্যাপারগুলো একবার ভেবে দেখ তো কালিন্দী। সেই সুবর্ণকঙ্কন, তোমাদের বাডিতে চোরের উপর্যুপরি উপদ্রব। কঙ্কনের পূর্ব-ইতিহাস। তারপর এ-বাড়ি কেনবার জন্য রানার আবির্ভাব ও এ-বাডি ক্রয়ের ব্যাপারে তার জেদাজেদি। ওরই মধ্যে আর এক ক্রেতার আবির্ভাব। টাকার অঙ্কও বাডে। সবশেষ সেই উডো চিঠি। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোকে যদি একসূত্রে গাঁথি তবে কোথায় আমরা পৌছই ভাব তো একবার।

সত্যি, আজ কিন্তু সমস্ত ঘটনাগুলো খাপছাডা যোগসূত্রহীন বলে সুজাতার মনে হয় না।

'কিন্তু কি রহস্য থাকতে পারে এ সব কিছুর মধ্যে ? সুজাতা প্রশ্ন করল।

আমিও তো সেটাই ভাবছি কালী। কিন্তু কিছুই এ পর্যন্ত ধরতে পারছি না।

অথচ এ-বাড়ির ব্যাপারে ক্রমেই যেন বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করছি। অবশ্য একটা ব্যাপারে আমি স্থিরনিশ্চিত হয়েছি—

কি ?

রত্নমঞ্জিল বিক্রি করা হবে না—লক্ষ টাকার বিনিময়েও না। মেসোমশাইকে এই রত্নমঞ্জিল বিক্রি করতে কিছুতেই আমি দেব না। শেষের দিকে বিনয়ের কণ্ঠে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন। সুজাতা বিনয়ের মুখের দিকে তাকাল। ল্যাম্পের আলোয় মুখখানা যেন কি এক চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে, চোখের তারা দুটোয় একটা স্থির প্রতিজ্ঞার দীপ্তি ঝকঝক করছে যেন।

মুহূর্তের জন্য বোধ হয় বিনয় চুপ করেছিল, হঠাৎ কিসের একটা স্পষ্ট শব্দে চকিতে পিছন ফিরে অন্ধকার সিঁড়ির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কে—কে ওখানে ?

সিঁড়ির মুখে স্তূপীকৃত অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছায়া যেন নড়ে ওঠে।

বিনয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।—কে ওখানে ? বলতে বলতে এগিয়ে যায় বিনয়। সুজাতাও উঠে দাঁড়ায় কৌতূহলে, উত্তেজনায়।

আজ্ঞে আমি মনোহর দাদাবাবু—দ্বিধাজড়িত স্খলিত কণ্ঠে অন্ধকার হতে জবাবটা এল।

কে, মনোহর। অন্ধকারে ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ ?

আজ্ঞে—

এদিকে এস।

বিনয়ের ডাকে মনোহর পায়ে পায়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

কি করছিলে ওখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনোহর ? বিনয়ের মনের মধ্যে সন্দেহ থাকলেও কিন্তু কণ্ঠস্বরে সেটা প্রকাশ পায় না।

আজ্ঞে নীচে ছিলাম, যেন আপনারা ডাকছেন শুনে উপরে আসছিলাম—

কোনমতে ঢোক গিলে একটা জবাবদিহি দেবার চেষ্টা করে যেন মনোহর। বিনয়ের ওর কথাগুলো শুনে ও বলবার ভঙ্গি দেখে তাই-ই মনে হয়।

বিনয় মনোহরের কথা শুনতে শুনতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু মনোহরের মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। কোনরূপ বৈলক্ষণ্যই তাতে যেন নেই। বোকা-বোকা নিরীহ সরলতা যেন সমস্ত মুখখানা ব্যেপে রয়েছে। চোখের তারায়ও অনুৎসাহিত সরল দৃষ্টি।

কিন্তু আমরা তো কেউ তোমাকে ডাকিনি মনোহর।

আজ্ঞে আমার যেন মনে হল, উপর থেকে আপনারা আমায় ডাকলেন—

না ডাকিনি, তুমি নীচে যাও।

মনোহর আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে নিঃশব্দে নীচের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল।

ক্রমে মনোহরের পদশব্দ সিঁড়িতে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

নির্বাক বিস্ময়ে সুজাতা এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা শুনছিল।

মনোহরের কৈফিয়ত শুনে সুজাতা স্পষ্টই বুঝেছিল মনোহর মিথ্যা বলছে, কারণ চারদিকে একটা স্তব্ধতা, তার মধ্যে তারা কেউ ডাকলে স্পষ্টই শোনা যেত। তাছাড়া উপরের ডাক নীচে পৌঁছনোর কথা নয়। তাই মনে হল তার, বিনয়ের কথার জবাবে সম্পূর্ণ সে মিথ্যা বানিয়ে একটা জবাব দিয়ে গেল। সুজাতা বললে দেখ আমার যেন মনে হচ্ছে, লোকটা আমাদের কথা শোনার জন্যই উপরে এসেছিল, ধরা পড়ে গিয়েছে।

বুঝতে পেরেছি বৈকি সেটা। বিনয় বলে।

বললে না কেন মুখের ওপরে লোকটাকে ?

উহুঁ। এতে করে একপক্ষে আমাদের ভালই হল। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল।

মানে ?

যদি সত্যিই লোকটার মধ্যে সন্দেহের কিছু থাকে, তাহলে প্রথমতঃ মিথ্যা জবাব দিয়ে লোকটা জানিয়ে দিয়ে গেল সে কি চরিত্রের লোক। দ্বিতীয়তঃ ওকে যে অবিশ্বাস করলাম এটা ওকে না জানিয়ে বুঝিয়ে দিলাম ওকে আমরা সন্দেহ করিনি। তাতে করে যদি সত্যিই লোকটার মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকে তো নিঃসন্দেহে ও ওর পথে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু—

না, ভয় নেই সুজাতা, আমরা ওকে চিনলাম এবং ওর ওপরে নজরও রাখতে পারব এবার থেকে। যদি তেমন কিছু থাকে—

তাহলে এ ব্যাপারের পরেও ওকে এ বাড়িতে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে কি! বাবাকে—

উঁহু। চট্‌ করে ছাড়িয়ে কোন লাভ হবে তো নয়ই, বিবেচনার কাজও হবে না। আরো কিছুদিন ওর ওপরে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখতে হবে সত্যিই ওর মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা। শুধু তাই নয়, বহুদিন ধরে এ-বাড়ির 'কেয়ারটেকার' হিসাবে এ ওখানে আছে, ওকে খুব বিবেচনার সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে হবে।

কিন্তু তোমার এ যুক্তি মানতে পারছি না বিনয়।

ব্যস্ত হয়ো না। এতদিনের একটা বিশ্বাসী লোককে হঠাৎ সন্দেহ করে তাকে অবিশ্বাস করাটাই বরং যুক্তির ব্যাপার হবে না। তোমার বাবাকেও এ সম্পর্কে কিছু বলো না আপাতত।

দেখ একটা কথা বলি, লোকটাকে আমার কেন যেন প্রথম থেকেই ভাল লাগেনি—

বিনয় হেসে সান্ত্বনা দেয় ভয় নেই, আমি সতর্ক থাকব।

আহারাদির পর বিনয় নিজের নির্দিষ্ট ঘরে শয্যার ওপরে এসে যখন গা ঢেলে দিল, চিন্তার ঘূর্ণাবর্তটা মন থেকে সরে গেল না, অবিশ্রাম পাক খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগল চিন্তাটা।

অন্ধকার রাত্রি। চাঁদ উঠবে সেই রাতের শেষ প্রহরে। শিয়রের ধারে খোলা জানালাপথে এক টুকরো স্বপ্নের মতো রাতের কালো আকাশের একটা খণ্ডাংশ ও কয়েকটি অনুজ্জ্বল তারা চোখে পড়ে।

নীচের বাগানের অন্ধকারের স্রোত পার হয়ে একটানা একটা ঝিঁঝির শব্দ কানে আসছে। নিষুতি রাতের একতারা যেন বেজেই চলেছে ঝিঁ ঝিঁ রবে।

মনোহরের ব্যবহারটা বিনয়কে কেবল বিস্মিত করেনি ভাবিতও করে তুলেছে। সুজাতার সন্দেহ মিথ্যা নয়, সত্যিই মনোহর সিঁড়ির মাথায় অন্ধকারে আত্মগোপন করে ওদের কথাবার্তা শোনবারই চেষ্টা করছিল।

কিন্তু কেন?

এ-বাড়িতে অনেকদিনের লোক ঐ মনোহর। পাকানো বাঁশের মত পেটানো মজবুত শরীর। শরীরের কোথায়ও এতটুকু খুঁত নেই। নির্ভেজাল। বলতে গেলে বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে মনোহরই দীর্ঘদিন ধরে হয়ে ছিল এ-বাড়ির সর্বেসর্বা। বামদেব ক্বচিৎ কালেভদ্রে এখানে এলেও এ-বাড়ি সম্পর্কে এতকাল তার কোনই আগ্রহ ছিল না। পিতৃপুরুষের নবাবী আমলের পুরাতন এই ভাঙা বাড়িটার ওপরে তার কোনরূপ আকর্ষণই ছিল না। এবং এ-বাড়ি এইভাবেই হয়ত পড়ে থাকত, যদি না আচমকা গুজরাটী ব্যবসাদার রানা এই বাড়ি কেনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত।

কিন্তু হঠাৎ রানাই বা এ বাড়িটা কেনবার জন্য এত আগ্রাহন্বিত হয়ে উঠল কেন?

খাগড়াই বাসনের ফ্যাক্টরি খুলবে স্রেফ একটা বাজে কথা। এ-বাড়ি কেনবার পিছনে আসল উদ্দেশ্য যে তার অন্য, সেটা বুঝতে বিনয়ের অন্তত কষ্ট হয়নি।

বাড়িটা সে কিনতে ইচ্ছুকই শুধু নয়, বিশেষভাবেই ইচ্ছুক। উদ্দেশ্যটাই বা কি?

বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই। নচেৎ বাড়ির মূল্য বাবদ এই ভাঙা লেকেলে একটা বাড়ির পিছনে নিছক খেয়ালের বশে আজকালকার দিনে কেউই অতগুলো টাকা ঢালতে এগিয়ে আসবে না। বিশেষ করে রানার মত একজন ঝানু ব্যবসাদার। যারা প্রতি টাকার পিছনে অঙ্ক কষে লাভটা বুঝে চলে এবং শুধু রানাই নয়, আরো একজন

খরিদ্দার এগিয়ে এসেছে বাড়িটার জন্য।

অতএব এর পশ্চাতে একটা যে রহস্য আছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সেদিন রাত্রে কিরীটীর সঙ্গে কথা বলেও সেই রকমই মনে হয়েছে বিনয়ের।

॥ দশ ॥

একটু তন্দ্রামতও যদি আসত। চোখের পাতা থেকে ঘুম যেন আজ একেবারে লোপ পেয়েছে।

সত্যি, আজ রাতে ঘুম আসবেই না নাকি। মাথার বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে হাতঘড়িটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল বিনয়।

অন্ধকারেও রেডিয়াম ডায়ালের সময়-সঙ্কেতের অক্ষরগুলো জোনাকির আলোর মত জ্বলজ্বল করছে।

আশ্চর্য, রাত দশটা বেজে দশ মিনিট মাত্র।

শয্যা হতে উঠে পড়ল বিনয়। চোখেমুখে একটু জল দিলে। যদি ঘুম আসে।

ঘরের কোণে মাটির সরাইয়ে ঠাণ্ডা জল ছিল, সেই জল হাতে ঢেলে বেশ করে চোখে মুখে ঘাড়ে ঝাপটা দিয়ে ভিজিয়ে দিল।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি যেন অনেকটা প্রশমিত হয়।

এগিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বিনয় শিয়রের ধারে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়ায়।

রাত্রির ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া সিক্ত চোখেমুখে একটা স্নিগ্ধ পরশ দেয়।

নীচের বাগানে অন্ধকারে গাছপালাগুলো এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড ভাবে যেন স্তূপ বেঁধে আছে।

অন্ধকার যেন জায়গায় জায়গায় একটু বেশী ঘন হয়ে উঠেছে। একটু বেশী স্পষ্ট।

এই বাগান অতিক্রম করেই নাটমন্দির এবং তার পশ্চাতে সেই মজা দিঘিটা।

অন্যমনস্ক বিনয় সিগারেটটায় মৃদু টান দিচ্ছিল, সামনের অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। অনেক দূরে গাঢ় অন্ধকারের বুকে হঠাৎ একটা রক্তচক্ষুর মত লাল আলো দেখা যাচ্ছে যেন। আলোটা মাটি থেকে হাত-চার-পাঁচ উপরেই হবে বলে মনে হচ্ছে। বিস্মিত বিনয় একদৃষ্টে লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ তার মনে হল, আলোটা এদিক ওদিক দুলছে না। হ্যাঁ, তাই তো। দুলছেই বটে। জমাট-বাঁধা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা রক্তপদ্ম যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে এদিক-ওদিক দুলছে।

দু মিনিট সময় প্রায় লাল আলোটা শূন্যে অন্ধকারের মধ্যে এদিক-ওদিক দুলে হঠাৎ দপ করে একসময় আবার নিভে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত বিনয় বোবা বিস্ময়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতিমধ্যে জলন্ত সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে তর্জনী ও মধ্যমার বন্ধনীকে প্রায় স্পর্শ করে। তর্জনী ও মধ্যমায় একটা তাপ অনুভূত হয়।

হঠাৎ চমকে উঠে নিঃশেষিতপ্রায় দগ্ধ সিগারেটের শেষ জলন্ত প্রান্তটুকু মাটিতে ফেলে দিযে পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘষে নিভিয়ে দিল বিনয়।

দূরে হলেও লাল আলোটা নীচের বাগানেব দক্ষিণ প্রান্ত থেকেই দেখা গিয়েছিল। দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীর। প্রায় একমানুষ সমান উঁচু প্রাচীর। আজই তো দ্বিপ্রহরে বিনয ঘুরে ঘুরে দেখেছে ওখানে যাতায়াতেব কোন পথ নেই।

শেষ সীমানায় প্রাচীর।

মন স্থির করে ফেলে বিনয় এবার আর কালক্ষেপ করে না।

বালিশের তলা থেকে পাঁচ-সেলের হান্টিং টর্চটা হাতে নিযে গায়ে একটা শার্ট চড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বিনয়।

নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে এল। নীচের সদর দরজাটা হাঁ হা করছে খোলা, নজরে পড়ল তার। কোন কিছু ভাববার সময় আর নেই তখন। খোলা দরজাপথেই বের হয়ে গেল বিনয়। দ্রুতপাযে ঘুবে বাড়ির পশ্চাতে বাগানে এল। অনুমানে যেদিকটা হতে অন্ধকাবে লাল আলোটা ক্ষণপূর্বে দেখা গিয়েছিল সেই দিকেই অগ্রসর হল সন্তর্পণে।

বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে হস্তধৃত টর্চের আলোর সাহায্যে এদিক-ওদিক খর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল বিনয।

হঠাৎ মাটির আগাছার ওপরে একটা বস্তু ওর দৃষ্টিকে আকর্ষণ কবে। একটি বর্মা চুরুটেব জলন্ত শেষাংশটুকু।

একটা সূক্ষ্ম ধোঁয়ার রেখা জলন্ত চুরুটের প্রায়-ভস্মাবশেষ থেকে তখনও সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে উপরের দিকে উঠছে এবং আশেপাশে দগ্ধ চুরুটের একটা উগ্র কটু গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তখনো।

তাহলে এখানে ক্ষণপূর্বে নিশ্চয়ই কেউ ছিল। ঐ জলন্ত চুরুটের শেষাংশটুকুই তার অবিসংবাদিত প্রমাণ। কেউ ছিল এখানে এবং যে ছিল সে চুরুট-সেবনে অভ্যস্ত।

পোড়া চুরুটের জলন্ত শেষাংশটা মাটিতে ঘষে নিভিয়ে পকেটে ভরে নিয়ে বিনয় আবার এগিয়ে চলে। কিন্তু আর কিছুই চোখে পড়ে না।

অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে অন্যমনা হয়ে অবশেষে বিনয় একসময় এমন একটা জায়গায়

এসে পড়ে যার আশেপাশে বেশ গভীর জঙ্গল। খেয়াল হতে আর পথ চিনে উঠতে পারে না বিনয়। সর্বনাশ। এ কোথায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল সে? যেদিকে পা বাড়াতে যায় আগাছা ও কাঁটাঝোপে বাধা পড়ে এগুতে পারে না। এত ঘন কাঁটাজঙ্গল যে তার মধ্যে দিয়ে পথ করে নেওয়াই দুঃসাধ্য। বুনো লতায় পা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত।

বিনয় যেন গলদঘর্ম হয়ে ওঠে। এ কি ফ্যাসাদেই পড়ল সে।

এ কি গোলকধাঁধা? কোথায় নির্গমনের পথ? মাথা তুলে চারদিকে তাকিয়ে রত্নমঞ্জিলেরও হদিস পায় না। ঘন আগাছা ও বুনো গাছপালায় দৃষ্টি ব্যাহত হয়।

হঠাৎ একটা সুমিষ্ট মেয়েলী হাসির খিলখিল শব্দে চমকে ওঠে। হাসির রেশটা অন্ধকারের বুকে একটা শব্দতরঙ্গ তুলে গেল যেন।

বিস্মিত হতচকিত বিনয় এদিক-ওদিক তাকায় অন্ধকারে। কে? কে হাসলে অমন করে? কে?

আবার সেই মিষ্টি খিলখিল হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল।

কে—কে হাসছ? চিৎকার করে বলে বিনয় যেন মরীয়া হয়ে, কিন্তু চিৎকার করলেও শব্দটা যেন গলা দিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় না।

প্রত্যুত্তরে আবার সেই হাসি শোনা যায়।

কে? কে?

আমি। মেয়েলী কণ্ঠে প্রত্যুত্তর এল এবারে।

তুমি কে?

আমি রাত্রি।

রাত্রি!

হ্যাঁ, পথ হারিয়ে ফেলেছেন তো?

বিনয়ের মনে হয় যেন খুব কাছ থেকেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল। এদিক ওদিক তাকিয়েও কিন্তু বিনয় কাউকে দেখতে পেলে না।

কোথায় তুমি?

কাছেই আছি। পথ হারিয়ে ফেলেছেন তো। থাকুন এখন বাকি রাতটুকু, পথ খুঁজে পাবেন না। মাথা খুঁড়ে মরলেও না।—কৌতুকে যেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ।

পথ খুঁজে পাব না!

না। পথ জানলে তো পথ খুঁজে পাবেন। শুধু জঙ্গলই নয়, এটা হচ্ছে মা মনসার স্থান। ভীষণ সাপ ওই জায়গাটায়।

সাপ

হ্যাঁ। আর বেশীক্ষণ পথ খুঁজতে হবে না, ওরা এলো বলে।

কারা ?

কালসাপ সব। মা-মনসার চেলারা।

তুমিও তো আছ।

আমাকে ওরা চেনে, আমায় ছোবল দেবে না।

বিনয় অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মেয়েটির কণ্ঠস্বরও আর শোনা যায় না।

একসময় বিনয়ই আবার প্রশ্ন করে, আছ না চলে গেলে ?

যাইনি, আছি। কিন্তু কেন বলুন তো ? জবাব এল।

আমাকে একটু পথটা দেখিয়ে দাও না।

বা রে আব্দার। আমি পথ দেখাতে যাব কেন ?

পথটা খুঁজে পাচ্ছি না যে—

উঁহু। দেবো না।

দেবে না ?

না। ঠিক আছে, একটা শর্তে পথ দেখিয়ে দিতে পারি—

কি শর্তে ?

রত্নমঞ্জিল ছেড়ে চলে যাবে বল। কথা দাও, তাহলেই পথ দেখিয়ে দেবো। রাজী আছ আমার ঐ শর্তে ?

না।

তবে থাকো। ভাবছ দিনের বেলায় পথ খুঁজে পাবে। তা হচ্ছে না, তার আগেই তোমার মৃতদেহ রাণীদিঘির পাঁকের তলায় পুঁতে ফেলবে।

কে—কে পুঁতে ফেলবে ?

কেন, দুর্বাসা মুনি।

দুর্বাসা মুনি ? সে আবার কে ?

এসে যখন ঘাড় টিপে ধরবে তখনই জানতে পারবে দুর্বাসা মুনি কে। তার চাইতে যাও না কলকাতায় ফিরে। কেন মিথ্যে প্রাণ দেবে।

প্রাণের ভয় আমি করি না।

প্রাণের ভয় করো না।

না।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কোন পক্ষেরই কোন সাড়া নেই। হঠাৎ আবার মেয়েটির

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এবারে একেবারে পাশে, এস, আমার হাত ধর।

আশ্চর্য।

চকিতে কণ্ঠস্বর শুনে বিনয় ফিরে তাকিয়েছে। সামনেই অন্ধকারে গুণ্ঠনবতী এক নারীমূর্তি। প্রসারিত হাত।

হাত ধর। গুণ্ঠনবতী নারী আবার আহ্বান জানাল।

সে যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠেছে একটা চকিত বিস্ময়ের মত।

চল আর দেরি করো না, টের পেলে বিপদে পড়বে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বিনয় হাতটি তার বাড়িয়ে দিল। একটি কোমল হাত তার মণিবন্ধ চেপে ধরল। স্পর্শ তো নয়, একটা পুলক-কোমল শিহরণ। রহস্যময়ী পথ-প্রদর্শিকার এই পথ যে অত্যন্ত সুপরিচিত, চলতে চলতে বিনয় খুব ভাল ভাবেই সেটা বুঝতে পারছিল।

ফণীমনসা ও কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে অন্যথায় এই অন্ধকারে অক্লেশে সহজ গতিতে ঐভাবে কারো পক্ষেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

নিঃশব্দেই দুজনে অন্ধকারে কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছিল। এবং ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে বিনয়ের সমস্ত মন জুড়ে একটিমাত্র স্পর্শের অনুভূতিই তার সমগ্র চেতনাকে যেন একটি মিষ্টি-স্নিগ্ধ সৌরভের মতই আমোদিত করে রেখেছিল, যে কোমল পেলব মণিবন্ধটি সে পরম বিশ্বাসে ও আশ্বাসে নিবিড় করে ধরেছিল তারই স্পর্শটুকু।

মিনিট-পাঁচ-সাত ঐভাবে চলবার পর হঠাৎ পথ-প্রদর্শিকা বলে উঠল, উঃ, হাতটা গেল আমার। কি শক্ত হাতের মুঠো আপনার।

লজ্জায় তাড়াতাড়ি বিনয় তার মুষ্টি ছেড়ে দিল। সত্যি, আমি দুঃখিত।

আচ্ছা এবারে আমি বিদায় নোব। ঐ যে দেখুন সামনে রত্নমঞ্জিল। এবারে নিশ্চয়ই চিনে যেতে পারবেন।

বিনয় তাকিয়ে দেখল, এ সেই জায়গা উদ্যানের মধ্যে আজ রাত্রে যেখানে দোতলায় নিজের শোবার ঘরের জানালা থেকে সেই লাল আলোর নিশানা চোখে পড়েছিল। হ্যাঁ, এবারে সে চিনে রত্নমঞ্জিলে যেতে পারবে। আর পথ হারাবার ভয় নেই। একটু এগিয়ে গেলেই সেই নাটমন্দির। তারপর তো সব তার চেনাই।

হ্যাঁ, পারব। ধন্যবাদ আপনাকে—কথাটা বিনয়ের শেষ হল না, বিস্ময়ে তখন সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

আশেপাশে তার কোথাও সেই ক্ষণপূর্বের রহস্যময়ী পথ-প্রদর্শিকা নেই। যাদুর মতই অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। তথাপি বৃথাই এদিক-ওদিক দু-চার পা অগ্রসর

হয়ে অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে ডাকতে লাগল, কোথায় গেলেন ? শুনছেন ? কোথায় গেলেন ?

কারো কোন সাড়া নেই। অকস্মাৎ সে স্বপ্নের মতই যেন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কেবল হাতের পাতায় ক্ষণপূর্বের সেই কোমল স্পর্শানুভূতিটুকু লেগে আছে অবশিষ্ট তখনো।

এদিকে রাতও প্রায় শেষ হয়ে এল।

রাত্রিশেষের হাওয়ায় কেমন একটা আলতো ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। আকাশের তারাগুলোও যেন সারাটা রাত জেগে থেকে এখন ঝিমিয়ে এসেছে। তাদের চোখেও বুঝি ঘুম লেগেছে।

বিনয় এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল। সদর দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে খোলা।

নীচের এই সদর-দরজাটা তো বন্ধ থাকার কথা। খোলা আছে কেন ? এখন মনে পড়লো, যাবার সময়ও দরজাটা এমনিই খোলা ছিল। দরজাটা বন্ধ করতে যাবে বিনয়, বাইরে কার মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল। থমকে দাঁড়াল সে

মনোহর।

এত রাত্রে মনোহর বাড়ির বাইরে কোথায় গিয়েছিল ?

মনোহর। ডাকে বিনয়।

মনোহরও বোধ হয় বিনয়কে দরজার গোড়ায় দেখবে প্রত্যাশা করেনি ঐ সময় বিনয়কে দরজার সামনে দেখে মনোহরও থমকে দাঁড়িয়েছিল।

দাদাবাবু আপনি।

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি। তুমি এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে মনোহর ?

মনোহর তখন তার গায়ের চাদরের নীচে একটা কি যেন লুকোতে ব্যস্ত।

বিনয়ের সে ব্যাপারটা নজর এড়ায় না।

আজ্ঞে, এই একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

কখন গিয়েছিলে ?

এই তো কিছুক্ষণ আগে।

কিছুক্ষণ আগে মানে ঘণ্টা দু-তিন আগে বল ?

আজ্ঞে না। এই তো মিনিট দশেক হবে।

কিন্তু এভাবে রাত্রে সদর খুলে রেখে গিয়েছিলে, যদি চোর-টোর ঢুকত।

মনোহর হেসে ফেলে, চোর এখানে আসবে কোথা থেকে বাবু। মনোহর দাশের লাঠিকে ভয় করে না এ তল্লাটে এমন কেউ নেই বাবু।

বিনয় বুঝতে পারে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দোতলার সিঁড়ির দিকে পা

বাড়াল। সিঁড়ি অতিক্রম করে নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে এসে প্রবেশ করল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, রাত প্রায় পৌনে-পাঁচটা। আর ঘুমোবার চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বিনয় খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল।

শেষরাতের হাওয়া ঝিরঝির করে একটা স্নিগ্ধ পরশ দিচ্ছে। বার বার মনের মধ্যে এসে উদয় হচ্ছে ক্ষাপূর্বের সেই রহস্যময়ী কৌতুকপ্রিয় পথ-প্রদর্শিকার কথাই—কণ্ঠস্বরে ও সামান্য কিছুক্ষণের মৃদু কোমল একটি স্পর্শের মধ্যে দিয়ে যে তার অপূর্ব একটি ক্ষা-পরিচয় মাত্র রেখে গিয়েছে।

সমগ্র ব্যাপারটা যেন এখনো বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। ঐ জঙ্গলের মধ্যে কোথা থেকে এলো ঐ মেয়েটি। আর সে জানলেই বা কি করে যে, বিনয় কাঁটাঝোপের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তবে কি আগে হতেই মেয়েটি তাকে অলক্ষ্যে থেকে অনুসরণ করছিল।

ওই জঙ্গলের মধ্যে সব কিছুই যেন মনে হলো মেয়েটির সবিশেষ পরিচিত।

মেয়েটি বলেছিল দুর্বাসা মুনির কথা। কে সে দুর্বাসা মুনি। মেয়েটি তাকেও ভয় করে। কিই বা সম্পর্ক দুর্বাসার সঙ্গে মেয়েটির।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল প্রায়। নিঃশেষিত-প্রায় সিগারেটটি জানালাপথে নীচে ফেলে দিয়ে বিনয় শয্যার উপরে এসে গা এলিয়ে দিল।

॥ এগার ॥

অজগরের চোখের সম্মোহনে যেমন শিকার সামনের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে, ঠিক তেমনি করেই ছট্টুলাল এগিয়ে গিয়ে মাটিতেই বসে পড়লো।

হাত বাড়িয়ে লোকটা ঘরের কোণে প্রজ্বলিত প্রদীপের শিখাটা একটু উসকে দিল।

আলোর তাতে করে বিশেষ উনিশ-বিশ হল বলে মনে হয় না, তবে প্রদীপের সেই আলোয় এবার ছট্টুলাল যেন নিজের অজ্ঞাতেই লোকটার মুখের দিকে তাকাল। অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লোকটার চেহারা।

মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁফ। বয়েস হলেও লোকটার শরীরের বাঁধুনি যেন এখনও অটুটই আছে। পরিধানে একটা লাল রংয়ের কাপড়। খালি গা। গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা। দেহের সমস্ত পেশী এখনও সজাগ ও স্পষ্ট। লোকটা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি হবে। চওড়া বক্ষপট। উন্নত সুদৃঢ় স্কন্ধ। কিন্তু চোখ দুটো

হিংস্র জন্তুর মত যেন ঝকঝকে করে জলছে দু খণ্ড জলন্ত অঙ্গারের মত।

সে চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

ছট্টুলাল দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে একবার তাকাল। ঘরের মধ্যে আসবাব বিশেষ কিছু নেই। এক কোণে একটা টিনের রং ওঠা সুটকেস। একটা মলিন সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। একটা মাটির কুঁজো ও গোটা দুই অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস ও থালা।

হঠাৎ ছট্টুলাল পুনরায় লোকটার ভারী গলার প্রশ্নে চমকে উঠল, তোর নাম কি?

ছট্টুলাল যেন প্রশ্নটা শোনেনি এমনি ভাব দেখাবার চেষ্টা করল।

এই শুনছিস, তোর নাম কি?

আমার!

তোর নয় তো কি আমার?

আমার নাম গোবিন্দলাল।

মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে বজ্রমুষ্টিতে ছট্টুলালের সামনেকার চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে প্রবলভাবে দুটো ঝাঁকুনি দিল লোকটা।

সেই ঝাঁকুনির চোটে ছট্টুর মনে হল তার মাথাটাই বুঝি দেহ থেকে আলগা হয়ে এল। দু চোখের তারায় যেন একরাশ সর্ষেফুল ঝিকমিক করে উঠল।

ধাপ্পা দেওয়ার আর জায়গা পাসনি বেটা! তোর নাম আমি জানতে পারব না ভেবেছিস!

আমার নাম তো গোবিন্দলালই। তবু পুনরাবৃত্তি করে ছট্টুলাল।

নাম তোর আমি ঠিক জেনে নেব। রত্নমঞ্জিলের চারপাশে ক'দিন ধরে ঘুরঘুর করছিস কেন বল!

ঘুরঘুর তো আমি করিনি।

ফের মিথ্যে কথা! আর একটা ধমক দিয়ে ওঠে লোকটা।

মিথ্যে কথা বলব কেন?

মিথ্যে কথা বলবি কেন! হুঁ, তোর চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে তুই জীবনে কটা সত্যি বলেছিস! শোন্, সত্যি কথা বলিস তো তোকে ছেড়ে দেব। আর যদি মিথ্যে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করিস, খুন করে তোকে রত্নমঞ্জিলের ঐ রাণীদিঘির পাঁকের তলে পুঁতে রাখব। বল্ এখনো সত্যি কথা!

ছট্টুলাল সত্যি এবারে রীতিমতই ভাবিত হয়ে ওঠে।

লোকটার চেহারা ও কথাবার্তাতেই মালুম হচ্ছে লোকটা মোটেই সুবিধার নয়। মুখে যা বলছে কাজে করতেও হয়ত ওর বাধবে না। কিন্তু ছট্টুলালও জাত-

সাপ। যার কাজের ভার নিয়ে ছট্টুলাল এখানে এসেছে সেই রতনলাল যানাও খুব সহজ ব্যক্তি নয়।

তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে সেও ছেড়ে কথা বলবে না। বিশেষ করে তার অনুচর পিয়ারী একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান বললেও অত্যুক্তি হবে না। পিয়ারীর অসাধ্য কিছুই নেই।

রতনলালের সামান্য ইঙ্গিতেই তার হাতের গুপ্ত ছোরা ঝিকমিকিয়ে উঠবে এবং নির্ভুলভাবেই ছট্টুর কলিজাটা ফাঁসিয়ে দেবে।

জলে বাঘ, ডাঙায় কুমীর।

তাছাড়া রতনলালকে এই জব্বর খবরটা দিতে পারলে মোটামত কিছু বকশিশও মিলত। তা সেও তো এখন সুদূরপরাহত। এই দুশমনটার হাত থেকে আপাততঃ কোন মুক্তির পথও ছট্টু ভেবেই পাচ্ছে না। চকিতে একটার পর একটা চিন্তাগুলো ছট্টুর মাথার মধ্যে খেলে যায়।

কিন্তু রতনলালের কথা পরে ভাবলেও চলবে, আপাততঃ এই দিকটা সামলাতে হবে।

কিন্তু ছট্টুলাল ভেবে পাচ্ছে না, ঠিক কোন্ পথে এগুলে বর্তমানের এই সঙ্কটকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে।

শক্তির প্রথম পরিচয়েই ছট্টুলাল বুঝতে পেরেছে, গায়ের শক্তিতে এই লোকটার সঙ্গে ছট্টু পেরে উঠবে না।

কি রে, জবাব দিচ্ছিস না কেন?

ছট্টুলাল জবাব দেবে কি, তখনও ভাবছে। সে চুপ করেই থাকে। লোকটাও বুঝতে পারে সহজে ছট্টুর মুখ থেকে জবাব বের করা যাবে না।

সেও এতক্ষণে মনে মনে অন্য উপায়ই ভাবছিল। ঘরের কোণে একটা মোটা দড়ি পড়ে ছিল, উঠে গিয়ে সেই দড়িটা যেমন লোকটা আনতে যাবে ছট্টু দেখল এই সুযোগ, চক্ষের পলকে সে দাঁড়িয়ে উঠেই এক লাফে ঘরের বাইরে চলে এল এবং অন্ধকারে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুট দিল।

অন্ধকারে কাঁটাঝোপে শরীর ও হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে লাগল ছট্টুর, কিছুতেই খেয়াল নেই। যেমন করে হোক পালাতে হবে। সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

ঘরের মধ্যে সেই দাড়িগোঁফওয়ালা লোকটা কল্পনাও করতে পারেনি যে ছট্টু হঠাৎ উঠে পালাতে সাহস পাবে।

ছট্টু হঠাৎ উঠে লাফিয়ে ঘরের বাইরে যেতে সেই লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ঘরের

বাইরে এল, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারল না কোন্ দিকে ছট্টু ছুটে পালিয়েছে।

তথাপি আন্দাজের উপরে নির্ভর করে কিছুদূর এগিয়ে গেল, কিন্তু পলাতক ছট্টুর সন্ধান করতে পারলে না অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে।

ঐ ঘটনার দিন-দুই বাদে সন্ধ্যার দিকে রতনলালের অফিসে আবার ছট্টুলালকে দেখা গেল। রতনলাল চেয়ারে বসে, থমথম করছে তার মুখটা। সামনে দাড়িয়ে ছট্টুলাল।

রতনলালের পাশেই অন্য একটা চেয়ারে উপবিষ্ট পিয়ারী নিঃশব্দে একটা সিগারেট টেনে চলেছে। হাতে ধরা একটা মার্কোভিচের টিন।

ছট্টুর মুখে সবই শুনেছে রতনলাল। বামদেব বিনয় প্রভৃতির রত্নমঞ্জিলে যাওয়াটার মধ্যে রতনলাল তেমন বেশী গুরুত্ব দেয়নি। চিন্তিত বিশেষভাবেই হয়ে উঠেছে সে কোন এক তৃতীয় দাড়িগোঁফওয়ালা শক্তিশালী লোকের সংবাদটা পেয়ে।

লোকটা কে? কেনই বা সেখানে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে? ঐ লোকটাও কি তবে ঐ রত্নমঞ্জিলের আশা নিয়েই ওখানে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে, না ঐ লোকটাই সেই দু'নম্বর পার্টি যে বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে তার হাত থেকে রত্নমঞ্জিল ছিনিয়ে নিতে চায়।

পিয়ারীর দিকে তাকাল রতনলাল। পিয়ারী বুঝতে পারে রতনলাল তার সঙ্গে একটা কিছু পরামর্শ করতে চায়। গুজরাটি বুদ্ধিতে আর কুলোচ্ছে না।

পিয়ারী ছট্টুর দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা ছট্টু তুই এখন যা। কাল এই সময় একবার দেখা করিস।

ছট্টু সেলাম দিল, যাচ্ছি কিন্তু বহরমপুরে আর যেতে পারব না। শালা একেবারে সাক্ষাৎ দুশমন।

ছট্টু চলে গেল।

কিছুক্ষণ অতঃপর দুজনেই চুপচাপ বসে থাকে। কারো মুখেই কোন কথা নেই।

রতনলালই প্রথমে স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, পিয়ারী, তোমার কি মনে হচ্ছে?

দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও। ক্রমেই সব জটিল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

যত জটিলই হোক—একটা কথা, যেমন করে যে উপায়ে হোক আমার কিন্তু পিয়ারী ঐ রত্নমঞ্জিল চাই-ই। শালা জান কবুল তবু ঐ রত্নমঞ্জিল আমি কাউকে নিতে দেব না।

তা যেন হল, কিন্তু মাঝখান থেকে ঐ বেটা দাড়ি কোথা থেকে এল তাই তো ভাবছি!

চল না পিয়ারী, একবার বহরমপুর ঘুরে আসা যাক।

উহু। সেখানে গিয়ে ভিড করে কোন লাভ হবে না। তার চাইতে আমি বলি কি, এ গোলমালে কাজ কি বাবা। দাও না বাড়িটা ছেড়ে।

ছেড়ে দেব! কভি না। বললাম তো জান কবুল, শেষ পর্যন্ত দেখব।

শোন রতনলাল, এসব ব্যাপারে জলের মত টাকা খরচ করতে হবে। পারবে? রাজী আছ?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটা উদ্ধার করে যদি দেখা যায়, ওসব গুপ্তধন টন স্রেফ সব ধাপ্পা, কিছুই নেই, তখন সে টাকার শোক সামলাতে পারবে তো বন্ধু।

মরদবাচ্চা আমি। টাকা বহু কামিয়েছি জীবনে পিয়ারী—এক দু লাখ যদিই যায় তো পরোয়া করি না। মোদ্দা কথা রত্নমঞ্জিল আমার চাই—

ঠিক?

ঠিক। রানা সজোরে টেবিলের উপরে একটা ঘুষি বসাল।

হুঁ, তাহলে শোন রানা। এসব ব্যাপারে টাকা তো খরচ করতেই হবে, কৌশলেরও দরকার, ওসব ছট্টুলালদের দ্বারা হবে না। আমি নিজে যাব বহরমপুর। সেখানে গিয়ে আগে সব ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে দেখি, তারপর—

কবে যাবে?

যত তাড়াতাড়ি পারি যাব। কিছু টাকা দাও।

টেবিলের টানা চাবি দিয়ে খুলে একমুঠো নোট বের করে পিয়ারীর সামনে রাখলে রানা।

একান্ত নির্বিকারভাবেই পিয়ারী নোটগুলো নিয়ে পকেটে রাখল।

পিয়ারী রানার বহুদিনকার পরিচিত।

পিয়ারীর ক্ষমতার উপরেও রানার যথেষ্ট আস্থা আছে।

যুদ্ধের সময়ে ব্যবসার একটা অংশ যখন চোরাপথে বাঁকাভাবে চলছিল, সেই বাঁকা-পথেই পিয়ারীর সঙ্গে আলাপ হয় রতনলাল রানার এবং সেই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

পিয়ারীর পদবী কি এবং কোথায় তার দেশ, কি তার জাত, কি মাতৃভাষা—কেউ কোনদিন জানতে পারেনি।

উর্দু, হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজী চার-চারটে ভাষায় পিয়ারী এত সহজভাবে কথাবার্তা চালাতে পারে যে ওর মধ্যে কোন্‌টা তার মাতৃভাষা বোঝাই দুষ্কর।

অত্যন্ত ঢ্যাঙা, রোগা। পরিধানে কখনো থাকে দামী স্যুট। প্রত্যেকটা ক্রিজ

তার স্পষ্ট। আবার কখনো থাকে পায়জামা-পাঞ্জাবি, সেরওয়ানি অথবা ধুতি-পাঞ্জাবি ও তার উপরে জহরকোট। হাতে সর্বদা একটি মার্কোভিচের টিন ও সিগারেট-লাইটার।

কথাবার্তা বলে খুব কম। এমন একটা কঠিন গাম্ভীর্যের আবরণ দিয়ে সর্বদা নিজেকে আবৃত রাখে যে আপনা হতেই তাকে যেন এড়িয়ে চলবার ইচ্ছা হয় সকলের।

পিয়ারী বা মিঃ পিয়ারী নামেই সে সর্বত্র পরিচিত।

পিয়ারীকে বিশ্বাস করবার রতনলালের কারণও ছিল, যেহেতু দু-তিনবার অত্যন্ত দুরূহ জটিল ব্যাপারে পিয়ারী তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে।

তবে পিয়ারীর পলিসি হচ্ছে ফেল কড়ি মাখ তেল।

সেই পিয়ারী যখন স্বেচ্ছায় রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারটা নিজহাতে তুলে নিল, রতনলাল সত্যিই অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করল।

অর্থব্যয় হবে ঠিক, কিন্তু যাহোক একটা ফয়সালা পিয়ারী করে দেবেই শেষ পর্যন্ত একটা কিছু।

রতনলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিয়ারী তার অফিস-কামরা হতে বের হয়ে এল। সিঁড়ির সামনে এসে তার সর্বোচ্চ ধাপের ওপরে দাড়িয়ে হাতের টিন থেকে একটা সিগারেট বের করল।

ওষ্ঠপ্রান্তে সিগারেটটা চেপে ধরে তাতে অগ্নিসংযোগ করল লাইটারের সাহায্যে। তারপর ধীরমন্থর পদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

এতদিন রানার রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারটা তার মাথার মধ্যে ভাল করে থিতোয়নি।

রানার মুখে দু-চারবার শুনেছে মাত্র। অবশ্য রত্নমঞ্জিলের মোটামুটি ইতিহাস তার অজ্ঞাত নয়।

রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে এতদিন সে বেশী মাথা ঘামায়নি, কারণ ওই ব্যাপারে তার এতদিন ততটা ইন্টারেস্ট ছিল না। কিন্তু এবারে তাকে ভাবতেই হবে।

রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারে খণ্ড খণ্ড ভাবে এতদিন যা সে শুনেছে এখন সেগুলো সব একত্রে গ্রথিত করে অখণ্ডভাবে চিন্তা করবার চেষ্টা করে। এ পর্যন্ত রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে যা জানা গিয়েছে সে সব কিছু একত্রে দেখলে দাড়াচ্ছে, যে কোন কারণেই হোক ঐ পুরনো বাড়ি রত্নমঞ্জিলের একটা সিক্রেট বা রহস্য আছে। এবং সেই কারণেই রতনলাল ছাড়াও রত্নমঞ্জিলের দ্বিতীয় খরিদ্দার মাথা তুলেছে।

এই দ্বিতীয় খরিদ্দারটি কে?

তবে এও ঠিক লোকটা যে সম্পদশালী তা বোঝাই যাচ্ছে, নচেৎ রানার সঙ্গে টেক্কা

দেবার সাহস হত না। এই হচ্ছে প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ রামদেব অধিকারী হঠাৎ বহরমপুরে গেলেন কেন?

তৃতীয়তঃ শ্রীমান দাড়িটি কে?

একটা দিন ও রাত পুরো নিজের মনে মনে চিন্তা করল পিয়ারী এবং নিজের কার্য-পদ্ধতিও ছকে ফেলল একটা।

॥ বারো ॥

সুজাতা বা রামদেব কাউকেই ঘুণাক্ষরেও সেরাত্রের অভিযানের কথা বিনয় ইচ্ছা করেই জানাল না এবং তারপর পর পর দুটো দিন সারাটা দুপুর বিনয় একা একা বাড়ির পিছনে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

কিন্তু সেরাত্রের সেই কাঁটাঝোপের কোন হদিসই পেল না। কোথায় গিয়ে যে সে পথ হারিয়েছিল বুঝতেই পারল না। জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা অগ্রসর হবার পর ফণীমনসা ও নানা জাতীয় বন্যগুল্ম কাঁটাঝোপ এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দাড়িয়ে আছে যে তার মধ্যে প্রবেশ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য।

শুধু তাই নয়, রত্নমঞ্জিলের একটা ভগ্নাংশ যেটা গত ভূমিকম্পের সময় ধ্বসে গিয়েছিল, সেটাও ঐ জঙ্গলের মধ্যেই যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ভগ্ন দালান ও জঙ্গল দুটোতে মিলে জায়গাটা অগম্য ভয়াবহ করে রেখেছে। যত বিষধর সাপের আড্ডা সেখানে এখন।

যাই হোক বার বার ব্যর্থ হলেও বিনয় দমল না। অফিস থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে এল পরের দিন কলকাতায় গিয়ে। তারপর ঐ জঙ্গল ও ভগ্ন ধ্বংসাবশেষ দালানের আশেপাশে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেমন করে যে উপায়েই হোক সেই রাত্রের রহস্যময়ী নারীকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সেই মজা জঙ্গলাকীর্ণ দিঘিটার আশেপাশেও কম ঘোরাঘুরি করেনি বিনয়। সেই দাড়িগোঁফশোভিত মুখখানার দেখাও আর মেলেনি যেমন তেমনি মেলেনি সেই দেখা রহস্যময়ীর।

এদিকে দিনসাতেক হয়ে গেল কিরীটী রায়ের দেখা মিলল না।

এমনি করে আরো দুটো দিন কেটে গেল।

সেদিন সকালে সবে দোতলার বারান্দায় চায়ের আড্ডাটা জমে উঠেছে, এমন সময় মনোহর এসে বললে কে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান কর্তাবাবুর সঙ্গে। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন, ভদ্রলোক নাকি কলকাতা থেকে আসছেন।

বামদেব বিস্মিত হলেন। কলকাতা থেকে এত দূরে কে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল।

বললেন, যা, উপরেই পাঠিয়ে দে।

মনোহর চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

আর কেউ নয়। আগন্তুক স্বয়ং পিয়ারী।

পরিধানে দামী মুগার স্যুট। মাথার চুল থেকে পায়ের দামী গ্রেসকীডের জুতোটি পর্যন্ত চকচকে ঝকঝকে পালিস করা, হাতে মার্কোভিচের টিন।

মুখে একটা আলগোছে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট।

যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে—আপনিই বোধ হয় মিঃ অধিকারী।

হ্যাঁ। আপনি?

গুড মর্নিং।

গুড মর্নিং। স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন বামদেব পিয়ারীকে, যদিচ তাকে চিনতে পারলেন না।

বামদেব যে পিয়ারীকে চিনতে পারবেন না সে তো জানা কথাই, কারণ ইতিপূর্বে কখনো তো তাকে তিনি দেখেননি।

বিনা আহ্বানেই একটা খালি চেয়ার টেনে বসতে বসতে পিয়ারী বললে, আমি আপনার পরিচিত নই মি. অধিকারী, আপনি আমাকে তাই চিনতে পারছেন না।

না—

আমি আসছি কলকাতা থেকে বিশেষ একটা কাজে আপনার কাছে। আমার নাম পিয়ারীলাল দেশমুখ। পিয়ারী বলেই লোকে আমায় জানে।

কিন্তু কাজটা কি বলুন তো?

এই রত্নমঞ্জিল আপনার কাছ থেকে আমি কিনতে চাই।

বামদেব সত্যিই এবারে চমকে উঠলেন।

আবার রত্নমঞ্জিলের নতুন ক্রেতা।

বিনয়ও বিস্মিত দৃষ্টি তুলে নতুন করে আবার পিয়ারীর দিকে তাকাল। আবার একজন ক্রেতা।

কিন্তু বাড়ি তো ইতিপূর্বেই বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে মি. পিয়ারী। বললেন বামদেব।

মৃদু হাসলে পিয়ারী।

বায়না নেওয়া হয়ে গেছে? তা যাক না।

কি বলছেন আপনি ?

ঠিকই বলছি। বায়না অমন হয়ই। নাকচ করতে কতক্ষণ লাগবে মশাই ?

বিনয়ও অবাক হয়েছে যেন কথাটা শুনে।

নাকচ করব ?

হ্যাঁ, সব সংবাদই আমি নিয়ে এসেছি। পঞ্চান্ন হাজার টাকা দর হয়েছে তো ? আশি হাজার টাকা দাম আপনাকে আমি দেব। ঐ সঙ্গে বায়নার টাকাও দেব। বলুন, isn't a fair offer !

বক্তব্যের শেষে বিশেষ করে ঐ শেষ কটি কথার ওপর জোর দিয়ে পিয়ারী বামদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে হাতের অর্ধনিঃশেষিত জ্বলন্ত সিগারেটটা তর্জনী মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে বারান্দার বাইরে নিক্ষেপ করে টিন হতে আর একটি সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করল।

বামদেব ভাবছিলেন, পঞ্চান্ন হাজার থেকে একেবারে আশি হাজার !

লোভনীয় টোপ বটে নিঃসন্দেহে।

ভেবে দেখুন মিঃ অধিকারী, আপনি যদি আমার terms-এ agree করেন তো এখুনি বায়না বাবদ ষাট হাজার আমি অগ্রিম দিতে প্রস্তুত। বলতে বলতে পিয়ারী আলতোভাবে ধীরে ধীরে মুখের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

টাকাটা যেন পিয়ারীর কাছে কিছুই নয় !

বামদেব নিশ্চুপ।

পিয়ারীই আবার কথা বলে, আমি অত্যন্ত সোজা এবং এক কথার মানুষ। বিজনেস যা করি তার মধ্যেও গোলমাল রাখতে ভালবাসি না।

পার্শ্বে উপবিষ্ট বিনয় বুঝতে পেরেছিল বামদেবের কোথায় দ্বিধা হচ্ছে। লোভনীয় টাকার পরিমাণে শুধু বামদেব কেন, যে কোন মানুষের পক্ষেই এক্ষেত্রে লোভ সামলানো দুষ্কর।

বিশেষ করে এই জীর্ণ বাড়িটার—যার ন্যায্য দাম পঁচিশ-ত্রিশ হাজারের বেশী কখনই হতে পারে না। সেক্ষেত্রে আশি হাজার টাকা একটা স্বপ্নাতীত ব্যাপার। শুধু তাই নয়, এ বাড়ির দাম আশি হাজার দিতে যে উদ্যত তার কাছ হতে এক লক্ষ টাকা পাওয়াও দুঃসাধ্য হবে না।

তাছাড়া আশি হাজার টাকা যখন বাড়িটার দাম উঠেছে, এর আসল মূল্যও নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশীই হবে। নচেৎ এই জীর্ণ একটা বাড়ির জন্য কোন পাগলও অত টাকা দিতে যেত না।

কিন্তু মিঃ পিয়ারী, তা তো হবার নয়। পরিষ্কার কণ্ঠে এবারে বিনয়ই জবাব দিল।

বিনয়ের কথা শুনে বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাকান পিয়ারী এবারে বিনয়ের মুখের দিকে।

আপনি ?

আমার আত্মীয়। জবাব দিলেন বামদেব।

ওঃ, কিন্তু কেন সম্ভব নয় বলুন তো ?

শুনলেন তো একটু আগেই মেসোমশাইয়ের কাছে, এ বাড়ি বিক্রয়ের জন্য বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

বললাম তো সে আর এমন একটা কঠিন ব্যাপার কি। ছেড়ে দিন না ব্যাপারটা আমার হাতেই, আমিই সব settle করে নেব। বাকি যা সামলাবার আমিই সামলাব।

না, তা আর হয় না মিঃ পিয়ারী। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, ক্ষমা করবেন। জবাব দিল আবার বিনয়ই।

অতঃপর পিয়ারী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করে।

তাহলে আমার অফারটা আপনারা নিচ্ছেন না।

দুঃখিত। বললে বিনয়।

মিঃ অধিকারী, আপনারও কি তাই মত ? পিয়ারী বামদেবের দিকে তাকিয়ে এবারে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ মিঃ পিয়ারী, ক্ষমা করবেন।

আচ্ছা তাহলে চলি। তবে একটা কথা যাবার আগে বলে যাই, আমার offerটা accept করলে হয়তো ভালই করতেন।

পিয়ারী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে।

পিয়ারীর কথার স্বরটাই যেন বিনয়ের ভাল লাগল না। সেও অনুরূপ কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে, কেন বলুন তো।

না, তাই বললাম—

আপনি যেন মনে হচ্ছে, আমাদের একটু থ্রেটেন করছেন মিঃ পিয়ারী।

যদি তাই মনে করেন মিস্টার তাই।

তাহলে আপনিও জেনে যান দশ লক্ষ টাকা দিলেও এ বাড়ি আপনি পাবেন না।

তাই বুঝি। আচ্ছা—সোজা হয়ে দাঁড়ায় পিয়ারী।

হ্যাঁ, আপনি যেতে পারেন।

পিয়ারীর চোখের তারা দুটো বিনয়ের চোখের ওপরে স্থিরনিবদ্ধ। এবং সে দৃষ্টিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গ যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাহলে দশ লক্ষ পেলেও দেবেন না?

না।

তাহলে আপনিও শুনে রাখুন, আমিও পিয়ারীলাল। নামটার সঙ্গে হয়তো আপনাদের সঠিক পরিচয় নেই। Well, I accept your challenge। হয় এ বাড়ি আমার হবে, আশি হাজারে নয় পঞ্চান্ন হাজারেই, অন্যথায় এ বাড়ি কেউ পাবে না। আপনাদেরও ভোগে আসবে না এ বাড়ি।

এই মুহূর্তে আপনি এখান হতে চলে যান।

বিনয়ের সমস্ত শরীর রাগে কাঁপছে তখন।

যাব বৈকি—আচ্ছা bye bye, আবার দেখা হবে। বলে দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে পিয়ারী জুতোর মচমচ শব্দ তুলে সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এবং পিয়ারীর ক্রমঅপস্রিয়মাণ দেহটা সিঁড়ির পথে মিলিয়ে গেল।

বামদেব বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি এই এক বাড়ি নিয়ে। মিথ্যে তুমি লোকটাকে চটাতে গেলে কেন বিনয়।

কি বলছেন আপনি মেসোমশাই, কোথাকার কে না কে, আমাদের বাড়িতে এসে চোখ রাঙিয়ে যাবে।

চটাচটি না করলেই হত। উপকার না করে করুক, অপকার করতে কতক্ষণ?

আপনি দেখছি ভয় পেয়ে গিয়েছেন মেসোমশাই।

ভয় নয় বিনয়, মিথ্যে ঝামেলায় লাভ কি?

তাই বলে ভয় দেখিয়ে যাবে?

কিন্তু বাবা এখানে আর নয়, চল আজই কলকাতায় ফিরে যাওয়া যাক।

না মেসোমশাই, এখন কলকাতায় যাওয়া হবে না।

কেন?

তবে শুনুন। অনেক কথা আছে আমার বলবার।

আবার কি কথা।

শুনুন। এ কদিন আমি চুপ করে বসে থাকিনি।

অতঃপর সংক্ষেপে গত দ্বিপ্রহর ও রাত্রির সমস্ত কাহিনী একে একে বলে গেল বিনয়।

বামদেব সব কথা শুনে তো নির্বাক।

ইতিমধ্যে পিয়ারীর সঙ্গে যখন বিনয়ের কথাবার্তা হয়, বিনয়ের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সুজাতাও একসময় সকলের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেও সমস্ত কথা শুনে বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

বিনয় বলে, নিশ্চয়ই এ বাড়ির পিছনে কোন জটিল রহস্য আছে, এখন তো বুঝতে পারছেন। এবং অন্যেও জানতে পেরেছে, তাই এ বাড়ি নিয়ে হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। নচেৎ আপনিই বলুন না, এমন কেউ কি পাগল আছে যে এ বাড়ি আশি হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে। নিশ্চয়ই এর মূল্য অনেক বেশী। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে না জেনে এ বাড়ি কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না। এবং সব ব্যাপারের একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এ স্থানও আমাদের ত্যাগ করা উচিতও হবে না।

বামদেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন।

অবশেষে বললেন, এ যে বড চিন্তার কথা হল বিনয়।

চিন্তার কথা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু বিচলিত হবার কি আছে। দেখাই যাক না কোথাকাব জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

বিনয় ঠিকই বলেছে বাবা, এ বাড়ি আমাদের কিছুতেই বিক্রি করা চলবে না।

সুজাতার কথায় বিনয় ও বামদেব দুজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকাল।

সুজাতা আবার বলে, বেটাকে গলাধাক্কা দিযে হাকিয়ে দিলে না কেন বিনয়। বেটার কি সাহস।

না মা না, ওসব কী চরিত্রের লোক কে জানে।

বাবা, তুমি দেখছি ভয়েই গেলে। যার যা খুশি তাই করলেই হল। দেশে আইন নেই আদালত নেই। প্রতিবাদ জানায় সুজাতা।

আপনি মিথ্যে ভাবছেন মেসোমশাই। এই ধরনের কুকুর সায়েস্তা করবার জন্য আমারও মুগুর জানা আছে। আবার যদি এখানে ও পা দেয়, সেই ব্যবস্থাই করব।

বিনয় আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে বামদেবকে, কিন্তু বুঝতে পারে বামদেবের মনের চিন্তা তাতে দূর হয়নি, তিনি প্রত্যুত্তরে কোন কথাই বলেন না।

নিঃশব্দে উঠে বামদেব তাঁর ঘরের দিকে চলে যান।

বিনয় নিজেও চিন্তিত হয়নি তা নয়। কিন্তু তার চিন্তাধারাটা অন্য পথে। সে ভাবছিল এই রত্নমঞ্জিলকে কেন্দ্র করে ক্রমে যে একটা রহস্য ঘনিয়ে উঠছে তারই কথা।

সেই ঝাঁকড়া চুলদাড়িগোঁফওয়ালা লোকটা, চকিতে দিঘির ধারে দেখা দিয়েই যে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কে সে লোকটা।

আর কেই বা সেই রাত্রের মধুকণ্ঠী পথ-প্রদর্শিকা? কেন সে তার পরিচয় দিল না? আর কেই বা সেই দুর্বাসা মুনি যার কথায় সেই মেয়েটিকেও শঙ্কিত বলে মনে হল। সেরাত্রে জানালা হতে দেখা সেই লাল আলো, সর্বশেষে এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য মনোহরের সন্দিগ্ধ আচরণ—সব কিছু যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এই রত্নমঞ্জিলের সঙ্গে

সব কিছুর নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক আছে।

সম্পর্কই যদি না থাকবে তো ওরা—ঐ বিচিত্রের দল এখানে এসে ভিড জমিয়েছে কেন? কেনই বা রহস্যজনক ওদের গতিবিধি? আর বিশেষ করে রত্নমঞ্জিলের সঙ্গে যদি ওদের কোন সম্পর্কই না থাকবে তো এখানেই বা ওরা কেন?

তারপর এই পিয়ারী।

কোথা হতে ঘটল এর আবির্ভাব? এ কি কোন সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ, না পূর্বের দলেরই কোন একজন?

আশি হাজার টাকা। আশি হাজার টাকায় লোকটা এই রত্নমঞ্জিল কিনতে চায়।

কি ভাবছ বিনয়?

সুজাতার প্রশ্নে বিনয়ের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

অ্যাঁ। কিছু বলছিলে সুজাতা?

বলছিলাম মুখ বুজে বসে আছ কেন?

এক কাপ চা হলে ভাল হত।

তা না হয় আনছি, কিন্তু—

ভয় নেই সুজাতা। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, এ ব্যাপারে যখন একবার জড়িয়েছি নিজেকে, এর শেষ না দেখে ছাডছি না।

কিন্তু যাই বল, ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠল দেখছি। সকৌতুকে বলে সুজাতা কথাটা।

হুঁ। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয় বিনয় মাত্র একটি শব্দে।

কিন্তু তোমার কি মনে হয় বল তো বিনয়? বাডিটার মধ্যে কোন গুপ্তধনটন নেই তো?

ব্যাপার দেখে সেই রকমই তো মনে হয় সুজাতা।

ভারী মজা হয়, না? যদি এই বাডির কোথাও ঘড়া ঘড়া যখের ধন পাওয়া যায়।

যখের ধন থাক আর না থাক, মজা তো শুরু হয়েই গিয়েছে। কিন্তু চা কই।

আনছি। আবার হঠাৎ উধাও হয়ো না কিন্তু। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে বিনয়।

ভয় নেই, চা পান না করে পাদমেকং ন গচ্ছামি। নির্ভয়ে চা তৈরী করে আন।

লঘুপদে সুজাতা চলে গেল।

ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি অতর্কিতভাবেই ঘটে গেল। লোকটা যে আচমকা অমনি করে হঠাৎ উঠে ছুটে পালিয়ে যাবে আদপেই তা সে ভাবেনি, ভাবতে পারেনি।

ছট্টুলাল হঠাৎ উঠে এক দৌড়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হওয়ায় প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে যায়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করে ছট্টুলালের পিছু পিছু বাইরে ছুটে আসতেও সে দেরি করে না।

কিন্তু ঘনান্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে কোন্ পথে যে সে পালাল বুঝতে পারা গেল না।

এই কুটীরে আসবার পথ তিন-চারটে আছে অবশ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দিয়ে কিন্তু সেও এক গোলকধাঁধার ব্যাপার।

ভাল করে না জানা থাকলে জঙ্গলের মধ্যে পথভ্রান্ত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। সেই ভেবেই সে অগ্রসর হল ছট্টুলালের খোঁজে।

জঙ্গলের মধ্যে পূর্বে কোন রাস্তাই ছিল না। কষ্টেসৃষ্টে চলবার মত পথ সে নিজেই করে নিয়েছিল এবং সেই পথ ধরে চলাচল করলেও তাকে ঠিক পথ বলা চলে না। এবং পূর্ব হতে না জানা থাকলে সে পথ ধরে যে যাতায়াত করা চলতে পারে কারুরই বিশ্বাস হবে না।

অন্ধকারে শ্বাপদের চোখের মত যেন লোকটার অনুসন্ধানী চোখের তারা দুটো জ্বলছে। হাতের নিশ্চিন্ত মুঠোর মধ্যে এসে সে পালিয়ে গেল।

তার এখানে গোপন অবস্থিতি সম্পর্কে একবার জানাজানি হয়ে গেলে এখানে তার আর আত্মগোপন করে থাকা সুবিধে হবে না। লোকটার আসল পরিচয় জানা হল না।

কে এবং কোন্ দলের লোক তাই বা কে জানে? কি উদ্দেশ্যে যে রত্নমঞ্জিলের আশেপাশে আজ ক'দিন ধরে চোরের মত উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছিল তাই বা কে জানে!

না, লোকটা সম্পর্কে অমন শৈথিল্য প্রকাশ করা আদপেই উচিত হয়নি।

ঐ শৈথিল্যের সুযোগেই ও পালাতে পারল।

আপসোসে নিজের হাত নিজেরই যেন চিবোতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তীর তূণ থেকে বের হয়ে গিয়েছে, আর উপায় নেই।

হঠাৎ একটা খসখস শব্দ শুনে ও থমকে দাঁড়ায়।

শ্বাস বন্ধ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকারেও ও বুঝতে পারে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে।

কাছাকাছি আসতেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ছায়ামূর্তিকে জাপটে ধরতেই নারীকণ্ঠে ভয়চকিত সাড়া এল, কে?

আক্রমণকারীর বজ্রবন্ধনও সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে যায়। বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে ওঠে, কে, বাণী!

হ্যাঁ।

এত রাত্রে এই জঙ্গলের মধ্যে তুমি কি করছিলে ? ঘুমোওনি ?

না, বাবা। ঘুম আসছিল না দেখে বাইরে একটু—

কতবার না তোমায় নিষেধ করে দিয়েছি বাণী, একা একা এমনি করে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে বের হবে না।

দিনরাত ঐ খুপরির মধ্যে কোন মানুষ বন্দী থাকতে পারে নাকি ? বাণীর কণ্ঠে সুস্পষ্ট একটা অভিমানের সুর।

খুব পারবে। যাও, ঘরে যাও।

বাণী কিন্তু নড়ে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কই গেলে না ? যাও !

বাণী তথাপি নিরুত্তর এবং নিশ্চল।

বজ্রকণ্ঠে এবার ডাক এল, বাণী !

তারপরই এগিয়ে এসে বাণীর একখানা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে ও হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে।—অবাধ্য মেয়ে। চল হাত-পা বেঁধে তোমাকে এরপর থেকে আমি ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দেব।

॥ তেরো ॥

রতনলাল উঠে দরজাটা খুলে দিল।

মিহি শান্তিপুরের সরু কালোপাড় ধুতি, মুগার পাঞ্জাবি ও পায়ে চকচকে নিউকাট জুতো মাঝারি দোহারা চেহারার একজন মধ্যবয়সী সুপুরুষ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। হাতে মলাক্কা বেতের সুদৃশ্য একটা ছড়ি।

এ কি যোগানন্দ যে। হঠাৎ কি মনে করে ? রতনলালই আগন্তুককে প্রশ্ন করে।

আগন্তুক যোগানন্দ কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষের মধ্যে খালি দ্বিতীয় চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে নির্বিকার কণ্ঠে কেবল বললে, একটা পাত্রে কিছু ঢাল দেখি আগে বাবা, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই।

রানা ড্রয়ার থেকে আর একটা কাঁচের গ্লাস বের করে বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ জলে ঢেলে মিশিয়ে এগিয়ে দিল যোগানন্দের দিকে।

দীর্ঘ এক চুমুকে কাঁচের পাত্রটি নিঃশেষ করে যোগানন্দ বললে, তারপর ? তোমার রত্নমঞ্জিল কেনবার ব্যাপারটা কতদূর এগুলো বল ?

ব্যাপারটা যে ক্রমেই একটু একটু করে ঘোরালো হয়ে উঠল হে যোগানন্দ।

এর মধ্যে আবার ঘোরালো হয়ে উঠবার কি হল? বায়না পরশু তো হয়ে গিয়েছে?

তা তো হয়েই গিয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে দত্ত-সাহাব ওখান থেকে আসছি। শালা রাঘব একটা নূতন প্যাঁচ কষবার মতলবে আছে।

কি রকম! মিটমিট করে তাকায় যোগানন্দ রানার মুখের দিকে।

হ্যাঁ, বলছে বাড়িটা ছেড়ে দাও, মোটা টাকা খেসারত দেব—অন্য কে এক পার্টি আছে—

বটে! তা তুমি কি বললে?

আমিও রতনলাল রানা! বললাম আরো দু-পাঁচ হাজার বেশী ছাড়তে হয় আমিই ছাড়ব। ওসব মতলব ছেড়ে দাও তো যাদু।

হুঁ, তা কত বেশী দিতে চায়?

ঠিক জানি না, তবে দশ-বিশ হাজার তো মিলবেই।

বল কি! তবে ছেড়েই দাও না, মুফৎসে দশ-বিশ হাজার যদি অমনি করে এসেই যায় তবে আর ক্ষতি কি? ঘরের টাকা ঘরে এসে গেল, সঙ্গে আবার ফাউ।

কি বলছ তুমি যোগেন? তুমিই না লোভ দেখিয়ে আমাকে এ ব্যাপারে নামিয়েছ! এখন বলছ ছেড়ে দিতে!

হ্যাঁ, তা বলেছিলাম বটে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে আগাগোড়া সব কিছুই তো একটা অনিশ্চিতের ওপরে নির্ভর করছে। কিছুই একেবারে নাও তো মিলতে পারে। এতগুলো টাকা ঢেলে তখন স্রেফ বোকা বনে যেতে হবে,—কথাটা ভেবে দেখ।

উঁহুঁ, হাত একবার বাড়িয়েছি, ওর শেষ না দেখে ফিরছি না। ভাগ্যে যদি কেবল মাটিই ওঠে উঠবে।

কিন্তু ভেবে দেখ, পঞ্চান্ন হাজার টাকা—

লোটা-কম্বল নিয়ে বাপ আমার এসেছিল এ মুলুকে—ফের না হয় রাম-সেই শুরু করব। শালা পুরুষের ভাগ্য ডুবতেও যতক্ষণ উঠতেও ততক্ষণ।

যোগানন্দ রানার সঙ্গে কথা বলছিল আর মধ্যে মধ্যে কাচের পাত্র পূর্ণ করে গলাধঃকরণ করছিল। বোতলটা প্রায় সে খালি করে আনে।

হঠাৎ বোতলের দিকে নজর পড়ায় রানা বলে, এই যোগেন, কত খাচ্ছিস!

ভয় নেই—যোগানন্দ মাতাল হয় না। মৃদু হেসে যোগানন্দ জবাব দেয়।

সত্যি যোগানন্দকে তার পরিচিতেরা কখনও যাকে বলে মদ খেয়ে মাতাল হতে দেখেনি। মদ খেয়ে মদ হজম করবার অদ্ভুত শক্তি আছে যোগানন্দের। বন্ধুবান্ধবমহলে কেউই যোগানন্দের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়টা জানত না এমন কি তার পদবীটাও

জানে না। কেউ জানে না কোথায় সে থাকে—কোন্ বাড়িতে বা কোন্ পাড়ায়। সংসারে কে তার আছে বা কিভাবে তার চলে।

পরিচিতজনদের আড্ডায় সে নিয়মিত হাজিরা দেয়। মদ্যপান করে হৈ হৈ করে অধিক রাত পর্যন্ত। তারপর একসময় দিব্যি আকণ্ঠ মদ্যপান করে (সর্বক্ষেত্রেই প্রায় পরের পয়সায়) এবং এতটুকু না টলে বের হয়ে যায় শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। কারোর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

বন্ধুবান্ধবরাও যোগানন্দকে খুশিমনে মদ খাওয়ায়, বিশেষ করে ব্যবসায়ীমহল। ব্যবসায়ীমহলেই যোগানন্দের আনাগোনা এবং খাতিরও তার প্রচুর। যোগানন্দকে খাতির করবার প্রধান কারণই ছিল, সকলের খুঁটিনাটি, সমস্ত ব্যবসার বাজারদরটা সর্বদা থাকত যোগানন্দের ঠোটের আগায় এবং বাজারদরের ওঠানামা সম্পর্কে আগে থাকতেই মতামত দেবার একটা অদ্ভুত দক্ষতা বা দূরদৃষ্টি ছিল যোগানন্দের। তার কথার উপরে নির্ভর করে বড একটা কাউকেই ব্যবসায়ীমহলে তেমন ঠকতে হত না।

ঐ দালালী করাটা ছিল তার প্রধান জীবিকা। অথচ ব্যবসায়ীমহলে ঐ শ্রেণীর লোকরা দালাল বলে সাধারণতঃ যে ব্যবহার পায়, যোগানন্দ কারো কাছ হতে সে ধরনের ব্যবহার পায়নি। বরং সে পেয়ে এসেছে সকলের কাছ হতেই একটা বিশিষ্ট সম্মানের ও প্রীতির আসন। এবং সেই কারণেই হয়ত তাকে সকলেই প্রায় সানন্দে মদ খাওয়াত। যোগানন্দের বিশেষ মদ্য-প্রীতিটা কারো কাছেই অজ্ঞাত ছিল না।

যোগানন্দই রতনলালকে 'রত্নমঞ্জিল'টা কেনবার জন্য উৎসাহিত করে তোলে। রতনলাল মিথ্যা বলেনি। এবং খুব সম্ভবত যোগানন্দের উৎসাহ না পেলে শেঠ রতনলাল এতদূর অগ্রসর হতো কিনা সন্দেহ।

রানার অফিসঘরের ওয়াল-ক্লকটায় রাত্রি আটটা ঢং ঢং করে ঘোষণা করল।

যোগানন্দ উঠে দাঁড়ায়, তবে চললাম হে শেঠ।

এর মধ্যেই? বস না—আর একটা বোতল খুলি। রানা বলে।

না। একটা কাজ আছে। এক জায়গায় যেতে হবে। যোগানন্দ মাথা নেড়ে বলে।

বল কি হে যোগানন্দ, এত শীঘ্র অমৃতে অরুচি। সবে তো শুরু করলে।

না হে, কাজ আছে। চলি—

সত্যি-সত্যিই যোগানন্দ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সিঁড়িপথে একটা টিমটিমে কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। স্বল্পালোকে সমস্ত সিঁড়িপথটা একটা আধো আলোছায়া, বিশ্রী স্তব্ধতায় যেন থমথম করছে।

যোগানন্দ বাইরের রাস্তায় নেমে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা

পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নিল। এ রাস্তাটা ঐ সময় সাধারণতঃ একটু নির্জনই হয়ে পড়ে। ফুটপাত ধরেই যোগানন্দ এগিয়ে চলল। শ্লথমন্থর পদবিক্ষেপে। রানার কাছে রত্নমঞ্জিল সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদটা সত্যিই যোগানন্দকে যেন একটু চিন্তিত করে তুলেছে।

যে টোপ সে ফেলেছিল মাছ সে টোপ গিললেও বঁড়শীটা ঠিক মাছের গলায় গেঁথেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। টেনে তুলতে গেলে যদি ফসকে যায়। আশপাশে আবার এদিকে অন্য মাছ ঘাই দিচ্ছে, খবর পেয়েছে সে।

অনিলেরও বহুদিন দেখাসাক্ষৎ নেই। গত এক মাস ধরে হঠাৎ কোথায় যে সে ডুব দিল, একেবারে কোন পাত্তাই নেই।

ঘটনাটা যে কোন্ দিকে গড়াচ্ছে ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে যোগানন্দ বৌবাজারে এল। শিয়ালদার দিকে বৌবাজার স্ট্রীট ধরে কিছুটা পথ এগিয়ে ডান দিককার একটা অপরিসর গলির মধ্যে একসময় ঢুকে পড়ল। গলিটা এত সরু যে দুজন লোকের স্বচ্ছন্দে রাত্রির অন্ধকারে পাশাপাশি হাঁটাই কষ্টকর। গলিটা ব্লাইণ্ড। একটা মাত্র করপোরেশনের গ্যাসবাতি সমস্ত গলিপথটার জন্য। তাই আলোর চাইতে মনে হয় অন্ধকার যেন বেশী। স্যাঁতসেঁতে নোংরা। হাওয়াটা বন্ধ হওয়ায় একটু ভ্যাপসা ভাব।

যোগানন্দ গলিটার মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতি একটা তিনতলা পুরাতন বাড়ির বন্ধ কবাটের কড়াটা ধরে বার-দুই নাড়া দিতেই ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এল, কে?

যোগানন্দ ডাকে কোনরূপ সাড়া না দিয়ে আবারও দরজার কড়াটা ধরে বার দুই নাড়া দিল এবং এবারে সঙ্গে-সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল।

বয়স বোধ করি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে, একটি মহিলা দরজা খুলে দিতে এসেছিলেন। পরিধানে সাধারণ কালোপাড় একটি মিলের শাড়ি, হাতে একগাছি করে শাঁখা। রোগাটে একহারা দেহের গড়ন। সিঁথিতে সিন্দুর ও কপালে একটি গোলাকার সিন্দুরের টিপ।

ভদ্রমহিলার চেহারা এমনিতে কুশ্রী নয়, কিন্তু দারিদ্র্য যেন সমস্ত সৌন্দর্য ও শ্রীকে লেহন করে নিয়েছে। শুধু দারিদ্র্যই নয়, সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চোখে মুখে একটা ক্লান্তি। মহিলার হাতে একটি হ্যারিকেন বাতি ছিল। তিনি আগে আগে চললেন। যোগানন্দ তাঁকে অনুসরণ করে।

মহাবীর কোথায়? তাকে দেখছি না। যোগানন্দ প্রশ্ন করে।

বাজারে গিয়েছে। মহিলা জবাব দিলেন।

আর নারাণী?

নারাণী তো আজ চারদিন হল কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছে কোথায়—

আমারই অন্যায় হয়েছে দিদি। কাজের ঝঞ্ঝাটে কদিন এ'দিকে আসতে পারি নি। একা একা ঐ বাড়িতে মহাবীরকে নিয়ে নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে।

না ভাই, কষ্ট আর কি—

ভয় করেনি?

ভয়! মহিলা মৃদু হাসলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, না, ভয় কি। সারাদিন ধরে টিনের ফ্যাক্টরীতে কাজ চলে—ঠং ঠং শব্দ। বরং সন্ধ্যার পর ফ্যাক্টরী বন্ধ হলে একটু আরামই পাওয়া যায়। তাছাড়া মহাবীর তো আছেই।

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে দুজনে একটা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। বহু পুরাতন আমলের বাড়ির নিচের তলার ঘর। ছোট ছোট জানালা। অন্ধকার চাপা তাই আলো-বাতাসের অভাবে কেমন যেন। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের বাহুল্যও তেমন নেই। একধারে একটি চৌকির ওপরে সাধারণ একটি শয্যা বিছানো। আর এক কোণে একটি ছোট আকারের স্টীলের ট্রাঙ্ক।

একটা মাদুর পেতে দিয়ে মহিলা বললেন, বস।

পরিধানে স্যুট থাকায় কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে পা গুটিয়েই যোগানন্দ মাদুরের ওপরে বসে পড়ল।

এই দারিদ্র্যের মধ্যে তুমি আস—আমারই লজ্জা করে যোগেন।

ওকথা ভাবেন কেন দিদি? ভাই আসবে দিদির বাড়িতে, সেখানে দারিদ্র্য যদি কিছু থাকেই তাতে লজ্জার আবার কি। ওরকম ভাবলে কিন্তু আমার আর আসাই হবে না। কিন্তু মহাবীরটারও তো আচ্ছা আক্কেল। কতক্ষণ গিয়েছে?

তা আধ ঘণ্টা তো হবেই—

একা আপনি বাড়িতে আছেন, সে খেয়ালও নেই নাকি?

না, ওর কোন দোষ নেই। ওর নিজের কি কাজ আছে, তাই বলে দিয়েছি একেবারে কাজ সেরে আসতে।

মহাবীরকে বলেননি কেন দিদি একটা ঝি খুঁজে আনতে?

কি হবে। একা মানুষ—কাজকর্মও বিশেষ কিছু নেই। আবার একটা ঝি দিয়ে কি হবে?

ঠিক সেজন্যে নয় দিদি। মহাবীর পুরুষমানুষ, আর একা আপনি এখানে স্ত্রীলোক—অন্ত একজন স্ত্রীলোকের থাকা খুবই প্রয়োজন।

চিরকাল তো এইভাবেই কাটিয়েছি বাণী আর আমি। তোমার দাদা কালেভদ্রে

কথনও ক্বচিৎ আসতেন—

দাদার আমলে যা হয়েছে হয়েছে—

কিন্তু থাক সেকথা। তাদের কোন সন্ধান পেলে?

না, এখনো কোন সন্ধানই পাইনি। তবে আপনি ভাববেন না, তারা ফিরে আসবেই। তারপর একটু থেমে বলে, চলুন না দিদি, আপনি আমার ওখানে গিয়ে থাকবেন।

না ভাই, তা হয় না।

কেন হয় না? একা একা এখানে পড়ে থাকেন—মহাবীর তো এখানে রইলই, তারা ফিরে এলে মহাবীরই তো আমাদের সংবাদ দিতে পারে। আপনি আমার ওখানে থাকলে আমিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

তুমি আমার জন্যে চিন্তা করো না ভাই।

বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল।—মহাবীর ফিরে এল বোধ হয়। সবিতা বললেন।

আমি যাচ্ছি, দরজা খুলে দিয়ে আসছি। যোগানন্দ ওঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু মহিলা বাধা দেন, না না, অন্ধকারে তুমি পথ ঠিক করতে পারবে না। তুমি বসো, আমি দরজা খুলে দিয়ে আসছি। সবিতা অন্ধকারেই দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একটু পরেই মহাবীরের জুতোর শব্দ দরজার বাইরে শোনা গেল।

তোমার বাবু এসেছেন মহাবীর। শোনা গেল মহিলার কণ্ঠস্বর।

মহাবীরের বয়স হয়েছে। পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। কিন্তু দেহের গঠন এখনও অটুট আছে।

॥ চোদ্দ ॥

মহাবীরের গলার শব্দ পেয়ে যোগানন্দ বাইরে এসে দাঁড়ায়, একলা মাইজীকে রেখে এতক্ষণ তুমি বাইরে ছিলে মহাবীর!

আমি তো যেতে চেয়েছিলাম না হুজুর। কিন্তু মাইজী বললেন—

নারায়ণী চলে গেছে। একটা ঝি তো খুঁজে আনতে পারতে মহাবীর!

আমি তো বলেছিলাম, মাইজী বারণ করলেন।

কালই একটা ঝি খুঁজে আনবে।

মহাবীর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে স্টোভ জ্বালিয়ে সবিতা চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিলেন কেৎলিতে।

ঘরে ঢুকে যোগানন্দ তাই দেখে বললে, এখন আবার চায়ের জল চাপালেন দিদি।

তা হোক, তুমি তো চা ভালবাস।

যোগানন্দ জানে, প্রতিবাদ জানালে দিদি মনে ব্যথা পাবেন, তাই আর কোনরূপ প্রতিবাদ জানাল না।

জুতো খুলে হাঁটু মুড়ে আবার মাদুরের ওপরে বসল।

সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই গৃহকোণটি সম্পর্কে যোগানন্দের কি যে দুর্বলতা—তার উচ্ছৃঙ্খল নিয়মকানুনহীন জীবনের এই গৃহকোণটি যে কতখানি অধিকার করে আছে, ভাবতে গেলে নিজেরই তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। যেদিন হতে এই গৃহকোণটি সে চিনেছে, সেইদিন হতেই যেন সে এক অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছে এখানে। ভালবাসা, স্নেহমমতা কোনদিনই এসবের কোন স্থান ছিল না যোগানন্দের জীবনে। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই মা ক হারিয়েছিল। সতের বছর বয়েসের সময় বাপকেও হারায়। এমন কিছু সঞ্চয় বাপ রেখে যাননি যোগানন্দের জন্য বা এমন কিছু শিক্ষাও দিয়ে যেতে পারেননি, যাতে করে সহজ স্বাভাবিক পথে জীবনটাকে যোগানন্দ কাটিয়ে দিতে পারত। অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল যোগানন্দের।

পিতার মৃত্যুর পর যোগানন্দ মামার বাড়িতে এসে ওঠে। কিন্তু দু'দিনেই বুঝতে পারল সেখানে স্থান তো হবেই না এবং কোনরূপ সাহায্যও মিলবে না।

যোগানন্দ কলকাতায় চলে এল। হাতে সামান্য যা ছিল তারই উপরে নির্ভর করে একটা মেসবাড়িতে এসে উঠল। পনের টাকায় খাওয়া-থাকা। সেই মেস বাড়িতেই আলাপ হয় যোগানন্দের শেয়ার মার্কেটের দালাল যতীন মিত্রের সঙ্গে। যতীন মিত্রের পরামর্শেই যোগানন্দ বাজারে ঘোরাফেরা শুরু করল। মাস ছয়েক বাজারে ঘোরাফেরা করে শেয়ার সম্পর্কে বাজারদর ও তার ওঠানামা সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভ করল এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই যোগানন্দ দালালী করে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করতে শুরু করে।

বছর দশকের মধ্যে যোগানন্দ তার নিজের বিশিষ্ট আসনটি কায়েম করে নিল। যথেষ্ট অর্থাগম হতে লাগল। এবং অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষ বস্তুর ওপরে তার আসক্তি জন্মাল। সুরা। কিন্তু সুরা তাকে ধ্বংস করতে পারেনি।

চা তৈরি করে সবিতা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলেন যোগানন্দের দিকে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যোগানন্দ বলে, আচ্ছা দিদি, বলতে পারেন চা তো আপনি বিশেষ খান না কিন্তু এমন চমৎকার চা তৈরী করেন কি করে?

সবিতা যোগানন্দের কথায় হাসেন।

নেহাৎ কাজের ঝঞ্ঝাটে রোজ আসতে পারি না, নচেৎ ইচ্ছা করে রোজ এসে আপনার হাতের তৈরী চা খেয়ে যাই—

তা বেশ তো, এলেই তো হয়।

দাঁড়ান, এখন আপনাকে জোর করছি না বটে, সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর আপনাকে আমার বাড়িতে যে নিয়ে যাব আর ছাড়াছাড়ি নেই। কিন্তু রাত হল, এবারে আমাকে উঠতে হবে। বলতে বলতে যোগানন্দ উঠে দাড়াল।

হঠাৎ দরজার গোড়া পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়ায়, তার পর পকেটে হাত দিয়ে কয়েকটা নোট বের করে বলে, টাকা আপনার নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গিয়েছে দিদি—এই টাকা কটা রাখুন।

না না, গত মাসে যে টাকা তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেই টাকাই তো এখনও শেষ হয়নি।

বলেন কি দিদি। মাত্র তো একশটা টাকা দিয়েছিলাম। সে টাকা এখনো আছে মানে।

খরচ আর কি, দুজন মাত্র তো লোক—

আজকালকার দিনে একজনেরই খেতে তো একশ টাকা লাগে। নিন রাখুন টাকাটা—

না, ভাই। এখন থাক। প্রয়োজন হলে আমিই চেয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।

সে আপনি যা চাইবেন তা আমার জানা আছে। নিন ধরুন তো টাকাটা।

যোগানন্দ টাকা কটা একপ্রকার জোর করেই সবিতা দেবীর হাতে গুঁজে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

অন্ধকার গলিপথটা অতিক্রম করে বড় রাস্তায় যখন এসে পড়ল, রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা বেজে গিয়েছে। ট্রাম বাস প্রাইভেট কার ও জনপ্রবাহে আলো-ঝলকিত কলকাতা শহর তখনও প্রাণপ্রাচুর্যে ঝলমল করছে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে-হাঁটতেই চলে যোগানন্দ।

সবিতাদির স্বামী ও কন্যা বাণীকে খুঁজে বের করতেই হবে। যেমন করেই হোক তাদের খুঁজে বের করে সবিতাদিকে সুখী করতেই হবে। সবিতাদির মুখের দিকে যেন আর চাওয়া যায় না।

আশ্চর্য চরিত্র অনিলবাবুর।

সবিতাদির মত স্ত্রী পেয়েও তিনি সংসার বেঁধে সুখী হতে পারলেন না। অথচ সবিতাদির মত স্ত্রী সংসারে কজনের ভাগ্যে লাভ হয়। আর ওদের বিবাহটাও নাকি হয়েছিল পরস্পরে পরস্পরকে ভালবেসে।

প্রফেসার বাপের শিক্ষিতা মেয়ে, অনিলবাবু নিজেও উচ্চশিক্ষিত, তবু যে কেন সব এমনি হয়ে গেল।

সুখের সংসারই দুজনে পেতেছিলেন, মফস্বল শহরে এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গিয়ে। দুটো বছর আনন্দেই কেটেছিল। তারপরই লাগল আগুন।

একটি ছাত্রীকে পড়াতেন, হঠাৎ একদিন সেই ছাত্রীকে নিয়ে হলেন পলাতক অনিলবাবু।

সবিতাদি তখন পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। ছোট মফস্বল শহরে একেবারে ঢি-ঢি পড়ে গেল ব্যাপারটা নিয়ে।

লজ্জায় অপমানে সবিতা পালিয়ে এলেন কলকাতায় বাপের কাছে। বাপ শশাঙ্কমোহন সব শুনে একেবারে স্তম্ভিত হযে গেলেন। কেবল বললেন, যাক, ভালই করেছিস। রাস্কেল। হাতের কাছে পেলে চাবুক মেরে পিঠের ছাল তুলে নিতাম। আজ থেকে জানবি তোর বিয়েই হয়নি।

কিন্তু বাবা, তার সন্তান যে আমার গর্ভে। দু হাতে মুখ ঢাকলেন সবিতা।

শশাঙ্কমোহন যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কথাটা শুনে।

তাঁর গলা দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত কোন শব্দই বের হয় না।

তারপর একসময় ধীরে ধীরে বললেন, ঠিক আছে, ঐ তোর সন্তান—যে আসছে তাকে নিয়েই তুই বেঁচে থাক। ঐ অপদার্থটার কথা ভুলে যা—ভুলে যা সব কথা।

যাই হোক, সবিতা পিতা শশাঙ্কমোহনের কাছেই থেকে গেলেন। ঐ একমাত্র মেয়ে শশাঙ্কমোহনের। স্ত্রীব আগেই মৃত্যু হয়েছিল। বড আদরের মেয়ে। কন্যা বাণী জন্মাল।

দশ বছর অনিলের আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

সবিতা নিজেও জেনেছিলেন আর হয়তো জীবনে কোনদিনই তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন শীতের মধ্যরাত্রে প্রাচীর টপকে অনিল শশাঙ্কমোহনেব বাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন।

পরিচিত গৃহ।

স্ত্রীর শয়নকক্ষটা চিনে নিতে তাঁর কষ্ট হয়নি। সবিতা একাই তাঁর ঘরে শুয়েছিলেন। পাশের ঘরে দাদুর সঙ্গে ঘুমিয়েছিল বালিকা বাণী, অনিলের মেয়ে।

সবিতার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে তুললেন অনিল তাঁকে ঘুম থেকে।

কে।

চুপ। চেঁচিও না—আমি অনিল।

তুমি! বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে গেছেন সবিতা।

হ্যাঁ, আমি। আমি আবার ফিরে এসেছি সবিতা।

তুমি ফিরে এসেছ!

ডায়বিটিসের রোগী শশাঙ্কমোহন। রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় না।

তিনি যে ইতিমধ্যে পাশের ঘরে আলো জ্বালা ও চাপা কথাবার্তার আওয়াজে উঠে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দুজনের একজনও তা টের পাননি।

কে রে সাবি? বলতে বলতে শশাঙ্কমোহন ঘরের মধ্যে এসে একেবারে সোজা আচম্‌কা প্রবেশ করেন।

বাবা! একটা আর্ত শব্দ বের হয়ে আসে সবিতার কণ্ঠ হতে।

জামাই অনিলকে চিনতে শশাঙ্কমোহনের কষ্ট হয় না।

রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করেন, এ বাড়িতে তুমি কোন্ সাহসে আবার ঢুকেছ? স্কাউন্‌ড্রেল! এখুনি বের হয়ে যাও—

বাবা! আর্তকণ্ঠে ডেকে ওঠেন সবিতা।

না। চরিত্রহীন লম্পটের আমার বাড়িতে কোন প্রবেশাধিকার নেই। যাও বেরিয়ে যাও।

আপনার বাড়িতে থাকতে আমি আসিনি। আমি এসেছি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে। ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিল বলেন।

তোমার স্ত্রী! কে তোমার স্ত্রী? সবিতার তুমি কেউ নও। তোমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক আছে কি না আছে সেটা আপনার বিচারে সাব্যস্ত হবে না।

নিশ্চয়ই—একশ বার হবে। যাও বেরিয়ে যাও।

বেশ তো, সবিতারও যদি সেই মত হয়, নিশ্চয়ই বের হয়ে যাব—সে-ই বলুক।

সবিতা আবার কি বলবে। আমিই বলছি—

বলবার যদি কারো অধিকার থাকে তো একমাত্র আছে সবিতারই। আপনি বলবার কে!

লজ্জা করছে না তোমার? নির্লজ্জ বেহায়া—

সবিতা!

সবিতা কিন্তু নিরুত্তর। পাথরের মতই যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে। স্থির, বোবা।

সবিতা তোমারও কি তাই মত? তাই যদি হয় তো বল, আমি চলে যাচ্ছি।

তবু সবিতার কোন সাড়া নেই।

বেশ তবে চললাম।

অনিল দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই সবিতা ডাকলেন, দাঁড়াও আসছি। বাণী ঐ ঘরে ঘুমিয়ে আছে, তাকে নিয়ে আসি।

সবিতা! তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন শশাঙ্কমোহন।

ক্ষমা করো বাবা, ওঁর অবাধ্য তো হতে পারব না—

সবিতা, তোর সঙ্গে যে নীচ জঘন্য ব্যবহার করেছে, তার পরেও—

কি করব বাবা, হিন্দুর মেয়ে—স্বামী তাদের যাই হোক না কেন, স্বাব তো তাকে ছাড়া অন্য পরিচয় নেই। তাছাড়া ওঁর ভুলকে যদি আমি না ক্ষমা করি, তবে উনি কোথায় দাঁড়াবেন? আমাকে যাবার অনুমতি দাও বাবা—

সবিতা, তুই কি ভুলে গেলি কি জঘন্য অপমান ঐ লোকটা তোকে করেছে, তবু তুই ওর সঙ্গে যাবি?

বাবা!

বেশ যা, কিন্তু এও জেনে যা আজ থেকে এ বাড়ির দরজাও তোর কাছে বন্ধ হয়ে গেল। আজ থেকে জানব সবিতা বলে কোন মেয়ে আমার ছিল না।

আজ তুমি আমাকে হয়তো ক্ষমা করতে পারছ না বাবা, কিন্তু একদিন যখন জানবে কতখানি নিরুপায় হয়েই আমাকে আজ তোমার অবাধ্য হয়ে তোমার মনে আঘাত দিয়ে যেতে হল সেদিন হয়তো আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে।

শশাঙ্কমোহন আর একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

সবিতা চিত্রার্পিতের মতই দাঁড়িয়েছিলেন।

অনিলও চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা যে হঠাৎ ঐভাবে ঘুরে যাবে এ কথা তিনি স্বপ্নেই ভাবেননি। ঝোঁকের মাথায়ই তিনি সবিতাকে তাঁর সঙ্গে চলে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। নচেৎ সবিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কোন মতলবই ছিল না।

তিনি এত রাত্রে সবিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি এসেছিলেন সবিতাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কিছু টাকাকড়ি চেয়ে নিয়ে আপাততঃ চলে যাবেন মনে করে, কিন্তু ঘটনা দাঁড়িয়ে গেল অন্যরকম।

একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে সবিতাই কথা বললেন, একটু দাড়াও, বাণীকে নিয়েআসি।

বাণী।

হ্যাঁ, আমাদের মেয়ে।

একটু পরেই ঘুম হতে তুলে বাণীর হাত ধরে সবিতা এ ঘরে ফিরে এসে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, চল।

তিনজনে সেই মধ্যরাত্রে জনহীন রাস্তার উপরে এসে দাঁড়ালেন।

।। পনের ।।

শীতের রাত—নির্জন রাস্তা। শুধু রাস্তার দুধারে ইলেকট্রিকের আলোগুলো নিঃসঙ্গ রাতে যেন এক চোখ মেলে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তিনজন হাঁটতে শুরু করে।

মেয়ে বাণী শুধায়, আমরা কোথায় যাচ্ছি মা?

ঘুরিয়ে মেয়ের প্রশ্নের জবাবটা দেন সবিতা, বাবার সঙ্গে যাচ্ছি মা।

বাবা।

হ্যাঁ, উনিই তোমার বাবা।

বাণী ঘুরে দাড়ায় অনিলের দিকে, সত্যি তুমি আমার বাবা।

হ্যাঁ, মা।

তবে তুমি এতদিন আসোনি কেন বাবা?

কাজ ছিল যে মা।

শেষ পর্যন্ত বৌবাজারের ঐ পুরাতন বাড়ির একতলায় এনে অনিল স্ত্রী ও কন্যাকে তুললেন।

ধনী পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা। চিরদিন সুখৈশ্বর্যের মধ্যে পালিতা, তবু একটি কথা বলেননি সবিতা। মুখ বুজে সব কিছুকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

শুধু যে ঐ জঘন্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই এনে অনিল ফেলেছিলেন স্ত্রী ও কন্যাকে তাই নয়—সেই সঙ্গে চালিয়েছেন তাঁর অত্যাচার।

এক এক করে সবিতার গায়ের সমস্ত সোনার গহনাগুলো বিক্রি করে সেগুলো নষ্ট করেছেন। এবং যতদিন সবিতার গায়ে গহনা ছিল দু বেলা আহার জুটেছে কিন্তু গহনা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল চরম দারিদ্র্য ও অনাহার।

আর তখন থেকেই মধ্যে মধ্যে অনিল বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত হতে লাগলেন। স্ত্রী ও কন্যার কোন খোঁজই রাখতেন না। অনন্যোপায় হয়ে সবিতা দু-চারটি টিউশনি যোগাড করে কায়ক্লেশে নিজের ও মেয়ের জীবন চালাতে লাগলেন।

তাতেও বাদ সাধেন অনিল। মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত এসে আবির্ভূত হয়ে সবিতার সামান্য পুঁজি ও সম্বলের ওপরে রাহাজানি করে চলে যান।

নিজের জীবনের কথা ভেবে সবিতা মেয়েকে আর স্কুলে দেননি। বাড়িতে নিজেই লেখাপড়া শেখাতেন।

বাণী ক্রমে বড হবার সঙ্গে সঙ্গে মা'র কষ্টটা দেখে দেখে সর্বদাই মা'র কাছাকাছি থাকত মাকে সুখী করবার জন্য। এবং তার বাপের প্রতি মা'র যে ক্ষমা সেটা তাকে বরাবরই পীডন করত।

মা যে বাবার যথেচ্ছাচার সহ্য করে নির্বিবাদে শান্ত হয়ে, বাণীর মনে হত সেটাই তার বাপের উচ্ছৃঙ্খলতাকে যেন আরও প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বাপের বিরুদ্ধে দাঁডাবার মত মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু জোর পেত না বাণী।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সে বাপের যথেচ্ছাচারিতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইত তার সহজ মনের রুচিবোধের সংঘাতে।

সবিতার জীবনে যোগানন্দেব আবির্ভাবটা দৈব যোগাযোগ ছাডা কিছুই নয়।

বাসায় ফিরতে যোগানন্দের প্রায়ই গভীর রাত হত।

বছর দেডেক আগে এক শীতের রাত্রে যোগানন্দ পায়ে হেঁটে ফুটপাথ ধরে বাসায় ফিরছিল।

সেরাত্রে একটু বেশী মাত্রাতেই যোগানন্দ মদ্যপান করেছিল। সমস্ত শরীরটা তো হাল্কা বোধ করছিলই, মাথার মধ্যেও কেমন শূন্যতা বোধ করছিল।

শীতের মধ্যরাত্রির জনহীন রাস্তা। একটা কুকুর পর্যন্ত কোথাও জেগে নেই।

বৌবাজারের কাছাকাছি এসে একটা তিনতলা বাড়ির ঝুল-বারান্দার নিচে আধো আধো অন্ধকারের মধ্যে একটি পুরুষ ও একটি নারীকণ্ঠের কথাবার্তার কিয়দংশ তার কানে যেতেই আপনা হতেই যোগানন্দ থেমে গিয়েছিল।

নারীকণ্ঠে করুণ মিনতির স্বর, রাগ করো না, ফিরে চল।

আঃ, কেন বিরক্ত কবছ সবিতা। একশবার তো বলছি, যাব না। এখানে এই ফুটপাতেই আমি শুয়ে থাকব। বিরক্তিপূর্ণ খনখনে পুরুষকণ্ঠ।

আর কতকাল এমনি করে আমাকে জ্বালাবে বলতে পার। এখনো কি বুঝতে পারছ না, কোন্ সর্বনাশের পথে তুমি ছুটে চলেছ।

আবার প্যানপ্যানানি শুরু করলে তো ?

মেয়ে বড হয়েছে এখন, সে-ই বা কি ভাবে বল তো। এইজন্যই কি তুমি সে রাত্রে বাবার আশ্রয় থেকে টেনে নিয়ে এসেছিলে ?

যাও না—বাপের ঘরে ফিরে গেলেই তো পার। তোমার পায়ে তো আমি শিকল দিয়ে রাখিনি।

ফিরে যাবার মুখ কি তুমি রেখেছ ?

কেন, পরপুরুষের সঙ্গে তো আর গৃহত্যাগ করোনি। তবে লজ্জাটা কিসের ?

তা যদি তুমি বুঝতে—

থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে অ্যাকটিং না করে বাসায় ফিরে যাও।

না, তোমাকে আমি না নিয়ে যাব না।

আহা, কি কথাই বললে। এঁদো অন্ধকার ঘর, মানুষ সেখানে থাকে। তার চাইতে এই রাস্তা ঢের ভালো।

ঠিক হয়ে উপার্জন করবার চেষ্টা কর, দেখবে সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। চেষ্টা করলেই তুমি সব পারবে। আবার তোমার সব হবে।

সে আর হয় না। এ শকুনির পাশা, দান আর উল্টাবে না।

হবে—সব হবে, মনকে একটু শক্ত কর।

পুরুষকণ্ঠ একেবারে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

আবার অনুনয় শোনা যায়, চল।

যাও তুমি—আমি আসছি।

না, আমার সঙ্গে চল। আর বাইরে থেকো না। দেখছ না কি ঠাণ্ডা বাইরে।

যাও না তুমি, আসছি।

যোগানন্দ এতক্ষণ একটা দোকানের কোলাপ্সিবল গেটের পাশে নিজেকে একটু আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ দেখলে অতঃপর নারীমূর্তি পাশের একটা গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যোগানন্দ এবার এগিয়ে গেল।

যোগানন্দের পায়ের জুতোর রবার সোল থাকায় তার জুতোর জুতোর শব্দ শোনা যায়নি।

সে সোজা গিয়ে একেবারে উপবিষ্ট পুরুষটির সামনে দাঁড়াল, শুনছেন ?

কে। চমকে উপবিষ্ট পুরুষটি উঠে দাঁড়ায়।

ভয় নেই চোরডাকাত নই। একটু মদ্যপান করেছি বটে তবে মাতাল হইনি —অতএব মাতালও নই।

তা এখানে কি চাও ?

বিশেষ কিছু না। ঘটনাচক্রে হঠাৎ আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপটা আমি শুনে ফেলেছি।

শুনেছো তো বেশ করেছ। এখন এখান থেকে সরে পড দেখি।

আহা চটছেন কেন, শুনুনই না। হঠাৎ সংসারের প্রতি অমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন কেন ?

কে তুমি জানতে পারি ? কি মতলব বল তো ?

অধীনের নাম যোগানন্দ। আর মতলব সেটা এখনো ভেবেচিন্তে ঠিক করে উঠতে পারিনি। ধরুন—মনে হচ্ছে আপনার যদি কোন কাজে লাগতে পারি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয় ?

রসিকতা করছ নাকি ?

আদপেই না। কারণ ওটা আমার ধাতে আদপেই সয় না। কিন্তু সেকথা যাক। এইভাবে রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে এই ফুটপাথে বসে থেকে লাভ কি। যান না ঘরে ফিরে।

না।

আরে বাবা রাগ করছেন কার ওপর বলুন তো ? ঐ নিরীহ ভদ্রমহিলাটির ওপরে। বেচারী হয়তো এখনো আপনার আশাপথ চেয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন। যান —বাড়ি যান—

খুব তো উপদেশ দিচ্ছ। জান বাড়ির অবস্থা ?

সে কতকটা অনুমানই করে নিয়েছি না জানলেও সঠিক। অভাব অভিযোগ এই তো। আমি আপনাকে না হয় কিছু টাকা ধার দিচ্ছি—পরে সময়মত শোধ দিয়ে দেবেন।

তুমি ! তুমি আমাকে টাকা ধার দেবে ?

বিস্ময়ের একটা সীমা আছে, অনিল বিস্ময়ে একেবারে বোবা বনে যায়। এমন কথা তো কেউ গল্প-কাহিনীতেও শোনেনি। একটা অচেনা অজানা লোক—

খুব আশ্চর্য লাগছে কথাটা শুনে, না ? তা হবারই কথা। আমি নিজেও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যে যাই না তা নয়। রাতের বেলার আমিটাকে দিনের বেলার আমিটাই

চিনতে পারে না তা পবে তো—যাকগে সে কথা, আপাতত কত দিলে আপনার বর্তমান Crisisটা কাটিয়ে উঠতে পারেন বলুন তো? কি নাম?

আমার নাম অনিল—

অনিল অর্থাৎ বায়ু—বাতাস। তা বেশ নাম। হ্যা বলুন তো অনিলবাবু, আপাতত, কত হলে চলে? তবে হ্যাঁ, একটা অসম্ভব চাইলেও আমি দেব না। ঠিক যতটুকু আপনার বর্তমান পরিচয়ে পাওয়া উচিত তাই দেব। কারণ ফুটো কলসীতে জল ঢালা মানেই অপব্যয়।

লোকটার কথায়বার্তায় অনিল উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। এবং কৌতুকও বোধ যে করছিল না তা নয়।

অনেক প্রকার লোকই জীবনে অনিল দেখেছে কিন্তু এরকম লোক বড একটা তার চোখে পড়েনি, যে অচেনা অজানা পথের একটা লোককে অযাচিতভাবে এমনি করে টাকা ধার দিতে পারে সেধে।

কি ভাবছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা বিশ্বাস করাটাও একটু শক্ত বৈকি।

একশ টাকা দিতে পার?

নিশ্চয়ই। দাঁড়ান। যোগানন্দ পার্স বের করে।

ঠিক এমনি সময় পশ্চাৎ হতে পূর্ব নারীকণ্ঠ প্রতিবাদ জানাল, না—টাকা দেবেন না।

নারী সবিতা। সবিতা যায়নি, গলির মাথাতেই দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে উভয়ের সব কথা শুনছিল।

সবিতা।

না—টাকা তুমি নিতে পারবে না।

আঃ আপনি আবার এর মধ্যে এলেন কেন? যোগানন্দ বাধা দেয়।

চলে এস তুমি। সবিতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে যোগানন্দর কথার কোন জবাব না দিয়ে।

বেশ, চলুন অনিলবাবু আপনাদের বাড়িতেই যাওয়া যাক। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, রাস্তায় থাকা আর উচিত হবে না। হঠাৎ কোন লাল পাগড়ীর উদয় হয় তো আমাদের তিনজনের কাউকে সে বিশ্বাস করবে না।

তাই চল। অনিল বলে।

কি জানি কেন সবিতা আর কোন প্রতিবাদ জানায় না। তিনজনে এসে অন্ধকার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে।

॥ ষোল ॥

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে যোগানন্দ যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। যদিও নেশাটা তখনও মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে চনচন করছে।

যোগানন্দ ঘরে ঢুকতেই সবিতা মদের গন্ধ পেয়ে একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যোগানন্দর কথায় সেটা কেটে গেল।

দিদি। কেন যেন আপনাকে দিদি বলতেই ইচ্ছে করছে। আপনি নিশ্চয়ই মদের গন্ধ পেয়েছেন। মদ আমি খেয়েছি দিদি, অস্বীকার করব না। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন আপনার সঙ্গে আজ রাত্রে দেখা হবে জানলে মদ নিশ্চয়ই আমি খেতাম না। তবে মদ খেলেও জানবেন মাতলামি আমি করি না।

কি জানি কেন, সবিতারও প্রথম হতেই যোগানন্দকে ভাল লাগে। তার সমস্ত অনুভূতি যেন বলে, লোকটা আর যাই হোক শয়তান বা দুষ্ট প্রকৃতির নয়। তাই আলাপ জমতে দেরি হয় না।

যোগানন্দ সহজেই দু' দণ্ডে সবিতার মনে একটি স্থায়ী আসন করে নেয়।

সে রাত্রে আর যোগানন্দর বিদায় নেওয়া হয় না।

রাত্রি ভোর হলে চা খেয়ে সে বিদায় নেয়। এবং যাবার সময় সবিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনিলের হাতে সত্যিই শ'খানেক টাকা গুঁজে দিয়ে যায়।

কিন্তু যে উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ অনিলের রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল সেই উচ্ছৃঙ্খলতার পথেই সেই একশত টাকা উবে যেতে পাঁচ দিনও লাগল না।

তারপর আবার যে অভাব সেই অভাব।

আবার নেয় টাকা অনিল যোগানন্দর কাছ থেকে এবং আবার তা ফুরিয়ে যায় একদিনে। ঐভাবে দু'তিনবার চলে।

উপন্যাসের কল্পিত এক কাহিনীর মতই যেন যোগানন্দর আবির্ভাব সবিতা ও অনিলের জীবনে।

সেবারে কিছু দিন পরে আবার যখন এক রাত্রে ঘটল যোগানন্দর আবির্ভাব, অনিল বাসায় ছিল না।

সবিতাই যোগানন্দকে বসতে বললে, বসুন, এসেছেন যখন যাবেন কেন?

তা বসছি। কিন্তু ঐ সম্বোধন, আপনি আজ্ঞেটা ছাড়তে হবে। দিদি বলে যখন ডেকেছি সে দাবিটা এই অধম জনের রাখতে হবে এবং শুধু রাখাই নয়, সেই সঙ্গে বড় বোন ছোট ভাইকে যেমন তুমি বলে ডাকে তেমনি বলবে তুমি এবার থেকে।

সবিতা হেসে বলে, তাই হবে।

তাই হবে না, বলুন তুমি।

বেশ বলব।

আঃ, সত্যি কি যে আনন্দ পেলাম দিদি। আর বুঝতে পারলাম ভগবান এখনো এই হতভাগাটাকে একেবারে ভোলেননি।

বোস, চা করে আনি।

চা তো নিশ্চয়ই হবে, আপনার হাতের চা না খেয়ে নড়ছিই না। কিন্তু অনিলবাবুকে দেখছি না কোথায়ও, বেরিয়েছেন বুঝি?

সবিতা চুপ করে থাকে।

দিদি।

সে নেই।

নেই?

দশ দিন বাড়িতে আসেন না।

সে কি।

ও আর এমন কি। সবিতা হাসে।

তাই তো—তাহলে—, যোগানন্দ বলে।

কি ভাই?

একা একা আছেন—

অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

তা যেন হল কিন্তু আপনাদের চলছে কি করে? কিছু মনে করবেন না দিদি

যেমন করে আগে চলছিল। দুটো টিউশনি করি।

কিন্তু দুজন স্ত্রীলোক—একা একা এই বাড়িতে ভয় করে না তো দিদি?

এমন সময় হঠাৎ অনিল ফিরে এল, হাতে একটা পোঁটলা।

এই যে যোগানন্দ। কতক্ষণ? অনিল প্রশ্ন করে।

এই কিছুক্ষণ। কিন্তু এ দশ দিন ডুব দিয়েছিলে কোথায়? যোগানন্দ বলে।

বর্ধমানে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনিল বললে।

হঠাৎ বর্ধমানে দেশের বাড়িতে? প্রশ্ন করে এবারে সবিতা।

হ্যাঁ, অনেক দিন যাইনি তাই দেখতে গিয়েছিলাম একবার। যা দেখলাম, বাড়িঘর অবশ্য ভেঙে গিয়েছে, কাঁচা টিনের বাড়ি—একটা পাকা ঘর ছিল, সেইটা কোনমতে টিকে আছে।

তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে সেখানে গিয়ে থাকলেই তো হয়। কিন্তু ঐ বাড়ির কথা তো

কোন দিনও তুমি আমাকে বলনি ? সবিতা বলে।

বলবার মত নয় বলেই বলিনি। সে যে এ বাড়ির থেকেও এক ডিগ্রী—

তা হোক, তবু তো নিজের ভিটে—পরের ভাঙা বাড়িতে ভাড়া টানার চাইতে নিজের পড়ো ভাঙা ভিটেও ঢের সুখের, ঢের সম্মানের। চল আমরা কালই সেখানে যাব—

তাই যাও না অনিল—যোগানন্দ বলে।

ক্ষেপেছ তুমি যোগানন্দ। সেখানে কোথায় যাবে? কথাটা শুরুতেই চাপা দিয়ে দেয় অনিল।

কেন, একটা ঘর তো আছে বলছিলে। সবিতা বলে।

থাকাটাই তো কেবল সব নয়, সেখানকার ম্যালেরিয়া—

তা হোক-

না না, ওখানে যাওয়া হবে না। অনিল বলে ওঠে।

যোগানন্দ উঠে দাঁড়ায় ঐ সময়, অনিল তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যায় এবং যোগানন্দর কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে নেয়।

যোগানন্দ টাকা দিতে গিয়ে এবারে বলে, এমনি করে বার বার পরের জমি থেকে মাটি কেটে এনে নিজের ঘরের গর্ত তো ভরাট করতে পারবে না অনিল। যা হোক একটা কিছু করো না।

ঘাবড়াও মাৎ ভায়া। তোমার সব দেনা এবার বোধ হয় শিগগিরি শোধ করে দিতে পারব আর সব অভাবও ঘুচবে।

কি রকম ?

দেখ না অভাব বোধ হয় এবার সত্যিই ঘুচল।

ভাল। যোগানন্দ মৃদুকণ্ঠে বলে।

ভাল নয় হে, এবারে সত্যিই দেখো কেমন বরাতের চাকাটা ঘুরে যায়।

অনিলের চোখেমুখে একটা আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তি ঝলমল করে।

যোগানন্দ একটু বেশ বিস্ময়ই অনুভব করে। বলে, ব্যাপার কি বল তো সত্যি করে। লটারিতে টাকা পাচ্ছ, না কোন গুপ্তধনটন আবিষ্কার করে ফেলেছ ?

সে যাই হোক, সময়ে সবই জানবে।

সবিতাকে লুকিয়ে অনিল সে রাত্রে যোগানন্দর কাছহতে টাকা নিলেও সবিতার নজর এড়ায়নি। যোগানন্দ যাবার পর সবিতা স্বামীকে বলে, আবার টাকা নিলে যোগানন্দর কাছ হতে ?

ভয় নেই, ভয় নেই—এবারে সব শোধ করে দেব এক কিস্তিতে।

সবই এক কিস্তিতে শোধ করে দেবে ?

হ্যাঁ।

কেমন করে শুনি ?

দেখই না। অনিল রহস্যপূর্ণ হাসি হাসতে থাকে।

এব পর কয়েকটা দিন অনিল আর কোথাও বের হয় না। এবং কোথাও বের হলেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসে। দিবারাত্র ঘরেই থাকে আর মধ্যে মধ্যে একটা লাল মলাট-বাঁধানো জীর্ণ খাতার পাতা উল্টেপাল্টে পড়ে গভীর মনোযোগ সহকারে।

সবিতার কৌতূহল হয় ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কিন্তু সুযোগ পায় না।

সর্বদা যেন যখের ধনের মতই অনিল লাল মলাটওয়ালা খাতাটা ও পোঁটলাটা আগলে রেখেছে।

শুধু সবিতাই নয়, এবারে বাণীও বাপের ওপরে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখে।

সে এবারে ঠিক করেছে বাপকে কিছুতেই নজরছাড়া করবে না, কারণ তারও মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। নিশ্চয়ই আবার তা বাপের মাথায় কোন দুরভিসন্ধি বাসা বেঁধেছে।

হঠাৎ একদিন অনিলের অনুপস্থিতির সুযোগে সবিতা পোঁটলা খুলে দেখে, তার মধ্যে নেকড়া জড়ানো আছে একটি সোনার কঙ্কন, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে বুঝবার আগেই হঠাৎ আবার অনিল ফিরে আসায় পোঁটলাটা যথাস্থানে রেখে দিতে বাধ্য হয় সবিতা। এবং পরদিনই প্রাতে ঘুম থেকে উঠে সবিতা দেখল তাব স্বামী ও বাণী দুজনের একজনও ঘরে নেই।

প্রথমটায় সবিতা ভেবেছিল তারা বোধ হয় দুজনে কোথাও বের হয়েছে, কিন্তু দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল তখনও যখন দুজনের একজনও ফিরল না দেখে সবিতা রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে। ঠিক ঐ সময় হঠাৎ তার রামায়ণটার ভিতরে বাণীর একটা চিঠি আবিষ্কার করে।

মা, বাবার সঙ্গে সঙ্গে চললাম—বাণী।

বুঝল সবিতা, দুজনেই একসঙ্গে গিয়েছে।

অন্যান্য বারের চাইতে এবারে সবিতার চিন্তা হল বেশী, কারণ সঙ্গে বয়স্থা মেয়ে বাণী।

এবং বাণী তার পিতার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট নয়, জানে সবিতা।

দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় দু'রাত্রি কেটে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এল যোগানন্দ।

সবিতা একাকী ঘরের মধ্যে চুপটি করে আলো জ্বেলে বসে ছিল।

যোগানন্দ সবিতাকে ঐ অবস্থায় দেখে শুধাল, কি ব্যাপার দিদি, চুপটি করে একা বসে যে। মেয়ে কোথায়? অনিলবাবু বুঝি আবার চলে গেছেন?

এস যোগেন। সবিতা যোগানন্দকে আহ্বান জানাল। এবং ধীরে ধীরে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল।

তাই তো! মেয়েও তার বাপের সঙ্গে গেল? তা মেয়ে যখন তার বাপের সঙ্গেই গিয়েছে—

নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম, কিন্তু আমার তা মনে হয় না ভাই। ওকে তো আমি চিনি—আর মেয়ে বাপের প্রতি কোনদিনই প্রসন্ন নয়।

ভাবছেন কেন, হয়তো একপ্রকার ভালই হল।

না যোগেন, সে যদি স্বেচ্ছায় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেত ভাবতাম না কিন্তু এ তো তা নয়, তাহলে তো—

কিন্তু আমারও মনে হয় আপনার এই চিন্তার কিছু নেই।

চিন্তার নেই!

না।

সবিতা চুপ করে থাকে।

সে যাক, এভাবে এখন তো আর একা একা এখানে আপনার থাকা চলতে পারে না দিদি।

তা ছাড়া আর উপায় কি বল? যাব কোথায়?

যদি আপত্তি না থাকে তো আমার ওখানে চলুন না দিদি।

তা হয় না যোগানন্দ।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না। তা ছাড়া এমনিতেই তো তোমার ঋণ এ জীবনে কোনদিন আমরা শোধ করতে পারব না। তার উপর আর ঋণ বাড়াতে চাই না।

ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না দিদি। আজকের দিনে সংসারে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বলে কোন বস্তুই নেই, এমনিভাবে আমরা সমাজের মধ্যে পরস্পর হতে পরস্পর পাশাপাশি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। জ্ঞান হওয়া অবধি সংসারে বা সমাজের মধ্যে একটি মাত্র সম্পর্কই সকলের মধ্যে দেখে আসছি—স্বার্থের সম্পর্ক। আমাদের সম্পর্কের মধ্যেও সেই সম্পর্কটা টেনে এনে সেটাকে ছোট করে দেবেন না, এই আমার অনুরোধ।

যোগানন্দর মুখে কথাগুলো শুনে সবিতা মুগ্ধ হয়ে যায়।

কদিনেরই বা পরিচয় ঐ যুবকটির সঙ্গে তাদের।

সম্পূর্ণ অপরিচিত, পথের লোক—নিজে যে সবিতা একটু বিব্রতও বোধ করে না তা নয়।

না না—দুঃখ করো না ভাই। তোমাকে আমি অন্তত সেরকম কখনো ভাবিনি। সবিতা বললে, তোমার সঙ্গে পরিচয়টা জীবনে অক্ষয়ই হয়ে থাক, ধূলোর ওপর টেনে এনে তাকে আমি তো ছোট করতে পারব না ভাই। আজকের দিনে তুমিই তো আমার একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেজন্য নয়, এখন হতে অন্য কোথায়ও যাবার আমার সত্যিই বাধা আছে—

বেশ, তবে আর কি বলব বলুন।

পরের দিনই সকালে যোগানন্দ তার দারোয়ান প্রৌঢ় মহাবীর ও একজন রাতদিনের ঝি সবিতাকে সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দিল। এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে এসে সবিতার খোঁজ নিয়ে যেতে লাগল।

॥ সতের ॥

বাণীর হাত ধরে টানতে টানতে কক্ষের মধ্যে নিয়ে এল অনিল।

মাসখানেক একেবারে ক্ষৌরকর্ম না করায় একমুখ দাড়িগোঁফ গজিয়েছে আজ অনিলের মুখে। তাকে আজ আর চেনবার সত্যিই উপায় নেই।

ঘরের কোণে প্রদীপটা জ্বলছে মিটমিট করে।

প্রদীপের স্বল্প আলোছায়া অপরিসর ছোট ইট বের-করা ঘরের জীর্ণ দেওয়ালে যেন রহস্যের আলপনা বুনে চলেছে।

হতচ্ছাড়া মেয়ে, তোকে ইচ্ছে করছে গলা টিপে শেষ করে ফেলি। রাগতকণ্ঠে অনিল বলে।

বাণী বাপের কথায় কোন প্রতিবাদ জানায় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাণীকে নীরব থাকতে দেখে কি জানি কেন অনিলের রাগটা বোধ হয় নরম হয়ে আসে। মৃদু চাপাকণ্ঠে এবারে বলে, কতবার না বলেছি ঝোপজঙ্গল, সাপে ভর্তি, যখন-তখন অমন করে ঘরের বাইরে যাস না।

তুমি তো সারাটা দিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াও। তোমাকে বুঝি সাপে কাটতে পারে না?

আমার আর তোর কথা এক হল!

কেন এক নয়? তার চাইতে চল না বাবা, কি হবে মিথ্যে অমন করে আর মাটি খুঁড়ে? আমরা ফিরে যাই।

ফিরে যাব? কখনোই না। জানিস তুই, কেন আমি এখানে এসেছি?

সবটা না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি বৈকি। স্মিতকণ্ঠে জবাব দেয় বাণী।

তুই কিছু জানিস না। জানিস যেজন্য এসেছি তা যদি পাই তাহলে এ জীবনে আমাদের আর কোন অভাবই থাকবে না। রাজার হালে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে-বসেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব।

ঐসব কথায় তুমি বিশ্বাস কর বাবা? পুরনো রাজবাড়ি জমিদারবাড়ি সম্পর্কে ওরকম অনেক কথাই রটে। যখের ধন সত্যি কখনও থাকে। ও গল্পই।

হ্যাঁ, তুই তো সব জেনে একেবারে বসে আছিস। খিঁচিয়ে ওঠে অনিল।

এই এক মাস ধরে তো তুমি কম খুঁজলে না, পেলে কিছুর সন্ধান? বল?

পাইনি এখনো ঠিক, তবে পাবই। নিশ্চয়ই আমি খুঁজে বের করব। আর খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে এক পা আমি নড়ছি না। খুঁজে আমাকে বের করতেই হবে।

সত্যি, বাপের জন্য দুঃখ হয় বাণীর।

মানুষের সমস্ত শিক্ষা ও রুচিকে কি ভাবে যে এক এক সময় তার দুর্ভাগ্য আচ্ছন্ন করে ভাবতেও বিস্ময় লাগে। নইলে তার শিক্ষিত বাপ দুর্ভাগ্যের টানে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আজ।

বাণী মুখে স্বীকার না করলেও তার মনের কোণায় তার উচ্ছৃঙ্খল পথভ্রষ্ট বাপের জন্য যে একটা দুর্বলতা ছিল, সেটাই সে বুঝতে পারত না।

দশ বৎসর বয়সের সময় সে তার বাপকে প্রথম দেখে।

মায়ের সঙ্গে তার সর্বপ্রকার আলোচনাই হত, একমাত্র বাপের সম্পর্কে কখনো কোন আলোচনা হত না।

মা যে কতকটা ইচ্ছা করেই একান্তভাবে তার বাপের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত, ঐ অল্প বয়সেও বাণী সেটা বুঝতে পেরেছিল। কারণ সাধারণের চাইতে ঐ অল্প বয়সেই বাণীর বুদ্ধিটা ছিল একটু বেশ প্রখরই।

এবং মা তার বাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও মার মনের কোণে যে তার স্বামী সম্পর্কে একটা বিশেষ দুবলতা আছে, সেটাও কিন্তু বুঝতে বাণীর কষ্ট হয়নি।

কতদিন তার চোখে পড়েছে মা তার নিভৃতে স্বামীর ফটোখানির দিকে নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তারপর বাপের সঙ্গে যখন এসে সেই বৌবাজারের ভাঙা অন্ধকার বাড়িতে ওরা উঠল একদিন তার হাত ধরে, তখন থেকেই কেন না-জানি ঐ বিচিত্র চরিত্রের লোকটির ওপরে এক অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করেছে সে।

একে একে তার চোখের সামনেই দেখেছে মায়ের গায়ের গহনাগুলো বেচে বাপ তার নষ্ট করেছে, তা সত্ত্বেও মায়ের নির্বিকার ক্ষমা মধ্যে মধ্যে বাণীকে বাপের প্রতি বিদ্রোহী করে তুললেও সেই সঙ্গে লোকটার প্রতি জেগেছে মনের কোথায় যেন একটা সহানুভূতি, অনুকম্পা।

মধ্যে মধ্যে বাপ তাকে পড়িয়েছে, সেই সময় বাণী দেখেছে লোকটির জ্ঞান কত গভীর, কত জানাশোনা।

তৎসত্ত্বেও জগতের সব কিছুর ওপরে অসীম একটা উপেক্ষা। ছন্নছাড়া জীবন—স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা।

তার মায়ের মত স্ত্রী পেয়েও যে লোকটা সুখী হয়ে ঘর বাঁধতে পারল না, তার জন্য মনে মনে বাণী দুঃখ বোধ করেছে।

এবং সেটাই বুঝতে পারেনি যে, ঐ দুঃখবোধের ভিতর দিয়েহ ধীরে ধীরে কখন মনের মধ্যে জেগেছে তার সহানুভূতি, পথভ্রষ্ট সৃষ্টিছাড়া বাপের ওপরে জন্মেছে একটা আকর্ষণ, যার টানে সে অনায়াসেই সেদিন মধ্যরাত্রে পলায়নপর পিতার পিছু পিছু ঘর থেকে বের হয়ে তাকে অনুসরণ করেছিল।

তারপর বাপ টের পেয়ে তাকে ফিরে যাবার জন্য তার অনুরোধ, ভয়-প্রদর্শন, রাগ কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি সেদিন। এবং এখানে এসেও বাপের গালাগালি ও রাগ সব কিছুকে উপেক্ষা করে এই বনজঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়িতে পড়ে আছে।

অনিলও প্রথমটায় তাকে না জানিয়ে অকস্মাৎ চোরের মত গোপনে গোপনে বাণী তার পিছু নেওয়ায় বিশেষ রকম ক্ষেপে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েকে সঙ্গে করে বহরমপুর না নিয়ে এসে পারেনি।

প্রথমে সে জানতে পারে বাণী তাকে অনুসরণ করে এসেছে স্টেশনে পৌঁছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা চেঁচামেচি ও কেলেঙ্কারির ভয়েই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসতে অনিল একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু রাগটা অনিলের দুদিনের বেশী থাকে না।

বাণী সঙ্গে আসতে তার কিছু সুবিধাও হয়েছিল। নিজে হাত পুড়িয়ে আর রান্না করে খেতে হয়নি।

প্রথম প্রথম জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়িতে থাকতে বাণীর খুবই খারাপ লাগছিল,

কিন্তু বাপের একান্ত ঘনিষ্ঠতার মধ্যে এসে বাপের মধ্যে একটা স্নেহকোমল অথচ দুর্দান্ত বেপরোয়া মন আবিষ্কার করে কেমন একটা মায়াও পড়ে গিয়েছিল এই এক মাসের মধ্যেই তার মনে।

অনিল সারাটা দিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

একটা লোহার শাবল নিয়ে এখানে-ওখানে মাটি খোঁড়ে বা জঙ্গল কেটে সাফ করে আর রাত্রে একটা লাল মলাট দেওয়া খাতার জীর্ণ মলিন পাতা খুলে প্রদীপের আলোয় উল্টে উল্টে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে।

কলকাতাতেও এবারে বাণী বাবাকে ঐ খাতাটা পড়তে ও সযত্নে আগলে বেড়াতে দেখেছে।

কৌতূহল হয়েছে খাতাটার মধ্যে কি আছে জানবার জন্য, কিন্তু সুযোগ বা সুবিধা পায়নি কলকাতাতে।

এখানে আসবার পর একদিন দ্বিপ্রহরে বাপের অনুপস্থিতিতে চুরি করে গোপনে খাতাটার কিছু অংশ পড়েছে।

জীর্ণ লালচে পাতায় কার যেন ডায়রী লেখা আছে।

সাল তারিখ দিয়ে নিয়মিত ডায়রী নয়। এলোমেলো অসংলগ্ন ভাবে লেখা, ঠিক ডায়রী নয়, যেন কতকটা আত্মজীবনী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর।

মা'র কাছেই শুনেছিল বাণী একদিন, তার পিতামহের নাম ছিল শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

এবং প্রথম হতেই তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ। সংসারের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। এবং দৈবচক্রে আকস্মিক দুর্ঘটনায় যে রাত্রে তার পিতামহী মৃণ্ময়ী দেবী নিহত হন সেই রাত্রেই তার পিতামহ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সেই যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, আর কোন সংবাদই পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি।

তিনি আজও জীবিত কি মৃত কেউ তা জানে না।

এবং পিতৃমাতৃহীন তার বাপ মানুষ হন তাঁর দিদিমার কাছে মামার বাড়িতেই।

অত্যন্ত আত্মাভিমানী পুরুষ ছিলেন তাঁর বাপ। বছর কুড়ি বয়স যখন তাঁর, সেই সময় একদিন তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট মামার সঙ্গে কি কথায় রাগারাগি হওয়ায় সেই যে একবস্ত্রে মাতামহের গৃহ ছেড়ে চলে আসেন, আর ওমুখো এ জীবনে হননি।

একটা মফস্বল শহরে গিয়ে সেখানকার কলেজে পড়ে ও টিউশনি করে বি এ. পাস করে কলকাতায় এসে এম. এ. পড়তে শুরু করেন। সেই সময়ই তার মাতামহের সঙ্গে ও তার মার সঙ্গে আলাপ।

॥ আঠারো ॥

কিরীটী বামদেবের সঙ্গে বহরমপুর যায়নি ইচ্ছা করেই। বহরমপুরের রত্নমঞ্জিল ও সুবর্ণকঙ্কনকে কেন্দ্র করে যে, একটা রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা কিরীটীর কাছে আর অজ্ঞাত ছিল না।

আগাগোড়া গত ক'দিনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না সব কিছুর মূলে ঐ রত্নমঞ্জিল।

কঙ্কনটা চুরি করার চেষ্টা।

রানার রত্নমঞ্জিলটা ক্রয় করবার বিশেষ আগ্রহ এবং অসম্ভব মূল্যে স্বীকৃত হয়ে বায়না দেওয়া, তারপর কোন এক অপরিচিতের পত্র মারফৎ সাবধান বাণী রত্নমঞ্জিল না বিক্রয় করবার জন্য—সব কিছু জড়িয়ে একটি রহস্যই যেন দানা বেঁধে উঠছিল সব কিছুর মধ্যে।

ঐ রত্নমঞ্জিল।

কিরীটী বুঝেছিল তাকে ঐ রহস্যের কিনারা করতে হলে ভেবেচিন্তে বুঝে অত্যন্ত সাবধানে মাটি বুঝে অতঃপর প্রতিটি পা ফেলে ফেলে এগুতে হবে।

এবং যতটা সম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখে কাজ করতে হবে। যেন কোন মতেই কারো না সন্দেহ জাগে এতটুকু যে কিরীটী রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে।

কিরীটী আড়াল থেকে কাজ করবে একপ্রকার স্থির করেছিল, যেদিন বামদেবের ওখান থেকে নিমন্ত্রণ সেরে ফিরবার পথে সে অনুসৃত হয়েছিল।

তাই পরের দিন যখন তার বন্ধু অফিসারকে বলে লালবাজার থেকে দত্ত অ্যাণ্ড সাহার অফিসে রানার সামনে একটা টোপ ফেলবার ব্যবস্থা করেছিল, নিজে তখন চুপ করে বসে থাকেনি।

কিছু পরেই সাধারণ এক ভাটিয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে বড রাস্তার উপরে এসে ভাবছে কোন্ পথে এখন অগ্রসর হওয়া যায়, হঠাৎ পাশ দিয়ে তার পরিচিত একটি ট্যাক্সিকে যেতে দেখে হাত-ইশারায় কিরীটী ট্যাক্সিটা থামাল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার পরমেশ্বর কিরীটীর বিশেষ পরিচিত হলেও ছদ্মবেশধারী কিরীটীকে কিন্তু চিনতে পারে না প্রথমটায়।

ট্যাক্সিতে চেপে কিরীটী তাকে নির্দেশ দিতেই ট্যাক্সি ছুটল।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ট্যাক্সিটা থামিয়ে পরমেশ্বর ট্যাক্সির দরজা খুলে দিতে যেমন উদ্যত হয়েছে কিরীটী বাধা দিল, এখন নামব না, দরজা বন্ধ করে দাও পরমেশ্বর।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে তাকায় পরমেশ্বর পশ্চাতে আরোহীর দিকে।

কি, চিনতে পারছ না? কিরীটী বললে।

এতক্ষণে কিরীটীর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে পরমেশ্বর তাকে চিনতে পারে।

হেসে বলে, স্যার, আপনি। ইস একদম চিনতে পারিনি স্যার।

সঙ্গে-সঙ্গেই পরমেশ্বর বুঝতে পারে কোন গোপন তদন্তের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারো গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য কিরীটীর এই ছদ্মবেশে অভিসার।

পরমেশ্বর রাস্তার একধারে গাড়িটা পার্ক করে রাখে। কিছুক্ষণ গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করে কিরীটী গাড়ি থেকে নামল। পরমেশ্বরকে অপেক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের বড় বাড়িটার গেটের দিকে।

মস্তবড় পাঁচতলা একটা বাড়ি। অসংখ্য অফিস সেই বাড়িটার ঘরে ঘরে। এবং তখনও সেখানে কর্মব্যস্ততার একটা চাঞ্চল্য।

সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় দত্ত অ্যাণ্ড সাহার চেম্বারের দিকে এগিয়ে চলে কিরীটী একসময়।

এবং চেম্বারের সুইং ডোরের অল্প দূরে দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষা করে।

প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে কিরীটী লক্ষ্য করে একজন হৃষ্টপুষ্ট ভাটিয়া লিফটে চেপে তিনতলায় এসে উঠল, সঙ্গে তার ঢ্যাঙামত একজন লোক, হাতে তার মার্কোভিচের একটা টিন ও ওষ্ঠে ধৃত সদ্য-জ্বালানো একটি সিগারেট।

আমার আর ভিতরে গিয়ে কি হবে শেঠ। ঢ্যাঙা লোকটি ভাটিয়াটিকে বলে।

তাহলে তুমি গাড়িতেই গিয়ে অপেক্ষা কর পিয়ারী। দেখি শালা দত্ত আবার ডাকল কেন?

কিরীটীর মনে হয় ঐ পিয়ারী লোকটি তার একেবারে অপরিচিত নয়।

তাই বসি গে। তুমি তাহলে কাজ সেরে এস। পিয়ারী নামধারী ঢ্যাঙা লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ভাটিয়া দত্ত-সাহার চেম্বারে ঢুকতে যাবে সুইং ডোর ঠেলে, একজন ভদ্রলোক বের হয়ে এল এবং মুখোমুখি হতেই বললে, রানা যে, কি খবর?

একটু কাজ আছে ভাই মুখুজ্জে।

ও।

রানা ভিতরে প্রবেশ করল এবং মুখুজ্জে চলে গেল।

তাহলে উনিই সেই স্বনামধন্য শেঠ রতনলাল রানা। কিরীটী মনে মনে ভাবে। রত্নমঞ্জিল বায়না করেছে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় কিনবার জন্য ও ই।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখা যাচ্ছে—লোকটির দেখা পাওয়া গেল।

কিরীটী অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ছকে ফেলে।

রতনলাল রানার সঙ্গে পিয়ারা।

কিরীটীর মনে পড়ল হঠাৎ ভাবতে ভাবতে, গোপন নোটবুকে তার ঐ পিয়ারা নামটি অনেকদিন আগে থেকেই টোকা আছে।

ক্রমশ সবই মনে পড়ে।

লোকটার গতিবিধি যে কেবল অত্যন্ত সন্দেহজনক শুধু তাই নয়, বছরখানেক আগে একবার ও মাসছয়েক আগে আর একবার দুটো জটিল নোট জাল ও ওপিয়াম স্মাগলিংয়ের কেসের সঙ্গে ঐ নামটি বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িয়ে ছিল কিরীটীর মনে পড়ল।

কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও লোকটাকে ধরা ছোঁয়া যায়নি সে সময়।

তেলা মাছের মত হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও প্রায় প্রমাণের অভাবে পিছলে গিয়েছিল যেন।

তখনই বুঝেছিল কিরীটী লোকটি যেমনি ধূর্ত, ক্ষিপ্র ও তেমনি শয়তান।

অসংখ্য ডেরা আছে লোকটার।

কোথায়ও এক দিন, কোথায়ও দুদিন বা বড়জোর দিন চারেকের বেশী এক নাগাড়ে থাকে না কখনো।

সর্বত্র গতিবিধি।

কি করে কি ভাবে চলে তাও সঠিক জানা যায়নি এখন পর্যন্ত।

তাতে করে আরো সন্দেহটা পিয়ারীর উপর ঘনীভূত হয়েছে কিরীটীর।

এবং সেই থেকেই তীক্ষ্ণ নজর আছে পিয়ারীর উপর কিরীটীর। লোকচরিত্র সম্পর্কে কিরীটীর যতটা জ্ঞান আছে, তাতে করে অন্তত এটুকু তার কাছে অস্পষ্ট নেই যে লোকটা গভীর জলের মাছ।

কিরীটী তাই রানার সঙ্গে পিয়ারীর ঘনিষ্ঠতা দেখে সত্যি চমকে উঠেছিল।

পিয়ারী রানার সঙ্গে কেন? কতদিনের আলাপ ওদের আর কেনই বা ঐ ঘনিষ্ঠতা? এবং কোন্ সূত্রে আলাপ ওদের?

প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে রানা চেম্বার থেকে বের হয়ে এল।

কিরীটীও নিঃশব্দে অলক্ষ্যে রানাকে অনুসরণ করে।

রানা তার অফিসে পৌঁছে পিয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে উপরে চলে গেল।

কিরীটী তখন গাড়ি থেকে নেমে পরমেশ্বরের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাকে বললে, পরমেশ্বর, তুমি একটু দূরে গিয়ে তোমার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা কর। ঐ যে ড্যাঙা লোকটা দেখলে, ও যদি এসে তোমার ট্যাক্সি ভাড়া করে তো তাকে পৌঁছে দেবে ও ঠিকানাটা ওর মনে রাখবে। আর তা যদি না হয় তো আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত

অপেক্ষা করবে। মোট কথা আমার সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয় ভালই, নচেৎ কাল সকালে আমার সঙ্গে সকাল নটার মধ্যে দেখা করবে।

পরমেশ্বর সম্মতি জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

আধঘণ্টা পরে প্রায় পিয়ারীকে বের হয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে লক্ষ্য করলে কিরীটী। কিন্তু রানাকে বের হতে দেখল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন রানা বের হল না, কিরীটী রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

মোড়ে এসে দেখল পরমেশ্বরের ট্যাক্সিটা সেখানে আশেপাশে কোথায়ও নেই।

খানিকটা আরও এগিয়ে গিয়ে হাত-ইশারায় একটা খালি ট্যাক্সি ডেকে কিরীটী উঠে বসল।

সোজা মেসে ফিরে এল কিরীটী।

॥ উনিশ ॥

রাত আটটা নাগাদ বামদেবের ওখান হতে টেলিফোনে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি লিখিত পত্রের কথা জানতে পারল কিরীটী।

বামদেবের সঙ্গে কথা শেষ করে কিরীটী সোফায় বসে একটা সিগার ধরাল।

নানা চিন্তা তার মাথার মধ্যে এসে ঘোরাফেরা করছে তখন।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে নিয়ে লালবাজারে কনেকশন চাইল।

ফোন ধরেছিল যে তাকে কিরীটী জিজ্ঞাসা করে, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ সি আই ডি. অফিসার আছে কিনা দেখ তো।

মৃত্যুঞ্জয় নতুন সি আই ডি তে ঢুকলেও ছেলেটি খুব চালাক, চটপটে ও কর্মঠ।

মৃত্যুঞ্জয় ওই সময় লালবাজারেই ছিল। সে এসে ফোন ধরে। কে? আমি মৃত্যুঞ্জয় কথা বলছি।

কে, মৃত্যুঞ্জয়?

হ্যাঁ। আপনি কে?

আমি কিরীটী রায়। শোন, একটা জরুরী কাজ করতে পারবে মৃত্যুঞ্জয় এখুনি?

কি ব্যাপার বলুন তো?

সংক্ষেপে তখন রানার অফিসের ঠিকানা ও রানার চেহারার একটা বর্ণনা দিয়ে সেখানে

গিয়ে বাড়িটার উপরে ও সেখানে অন্য কেউ আসা-যাওয়া করে কিনা তাদের ওপরে নজর রাখবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে বলল কিরীটী।

মৃত্যুঞ্জয় সব শুনে বললে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

মৃত্যুঞ্জয় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছবার মিনিট কয়েক বাদেই লক্ষ্য করলে, যোগানন্দকে রাণার অফিসে গিয়ে প্রবেশ করতে।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে পাড়াটা তখন বেশ নির্জন হয়ে গিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় দুটো বাড়ির মধ্যবর্তী একটা সরু গলি মত জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। স্থির সতর্ক দৃষ্টি তার থাকে রানার অফিস-বাড়িটার দিকে।

রানার গাড়িটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

রাত প্রায় সোয়া নটা নাগাদ যোগানন্দ বের হয়ে এল এবং সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে শ্লথ মন্থর পদে হেঁটে চলল। এবং প্রায় যোগানন্দ হাত দশ-বারো এগুবার পরই রানা নেমে এসে গাড়িতে উঠল।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

মৃত্যুঞ্জয় তখন বেশ একটু দ্রুতপদেই এগিয়ে গেল রাস্তার মোড়ের দিকে। যোগানন্দ তখনও বেশী দূর যায়নি, ফুটপাথ ধরে ধীরে শ্লথ গতিতে হেঁটে চলেছে।

মৃত্যুঞ্জয় অনুসরণ করে যোগানন্দকে একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান রেখে নিঃশব্দে।

হাঁটতে হাঁটতে যোগানন্দ বৌবাজার স্ট্রীট ধরে কিছুটা এগুবার পর হঠাৎ বাঁয়ের একটা সরু অন্ধ গলির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়িয়ে পড়ে।

রাত প্রায় পৌনে দশটায় দীর্ঘ অপেক্ষার পর যোগানন্দ আবার একসময় বের হয়ে এল।

আবার সে হেঁটেই চলল। মৃত্যুঞ্জয়ও তাকে অনুসরণ করে চলে।

হেঁটেই চলেছে যোগানন্দ।

স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটি বেশ অন্যমনস্ক, কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে।

রাত দশটা বাজতে চলল তবু কলকাতার রাস্তার জনপ্রবাহের এখনো যেন বিরাম নেই। শহরের কর্মব্যস্ততা তেমনি চলেছে যেন অব্যাহত। তবে বাসে ট্রামে ভিড়টা যেন একটু কমে এসেছে।

দোকানপাট ক্রমে ক্রমে সবই প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একমাত্র খাবারের দোকান, পান-সিগারেটের দোকান ও চায়ের রেস্তোরাঁগুলো ভিন্ন—বিশেষ করে শেষোক্ত জায়গায় খরিদ্দারের এখনো অভাব নেই।

মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্য করে—যোগানন্দ হেঁটে চলেছে অন্যমনস্ক হয়ে এভিন্যু ধরে।

যোগানন্দ হেঁটে চলছিল। রানার ওখানেও আজ যোগানন্দ বিশেষ পান করেনি। সামান্য যা পান করেছিল তাতে শরীরটা একটু চনচন করে উঠেছিল বটে কিছুক্ষণের জন্য, তার চাইতে বেশী কিছুই হয়নি।

দুটো ডেরা যোগানন্দর। একটি কলেজ স্ট্রীটের উপরে সিটি হোটেলে তিনতলার নিভৃত একটি কক্ষ। অন্যটি কালীঘাটে মহিম হালদার স্ট্রীটের উপর দোতলা একটা বাড়ি। আজকের রাত্রের মত যোগানন্দ আর কালীঘাটে ফিরবে না।

সিটি হোটেলের ঘরেই রাত কাটাবে ঠিক করেছিল ইতিমধ্যে মনে মনে। হোটেলে পৌঁছে সোজা তিনতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে পকেট থেকে চাবি বের করে দরজাটা খুলে নিজের নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল যোগানন্দ।

দরজাটা ভিতর থেকে এঁটে দিল।

ঘরটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো।

একটি কাবার্ড, একটি ড্রেসিংটেবিল, তার পাশে একটি আলনা।

এক পাশে একটি সিঙ্গল খাটে শয্যা বিছানো। একটি ছোট টেবিল ও একটি বেতের আরাম-কেদারা।

জামাকাপড় খুলে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করল যোগানন্দ।

স্নান করে একটা পায়জামা ও গেঞ্জি পরে বাথরুম থেকে বের হয়ে এল।

ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে আসছে।

আরাম-কেদারাটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল যোগানন্দ।

মৃত্যুঞ্জয় তখন হোটেলের মালিক শশীকান্ত হাজরার সঙ্গে তার প্রাইভেট চেম্বারে বসে কথা বলছে।

মৃত্যুঞ্জয় পূর্বে কয়েকবার কিরীটীর সঙ্গে কাজ করেছে। এবং কিরীটীর সঙ্গে কাজ করে ভাবছে ঐ লোকটি সখের একজন গোয়েন্দা হলেও অদ্ভুত তার বিচার ও বিশ্লেষণশক্তি। কিরীটীর সঙ্গে কাজ করতে পারলে সে লাভবান হবে। তাই কিরীটীর নির্দেশ পেয়ে সে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল।

পরের দিন ঠিক বেলা নটায় পরমেশ্বর কিরীটীর সঙ্গে মেসে এসে দেখা করল।

লেক অঞ্চলে যে হঠাৎ-ধনী ও তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর উন্নাসিক এক অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে ও গত মহাযুদ্ধে কালোবাজারে ফেঁপে-ওঠা সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছে—সেই-

খানেই একটা বাড়ির দোতলা ফ্ল্যাটের দুখানা ঘর নিয়ে পিয়ারী থাকে পরমেশ্বর বললে।

পরমেশ্বরের ট্যাক্সিতে চেপেই পিয়ারী ফিরে গিয়েছিল। এবং লেক অঞ্চলের সেই টবাড়ির সামনেই তাকে নামিয়ে দিয়ে এসেছে পরমেশ্বর।

ইতিমধ্যে খুব ভোরে ফোন মারফৎ কিরীটী যোগানন্দর সংবাদও মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে পেয়েছিল।

হোটেলের ম্যানেজার হাজরার কাছ থেকে যোগানন্দ সম্পর্কে মৃত্যুঞ্জয় যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিল সেটা যেমনি অস্পষ্ট তেমনি ধোঁয়াটে।

যোগানন্দের পুরো নাম যোগানন্দ রায়।

সিটি হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরটি যোগানন্দ বছর তিনেক হল ভাড়া নিয়ে রেখেছে বটে কিন্তু নিয়মিত ঠিক ভাড়া দিলেও দিনের বেলায় তো কোন দিনই নয়—রাতেও কখনো কখনো হপ্তায় এক-আধ-দিন কাটায় মাত্র সেই ঘরে।

ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। বিশেষ সজ্জন বলেই মনে হয়।

কি করে, চাকরি না ব্যবসা তাও ম্যানেজার বলতে সক্ষম হয়নি। তবে অবস্থা বেশ সচ্ছল বলেই মনে হয়, বেশভূষা অত্যন্ত কেতাদুরস্ত ফিটফাট।

ভিজিটার্স কখনো কাউকে আসতে দেখা যায়নি। সঙ্গে করেও গত তিন-চার বছরে কাউকে কখনও তাকে কেউ আনতে দেখেনি।

লোকটা যে মদ্যপান করে সেটা হোটেলের চাকরের মুখেই শোনা।

।। কুড়ি ।।

পরমেশ্বরকে বিদায় দিয়ে কিরীটী সোজা এল লালবাজার। এবং সুভাষের ঘরে ঢুকল।

সুভাষ বললে, কিরীটী যে, কি ব্যাপার?

একটা কাজ করতে পারবে ভাই?

কি বল?

কাউকে আজ রাত্রের গাড়িতেই হরিদ্বার পাঠাতে পারবে?

কি ব্যাপার বল তো কিরীটী?

হরিদ্বারে হরকি পিয়ারীর কাছে ভরদ্বাজ আশ্রমে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী নামে একজন সংসারত্যাগী ভদ্রলোক থাকেন। আমি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর নামে একটা চিঠি দেব, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বামদেব অধিকারীর পূর্বপুরুষদের যতটা সম্ভব সংবাদ লোকটিকে সংগ্রহ করে আনতে হবে, আর জেনে আসতে হবে তিনি তাঁর পুত্র অনিল চক্রবর্তীর কোন

সংবাদ রাখেন কিনা।

ব্যাপারটা খুলে বল ভাই।

অতঃপর কিরীটী সংক্ষেপে রত্নমঞ্জিল ও স্বর্ণকঙ্কন সম্পর্কে সমস্ত বললে সুভাষকে এবং পরদিন কিরীটী বহরমপুর রওনা হয়।

অপমানে আক্রোশে ফুলতে ফুলতে পিয়ারী রত্নমঞ্জিল থেকে বের হয়ে এল।

বিনয়ের শেষের কথাগুলো তখনও যেন তাঁর সর্বাঙ্গে ছুঁচ ফোটাচ্ছিল।

রামদেব যে তার প্রস্তাবে রাজী হবেন না পিয়ারী সেটা কিছুটা পূর্বেই অনুমান করেছিল, তাই সে আরো দুজনকে সঙ্গে এনেছিল, তার বিশ্বস্ত ও বহু পাপানুষ্ঠানের সহচর গুপীনাথ ও ছট্টুলালকে।

গুপীনাথের তাঁবে ছিল কলকাতার একদল নিম্নশ্রেণীর জঘন্য প্রকৃতির গুণ্ডা।

নিজেও যে সে রাতের অন্ধকারে ও দিনের প্রকাশ্য আলোকে কত লোকের বুকে ছুরি বসিয়েছে তার সংখ্যা ছিল না।

গায়ে যেমন অসুরের মত শক্তি, প্রকৃতিও তেমনি ছিল দুর্ধর্ষ।

পয়সার বিনিময়ে গুপী করতে পারত না দুনিয়ায় এমন কোন কাজই ছিল না।

পিয়ারী বহরমপুরে এসে কিন্তু কোন হোটেলে ওঠেনি।

ছট্টুর কাছ থেকে পূর্বাহ্ণেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে জেনেছিল রত্নমঞ্জিল থেকে আধ মাইলটাক দূরে গঙ্গার ধারে নবাব আমলের একটা ভগ্ন অট্টালিকা আছে, লোকে বলে সেটাকে আরামবাগ। সেই আরামবাগেই এসে আশ্রয় নিযেছিল তিনজনে গোপনে।

জঙ্গলাকীর্ণ বুনো আগাছায় ভরা বহু বৎসরের পরিত্যক্ত ভগ্ন জীর্ণ আরামবাগেরই একটা কক্ষ কোনমতে পরিষ্কার করে নিয়ে ওরা তাদের ডেরা বেঁধেছিল।

একটি ভগ্ন অট্টালিকা।

চারিপাশে ও মধ্যস্থলে একদা মনোরম উদ্যান ছিল, শোনা যায় কোন নবাবের বিলাসকেন্দ্র ছিল ঐ সুরম্য আরামবাগ।

বেগম ও তার সুন্দরী সহচরীদের নিয়ে একদা নবাবের হয়তো কত আনন্দ-মুখরিত দিনরাত্রি আরামবাগে কেটে গিয়েছে।

কত মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগের স্মৃতি আজও হয়তো আরামবাগের মন্থর বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গে দীর্ঘশ্বাসের মত গুমরে গুমরে উঠছে।

আরামবাগের দেড় ক্রোশের মধ্যে কোন জনমানবের বসতি নেই। শহরের এদিকটা একপ্রকার পরিত্যক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। নবাবী আমলের কলকোলাহল ঐশ্বর্য

প্রাচুর্যের আড়ম্বর আজ শান্ত ও লুপ্ত। কেবল এখনো সাক্ষ্য দিচ্ছে সব কিছুর ভগ্ন-জীর্ণ স্তূপে স্তূপে।

পিয়ারী রত্নমঞ্জিল থেকে বের হয়ে প্রথমে সোজা শহরের দিকে গেল। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার চিন্তায় সে ডুবে গেল।

কোন্ পথে এবারে সে অগ্রসর হবে ?

চিন্তা করতে করতে একটা বুদ্ধি তার মাথার মধ্যে এসে উদয় হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিজের চিন্তায় মগ্ন পিয়ারী কিন্তু লক্ষ্য করল না ঠিক সেই সময় মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পুরুষ্টু গোঁফ, মাথায় শালের টুপি, পরিধানে পায়জামা ও তসরের সেরওয়ানী একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ভদ্রলোক রেস্টুরেন্টের মধ্যে এসে প্রবেশ করে পিয়ারীর অদূরে একটি টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। ছোকরা চাকরটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল নতুন আগন্তুকের।

এক কাপ চা। আগন্তুক বলে।

পিয়ারীর মুখের সিগারেটটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, হাতের মার্কোভিচের টিনটা থেকে নতুন একটা সিগারেট বের করে দুই ওষ্ঠে চেপে ধরে, সমাপ্তপ্রায় সিগারেটটার সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করে প্রথমটা ফেলে দিল নিঃশেষিত চায়ের কাপটার মধ্যে।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি শোভিত মুসলমানী পোশাক পরিহিত আগন্তুক আর কেউ নয়, কিরীটী। এবং মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে সে বহরমপুরে এসেছে।

পিয়ারী যে বহরমপুরে এসেছে কিরীটীর সেটা অজ্ঞাত ছিল না।

মিনিট দশেক বাদে চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে পিয়ারী রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গেল। কিরীটীও সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় বের হয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে।

সাধারণ বেশে মৃত্যুঞ্জয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে এসে চাপাকণ্ঠে কয়েকটা উপদেশ দিয়ে কিরীটী আবার রেস্টরেন্টে গিয়ে প্রবেশ করল।

পরের দিন রাত্রে অপেক্ষা করেও প্রায় সারাটা রাত বিনয় কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু হতাশ হল না সে।

তার পরের রাত্রেও বিনয় তার দোতলার শয়নঘরের খোলা জানালার সামনে অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ নীচের বাগানে। শুধু কি সেই লাল আলোর সংকেতটুকুই! রাত্রির মত মাধুর্যময়ী অথচ রহস্যময়ী সেই পথপ্রদর্শিকার মিষ্টি কৌতুক সেও ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

আজকের রাতেও যে বিনয়ের চোখে ঘুম নেই, শেষোক্তগুলোও তার কারণ বৈকি।

নীচের বাগানে কাল রাত্রে যে পোড়া সিগারের শেষ টুকরোটা পাওয়া গিয়েছে পরে সেটা পরীক্ষা করে দেখেছে বিনয়।

দামী দগ্ধ সিগারের শেষাংশ।

সিগারের টুকরোটা যখন বিনয় বাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পায় তখনও সেটা পুড়ছিল অতএব ক্ষণপূর্বে কেউ নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল নিঃসন্দেহে।

কিন্তু কে?

তারপর এ বাড়ির কেয়ারটেকার মনোহর।

লোকটার গতিবিধি ও হাবভাব স্পষ্ট সন্দেহজনক। বিপক্ষ দলের সংবাদ সরবরাহকারী বলেই মনে হয়।

অঘোরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছেন শয্যার ওপরে বামদেব। ঘরের আলোট নেভানো।

বন্ধ দরজার মধ্যবর্তী সামান্য ফাঁক দিয়ে স্টিলের একটি পাত ধীরে ধীরে প্রবেশ করল, তারপর নিঃশব্দে সেই পাতের চাপে দরজার অর্গলটা উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে।

দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে যায়—সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে কালো একটা হাত ধীরে ধীরে একটা সরীসৃপের মত।

অতি সহজেই অতঃপর সেই হাত দরজার অর্গলটা ধরে নীচের দিকে অর্গলটা নামিয়ে আনে—দরজার কপাট দুটো খুলে যায়।

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ছায়ার মত একটা মনুষ্যমূর্তি বামদেবের শয়নঘরে প্রবেশ করে।

তার পশ্চাতে আর একজন।

অন্ধকারে আগে-পিছে সেই ছায়ামূর্তি দুটো এগিয়ে যায় বামদেবের শয্যার দিকে।

প্রথম ছায়ামূর্তি পকেট থেকে একটা ছোট শিশি ও রুমাল বের করে শিশির মধ্যস্থিত আরক ঢেলে রুমালটা ভিজিয়ে নিল।

প্রথম ছায়ামূর্তি রুমাল হাতে ঘুমন্ত বামদেবের শিয়রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি দাঁড়াল এসে পায়ের কাছে।

রুমালটা ছায়ামূর্তি ঘুমন্ত বামদেবের নাকের কাছে ধরল। ঘরের বাতাসে একটু মিষ্টি কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

অজ্ঞান বামদেবকে কাঁধের ওপরে তুলে ছায়ামূর্তি দুজন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বিনয় অপেক্ষা করেছিল। আজকেও আবার ঠিক সেই সময় লাল আলোর সঙ্কেত দেখা গেল নীচের অন্ধকারে।

বিনয় জানালার সামনে সতর্ক হয়েই দাঁড়িয়েছিল। সে আর মুহূর্ত বিলম্ব করে না। টর্চটা নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায়।

গতরাত্রের মত আজও দরজাটা খোলা। কিন্তু নজর দেবার মত যেন বিনয়ের ফুরসত নেই।

দ্রুতপদে বিনয় বাগানের দিকে চলে।

কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার আগেই কার সঙ্গে যেন তার অন্ধকারেই ধাক্কা লাগে।

কে?

কিন্তু যার সঙ্গে বিনয়ের অন্ধকারে ধাক্কা লেগেছিল সে বিনয়ের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বিনয়ের হাতটা চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে কেবল বলে, চুপ। আস্তে।

কে?

বিনয়বাবু, আমি কিরীটী।

বিস্ময়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খায় বিনয়। কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কথাই সরে না।

কিরীটী রায়। এই মধ্যরাত্রে রত্নমঞ্জিলের বাগানের মধ্যে অন্ধকারে।

অদূরে এমন সময় একটা দ্রুতপলায়নপর পদশব্দ শোনা গেল। শুকনো ঝরা পাতার ওপর দিয়ে মচমচিয়ে কে যেন দ্রুত পালিয়ে গেল।

সব মাটি করে দিলেন। পালিয়ে গেল লোকটা। কিরীটী বললে।

কিরীটীর কথায় বিনয়ের বিস্ময় যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবু প্রশ্ন করে, কে? কে পালাল?

তা আর জেনে কি হবে। কিন্তু আপনাকে কলকাতা থেকে আসবার সময় বার বার বলে দিয়েছিলাম না, দিনেরাত্রে সর্বদা সাবধানে থাকবেন। অন্ধকারে রাত্রে একা একা নিরস্ত্র ঐ জঙ্গলের মধ্যে এক লাল আলোর নিশানা দেখে ছুটছিলেন, যদি আচমকা বিপদে পড়তেন কে রক্ষা করত আপনাকে। ছিঃ, আপনি একেবারে ছেলেমানুষ।

কিন্তু—

পরশু রাত্রের ব্যাপারেও আপনার শিক্ষা হয়নি। আবার ঐ জঙ্গলের মধ্যে ছুটছিলেন।

আপনি—আপনি পরশু রাত্রের ব্যাপার জানেন?

জানি। কেন ভিচের সিগারের টুকরো পাননি?

Oh! It was then you? তা কবে এলেন আপনি?

চারদিন হল। যাক, এখন চলুন দেখা যাক মনোহর কি করছে।

দুজনে ফিরে এল রত্নমঞ্জিলে।

দেখা গেল মনোহরের ঘরের দরজা খোলা। আগে বিনয় ও পশ্চাতে কিরীটী মনোহরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মাটির শয্যায় শুয়ে মনোহর নাক ডাকাচ্ছে।

ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন যখন, আপাতত আর ওঁকে বিরক্ত করে প্রয়োজন নেই। চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

বেশ একটু জোরে জোরেই কথাগুলো উচ্চারণ করে কিরীটী বিনয়কে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং নিঃশব্দে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার কবাট দুটো বাইরে থেকে টেনে শিকল তুলে দিল।

ও কি!

এতকাল এ বাড়ির কেয়ারটেকার ছিল, তাই ওর সম্পর্কে একটু কেয়ার নেওয়া হল। এখন চলুন ওপরে যাওয়া যাক। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

দুজনে সবে ওপরের বারান্দায় পা দিয়েছে, সুজাতার শঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বিনয়! বিনয়!

সুজাতা হন্তদন্ত হয়ে বিনয়ের ঘরের দিকেই আসছিল।

কি—কি হয়েছে সুজাতা? বলতে বলতে উৎকণ্ঠিত বিনয় এগিয়ে যায়।

বাবা—বাবাকে তার ঘরে দেখছি না। ঘরের দরজা খোলা।

সে কি! চল তো?

সুজাতা, বিনয় ও কিরীটী তিনজনেই এগিয়ে যায় বামদেবের শয়নকক্ষের দিকে।

সত্যি ঘর খালি।

বিনয় থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কিরীটী কিন্তু ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে একটা মিষ্টি উগ্র গন্ধ পেয়েছিল।

বার দুই জোরে জোরে ঘ্রাণ নিয়ে কিরীটী বললে, হুঁ, ক্লোরোফরম।

সুজাতার মুখে যা শোনা গেল তার মর্মার্থ এই, হঠাৎ ঘুম ভেঙে সুজাতা বাইরে এসে বামদেবের শয়নঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে। বামদেবের চিরদিন শয়নঘরের দরজা বন্ধ করে যেমন শোওয়া অভ্যাস তেমনি রাত্রেও কখনও তিনি ওঠেন না। বহুকাল থেকেই তিনি রাত নটায় শয্যাগ্রহণ ও ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করেন।

তবু সুজাতা বাথরুমটা একবার দেখে এসেছে। কিন্তু সেখানেও বামদেব নেই।

কি হল কিছুই তো বুঝতে পারছি না কিরীটীবাবু। উৎকণ্ঠিত বিনয় বলে।

কিরীটীর চিন্তাশক্তি তখন অত্যন্ত সক্রিয়। ঘরের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তা[র] নাসারন্ধ্রে যে মিষ্টি গন্ধের [illegible] প্রবেশ করেছিল, সেটা যে ক্লোরোফরম ছাড়া আর কিছু নয় এবং বামদেবের অদৃশ্য হওয়ার রহস্যটা যে সেইখানেই দানা বেঁধে আছে, কিরীটীর পক্ষে সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি।

শয্যায় [illegible] বা

ঘুম [illegible] চোখ বুজে একপ্রকার বাধ্য হয়েই শয্যার ওপরে শুয়ে [illegible] শুয়ে আছে।

বা[illegible] শেষ হওয়া সোজা নয়।

ক[illegible] কথা। অন্ধকারে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে বাণী হঠাৎ একসময় [illegible] বাপ শয্যা ছেড়ে উঠে বসল।

কিছুক্ষণ অন্ধকারে তার শয্যার দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পায়ে অনিল ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বাণী তথাপি কিছুক্ষণ শয্যার ওপরে শুয়ে রইল। তারপর উঠে বসে দেশলাইটা দিয়ে প্রদীপটা জ্বালল। গতকাল বাণী একসময় লক্ষ্য করেছিল হঠাৎ মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে, ঘরের দেওয়ালে একটা ফোকরের মধ্যে বাবা তার পুঁটলিটা রাখে আর সেই লাল মলাটের নোটবইটা রাখে ঘরের মেঝেতে একটা গর্তে ইট চাপা দিয়ে। নোটবইটা রাখবার জায়গাটার সন্ধান এতদিন বাণী পায়নি।

প্রদীপের আলোয় গতরাত্রের দেখা দেওয়ালের একটা ইট সরিয়ে ফোকরটার মধ্যে হাত গলিয়ে পুঁটলিটা টেনে বের করল।

পুরাতন লাল রংয়ের শালুতে বাঁধা একটা ছোট পুঁটলি।

প্রদীপের ম্লান আলোর সামনে বসে কম্পিত হাতে বাণী পুঁটলিটা খুলে ফেলল।

পুঁটলিটা খুলতেই একটা ছোট চৌকো সাইজের কারুকার্য করা হাতীর দাঁতের তৈরী কৌটো বের হল। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কৌটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে বাণী।

ধীরে ধীরে কৌটোর ঢাকনিটা খুলতেই ম্লান প্রদীপের আলোয় তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে প্রকাশিত হল সযত্নে তুলোর ওপরে রাখা একটি স্বর্ণকঙ্কন।

সেকেলে জড়োয়া একেবারে খাঁটি পাকা সোনার তৈরী কঙ্কনটি।

হাঙ্গরমুখী কঙ্কন। দু'পাশ হতে দুটো হাঙ্গরের হিংস্র মুখ যেন পরস্পরের সঙ্গে এসে

ঠেকেছে।

কঙ্কনের গায়ে যে সূক্ষ্ম ছিলার কাজ তাও দেখবার মত।

নারীমনের সহজাত কৌতূহলেই বাণী কঙ্কনটা একবার [illegible] নিয়ে দেখে।

বাইরে একটা মৃদু পত্রমর্মর শোনা গেল।

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি কঙ্কনটা কৌটোয় ভরে পুঁটলির মধ্যে রেখে যথাস্থানে গিয়ে রেখে দিল।

সুবর্ণকঙ্কন। লাল মলাটের নোটবই [illegible] মোহন চৌধুরীর রোজনামচা—ডায়েরী।

নিশ্চয়ই ঐ নোটবইয়ের মধ্যে আছে [illegible]। কার ঐ কঙ্কন?

অদম্য কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে রাখতে [illegible] থেকে ইট তুলে গর্তের মধ্যে যেখানে লাল মলাটের [illegible] হাত ঢুকিয়ে বাণী নোটবইটা বের করে আনলে।

প্রদীপের আলোয় বসে দ্রুত একটার পর একটা [illegible] লাগল।

হঠাৎ মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে তার চোখের দৃষ্টি [illegible] হল।

মৃন্ময়ী জানে না যে ঐ সুবর্ণকঙ্কনের কথা অনেকদিন আগেই আমি শ্বশুর মশাইয়ের কাছে শুনেছি। অনিলের জন্মের বছর দেড়েক আগে তিনি একদিন হঠাৎ সন্ধ্যেবেলায় বহির্মহলে আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। একথা সেকথার পর একসময় আমাকে বললেন, দেখ বাবা, তোমাকে আজ একটা কথা বলব। আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছু সঞ্চিত হীরা জহরৎ ও বাদশাহী মোহর আছে। বাবা মৃত্যুর সময় আমাকে বলে গিয়েছিলেন, ঐ ধনরত্ন রত্নমঞ্জিলের ঐ নৈঋত কোণে যে শিংশপা বৃক্ষটি আছে, তার গোড়া থেকে পূব কোণে কোন এক জায়গায় মাটির নীচে একটি শিলাখণ্ড প্রোথিত আছে, সেই শিলাখণ্ডের নীচে একটি ছোট লোহার সিন্দুকে সেই ধনরত্ন লুকোনো আছে, সিন্দুকটির কোন চাবি নেই। সিন্দুকের ওপরে পাশাপাশি অনেকটা দুটি বলয়ের আকারে খাঁজ কাটা আছে। ঐ বলয়াকার খাঁজের মধ্যে দুটি কঙ্কন বসিয়ে চাপ দিলেই আপনা হতেই তখন সিন্দুকের ডালাটি নাকি খুলে যাবে। মীনুর হাতে যে দুটি সুবর্ণকঙ্কন দেখেছ, যা তোমার শাশুড়ী তাকে দিয়েছেন, একমাত্র ঐ দুটি কঙ্কনের সাহায্যেই সিন্দুকটি খোলা যায়। অন্য কোন কঙ্কন দিয়েই সিন্দুক খোলা যাবে না। শরীর আমার ইদানীং খারাপ যাচ্ছে। কবে আছি কবে নেই—তাই তোমাকে এই গোপন তথ্যটি বলে গেলাম। যদিচ এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই একমাত্র অধিকার আছে ঐ ধনরত্নে, তবু তোমাকে

বলে রাখলাম এইজন্য যে আর তো পুত্র আমাদের হবে না, তোমরাই হবে সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

কথাটা শুনে আমি চুপ করেই রইলাম।

শ্বশুরমশাই একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, মীনুকেই আমি একথা বলে যেতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই তাকে বলিনি, কারণ সে আমার নিজের সন্তান হলেও সে অস্থির চপল ও উগ্র প্রকৃতির। বিলাসব্যসনই দেখছি তার জীবনের একমাত্র কাম্য। সে হয়তো ঐ ধনরত্নের লোভ সামলাতে পারবে না। পূর্বপুরুষের নির্দেশ আছে, অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া ও নিতান্ত অভাব না হলে কোন মতেই যেন ঐ সঞ্চিত গুপ্তধনে না হাত দেওয়া হয়। তুমি নির্লোভ, নীতিপরায়ণ। তুমি সে লোভকে জয় করতে পারবে, তাই তোমাকে আরো বলে গেলাম।

এতক্ষণে বাণীর কাছে সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পিতার এই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ে থাকার উদ্দেশ্য তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়।

পিতা তার তাহলে সেই গুপ্ত ধনৈশ্বর্যের লোভেই এখানে এসেছে, তাই সে দিবারাত্র জঙ্গলের মধ্যে এখানে ওখানে মাটি খোঁড়ে, জঙ্গল সাফ করে।

বাণী আবার ডায়েরীর পাতা ওল্টাতে লাগল। আর এক পাতায় লেখা আছে :

মৃন্ময়ীকে স্পষ্টই আজ বলে দিয়েছি, বামদেবের ভাবী স্ত্রীই ঐ কঙ্কনের যখন একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তখন কঙ্কন তাকে এ বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে একটি ফিরত দিয়ে যেতেই হবে। মৃন্ময়ী শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতা হয়েছে।

।। বাইশ ।।

শেষরাত্রির দিকে বামদেবের জ্ঞান ফিরে এল।

প্রথমটায় তো বামদেব বুঝতেই পারেন না, এ তিনি কোথায়। চিন্তাশক্তি ধোঁয়াটে দুর্বল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন জ্ঞান বেশ স্পষ্ট হয়ে এল, তিনি দেখলেন হাত-পা-বদ্ধাবস্থায় জীর্ণ পুরাতন একটা ঘরের মধ্যে মাটিতে পড়ে আছেন।

অদূরে ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে।

কিছুই মনে পড়ে না, কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না—এ তিনি কোথায় এলেন! কেমন করেই বা এলেন। ছিলেন তো রত্নমঞ্জিলের নিজের ঘরে শয্যায় শুয়ে।

তবে এখানে এলেন কেমন করে, কখনই বা এলেন।

মচমচ একটা জুতোর শব্দ শোনা গেল। তারপরই ভেজানো দরজা ঠেলে দুজন ঘরে

প্রবেশ করল। প্রথম ব্যক্তিকে দেখেই কিন্তু বামদেব চমকে উঠলেন। পরশু সকালে ঐ লোকটিই রত্নমঞ্জিল কেনবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল।

নামটাও মনে পড়ে—পিয়ারী।

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কিন্তু চিনতে পারলেন না বামদেব। গুপীনাথকে তো বামদেব ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি, চিনবেন কি করে।

জুতোর মচমচ শব্দ তুলে পিয়ারী বামদেবের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল, এই যে অধিকারী মশাইয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখছি। গুপী, ওঁকে তুলে বসিয়ে দাও।

গুপী পিয়ারীর নির্দেশ পালন করে, এক হ্যাঁচকা টানে তুলে বামদেবকে বসিয়ে দিল।

তারপর অধিকারী মশাই, এবারে রত্নমঞ্জিল বিক্রী করবেন তো ?

পিয়ারীর কথায় বামদেবের সর্বাঙ্গ আক্রোশে যেন জ্বলে ওঠে রি-রি করে। অবজ্ঞাভরে জবাব দেন, শয়তান। তুই যদি ভেবে থাকিস এইভাবে অত্যাচার করে তুই আমার স্বীকৃতি পাবি তো ভুল করেছিস।

হুঁ, গর্তের মধ্যে পড়েও এখনো তড়পানি যায়নি। শোন বামদেববাবু, রানার কাছে যা কবুল করে বায়না নিয়েছ সেই পঞ্চান্ন হাজার টাকাই তোমাকে দেওয়া হবে, যদি ভালয় ভালয় এই স্ট্যাম্পযুক্ত বিক্রয়কোবালায় শান্ত সুবোধ ছেলের মত সই করে দাও। আর তাঁ্যাদড়ামি যদি কর তো, বিক্রয়কোবালায় সই তো করতেই হবে—একটি কপর্দকও পাবে না। এখন ভেবে বল কোন্ পথ নেবে।

মরে গেলেও বাড়ি বিক্রি করব না। বুঝতে পারছি সেই শয়তান ঘুঘু শেঠ রানারই সব কারসাজি। তুই তারই লোক। তোর মনিবকেও বলিস, আর তুইও শুনে রাখ্, তোদের হাতে মরব তবু সই করব না।

হুঁ সহজ পথে তুমি তাহলে এগুতে রাজী নও। বেশ, তবে সেই ব্যবস্থাই হবে। গুপী, তিন দিন ওকে কিছু খেতে দিবি না। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত নয়। থাক উপবাস দিয়ে, দেখি ও তেজ কতদিন থাকে।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল পিয়ারী।

গুপী এবারে এগিয়ে এসে বললে, কেন মিথ্যে ঝামেলা করছ বামদেববাবু। ভালয় ভালয় রাজী হয়ে যাও। আর রাজী যদি হয়ে যাও তো, আটকে কটা দিন তোমাকে রাখলেও দিব্যি রাজার হালে আরামে থাকবে। দলিলটা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই ড্যাং ড্যাং করে টাকা নিয়ে চলে যাবে।

বামদেব গুপীর কথায় কোন সাড়াই দেন না।

কেবল মনে মনে ভাবতে থাকেন, কিরীটীর পরামর্শে বহরমপুরে এসে তিনি কি

ফ্যাসাদেই না পড়লেন। এতদিনকার জানাশোনা কিরীটী—বন্ধু কিরীটী যে তাকে এই বিপদের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি কলকাতায় বসে রইল, দু'একদিনের মধ্যেই আসবে বলেছিল—নদিন আজ হয়ে গেল, হয়তো বেমালুম সব ভুলেই বসে আছে। বামদেবকে যে ঠেলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে হয়তো মনেই নেই তার।

শয়তানের পাল্লায় পড়েছেন, সহজে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে বলেও তো মনে হচ্ছে না। কত দুর্ভোগ আছে বরাতে কে জানে।

বিনয় আর সুজাতা তারাই বা কি করবে। জানতেও পারবে না তারা কাল সকালের আগে যে, শত্রু হাতে তিনি বন্দী হয়েছেন!

আর জানলেই বা এই শয়তানদের হাত থেকে রক্ষা করবে কেমন করে তারা তাঁকে।

ভোরের আলো একটু একটু করে আকাশপটে দেখা দেয়।

সুজাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিরীটী বলে, বামদেববাবু শত্রুর হাতে পড়লেও চিন্তা করবার কিছু নেই। কারণ আমার ধারণা চট্ করে প্রাণে মারবে না তাঁকে তারা।

প্রাণে মারবে না কি করে আপনি নিশ্চিত জানলেন কিরীটীবাবু?

কারণ এ তো বোঝাই যাচ্ছে, এই রত্নমঞ্জিলের ব্যাপারেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোন জায়গায় গুম করেছে। সেক্ষেত্রে তাকে প্রাণে মেরে ফেললে তো কোন সুবিধাই হবে না তাদের। তাহলে তো যেজন্য নিয়ে যাওয়া সেটাই ভেস্তে গেল।

সুজাতা না বুঝতে পারলেও বিনয় কিরীটীর কথার যুক্তিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এও বুঝেছে সে, এই বিপদে অস্থির হয়ে হা-হুতাশ করলেও কোন ফল হবে না। যা করবার ধীরেসুস্থে করতে হবে।

সত্যি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না সুজাতা। কিরীটীবাবু যখন এসে পড়েছেন, মেসোমশাইকে যেমন করে হোক উদ্ধার আমরা করবই।

বিনয়ের আশ্বাস পেয়ে সুজাতা নিশ্চিন্ত না হলেও চুপ করে থাকে।

কিরীটী বিনয়কে সম্বোধন করে এবার বলে, আমাদের সময় নষ্ট করলে চলবে না বিনয়বাবু। চলুন সবার আগে শ্রীমান মনোহরের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক তার কাছ থেকে কিছু বের করা যায় কিনা।

দুজনে আবার নীচে গেল।

কিন্তু ঘরের দরজা খুলে দেখা গেল ঘর শূন্য। ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

আশ্চর্য। মনোহর গেল কোথায়?

খোঁজ করতে দেখা গেল, ঘরের জানালার একটা শিক আলগা। সেই শিকটা তুলেই

ইতিমধ্যে মনোহর পালিয়েছে তাহলে।

কিরীটী কিন্তু মনোহরের পলায়নের ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হল না। সে বিনয়কে বললে, বিনয়বাবু, আপনি এখান থেকে কোথাও যাবেন না। আমি থানা থেকে এখুনি একবার ঘুরে আসছি।

থানায় গিয়ে কিরীটী দেখল মৃত্যুঞ্জয় বসে আছে তারই অপেক্ষায়।

কি খবর মৃত্যুঞ্জয়?

পিয়ারীকে follow করেছিলাম। শহর থেকে মাইল দুই দূরে গঙ্গার ধারে যে আরামবাগ আছে সেই দিকে তাকে যেতে দেখেছি।

থানার দারোগা রহমৎ সাহেবও সেখানে বসেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের কথা শুনে তিনি বললেন, সে কি! সে তো একটা পোড়ো বাড়ি। চারদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দিনের আলোতেও সেইখানে পা দিতে গা ছমছম করে, সাপে ভর্তি জায়গাটা।

কিন্তু রহমৎ সাহেবের কথায় কান না দিয়ে কিরীটী মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, কাল কতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর তুমি চোখ রেখেছিলে মৃত্যুঞ্জয়?

বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। সেই সময় তাকে আরামবাগের দিকে যেতে দেখি। ঘণ্টা দুয়েক তার ফেরবার প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম। কিন্তু তাকে আর ফিরতে দেখিনি। তাতেই আমার মনে হয়, ঐখানেই কোথাও পিয়ারী আড্ডা নিয়েছে।

কিন্তু সেখানে তো মানুষ থাকতে পারে না কিরীটীবাবু। আবার রহমৎ সাহেব বললেন।

তা না থাকুক, কিন্তু স্থানটিতে সাধারণের যাতায়াত যেমন নেই তেমনি নিরাপদও বটে। মৃদু হেসে কিরীটী বলে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, এদিকে কাল মাঝ-রাতে রত্নমঞ্জিল থেকে বামদেববাবুকে কারা যেন লোপাট করে নিয়ে গিয়েছে, শুনেছেন?

বলেন কি!

হ্যাঁ, ক্লোরোফরম করে নিয়ে গিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে ফিরে বাকি কথাটা বলে কিরীটী, তুমি স্টেশনটা watch করবে। রহমৎ সাহেব, আপনি স্টেশন মাস্টারকে একটা চিঠি দিয়ে দিন যদি প্রয়োজন হয় তো তিনি যেন ওকে সাহায্য করেন।

মৃত্যুঞ্জয়কে চিঠি দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে কিরীটী রহমৎ সাহেবকে বললে, বাছা বাছা সেপাইয়ের দরকার যে রহমৎ সাহেব।

কখন দরকার বলুন?

এখুনি। একবার আরামবাগে গিয়ে হানা দিতে হবে।

বেশ, এখুনি আমি ব্যবস্থা করছি।

বহরমপুর আসবার আগের দিন সিটি হোটেলে রাত বারোটার পর গিয়ে যোগানন্দের সঙ্গে দেখা করেছিল কিরীটী পূর্বেই।

যোগানন্দ কিরীটীর পরিচয় পেয়ে খুশী হয়। যোগানন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয় কিরীটীর।

অনিল চৌধুরীর মোটামুটি ইতিহাস যতটুকু যোগানন্দের জানা ছিল সে কিরীটীকে বলে, কিছুই না গোপন করে। এবং কিরীটীর কাছ থেকে যোগানন্দও রত্নমঞ্জিল ও সুবর্ণকঙ্কনের ইতিহাস শোনে।

যোগানন্দ আর দেরি করে না। কেন যেন তার মনে হয় আচমকা রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্ট অনিলের বুঝি একটা হদিস মিলল, আর তাই পরের দিনই প্রত্যুষে সবিতার সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাকে খুলে বলে।

যোগানন্দের মুখে সব কথা শুনে চকিতে সবিতার একটা কথা মনে পড়ে। অনিল ও বাণীর চলে যাবার দিন সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য অনিল বাইরে গেলে সবিতা কৌতূহলভরে পোটলাটি খুলেছিল এবং তার মধ্যে একটা কঙ্কন ও লাল মলাটের একটা নোটবই দেখেছিল। কিন্তু ভাল করে সব কিছু দেখবার সুযোগ পায়নি। সেই রাত্রেই স্বামী চলে যায় এবং বাণীকেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রথম বিবাহের পর তখনও তার সুখের সংসারে ভাঙন ধরেনি। শিক্ষার, ভদ্রতার রুচির গিলটির পাতটা ওপর থেকে খসে গিয়ে যখন অনিলের লোভী অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল ও নির্লজ্জ পরবর্তী চরিত্রের দৈন্যটা প্রকাশ পায়নি, তখন একদিন কথায় কথায় তার স্বামীর মুখেই তার স্বামীর শৈশবের ইতিহাস শুনেছিল সবিতা। নবাব-অনুগৃহীত তার মাতামহদের শৌর্য ও ঐশ্বর্যের কথা, বহরমপুরে তাদের রত্নমঞ্জিলের গল্প অনেক কিছুই শুনেছিল।

কিরীটী কর্তৃক বিবৃত কাহিনী যোগানন্দের মুখে শুনে সবিতার কেন যেন ধারণা হল, হয়তো অনিল বহরমপুরেই গিয়েছে।

এবং সে স্বামীর সন্ধানে বহরমপুর যাওয়াই স্থির করল।

যোগানন্দকে সেকথা বললেও।

যোগানন্দ কিন্তু একাই বহরমপুরে অনিলের খোঁজে যাবার কথা বলেছিল। কিন্তু সবিতা রাজী হল না।

বাণীর জন্য মনটা তার সত্যিই বিশেষ চঞ্চল হয়ে ছিল।

সে বললে, আমি তোমায় সঙ্গে যাব যোগেন। আমার স্থির বিশ্বাস, বাণী তার সঙ্গেই গিয়েছে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, সে যা খুশি তাই করুক কিন্তু বাণীকে আমার ফিরিয়ে আনতেই হবে।

সেইদিনই যোগানন্দ ও সবিতা বহরমপুর যাত্রা করে।

॥ তেইশ ॥

কিরীটী থানায় গিয়েছে, এখনো সেখান থেকে ফেরেনি। বিনয় ও সুজাতা দোতলার ঘরে বসে সেই সম্পর্কেই আলোচনা করছে। এমন সময় যোগানন্দ ও সবিতা এসে সেখানে উপস্থিত হল।

সুজাতা বা বিনয় কেউ তাদের চেনে না। জীবনে কখনো তো দেখেনি। কিন্তু যোগানন্দর মধ্যস্থতায় পরস্পরের পরিচয় হল।

সবিতা এ বাড়ির ভাগ্নে-বৌ।

সম্পর্কে সুজাতার বৌদি।

সবিতা কিন্তু সুজাতার মুখে গতরাত্রে বামদেবের আচমকা নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কথা শুনে ও এখানকার ক'দিনের ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বিনয়ও সংক্ষেপে রত্নমঞ্জিলের বিক্রয়-ব্যাপার নিয়ে গত মাসখানেকের ঘটনা ও সুবর্ণকঙ্কনের সমস্ত ইতিহাস সবিতাকে বলে।

সবিতার চোখে যেন নতুন আলো ফুটে ওঠে। ইদানীংকার স্বামীর অধঃপতনের ইতিহাসটাও ঐ সঙ্গে সঙ্গে সবিতার চোখের ওপরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিমতী সবিতার মনে হয় এই দুই ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা যোগসূত্র আছে। একে অন্য হতে বিচ্ছিন্ন নয়।

আর তাই যদি সত্য হয় তো এদের কাছে লজ্জায় সে মুখ দেখাবে কেমন করে?

এই সুজাতা, এই বিনয় তারা তো অনিলের থেকে তাকে পৃথক ভাববে না। সত্যি হোক মিথ্যে হোক অনিলের কলঙ্কের দাগ তো তার গায়ে কালি ছিটোবে।

তবু মনে মনে সে বার বার বলে, হে ভগবান। যেন সত্য না হয়। এই জঘন্য ঘটনার সঙ্গে যেন তার স্বামী না জড়িয়ে থাকে।

কিন্তু সবিতা জানত না নির্মম ভাগ্যবিধাতা তাকে কোন্ পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। নির্যাতন ও অপমানের এখনো কত বাকি।

তাড়াতাড়ি বাণী নোটবুকটার পাতার পর পাতা উল্টেপাল্টে পড়ে চলে কিন্তু বিশেষ কিছুই আর চোখে পড়ে না। শেষের দিকে ছাড়া-ছাড়া পাতাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, খেদোক্তিতে ভরা। একটা অনুশোচনা যেন বড় করুণভাবে

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এমন সময় হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাণী খাতাটা যথাস্থানে রেখে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘরে এসে একটু পরেই তার বাবা অনিল যে প্রবেশ করল, বাণী তা বুঝতে পারে।

জেগে থাকলেও ঘুমের ভান করে কাঠ হয়ে শয্যায় পড়ে থাকে বাণী।

অনিল ঘরে ঢুকে দেশলাই দিয়ে প্রদীপটা জ্বালাল। প্রদীপের আলোয় ঘুরে একবার অদূরে শয্যায় শায়িত ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। তারপর পুঁটলি খুলে আলোর সামনে নোটবইটা নিয়ে বসল।

শেষরাত্রের দিকে বাণী কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই জানে না।

একটা ফিসফাসে কথাবার্তার শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়।

চমকে ওঠে বাণী রত্নমঞ্জিলের সেই ভৃত্য মনোহরকে ফিসফিস করে তার বাপের সঙ্গে কথা বলতে শুনে।

ঘরের মধ্যে আমাকে শিকল তুলে আটকে দিয়েছিল কর্তা। কিন্তু বেটারা তো জানত না ঘরের দক্ষিণের জানালার একটা শিক আলগা। শিকটা তুলে পালিয়ে এসেছি। অনেক লোকজন এসে গিয়েছে রত্নমঞ্জিলে।

ওরা কে বুঝতে পারলে মনোহর? বাধা দেয় অনিল।

না। তবে কথাবার্তায় মনে হল পুলিসের লোক। আমি আর এখানে এক দণ্ডও থাকব না। ধরতে পারলেই ওরা আমাকে পুলিসে দেবে।

ভয় পাচ্ছ কেন মনোহর। পুলিসে দিলেই অমনি হল? ওরা জানতেই পারবে না যে আমারা এখানে থাকতে পারি।

না কর্তা, কাল সকালে বিনয়বাবুর কথা শুনে বুঝেছি, আপনাদের সন্ধান না এখনো পেলেও ওরা টের পেয়েছে এই জঙ্গলের মধ্যে কেউ থাকে। পুলিস নিয়ে খোঁজে আসলে ঠিক সবাইকে খুঁজে বের করবে। সময় থাকতে আপনিও পালান। মনোহর উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলে যায়।

না। সেই সিন্দুক না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমি নড়ছি না।

আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে কর্তা, সত্যি মাটির নীচে কোন রকম সিন্দুক পোঁতা থাকলে আমরা কি খুঁজে পেতাম না এতদিন। আমরা এই এক মাস ধরে বাড়ির আশপাশ কত জায়গাতেই তো মাটি খুঁড়ে দেখলাম। আমার মনে হয় যদি কিছু থাকে তো ঐ বাড়ির মেঝের নীচেই কোথাযও পোঁতা আছে।

না, তা হতেই পারে না।

তাই যদি না হবে তো ঐ বাড়িটা কিনবার জন্য সবাই এত চেষ্টা করছে কেন। এই তো দিন দুই আগে আর একজনও বাড়িটা কিনতে এসেছিল, বিনয়বাবু লোকটাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

মনোহরের যুক্তিটা কেন যেন অনিলের মনে লাগে।

হয়তো মনোহরের কথাই ঠিক। নচেৎ নোটবুকের নির্দেশমত কই কোন শিলাখণ্ডই তো এই এক মাস ধরে খুঁজে-খুঁজেও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও পাওয়া গেল না।

তাছাড়া মনোহর যে বাদশাহী মোহর দুটি পেয়েছিল, সেও তো ঐ বাড়িরই মেঝের একটা ফাটলের মধ্যে সাপ মারতে গিয়েই।

অনিল বলে, মনোহর, তাহলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব, চল আজই রাত্রে ঘরের সেই মেঝেটা খুঁড়ে দেখি।

আমি আর ওর মধ্যে নেই বাবু। যা করবার আপনি করুন গে—আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিন, আমি চলে যাই।

নিশ্চয়ই, মিটিয়ে দেব বৈকি—আগে টাকা পাই, তবে তো। কথার খেলাপ আমি করি না। যা পাব তার অর্ধেক ভাগ তোমার।

না কর্তা, আধাআধি বখরায় কাজ নেই আর, আমাকে হাজারখানেক টাকা দিন যেমন আগে বলেছিলেন, আমি চলে যাই। মাটি খুঁড়ে যা পাবেন তা আপনিই সব নেবেন।

টাকা এখন আমি কোথায় পাব, টাকা কি আমার হাতে আছে নাকি?

ওসব বাজে কথা রাখুন দেখি। যা দেবেন বলেছিলেন—হাজার টাকা, এখুনি মিটিয়ে দিন। আপনার কথায় লোভে পড়ে এতদিনকার পুরনো মুনিবের সঙ্গে অনেক নেমকহারামি করেছি। আর নয়, দিন টাকাটা বের করে দিন, ভোর হয়ে এল, ছুটে গিয়ে আবার আমাকে শেষরাত্রের প্রথম ট্রেনটা ধরতে হবে।

বললাম তো, টাকা এখন কোথায় যে দেব।

আবার চালাকি খেলছেন কেন? বার করুন তো টাকাটা চটপট।

বলেছি তো টাকা নেই, তা দেব কোথা থেকে?

টাকা নেই মানে। মনোহরের কণ্ঠস্বরটা এবারে বেশ স্পষ্ট ও ঝাঁঝালো মনে হয়।

টাকা নেই মানে টাকা নেই। চলে যেতে হয় চলে যা। ঠিকানা রেখে যা, টাকা আমি ঠিক পৌঁছে দেব।

স্বাইরি! সোনার চাঁদ আমার!

মুহূর্তে অনিলের চোখ দুটো আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বাঘের চোখের

মত তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে যেন।

চাপাকণ্ঠে গর্জন করে ওঠে, এই উল্লুক। মুখ সামলে কথা বল্।

ওঃ, আবার চোখরাঙানি। এক ঘায়ে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেব।

মনোহরের মুখের কথাটা শেষ হয় না—অকস্মাৎ যেন বাঘের মতই চোখের পলকে লাফিয়ে পড়ে অনিল মনোহরের ওপরে এবং লোহার মত শক্ত দু হাতে তার গলাটা টিপে ধরে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে এতক্ষণে বাণী, বাবা। বাবা।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে মনোহর টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায় এবং অনিল দু হাতে তার গলা টিপে বুকের ওপরে উঠে বসে।

বাণী ছুটে এসে বাপকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে দু হাতে টেনে ধরে। কিন্তু বৃথা, অনিল তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে।

আকস্মিক বেকায়দাভাবে আক্রান্ত হয়ে মনোহরও সুবিধা করতে পারে না। অনিলের হাতের লৌহকঠিন আসুরিক পেষণে খুব শীঘ্রই কাহিল হয়ে পড়ে।

অনিল হয়তো মনোহরকে শেষই করে ফেলত, কিন্তু বাণী মরীয়া হয়ে বাধা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মনোহরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় অনিল।

দু পাশের শিরা ফুলে উঠেছে, রক্তচাপে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে মনোহরের। হাঁপাচ্ছে সে তখন। একটা লাথি দিয়ে মনোহরকে ঘর থেকে বের করে দেয় অনিল।

মনোহরও একছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অনিল গর্জাতে থাকে, হারামজাদাকে শেষ করে ফেলাই উচিত ছিল। তুই বাধা দিলি কেন? টাকার সাধ ওর জন্মের মত মিটিয়ে দিতাম।

বাণী স্তম্ভিত নির্বাক।

বাপের ওই মূর্তির সঙ্গে পূর্বপরিচয় তো তার কখনো ঘটেনি। এ যে তার কল্পনাতীত। এই তার বাপ।

হাত-পা যেন বাণীর অসাড় হয়ে গিয়েছে। শব্দ বের হয় না গলা দিয়ে।

॥ চব্বিশ ॥

বেলা প্রায় নটা নাগাদ জনদশেক পুলিস নিয়ে কিরীটী ও রহমৎ সাহেব আরামবাগে এসে উপস্থিত হল।

অতীতের নবাবী ঐশ্বর্যের ভগ্নস্তূপ

বেদনার্ত হাহাকারে যেন আজও স্মরণ করিয়ে দেয় এক হারিয়ে যাওয়া দিনকে।

দেখছেন তো মিঃ রায়! এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোন মানুষ কি থাকতে পারে? রহমৎ সাহেব আবার বলেন।

কিরীটী এবারেও তাঁর কথার কোন জবাব দেয় না। এগিয়ে চলে নিঃশব্দে। পুলিস বাহিনীকে সে অনুসরণ করতে বলে।

ঘরের পর ঘর।

কিন্তু কোন ঘরেই জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ধূলিতে আকীর্ণ—বদ্ধ বায়ুতরঙ্গে একটা ধুলো-বালির ভ্যাপসা গন্ধ। সকলে এসে একটা প্রশস্ত হলঘরের মত জায়গায় পৌঁছায়। এবং হঠাৎ ঐ সময় একটা পদশব্দ কানে আসে কিরীটীর। সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয় তার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

রহমৎ সাহেবের কানেও পদশব্দটা প্রবেশ করেছিল। তিনিও থমকে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিমধ্যে।

স্পষ্ট পদশব্দ যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

চারিদিকে বড় বড় কারুকায করা থাম। কিরীটী চোখের ইঙ্গিতে মুহূর্তে সকলে এক-একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে।

পদশব্দ আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আরো এগিয়ে আসছে।

জায়গাটায় দিনের বেলাতেও পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ না করায় আবছা একটা আলো আঁধারি।

কে ঐ এগিয়ে আসছে!

কিরীটীর চিনতে কষ্ট হয় না অস্পষ্ট আলো-আঁধারেও। লোকটা পিয়ারী।

তাহলে তার অনুমান ভুল হয়নি! পিয়ারী এই পড়ো আরামবাগেই এসে আশ্রয় নিয়েছে!

নিশ্চিন্ত মনেই পিয়ারী এগিয়ে আসছে, ওষ্ঠে ধৃত তার একটি জ্বলন্ত সিগারেট।

কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা বের করে কিরীটীর নির্দেশে রহমৎ সাহেব প্রস্তুত থাকেন।

এবং হাত পাঁচেকের ব্যবধান যখন তার পিয়ারী থেকে, আচমকা থামের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলে, পিয়ারী, হাত তোল!

ভূত দেখবার মতই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে পিয়ারী। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে পিয়ারী বলে, এসবের মানে কি? কে তুমি?

আশ্চর্য, আমাকে তো তোমার চেনা উচিত ছিল পিয়ারী! এর আগেও তো দু

দুবার আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়েছে। ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে এবারে কিরীটী বলে।

পিয়ারী চুপ করে থাকে প্রত্যুত্তরে। কারণ ইতিমধ্যে তার চারিপাশে সশস্ত্র এক পুলিস বাহিনী নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

বামদেব অধিকারীকে কোথায় রেখেছ বল? কিরীটীই আবার প্রশ্ন করে।

বামদেব অধিকারী!

নামটা চেনো না বলে মনে হচ্ছে নাকি!

না, জীবনে কখনো ও নাম আমি শুনিনি এর আগে এবং বুঝতে পারছি না, কেনই বা আপনি এভাবে এসে আমাকে ঘিরেছেন?

এমন চমৎকার জায়গাতে ধরা পড়েও বুঝতে পারছ না কেন তোমাকে আমরা ঘিরে দাঁড়িয়েছি।

না। আমি তো এখানে বেড়াতে এসেছি।

বেড়াতেই এসেছ বটে! ব্যঙ্গভরে কথাটা বলে কিরীটী। তারপর রহমৎকে বলে, তাহলে রহমৎ সাহেব, বাকি জায়গাগুলো খোঁজ করে দেখুন—এইখানেই কোথাও বামদেবকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

রহমৎ সাহেব তখন কিরীটীর নির্দেশে দুজন সশস্ত্র পুলিসকে পিয়ারীর পাহারায় রেখে বাকী চারজনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

বেশী আর খুঁজতে হল না বামদেব অধিকারীকে।

তবে ছটুলাল ও গুপীনাথ আগেভাগেই সরে পড়ায় তাদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

পিয়ারীকে গ্রেপ্তার করে ও বামদেব অধিকারীকে মুক্ত করে সকলে রত্নমঞ্জিলে ফিরে এল।

সেখানে তখন বাণী তার মা'র কাছে গত এক মাসের কাহিনী বলে চলেছে আর সকলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে।

বাণী একসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পিতার সান্নিধ্য সত্যিই সে আর যেন সহ্য করতে পারছিল না।

অনিল চিৎকার করে ডাকে, কোথায় যাচ্ছিস বাণী?

বাণী কোন জবাব দেয় না বাপের কথায়।

বাণী সোজা জঙ্গলের পথ ধরে রত্নমঞ্জিলের সামনে এসে দাঁড়াল। স্থিরপ্রতিজ্ঞ তখন সে, বামদেব অধিকারীকে সব কথা খুলে বলবেই।

নিচে কাউকে না দেখতে পেয়ে বাণী সিঁড়ি দিয়ে সোজা একেবারে দোতলায় উঠে যায়।

বিনয় ও সুজাতা তাকে চিনতে পারে না, কিন্তু সবিতা ও যোগানন্দ তাকে চিনতে পারে।

সবিতা চিৎকার করে ওঠে, এ কি, বাণী!

বাণী কম আশ্চর্য হয়নি। সে বলে, মা!

বাণী ছুটে এসে দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে।

বামদেবকে নিয়ে কিরীটী ফিরে আসবার পর যেন একটা আনন্দ-কোলাহল পড়ে যায়।

বাণীর মুখে সমস্ত ইতিহাস শুনে তখনি সকলে মিলে জঙ্গলের মধ্যে পড়ো বাড়িতে অনিলের খোঁজে যায় কিন্তু তার সন্ধান সেখানে ওরা পায় না।

হতাশ হয়েই সকলে ফিরে আসে।

বাণী কিন্তু একসময় তার মাকে আড়ালে ডেকে বলে, মা, বাবা নিশ্চয়ই এখনো আশেপাশে কোথাও আছে। আর আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো রাত্রে বাবা রত্নমঞ্জিলে আসবেই।

মেয়ের কথা শুনে সবিতা কিছু বলে না, চুপ করে থাকে।

দুপুরের ডাকে কিরীটী একখানা চিঠি পেল।

হরিদ্বার থেকে এসেছে চিঠিখানা।

॥ পঁচিশ ॥

তারপর এল রাত্রি।

সকলেই যে যার শয্যায় নিদ্রাভিভূত।

কেবল চোখে ঘুম ছিল না সবিতার। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা তাকে যেন কিছুতেই সুস্থির হতে দিচ্ছিল না।

অনেক আশা নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল সবিতা কিন্তু সব ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

নির্মম ভাগ্যবিধাতা তাকে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে বার বার কিন্তু সবিতা ভেঙে পড়েনি।

সমস্ত দুর্ভাগ্যকে সে বুক পেতেই গ্রহণ করেছিল তবু সে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারল না। কেন?

আর একজনও সে রাত্রে জেগে ছিল। কিরীটী রায়

হঠাৎ মধ্যরাত্রির সুগভীর সুপ্তি পীড়িত হয়ে ওঠে একটা যান্ত্রিক ঠং ঠং শব্দে। উঠে পড়ল শয্যা হতে সবিতা।

অন্ধকারেই পায়ে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

এগিয়ে চলে শব্দটাকে অনুসরণ করে।

ঘরের দরজাটা ভেজানো।

ভেজানো দরজাটা ঠেলে নিঃশব্দে ভিতরে পা দিল সবিতা।

পাগলের মতই একটা ছোট লোহার শাবল নিয়ে অনিল ঘরের মেঝেতে সর্বত্র ঠুকে ঠুকে চলে।

কি করছ?

কে? চকিতে ফিরে দাড়ান অনিল। এ কি, সবিতা তুমি!

হ্যাঁ, কিন্তু কি করছো তুমি? সবিতা আবার প্রশ্ন করে শান্ত গলায়।

কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে?

সে প্রশ্নের জবাব পরে দেব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বলতে বলতে সবিতা দরজার খিলটা তুলে দিয়ে বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাড়াল।

সবিতার দাঁড়াবার ঋজু কঠিন ভঙ্গী, তার মুখের প্রত্যেকটি রেখা, তার কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা অনিলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

এ যেন তার চেনা-পরিচিত সবিতা নয়। সেই চিরসহিষ্ণু, নির্বাক নমনীয় সবিতা নয়।

এ সবিতাকে সে কোনদিন দেখেনি। কোনদিন চেনে না। এ তার বিবাহিত স্ত্রী সবিতা নয়। এ যেন অন্য কোন এক নারী।

কই, জবাব দিচ্ছ না কেন? এখানে এত রাত্রে তুমি কি করছ?

আকস্মিক বিহ্বলতাটা অনিলের ততক্ষণে কেটে গিয়েছে। দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিল বলে, যাই করি না কেন, সে জেনে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এখান থেকে যাও।

না। তোমার জবাব না নিয়ে আমি যাব না।

সবিতা! চলে যাও বলছি এখান থেকে।

না। বললাম তো আগে আমার কথার জবাব দাও।

সবিতা!

না, অনেক সহ্য করেছি তোমার অত্যাচার, অন্যায় জুলুম মুখ বুজে এতকাল। কিন্তু

আর সহ্য করব না। জেনো সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

সবিতা, এখনো চলে যাও বলছি।

ছি, ধিক্ তোমাকে। একবার ভেবে দেখ তো কোথা থেকে কোথায় তুমি নেমে এসেছ আজ। একদিন কি তুমি ছিলে, আর আজ তুমি কি হয়েছ।

সবিতা, এখনো বলছি চলে যাও এখান থেকে। চিৎকার করে ওঠে অনিল স্থানকাল ভুলে।

চল—এখান থেকে আমরা চলে যাই চল। ওপরে কিরীটীবাবু ওৎ পেতে আছেন তোমাকে ধরবেন বলে। ধরা পড়লে মেয়েব কাছে তুমি মুখ দেখাবে কি করে। কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে যায় সবিতা স্বামীর দিকে। না, আর অন্যায় আমি তোমায় করতে দেব না।

এখান থেকে যাও সবিতা। অনিল বলে।

বললাম তো আমি যাব না। দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে সবিতা বলে।

যাবে না।

না। যদি যাই তো, তোমায় সঙ্গে নিয়েই যাব—একা নয়।

তুমি যাবে না সবিতা?

না।

শাবলটা হাতে সামনে এসে দাঁড়ায় অনিল।

তার চোখের মণি দুটো যেন বাঘের চোখের মত জ্বলছে।

সবিতা।

শোন তুমি হয়তো জান না—ওপরে কিরীটীবাবু ওৎ পেতে আছেন। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে তুমি এসেছ—তোমার হাতে হাতকড়ি পড়বে। আমি জানতাম—বুঝতে পেরেছিলাম তুমি আসবেই। তাই না ঘুমিয়ে কান পেতে অপেক্ষা করেছিলাম।

কিরীটী বায় করবে আমার কচুটা।

আচ্ছা তোমার ঘৃণা লজ্জা বলেও কি কিছু নেই? নিজের সন্তানেব কাছে আজ তুমি কত ছোট হয়ে গিয়েছ জান?

হিতোপদেশ।

না, হিতোপদেশ নয়—এ শুধু আমার অনুরোধ। এতকাল তো তোমার নিজের মতে চলে দেখলে, এবারে না হয় ফেরো—

ফিরব বললেই আজ আর ফেরা যায় না।

যায়—খুব যায়। চল এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই।

পালিয়ে যাব ?

হ্যাঁ, দুজনে মিলে আমরা রোজগার করব। নতুন জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধব—যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।

ও নাটকে আর যে ই বিশ্বাস করুক আমি করি না, শূন্য হাতে ভাগ্যের সঙ্গে দুনিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ করা যায় না সে কথাটা আর কেউ না বুঝুক কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি সবিতা। শোন, যে কুবেরের ঐশ্বর্য আমি প্রায় মুঠোর মধ্যে এনেছি সেটা আমায় মুঠো ভরে নিতেই হবে।

অকস্মাৎ একটা মতলব যেন সবিতার মাথার মধ্যে খেলে যায়। সে বলে, কিন্তু সে তুমি কোনদিনই পাবে না।

পাব—পাব।

না। তার কারণ, তোমার কাছে যে কঙ্কনটা ছিল সেটা আমি সরিয়ে ফেলেছি।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় অনিল, সবিতা!

অনিলের চোখের মণি দুটো যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মণির মত জ্বলছে।

সবিতা!

হ্যাঁ, সে কঙ্কন এখন আমার কাছে। আর শুধু তাই নয়, যে কুবেরের ঐশ্বর্যের জন্যে তুমি ক্ষেপে উঠেছ তাও তোমার আগেই দুটো কঙ্কনের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়েছে।

সে কি! সে কঙ্কন—

পেয়েছি। তোমার ডেবায় বাক্সর মধ্যে পেয়েছি—তুলোর ওপর রাখা ছিল।

সে কঙ্কন তুমি ঐ রামদেবকে দিয়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ, তার জিনিস—

সবিতার কথা শেষ হল না, কেন—কেন দিলি সে কঙ্কন হারামজাদী—বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার মত শক্ত দু হাতে সবিতার গলাটা চেপে ধরে অনিল।

বল্ বল্—কেন?

নিষ্ঠুর লৌহকঠিন হাতের সেই পেষণে ক্রমশঃ সবিতার দেহটা শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে।

চোখের মণি দুটো কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসে।

অনিল যেন পেষণ করে চলেছে।

আর উন্মাদের মত বলে চলেছে, বল্ বল্—কেন?

হঠাৎ ঐ ঘরের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল এবং কিরীটী এসে ঘরে

প্রবেশ করল।

সবিতার অনুমান মিথ্যা নয়।

সত্যিই কিরীটী বাণীর মুখ থেকে আনুপূর্বিক সব শুনে জঙ্গলের মধ্যে অনিলের ঘরে গিয়ে হানা দেয় এবং সেই ডায়েরী ও কঙ্কন উদ্ধার করে।

এবং সেও বুঝতে পেরেছিল, শেষ চেষ্টা অনিল করবেই এবং অনিল রত্নমঞ্জিলে আসবেই, তাই সে ওৎ পেতে ছিল।

কিরীটী এল বটে, কিন্তু বড় দেরিতে।

তখন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।

সবিতার শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে অনিলের নৃশংস নিষ্ঠুর পেষণে।

হাত তুলুন অনিলবাবু। রহমৎ সাহেব বললেন। তিনিও কিরীটীর সঙ্গে এসেছেন। রহমৎ সাহেবের হাতে পিস্তল।

অনিলের হাত থেকে সবিতার শিথিল মৃতদেহটা ঝপ করে মাটিতে পায়ের সামনে পড়ে যায়।

এ কি অনিলবাবু—এ কি। কিরীটী চিৎকার করে ওঠে।

অনিলের সম্বিৎও বুঝি তখন ফিরে এসেছে।

সে প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল।

কিরীটীর দিকে ফিরেও তাকায় না—সে তাকিয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে ভূপতিত তারই পায়ের সামনে সবিতার দিকে।

তারপরই নিষ্প্রাণ দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠে, সবিতা—সবিতা—না—না – না—

কিরীটী স্থির নিস্পন্দ বোবা—পাথর যেন।

সবিতা—সবিতা—কথা বল সবিতা—সবিতা—আমি—আমি ওকে হত্যা করেছি—আমি আমার স্ত্রীকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছি। দারোগাবাবু গ্রেপ্তার করুন আমায়—ফাঁসী দিন!

এ কাহিনীর এখানেই শেষ।

ডাইরীর মধ্যে বর্ণিত সিন্দুকের কোন সন্ধানই কেউ জানতে পারেনি।

রত্নমঞ্জিলের রত্নভাণ্ডার মাটির নীচেই গুপ্ত থেকে গিয়েছে।

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত ॥